গৌড় থেকে সোনার গাঁ

শফীউদ্দীন সরদার

গৌড় থেকে সোনার গাঁ

১

ঃ দাঁড়ান, এগুবেন না —

ঃ জি ?

ঃ আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়ে, তবে আজ এগুবেন আপনি ওদিকে।

থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলেন তরুণ সৈনিক শরীফ রেজা। এক অপরূপা সুন্দরী তাঁর পথ আগলে দাঁড়িয়েছেন। নয়া যৌবনে সমৃদ্ধা এক আকর্ষণীয়া তরুণী। আটিশাটি করে এক নীল শাড়ী পরণে। লাল জামা গায়ে। আঁচলখানা ঘাড় পেঁচিয়ে কটি দেশে গোঁজা। মুক্ত মাথার বামপাশে বলিষ্ঠ এক খোঁপা। রণাঙ্গিনী বেশের এক রূপসী নারীমূর্তি। শেষ বেলার রোদ এসে সর্বাঙ্গে ঠিকরে পড়ায় সে মূর্তি আরো দীপ্ত হয়ে উঠেছে। মুখে তাঁর ক্ষোভ, আর দু'চোখে জিজ্ঞাসা। দাঁড়িয়ে গিয়ে শরীফ রেজা থতমত করে বললেন — প্রশ্নের জবাব!

তরুণীটি শক্ত কণ্ঠে বললেন — হ্যাঁ; প্রশ্নের জবাব। কে আপনি ? কি আপনার পরিচয় ?

তরুণীটির মুখের দিকে চোখ তুলেই চোখ দু'টি তৎক্ষণাৎ নামিয়ে নিলেন শরীফ রেজা। এত আগুন হয়তো তিনি সহ্য করতে পারলেন না। মাটির দিকে নজর রেখে ধীরকণ্ঠে বললেন — আমি মানে আমি একজন পথিক।

ঃ পথিক!

ঃ জ্বি। আপাততঃ এই আমার পরিচয়।

ঃ কোথা থেকে আসছেন ?

ঃ গৌড় থেকে।

ঃ গৌড় থেকে ?

ঃ জ্বি, লাখ্‌নৌতি বা গৌড় থেকে।

ঃ যাবেন কোথায় ?

ঃ সোনার গাঁ।

তরুণী এ জবাবে আরো খানিক সজাগ হয়ে উঠলেন। বললেন — এর আগেও আপনি এসেছেন এখানে কয়েকবার। আসেন নি ?

ঃ জ্বি, এসেছি।

ঃ এখান থেকে তাহলে ঐ সোনার গাঁয়েই গিয়েছেন ?

ঃ হ্যাঁ, তাই গিয়েছি।

ঃ কাজটা কি সেখানে ?

ঃ কাজ মানে — কিছুটা রাজনৈতিক ব্যাপার।

ঃ কি রকম! গৌড়ের লোকের সোনার গাঁয়ে রাজনৈতিক ব্যাপার।

ঃ মানে প্রশাসনিক ব্যাপার।

ঃ প্রশাসনিক ব্যাপার মানে ?

তরুণীটির নজর আরো তীক্ষ্ণ হলো। শরীফ রেজা এ প্রশ্নের থৈই খুঁজে পেলেন না। বললেন — এর তো কোন মানে নেই।

ঃ মানে অবশ্যই আছে। আপনারা, ঐ গৌড় বা লাখনৌতির লোকেরা, সোনার গাঁয়ের দোস্ত নন, দুষমন। লাখ্নৌতির লোক সোনার গাঁয়ে যাওয়া মানেই দুষমনী করতে যাওয়া।

ঃ দুষমনী করতে যাওয়া।

ঃ বিলকুল। অন্য কিছু ভাবার মতো মওকা কেউ আর রাখেননি। আপনিও বোধ হয় ঐ দিল্লীওয়ালা একজন ?

ঃ দিল্লীওয়ালা মানে ?

ঃ মানে আপনি কোন্ মুলুকের লোক ? এই বাঙ্গালার, না দিল্লী থেকে এসেছেন ?

ঃ জ্বিনা, আমি বাঙ্গালা মুলুকের লোক। এই বাঙ্গালা মুলুকেই জন্ম আমার।

ঃ বাঙ্গালা মুলুকেই জন্ম ?

ঃ জি, এই বাঙ্গালাই আমার জন্মভূমি।

ঃ তাজ্জব! নিজের জন্মভূমিকে জানি সকলেই ভালবাসে। জন্মভূমির প্রতি সবারই একটা দুর্বলতা থাকে। আপনাদের দীলে কি তা একবিন্দুও নেই ?

শরীফ রেজা এতক্ষণ সহজভাবেই জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তরুণীটির প্রশ্নের ধরন দেখে তিনি ক্রমশঃই বিস্মিত হতে লাগলেন। অল্প একটু চোখ তুলে আবার তিনি তরুণীর মুখের দিকে তাকালেন। আবার তাঁর দুই চোখ ঝল্সে গেল আগুনে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ আবার নীচের দিকে টেনে নিয়ে শরীফ রেজা বললেন — আপনার এ ধরনের প্রশ্ন করার হেতু ?

তরুণীর কণ্ঠ আরো শক্ত হলো। বললেন — বাঙ্গালা মুলুকের লোক হয়েও আপনারা এই বাঙ্গালাটাকে আজাদ হতে দিলেন না ?

শরীফ রেজাও সজাগ হয়ে উঠলেন। বুঝতে তাঁর আর ফাঁক কিছু রইলো না যে, শুধু বাইরেই নয়, এ তরুণীর আগুন আছে ভেতরেও। তিনি সবিস্ময়ে বললেন — আমরা দিলাম না ?

ঃ কৈ দিলেন ? গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেব ঐ দিল্লীর খপ্পর থেকে খালাস হওয়ার কোশেশ করতেই তো আপনারা তাঁকে জানে প্রাণে মারলেন।

ঃ মারলাম!

ঃ গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর যে নিহত, তা জানেন ?

ঃ হ্যাঁ। সেই খবর শুনেই আমি আসছি।

ঃ তাকে আপনারা মারলেন কেন ?

ঃ আপনি ভুল করছেন। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরকে মেরেছে দিল্লীর হুকুম তামিলকারী কর্মচারীরা। আমরা কেউ মারিনি। বাঙ্গালা মুলুকের খাশ আদমী যাঁরা, তাঁরা অধিকাংশেরাই চাননি — গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের খোয়াবটা বরবাদ হয়ে যাক।

ঃ লাখ্নৌতিতে বাঙ্গালা মুলুকের দেশ দরদী খাশ লোক কেউ আছে ? লাখ্নৌতির প্রশাসনের সবাইতো ঐ দিল্লীর হুকুম তামিলকারী গোলাম। খুব সম্ভব আপনিও তাই।

ঃ গোলাম তো বাঙ্গালা মুলুকের প্রশাসনের সবাই। লাখ্নৌতি, সাতগাঁ, সোনার গাঁ — সব স্থানের প্রশাসনের লোকেরাই তো গোলামী করছেন দিল্লীর হুকুমাতের। কোন অঞ্চলের শাসনকর্তাও কেউ স্বাধীন কিছু নন। তাঁরাও গোলামী করছেন দিল্লীর। ঐ গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবও একদিন দিল্লীর সুলতানের গোলামই ছিলেন।

ঃ কিন্তু পরে তো তা ছিলেন না। তিনি এই মুলুকটাকে আজাদ করতে চেয়েছিলেন। একটা স্বাধীন সাল্তানাত্ কায়েম করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই আপনারা, লাখ্নৌতি আর সাতগাঁয়ের লোকেরা, তা হতে দিলেন না। কেন আপনারা হতে দিলেন না তা ? কেন ?

ঃ জি ?

ঃ বেচারা গৌড় থেকে সোনার গাঁয়ে এসেও ঐ দিল্লীওয়ালাদের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেন না। আজাদীর জন্যে তাঁকে জান দিতে হলো।

তরুণীর মুখমণ্ডল মলিন হলো। এতদৃশ্যে শরীফ রেজা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন আপনি ? আপনি কে ?

তরুণীটির জবাব দেয়ার ফুরসুত কিছু রইলো না। সঙ্গে সঙ্গে বল্লমধারী এক বিকটকায় দস্যু বা পালোয়ান মাফিক লোক এসে লাফিয়ে পড়লো সামনে। বল্লম বাগিয়ে ধরে আওয়াজ দিলো — খবরদার!

সঙ্গে সঙ্গে শরীফ রেজারও হাত গেল তলোয়ারের বাঁটে। হকচকিয়ে গিয়ে তিনি বললেন — জি ?

পালোয়ানটি সবিক্রমে বললো — আম্মিজানের হদিস নেয়ার কোশেশ কিছু করবেন তো এই বল্লম আপনার কলিজাটা দু'ফাঁক করে দেবে।

ইষৎকণ্ঠে বাঁধা দিলেন তরুণী। অল্প একটু হাত তুলে বললেন — বাবা!

শরীফ রেজা যে স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন সেটা একটা সরু রাস্তা। একপাশে ঈষৎ-উঁচু প্রাচীরঘেরা ফুলবাগান, অন্যপাশে কাতারবদ্ধ পরিচ্ছন্ন ঘরদুয়ার। পথটা এর মাঝ দিয়ে। অশ্বটা সদর রাস্তায় বেঁধে রেখে শরীফ রেজা সামনের দিকে এগুচ্ছিলেন। তাঁর গন্তব্যস্থল এই ঘরদোরগুলোর ওপারেই প্রশস্ত এক মকান। অবসরপ্রাপ্ত ফৌজদার সোলায়মান খানের বাড়ী। সোলায়মান খানের বাড়ীর এটা সম্মুখের দিক নয়, এ দিকটা পেছন দিক। সদর রাস্তা আরো খানিক ডাইনের দিকে ঘুরে খান সাহেবের মকানের সদর দিকে গেছে। খুব বেশী তাড়া থাকায়, শরীফ রেজা সদর রাস্তার এখানেই অশ্ব বেঁধে রেখে সোজা পথ ধরেছিলেন। সামনের দিকে এগুতেই তরুণীটি ফুলবাগানের ফটকে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। এক্ষণে ঐ ঘরদুয়ারের দিক থেকে পালোয়ানটি এসে রাস্তা আগ্‌লে দাঁড়ালো।

শরীফ রেজা হতভম্ব হয়ে গেলেন। সেই সাথে বুঝতে পারলেন, তরুণীর এই নির্ভীকতা অসার বা অলীক কিছু নয়। তাঁর পায়ের তলে মাটি আছে মজবুত। পালোয়ানটি গর্জন করে উঠতেই শরীফ রেজা সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যখন বুঝলেন — পালোয়ানটি একেবারেই হিংস্র কিছু নয়, তখন তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন — কি ব্যাপার! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে ?

জবাব দিলেন তরুণী। বললেন — বোঝার কিছুই নেই এখানে। আমি কে, কার কন্যা, কি নাম — এসব কথা থাক। যে প্রশ্ন আমি আপনাকে করেছি, পারলে তার জবাবটাই দিন। কেন আপনারা এ মুলুকটাকে আজাদ হতে দিলেন না ? এ মুলুকের লোক হয়ে কেন আপনারা এ দুষমনী করলেন ?

শরীফ রেজা বললেন — আবারও আপনি ভুল করছেন। আমি আপনার এই 'কেন'র জবাব দেয়ার লোক নই, আমিও আপনার মতই একজন এই 'কেন'র জবাব নেয়ার লোক । আর এই জবাবটার তালাশেই আমি লাখ্‌নৌতি থেকে বেরিয়েছি। অন্ততঃ এ মুলুকের লোকেরা এটা সমর্থন করলো কি করে — এর হদিসটা আমার চাই।

তরুণীটি এবার একটু হকচকিয়ে গেলেন। বললেন — তার অর্থ ?

ঃ অর্থ ঐ একটাই। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের এত শিগ্‌গির এমন হালত কেন হলো, এর সাথে স্থানীয় কোন মদদ আছে কিনা, এটা সুনিশ্চিত করার জরুরত দেখা দিয়েছে।

ঃ তারপর ?

ঃ সেই মোতাবেক ভবিষ্যতের পথ-পদ্ধতি ভাবতে হবে আমাদের।

দুই চোখ পুনরায় জ্বলে উঠলো তরুণীর। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন — আমি বিশ্বাস করিনে।

ঃ মানে ?

ঃ তাই যদি ইরাদা আপনার, তাহলে এখানে এসেছেন কেন ? সরাসরি সেখানেই তো যাবেন আপনি।

ঃ তাই যেতাম। কিন্তু তার আগে খান সাহেবের সাথে কিছু জরুরী আলাপ আছে আমার।

ঃ আলাপ আছে, না আরো কিছু সন্ধান চাই আপনার ?

ঃ সন্ধান!

ঃ সেই সাথে খান সাহেবের মতি গতির খবরটা ?

ঃ একি বলছেন আপনি ?

ঃ ঠিকই বলছি। আপনার মতো দেশদরদী সেজে কাশিম খাঁ নামের এক ব্যক্তিও বড়বাপের সাথে কথা বলতে এসেছিল। বেঈমানের বাচ্চা বেঈমান। সব কথা শুনে নিয়ে সাতগাঁ গিয়ে বাহরাম খানের কাছে গোপন তথ্য তামামই ফাঁশ করে দিয়েছে। ঐ বেঈমানের বাচ্চা যদি গোপন সন্ধান না দিতো, তাহলে বাহরাম খানের পক্ষে এত দ্রুত আর এত সহজে সোনার গাঁ দখল করা সম্ভবপর ছিল না।

ঃ কাশিম খাঁ। সেকি! সেতো একটা জাত বেঈমান। তাকে এখানে আসতে দিলে কে ?

ঃ আপনার মতো সেও কয়দিন দরদী সেজে যাওয়া আশা করেছে। এ দেশেরই লোক। তাই সরল বিশ্বাসে বড়বাপ তাকে সব কথা বলেছেন, আর আমরাও তার যাতায়াত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে যাইনি। কিন্তু আর আমাদের বিশ্বাস নেই কাউকে।

সঙ্গে সঙ্গে পালোয়ান ফের নড়ে উঠলো বিক্রমে। জমিনে বল্লম ঠুকে সগর্জনে বললো — জরুর! আর কাউকে বিশ্বাস করিনে আমরা। ওয়াপস্‌ যান। আপনি এখান থেকেই ওয়াপস্‌ যান। আভ্‌ভি।

বল্লমটা হাতে নিয়ে খেলতে লাগলো পালোয়ান। তা দেখে তরুণীটি বিব্রতবোধ করলেন। তিনি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন — আহ্‌ বাবা! এসব কি ?

চুপ্‌সে গেল পালোয়ান। থতমত করে বললো — এ্যাঁ! কোন কসুর হলো আম্মিজান ?

জবাবে তরুণী বললেন — হলোই তো।

ঃ সাচ্‌ ?

ঃ উনি তো খারাপ লোক নাও হতে পারেন।

ঃ কেয়া গজব!

সে তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে শরীফ রেজাকে লক্ষ্য করে বল্‌লো — তব্‌ ঠিক হ্যায়। আমার গল্‌তি হয়ে গেছে। আপনি সিধা চলে যান। কুয়ী বাত্‌ নেই।

সে শরীফ রেজাকে সামনের দিকের পথ দেখিয়ে দিলো। তা দেখে তরুণী ফের শক্ত কণ্ঠে বললেন — না, বাত্‌ আছে।

ঃ জি ?

ঃ উনি খারাপ লোক নাও হতে পারেন — এটা আমার ধারণা। উনি যে নির্ভেজাল ভাল লোক, এ সম্বন্ধেও তো নিঃসন্দেহ নই আমরা।

ঃ তাহলে ?

ঃ উনি খারাপ ভাল যা-ই হোন, যাবার আগে উনাকে কসম করে যেতে হবে— এই মুলুকের লোক হয়ে কাশিম খাঁর মতো কোন বেঈমানী উনি কখনও করবেন না।

এর জবাবে শরীফ রেজা অল্প একটু হাসলেন। হাসিমুখে বললেন — আপনাকে আমি এর মধ্যেই যতটুকু বুঝেছি, তাতে কথাটা কিন্তু আপনার মতো হলো না।

তরুণী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হলেন। বললেন — অর্থাৎ ?

শরীফ রেজা বললেনস — যারা জাত বেঈমান, তাদের জন্যে কসম কোন বাধাই নয়। তারা নিঃসংকোচে যখন তখন যে কোন কসম খেতে পারে। সুতরাং কসম খেলেই কি করে আপনি বুঝবেন, আমার দ্বারা বেঈমানী কিছু হবে না ?

তরুণী কিছু বলার আগেই দুই চোখ বৃহদাকার করে পালোয়ান ফের বললো — ঠিক-ঠিক। বিলকুল কায়েমী বাত্‌। বেঈমানের কসমের কোন দামই নেই। তাহলে তো আপনাকে আর যেতে দেয়া যায় না। কভ্‌ভি না।

ফের সে শরীফ রেজার পথ আগ্‌লে দাঁড়ালো। তা দেখে আপত্তিসূচক কণ্ঠে তরুণী আবার বললেন — বাবা!

জিদ্‌ ধরলো পালোয়ান। বললো — আস্‌লী না নক্‌লী — এটা আন্দাজ করা না গেলে একে তুমি যেতে দেবে কি করে ?

ঃ উনাকে যেতে দাও —

ঃ সেকি আম্মি!

এবার তরুণীর মুখেও একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি ইষৎ হেসে বললেন — কিছু নয় বাবা। উনি যা বলছেন সেটাও যেমন ঠিক, আমিও তেমনি মুখ দেখলেই আন্দাজ করতে পারি — কাকে কিছুটা বিশ্বাস করা যায়, আর কাকে আদৌ তা যায় না।

ঃ আম্মিজান!

ঃ ব্যাপারটা এ রকম না হলে, যাকে তাকে আমি সরাসরি এভাবে প্রশ্ন করে বসতাম না, বা যার তার কাছে অভিযোগ নিয়ে আসতাম না।

শরীফ রেজা বিস্মিত নেত্রে তরুণীটির মুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন। রূপেরছটা দুই চোখে তাঁর আবীর ঢেলে দিলেও, তা খেয়াল করার অবকাশ তাঁর ছিল না। কিয়ৎকাল নীরবে চেয়ে থাকার পর তিনি বললেন — আমার মুখ দেখেই বুঝলেন আমাকে কিছুটা বিশ্বাস করা যায় ?

এর জবাবে তরুণী স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন — হ্যাঁ, তাই বুঝলাম।

ঃ কি করে তা বুঝলেন ?

ঃ মানুষের মুখমণ্ডলেই তার অন্তরের ছাপ অনেকটা আঁকা থাকে। তা ছাড়া এর আগেও আমি আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করেছি কয়েকবার। সত্যিটা চেপে না গেলে বলতে হয়, কোন অসততার আলামত তাতে নজরে আমার পড়েনি। অবশ্য, এগুলো সবই আমার অনুমান, কোন চরম সত্য নয়।

আরো খানিক তাজ্জব হলেন শরীফ রেজা। প্রশ্ন করলেন — বলেন কি! এর আগেও আপনি লক্ষ্য করেছেন আমাকে ?

ঃ করেছিই তো! আমার নজরের সামনে দিয়েই তো কয়েকবার আপনি এলেন গেলেন।

ঃ আপনার নজরের সামনে দিয়ে ?

ঃ বলা যায়, অনেকটা আমার কোল ঘেঁষেই। আপনার কপালের ছোট্ট ঐ কাটাদাগটাও নজরে পড়েছে আমার।

ঃ তাজ্জব! আমি তো কখনও দেখিনি আপনাকে ?

ঃ দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি।

ঃ প্রয়োজন বোধ করিনি!

ঃ ফৌজদার সাহেবের মকানের চারপাশে চোরা-নজর ফেললেই দেখতে পেতেন আমাকে।

ঃ চোরা-নজর।

ঃ হ্যাঁ, চোরা-নজর। এখানে যাঁরা আসেন, তাঁদের প্রায় সবার মধ্যেই এই স্বভাব লক্ষ্য করেছি আমি। কেবল আপনিই একটা ব্যতিক্রম।

ঃ তাই ?

ঃ আর এই জন্যেই আপনাকে কিছুটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় আমার।

ঃ তাই যদি হয়, তাহলে আর এত প্রশ্ন তুলছেন কেন ?

ঃ ঠিক প্রশ্ন নয়। বলতে পারেন, এটা আমার দীলের এক আর্তনাদ বা আফসোস্‌। আমার এই আফসোস্‌ প্রকাশ করে বলার মতো লাখ্‌নৌতি বা

সাতগাঁয়ের তেমন কোন লোক আমি পাচ্ছিনে। সে সব যায়গার লোকের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আমার।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আপনাকে কিছুটা বিশ্বাস করা যায় বোধেই সাহস করে এগিয়ে এসেছি আমি। আপনারা লাখ্নৌতি আর সাতগাঁয়ের লোকেরা — বিশেষ করে বাঙ্গালাকে যাঁরা ভালবাসেন — তারা কি একেবারেই মেরুদণ্ডহীন? বসে বসে করছেন কি আপনারা?

এমন সময় খানিকটা দূর থেকে এক গুরুগম্ভীর আওয়াজ এলো — দবির খাঁ —

বিপুল বেগে নড়ে উঠলো পালোয়ান। সে ব্যস্তকণ্ঠে উচ্চৈস্বরে আওয়াজ দিলো — হুজুর —

ঃ একটু এদিকে এসো জলদি।

ঃ বহুৎ আচ্ছা হুজুর —

বর্শা কাঁধে দবির খাঁ দ্রুত পদে ছুটলো। শরীফ রেজা তাঁর গতিপথে এক নজরে চেয়ে রইলেন। এ লোকটিকে এখানে এই প্রথম দেখছেন তিনি। ইতিমধ্যেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তরুণীটি বললেন — ঐ বুঝি বড়বাপ এলেন বাইরে থেকে। যান, কিন্তু দোহাই আপনার, ভাল কিছু করতে হলে আপনারা পারেন আর না পারেন, মেহেরবানী করে ঐ সরল লোকটির সাথে কোন বেঈমানী করবেন না।

শরীফ রেজা কোন কিছু বলার আগেই তরুণীটি বাগানের মধ্যে অন্তর্হিত হলেন।

এ ঘটনা ঈসায়ী ১৩২৮ সালের ঘটনা। ইখ্তিয়ারউদ্দীন-মুহাম্মদ-বিন-বখ্তিয়ার খলজী জান বাজী রেখে বাঙ্গালা মুলুকে মুসলীম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। তাঁকে মদদ দিলেন তাঁর নিকটতম তিন-ইয়ার শিরান খলজী, আলী মর্দান ও ইওজ খলজী। তাঁরা লাখ্নৌতি, বিহার ও বরেন্দ্র অঞ্চলকে এই নয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন। ঈসায়ী ১২০৫ সালে ইখতিয়ারউদ্দীন-মুহাম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজী ইন্তেকাল করলে দিল্লীর সুলতানকে নামমাত্র সদকা দিয়ে তাঁর তিন বন্ধু পর পর ঈসায়ী ১২২৭ সালতক্ বাঙ্গালা মুলুক শাসন করে গেলেন। রক্ত দিয়ে নয়ারাজ্য স্থাপন করলেন স্থপতিরা, আর তা ভোগ করতে ছুটে এলেন দিল্লীর শাসককুল — যাঁদের একফোঁটা রক্তও এই

রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ঝরেনি। ঈসায়ী ১২২৭ সালে দিল্লীর সুলতান ইল্তুত্মিশের পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ দিল্লীর সুবিশাল বাহিনী নিয়ে এসে বাঙ্গালা মুলুকের অন্যতম স্থপতি গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজীকে পরাজিত ও হত্যা করে বাঙ্গালা মুলুক বা লাখ্নৌতি দখল করেন। এই সাথে বাঙ্গালা মুলুক স্বকীয় সত্ত্বা হারিয়ে দিল্লীর অধীনে চলে যায় এবং দিল্লীর আর পাঁচটা প্রদেশের মতো স্রেফ একটা প্রদেশে রূপান্তরিত হয়। অতপর একটানা পঞ্চান্ন বছর ধরে দিল্লী থেকে নিযুক্ত পনেরজন শাসক বাঙ্গালা মুলুক শাসন করেন — যাঁদের দশজনই ছিলেন মামলুক বা দাস। ঈসায়ী ১২৮২ সালে বলবনী সুলতানেরা দিল্লীর তখ্তে এলে বাঙ্গালা মুলুক বা লাখ্নৌতি রাজ্য তাদের অধীনে থাকে এবং বলবনদের শেষ শাসক রুকনউদ্দীন কাই-কাউস্ ঈসায়ী ১৩০০ সাল পর্যন্ত বাঙ্গালা মুলুক শাসন করেন।

বখ্তিয়ার ও তাঁর তিন ইয়ারের পর ঈসায়ী ১২২৭ সাল থেকে ১৩০০ সাল পর্যন্ত বাঙ্গালা মুলুকের ইতিহাস — তৈরী সম্পদ ভোগ করার ইতিহাস। দলাদলী, কোন্দল ও বিশৃঙ্খলার ইতিহাস। বাঙ্গালা মুলুকে মুসলীম বীর্যের স্থবিরতার ইতিহাস। এ ছাড়া, অন্যান্য প্রদেশ থেকে বাঙ্গালা মুলুক যেহেতু ছিল দিল্লী থেকে ঢের ঢের দূরে ও কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে অনেক বেশি মুক্ত, এবং যেহেতু গুরুত্বে ও মর্যাদায় বাঙ্গালার তখ্তের স্থান ছিল দিল্লীর তখ্তের পরেই, সেই হেতু এই সময়ের ইতিহাস — বাঙ্গালা মুলুকের শাসনভার লাভ করার প্রতিযোগিতার ইতিহাস। শাসনভার লাভ করে শাসকেরা খোশহালে বাঙ্গালা মুলুকে আসতেন, ধুমছে প্রভুত্ব ও আমোদ-ফূর্তি করতেন এবং শাসনকর্তার আসন থেকে অন্যকে ঠেকিয়ে রাখার কাজে প্রশাসনিক কোন্দল প্রকট করে তুলতেন। এই শাসকদের অধিকাংশেরই ঘাড়ে ছিল না দায়িত্ব, ঘটে ছিল না বুদ্ধি, বুকে ছিল না সাহস, দেহে ছিল না বল। আরো যা করুণ তাহলো — এঁদের অনেকেরই দীলে ছিল না রাষ্ট্রের প্রতি রাষ্ট্রপতির স্বভাবজাত দরদ। আদৌ কিছু এসব তাঁদের থাকলেও তামামই তা তালুই-তালুই ব্যাপার, আহামরি বা তারিফ যোগ্য নয়। কেন্দ্রীয় শক্তির ছত্রছায়ায় থেকে এঁরা 'তাইরে-নাইরে-নাইরে' করে খাইতেন-দাইতেন-গাইতেন আর পার্শ্ববর্তী ভিন জাতির হাঁক-হুমকি রোধ করার সাহস তাকত্ না থাকায়, আসনটা জনম জনম আঁকড়ে থাকার বাসনায় — প্রতিশ্রুতিশীল স্বজাতির ঠ্যাং ভেঙ্গে বেড়াতেন। নকরী করার মানসিকতায় রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করার বিশেষ কোন আগ্রহই এঁদের অধিকাংশের ছিল না বা সে ঝুঁকি নেয়ার বুকের পাটাও ছিল না এঁদের অনেকেরই।

ফলে, বখতিয়ারদের কামাই করা রাজ্যসীমার বাইরে এ সময়ে বাঙ্গালা মুলুকে মুসলিম রাজ্যের বিস্তারই তেমন ঘটেনি। কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী নিজ নামে খোত্‌বা পাঠ, মুদ্রা চালু আর অর্থপ্রাপ্তীর ব্যাপার নিয়েই তৎপর হয়ে থেকে গেছেন, বাঙ্গালা মুলুকে মুসলীম রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল, শক্তিবৃদ্ধি বা রাজ্য বিস্তার নিয়ে মাথা ঘামাতে যাননি।

প্রকৃতির নিয়ম অতি অমোঘ। একপক্ষ নেতিয়ে পড়লে প্রতিদ্বন্দ্বি অপর পক্ষ মাথা চাড়া দেবেই। বাঙ্গালা মুলুকে ইসলামের অনুপ্রবেশ আদৌ যাঁরা মেনে নিতে পারেন না এবং দ্রাবিড় বা অনার্যদের মুলুকে নিজেদের অনুপ্রবেশের কথা যাঁরা একবারও ভাবেন না, তাঁরা এ সুযোগের অপচয় করেননি। মুসলমানদের এই অযোগ্যতা, কোন্দল আর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চারপাশের অমুসলমান রাজ্যগুলো দুর্বার হয়ে উঠে। উড়িষ্যা, কামরূপ এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাজ্য অপরিসীম শক্তি সঞ্চয় করে। এমন কি দীর্ঘ এ অবকাশে কোচ, মেচ, থারু নামক উপজাতিগুলোও রণবিদ্যায় উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা অর্জন করে করতোয়ার পূর্বদিকে মুসলমানদের অগ্রযাত্রার পথে দুর্লঙ্ঘ্য এক বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ফাঁকা ময়দান পেয়ে আরো পূর্বে ব্রহ্মদেশের শান্‌জাতি অহোম রাজ্যের গোড়াপত্তন করে লাখ্‌নৌতির বলবীর্য জরিপ করতে থাকে। সেনদের পতনের পর সমতটের লা-ওয়ারিশ মাঠে কায়স্থ রাজা দশরথ দুলুজ মাধব 'চন্দ্রদ্বীপ' নামের এক নতুন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সিংহনাদ ছাড়তে থাকেন। সর্বোপরি উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজারা এ সময় লাখ্‌নৌতির বিরুদ্ধে মারাত্মক এক হুমকি হয়ে দাঁড়ান এবং বাঙ্গালা মুলুক থেকে মুসলমানদের উৎখাতের নয়া প্রতিজ্ঞা নিয়ে সাজ-সাজ রবে তাঁরা হুংকার ছাড়তে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের অগ্রগতির পথে উড়িষ্যার এই গঙ্গবংশীয় রাজারাই সে সময়ে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো। গঙ্গবংশীয় রাজাদের অধীনস্ত হুগলী এলাকার সামন্ত রাজারাও এ সময়ে মুসলমানদের নিদারুণভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন।

ঈসায়ী ১৩০০ সালে রুকনউদ্দীন কাইকাউসের পরে যিনি বাঙ্গালার তখ্‌তে বসেন তিনি শাম্‌সুউদ্দীন ফিরুয শাহ্‌। শামসুউদ্দীন ফিরুয শাহ্‌ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। দিল্লীর তখ্‌তের তোয়াজ-তোয়াক্কা না করে তিনি স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা মুলুকের শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর শাসন আমল থেকেই বাঙ্গালা মুলুকের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইখতিয়ারউদ্দীন-মুহাম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজীর পর তাঁর আমলেই বাঙ্গালা মুলুকে মুসলীম রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার লাভ ঘটে। বলবনী শেষ শাসক রুকনউদ্দীন কাইকাউসের আমলে এই রাজ্য বিস্তার প্রক্রিয়ার শুভ সূচনা

ঘটলেও, শাম্‌সুউদ্দীন ফিরুয শাহ্‌র আমলেই এই বিস্তার কার্য সুসম্পন্ন হয়। তাঁর আমলেই বঙ্গ, সাতগাঁ, সোনার গাঁ, ময়মনসিংহ ও সিলেট সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয় এবং কিছু প্রত্যন্ত এলাকা ছাড়া প্রায় সমগ্র বাঙ্গালা মুলুক মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে।

সোনার গাঁয়ে নিহত ঐ গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর এই শাম্‌সুউদ্দীন ফিরুয শাহেরই অন্যতম সন্তান। শাম্‌সুউদ্দীন ফিরুয শাহ্‌র বংশের তিনিই পরবর্তী উল্লেখযোগ্য শাসক এবং তিনিই সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র। লাখ্‌নৌতির মসনদে আরোহণ করেই তিনি তাঁর ওয়ালেদের মতো স্বাধীন সুলতান হিসেবে বাঙ্গালা মুলুক শাসন করতে শুরু করেন। তিনি নিজের নামে খোৎবা পাঠ ও মুদ্রা চালু করতে থাকেন। এ সময়ে দিল্লীর তখ্‌তে আসীন ছিলেন তুঘলক বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক। আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও তখ্‌ত্‌ দখলের আনুসঙ্গিক ঝুট্‌ ঝামেলা নিয়েই তিনি ব্যাপৃত হয়ে থাকেন, বাঙ্গালা মুলুকের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে যান না। বাঙ্গালা মুলুকের ব্যাপার নিয়ে দিল্লীর সুলতানদের এই সময় আগ্রহও তেমন ছিল না। দিল্লীর মুনীবদের অহেতুক হস্তক্ষেপ না থাকার দরুনই শাম্‌সুউদ্দীন ফিরুয শাহ্‌ স্বধীনভাবে বাঙ্গালা মুলুকে রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হন। তৎপুত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরও দিল্লীর খপ্পড় থেকে সম্পূর্ণ মুক্তভাবেই শাসনকার্য শুরু করেন।

কিন্তু বাঙ্গালার মাটি গাদ্দার পয়দায় অত্যন্ত উর্বর। গাদ্দারের অভাব এখানে কোন কালেই ঘটে না। খানিকটা গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের কঠোর শৃঙ্খলায় নাখোশ হয়ে এবং অধিকটা মসনদের দুর্বার লালসে, গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরউদ্দীন ইবরাহিম খাল কেটে কুমীর আনার কাজে তৎপর হয়ে উঠেন। স্বদেশের সর্বনাশ সাধনে বিদেশীকে ডেকে আনার অদম্য পুলকে তিনি দিল্লী শহর গমন করেন এবং হাজার রকম উস্কানী ও হাজার একটা প্রলোভনের মাধ্যমে দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলককে বাঙ্গালা মুলুক আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করেন।

পুনরায় ঘুরে গেল ইতিহাসের গতি। হারিয়ে গেল বাঙ্গালা মুলুকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এসে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক দখল করলেন বাঙ্গালা মুলুক, বন্দি করলেন গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরকে এবং খর্ব করলেন বাঙ্গালা মুলুকের শক্তি। তিনি দেখলেন — সুলতান শাম্‌সুউদ্দীন ফিরুয শাহ্‌ কর্তৃক পরিবর্ধিত বিশাল এই বাঙ্গালা রাজ্যের শাসনভার যার হাতেই পড়বে, তার হাতেই দিল্লীর সাথে পাঞ্জালড়ার তাকত্‌ পয়দা হবে। তাই সুবৃহৎ বাঙ্গালাকে তিনি ভেঙ্গে চুরে খণ্ড খণ্ড করলেন। লাখ্‌নৌতি (গৌড়), সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম) ও সোনার গাঁ (সুবর্ণগ্রাম) নামের তিন তিনটি শাসন বিভাগে বাঙ্গালা মুলুককে

ভাগ করে তিনি একাধিক শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন — যাতে করে বাঙ্গালার শক্তি বিভক্ত হয়ে যায়, যাতে করে একের দ্বারা অন্যের মাথা ভেঙ্গে বাঙ্গালা মুলুককে চিরকাল দিল্লীর একটি প্রদেশ করে রাখা যায় এবং যাতে করে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে বাঙ্গালা মুলুক কোনদিনই মাথা তুলতে না পারে। এ প্রক্রিয়ার অধীনে বেঈমান নাসিরউদ্দীন ইবরাহিম লাখনৌতির শাসনকর্তার পদ পেলেন। সাতগাঁ ও সোনার গাঁয়ের শাসনভার অর্পিত হলো সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের পালিত পুত্র তাতারখান ওরফে বাহরাম খানের উপর। বাঙ্গালা মুলুকের বিলিবন্টন সুসম্পন্ন করে দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক বন্দি গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লীর পথে রওনা হলেন।

অদৃষ্টের লিখন। মশহুর দরবেশ নিজামউদ্দীন আউলিয়া দিল্লীতে তাঁর সদ্য কাটা দিঘীর ধারে বসে যথার্থই মন্তব্য করলেন — দিল্লী দূর অস্ত — দিল্লী অনেক দূর।

দিল্লীর এক পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণের প্রকট পানি-সংকট নিবারণে দরবেশ নিজামউদ্দীন আউলিয়া এক সুবিশাল পুকুর খনন করলেন। দরবেশের ডাকে সাড়া দিয়ে দিল্লী ও তার আশেপাশের তামাম মযদুর এসে খনন কাজে যোগ দিলো। এতে, প্রবল প্রতাপশালী সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের নগর নির্মাণ কাজ মযদুর অভাবে স্থগিত হয়ে গেল। সুলতান তখন বাঙ্গালায়। বন্দি গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরকে নিয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক যখন দিল্লীর দিকে ফিরে আসতে লাগলেন, তখন শিষ্য-মুরিদ-ভক্তেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দরবেশকে দিল্লী থেকে পলায়ন করার অনুরোধ করলো। সুলতানের কাজ বন্ধ করে পুকুর কাটার অপরাধ নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন না সুলতান। হয়তো প্রাণদণ্ডও দিতে পারেন। এ অনুরোধের জবাবে আল্লাহভক্ত দরবেশ স্মিতহাস্যে বললেন — দিল্লী অনেক দূরে। সুলতান যখন দিল্লীর মাত্র কয়েক ক্রোশ ফারাগে আফগানপুরে পৌছলেন, ভক্তদের নিরতিশয় অনুরোধের জবাবে দরবেশ ফের বললেন — দিল্লী হনুজ দূর অস্ত — দিল্লী এখনও অনেক দূরে।

দূরেই রয়ে গেল সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের নিকট থেকে তার রাজধানী দিল্লী। বিজয়ী পিতাকে খোশ আমদেদ জানাতে আফগানপুরে ছুটে এলেন সুলতান-পুত্র জুনাখাঁ ওরফে মুহম্মদ-বিন-তুঘলক। মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের অভ্যর্থনা মণ্ডপে প্রবেশ করলেন বিজয়ী সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক। কিন্তু আর বেরুলেন না। মণ্ডপটি ভেঙ্গে পড়ে ওখানেই শেষ হলো গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের ইহ দুনিয়ার খেলা। নিভে গেল তার ঐ দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জিন্দেগীর দীপ। দিল্লী দূর অস্ত্।

মৃত পিতার শূন্যতখতে উঠে বসলেন পুত্র মুহম্মদ-বিন-তুঘলক। বাঙ্গালার বন্দি গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর গেলেন দিল্লীর কারাগারে। মুহম্মদ-বিন-তুঘলক ভাবতে লাগলেন তামার নোট সহকারে নতুন নতুন পরিকল্পনার কথা। গড়িয়ে চললো দিন।

মুহাম্মদ-বিন-তুঘলককে খামখেয়ালী লোক বলে যে যেখানে যত 'গাওনা'ই গেয়ে বেড়াক, নতুন নতুন উদ্ভাবনের পেছনে তার যত সময়ই অতিবাহিত হোক, বাঙ্গালা মুলুকের ব্যাপারে তাঁর গৃহিত পদক্ষেপ কোনটাই উদ্ভট কিছু ছিল না বা বাঙ্গালার দিকে নজর দিতে সময়ের তাঁর আদৌ অভাব হয়নি। মসনদে আরোহণ করার কিছুদিন পরেই তিনি বাঙ্গালা মুলুকের শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক রদবদল ও পরিবর্তন আনলেন। পিতার পালক পুত্র তাতার বা বাহরাম খানের উপর তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। বেঈমানকে বিশ্বাস করার মতো কোন পাগলামীও মোটেই তিনি করেননি। মসনদে উঠেই তিনি লাখনৌতির গদি থেকে সরিয়ে দিলেন বেঈমান নাসিরউদ্দীন ইবরাহিমকে। মালিক পিণ্ডার বা পিন্দির খলজীকে কদর খান উপাধি দিয়ে লাখনৌতির শাসনভার তাঁর উপর অর্পণ করলেন। তিনি নাসিরউদ্দীন ইবরাহিমকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর আর তাঁর বাঙ্গালা মুলুকে ওয়াপস্ আসার মওকাই কিছু ঘটেনি। বাহরাম খানের উপর একসাথে সাতগাঁ ও সোনার গাঁ এই দুই জায়গার শাসনভার দিয়ে রাখা মুহাম্মদ-বিন-তুঘলক সমীচিন বোধ করলেন না। দুই দুইজন ব্যক্তিকে যুগ্মশাসক করে তাঁর পেছনে এই দুই জায়গায় পাঠালেন।

এই দুইজনের একজন গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর। ঈজউদ্দীন ইয়াহিয়া নামক এক ব্যক্তিকে আজম মালীক উপাধি দিয়ে সাতগাঁয়ের যুগ্মশাসক বানালেন। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরকে পাঠালেন সোনার গাঁয়ে। দিল্লীর কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে সোনার গাঁয়ের যুগ্মশাসক বানাতে গিয়ে মুহাম্মদ-বিন-তুঘলক গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরকে পক্ষান্তরে সোনার গাঁয়ের পুরোপুরি শাসনকর্তাই বানালেন। বাহরাম খানকে সোনার গাঁয়ে যুগ্মশাসকের পর্যায়ে এনে ফেললেন। অবশ্য সাতগাঁয়ে বাহরাম খান মূল শাসকই রইলেন।

গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের প্রতি এত করুণা দিল্লীর সুলতান একেবারে অমনি অমনি করলেন না। কয়েকটা কড়া কড়া শর্ত আরোপ করেই তবে সোনার গাঁয়ের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করলেন। দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ-বিন-তুঘলকের নামে খোত্‌বা পাঠ, মুদ্রাজারী এবং আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের পুত্র মুহাম্মদকে দিল্লীর দরবারে জামিন রাখা — ইত্যাদি ঐ শর্তগুলোর অন্তর্ভুক্ত রইলো। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের এই নিয়োগ মুহাম্মদ-বিন-তুঘলকের ছিল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ব্যবস্থা। বিভিন্ন

মানসিকতার লোককে বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করার অন্তর্নিহিত কারণ — যাতে করে এরা কখনও জোট বাঁধতে না পারে। মুহাম্মদ-বিন-তুঘলকের এই পদক্ষেপ প্রশংসার বৈকি!

কিন্তু এতো কিছু করেও বিপত্তিরোধ হলো না। সেটা এলো অন্যপথে। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের এই প্রতিপত্তি ও সুলতানের এই অনুগ্রহ লাভ করা দেখে বাহরাম খান হিংসায় জ্বলে পুড়ে যেতে লাগলেন। তিনি লাখ্নৌতির শাসনকর্তা কদর খানের সাথে মত বিনিময় করলেন। সুলতানের অনুগ্রহ লাভের প্রতিযোগিতায় তাঁরা, বিশেষ করে বাহরাম খান, গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের সামান্যতম ত্রুটিও দিল্লীতে পেশ করতে লাগলেন। এদিকে আবার গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের রক্তে ছিল স্বাধীনতার বীজ। অধীন অবস্থা বরদাস্ত করা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল তাঁর কাছে। তিনি প্রথম প্রথম বছর দুয়েক কোন মতে দিল্লীর তখ্তের অনুগতই ছিলেন। খোত্বা পাঠ মুদ্রা জারী নির্দেশ মোতাবেক করলেন। পরে তিনি ধীরে ধীরে স্বাধীনতার জন্যে তৈয়ার হতে লাগলেন। তিনি সোনার গাঁয়ের টাকশাল থেকে মুদ্রাজারী করলেন এবং মুদ্রার এক পৃষ্ঠায় নিজের নাম খোদাই করলেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর গেল দিল্লীতে। বাহরাম খানই পাঠালেন। সুলতান এতে গোস্বা কিছু হলেও মুদ্রার সামনের পৃষ্ঠায় "সুলতান মুহাম্মদ-বিন-তুঘলকের আদেশে জারি" কথাটা থাকার জন্যে এ নিয়ে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মাথা ঘামাতে গেলেন না। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর নানারকম অজুহাতে সুলতানের তৃতীয় শর্ত তখনও প্রতিপালন করেননি। অর্থাৎ নিজপুত্র মুহাম্মদকে জামিন স্বরূপ দিল্লীর দরবারে পাঠাননি। সুলতানের নজর এবার এদিকে ঘোরানো হলো। এটা আর দিল্লীর সুলতান উপেক্ষা করতে চাইলেন না। মুহাম্মদকে দিল্লীর দরবারে পাঠানোর জন্যে তিনি চাপের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। বিষয়টি যখন প্রকট আকার ধারণ করলো, তখন তিনি বাধ্য হয়ে অল্প প্রস্তুতি নিয়েই দিল্লীর হুকুম অগ্রাহ্য করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং নিজের নামে মুদ্রাজারী করলেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন, ছেলেকে দিল্লীতে পাঠানো মানেই তাকে কোরবানী করে দেয়া। পিতার নামমাত্র অপরাধের জন্যও পুত্রের প্রাণদণ্ড হতে পারে দিল্লীতে। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা লোক এই গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর। পুত্রের জানবাজী রেখে দিল্লীর গোলামী করা তিনি কল্পনা করতে পারলেন না। তারচেয়ে মউতকেই তিনি অগ্রাধিকার দিলেন। ঈসায়ী ১৩২৮ সালে বিদ্রোহী হয়ে সোনারগাঁয়ের স্বাধীন সুলতানরূপে নিজেকে ঘোষণা করলেন প্রকাশ্যে।

কিন্তু একেবারেই কাঁচা মাটিতে দাঁড়িয়ে এ বিরাট ঝুঁকি নিতে গেলেন গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর। পায়ের তলার মাটি তিনি শুকিয়ে নেয়ার অবকাশটা

পেলেন না। প্রস্তুতি পরিপক্ক না হওয়ার কারণে যাদের ভরসায় এই দুঃসাহসিক কাজে হাত দিলেন তিনি তারা শুরুতেই নিরাশ করলো তাঁকে। অল্প চাপ আর সামান্যতম প্রলোভনেই তারা সবাই গাদ্দারী করে বসলো। দিল্লীর বাদশাহর মনরঞ্জনের উম্মিদে অনেক বেঈমান অনেক গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য ফাঁশ করলো সাতগাঁয়ে অবস্থিত বাহরাম খানের কাছে। খবর গেলো লাখ্নৌতিতে অবস্থিত কদর খানের কাছেও। দিল্লী থেকে আদেশ এলো — 'পাক্ড়ো' —

লাখ্নৌতিই বাঙ্গালা মুলুকের প্রশাসনের আদি পীঠ। লাখ্নৌতির শাসনকর্তাই এই তিন অঞ্চলের সমন্বয়কারী শাসনকর্তা। তবু অগ্রণীভূমিকা নিলেন সাতগাঁয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খান। বাহরাম খানের নেতৃত্বে সাতগাঁয়ের বাহিনীর সাথে সামিল হলো লাখনৌতি ও সোনার গাঁয়ের অতি উৎসাহীর দল। সবাই মিলে ঘিরে ধরে ধরলো গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরকে। ওয়াদা খেলাপকারী বেঈমানদের বেঈমানীর জন্যে একান্তই এককভাবে প্রাণপণে লড়ে পরাজিত ও নিহত হলেন গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর। দিল্লীসহ এ খবর সংগে সংগে সারা বাঙ্গালায় প্রচার করা হলো। সোনার গাঁয়ের একক শাসনকর্তারূপে বাহরাম খানের পদবী পাকাপোক্ত হলো। সোনার গাঁ, সাতগাঁ ও লাখনৌতিতে দিল্লীর দালালেরা আনন্দে আত্মহারা হতে লাগলো। হেথা হোথা ভেঙ্গে পড়লেন স্বাধীনতা-প্রিয় বাঙ্গালা মুলুকের নরনারী। দীর্ঘ দিন যাবত আড়ালে ও অন্তরালে এ নিয়ে আক্ষেপ করলেন তাঁরা।

এক্ষণে এ নিয়ে আক্ষেপ করলেন অবসর প্রাপ্ত ফৌজদার সোলায়মান খানের মকানের পাশে দণ্ডায়মান ঐ অপরূপা তরুণীও। শরীফ রেজাকে সামনে পেয়ে তিনি মনের খেদ ব্যক্ত করে দ্রুত পদে ফুল বাগানে অন্তর্হিত হলেন।

অবাকবিস্ময়ে কিছুক্ষণ বাগানের দিকে চেয়ে থাকার পর শরীফ রেজা ভাবতে লাগলেন কে এই সুন্দরী ? এই দবির খাঁই আসলে কি পিতা ওর ? ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের সাথে কি তাঁর সম্পর্ক ? এই দবির খাঁই বা কে ? আগে তো তাঁর চোখে পড়েনি একে ?

রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কিয়ৎকাল এসব কথা ভাবার পর তিনি ধীরে ধীরে ফৌজদার সাহেবের মকানের দিকে অগ্রসর হলেন।

তিনি যখন ফৌজদার সাহেবের মকানে এসে পৌঁছলেন, তখন দবির খাঁ হনহন করে দহলীজ থেকে বেরিয়ে এলো। শরীফ রেজাকে সামনে দেখে বললো — যাইয়ে-যাইয়ে। হুজুর ঐ দহলীজেই আছেন।

অতপর বল্লম কাঁধে দবির খাঁ বাইরের দিকে ছুটলো। শরীফ রেজা দহলীজের দিকে আসতেই ফৌজদার সাহেবের নজর পড়লো তাঁর উপর। তাঁকে

দেখতে পেয়েই ফৌজদার সাহেব ব্যাকুল চিত্তে ডাক দিলেন — আরে এই যে শরীফ রেজা। এসো-এসো —

সালাম দিয়ে শরীফ রেজা দহলীজে প্রবেশ করলেন। সালাম গ্রহণান্তে বসার আসন দেখিয়ে দিয়ে ফৌজদার সাহেব বললেন — বসো, বসো। কখন এলে? আমিতো একটু বাইরে ছিলাম।

বসতে বসতে শরীফ রেজা বললেন — জি এই এখনই। রাস্তায় থাকতেই আপনার কণ্ঠস্বর কানে পড়েছে আমার।

ঃ ও, আচ্ছা। তা এদিকের খবর তো সব শুনেছো?

ঃ জি, তা শুনেই আমি আসছি।

ঃ সব শেষ হয়ে গেল বাপজান, আর কোন আশা ভরসা রইলো না।

ঃ জনাব!

ঃ আমরা কেউ তাঁর কোন কাজেই আসতে পারলাম না। তুমি থাকলে লাখ্‌নৌতিতে, আমি থাকলাম ভুলুয়ার এই দুর্গম এলাকায়। খবর এসে পৌছতে না পৌছতেই তামাম কিছু খতম হয়ে গেল। কয়েক কদম এগিয়েও ফল কিছু হলো না। লোক-লস্কর নিয়ে ফের ওয়াপস্‌ আসতে হলো।

ঃ আচ্ছা। আপনি তো তবু তাহলে এগিয়েছিলেন। কিন্তু আমি সেই খবরটাই পেলাম না। পেলাম শুধু দুঃসংবাদটা।

ঃ এগিয়েইবা লাভটা কি হলো? মাঝপথটাও পাড়ি দেয়া হলো না। এরই মধ্যেই সবশেষ।

ফৌজদার সাহেব নীরব হয়ে গেলেন। একটু থেমে শরীফ রেজা বললেন — কাশিম খাঁ এখানে এসেছিলো?

ফৌজদার সাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন — কে? ঐ নেমেকহারাম — ঐ বেঈমান? ওঃ! ঐ শয়তানটা যে এ মুলুকের কত বড় ক্ষতি করলো, তা পরিমাপ করার জো নেই।

ঃ আপনার সম্বন্ধে বাহরাম খান বা দিল্লীর এই সব সেবাদাসদের ধ্যান ধারণা এখন কেমন মনে করছেন?

ঃ তা যেমন হয় হোক। ও নিয়ে আর ভাবিনে।

ঃ এই যে আপনি বাহাদুর সাহেবের মদদে লোক-লস্কর নিয়ে এগুলেন — এ নিয়ে কোন বিপদ মুসিবত হবেনাতো?

ঃ না, তা আর হবে কেন? সোনার গাঁয়ে লড়াই বেধেছে। অবসর প্রাপ্ত হলেও আমি একজন ফৌজদার। আমি ফৌজ নিয়ে সোনার গাঁয়ে যাচ্ছি। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবকেই সাহায্য করতে যাচ্ছি — সাকুল্যে এমনটি ভাবার কারো অবকাশটা কোথায়?

ঃ কিন্তু ঐ কাশিম খাঁ?

ঃ ঐ মোনাফেক আমার কাছে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের সামরিক প্রস্তুতির তথ্যটাই নিয়েছে। বিশ্বাসী লোক বোধে তাকে আমি তাঁর প্রস্তুতির ঘাটতির কথাই বলেছি। কোন্‌ পক্ষের লোক আমি, এসব কিছু স্পষ্টভাবে তাকে আমি বলিনি। আমার ধারণা ছিল, বাহাদুর সাহেবের শুভাকাঙ্খীদের এই সমস্ত ঘাটতির তথ্য জেনে থাকা ভাল। জানা থাকলে সেই মোতাবেক হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবে তারা। ইব্‌লিসের বাচ্চা ইব্‌লিস।

ভেতর বাড়ী থেকে এক নওকর এসে বললো — হুজুর, আম্মি আপনাকে ডাকছেন। খুব নাকি জরুরী, তাই আপনাকে এই তকলিফ দিচ্ছেন উনি।

এই ভারাক্রান্ত পরিবেশেও ফৌজদার সাহেবের মলিন মুখে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি স্বগতোক্তি করলেন — হুঃ। এই আম্মিটাকে নিয়ে আর পারলাম না।

— উঠতে উঠতে শরীফ রেজাকে বললেন — একটু বসো। এক্ষুণি আমি আসছি। অবসরপ্রাপ্ত ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব কিছুটা ব্যস্ত পদেই অন্দরের দিকে ছুটলেন।

সোলায়মান খান। অবসরপ্রাপ্ত ফৌজদার। এক কালের প্রখ্যাত এক যোদ্ধা। সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুয শাহ্‌র রাজ্য বিস্তার কর্মকাণ্ডে তাঁর অবদান আছে অনেক। সোনার গাঁ বিজয়ে তিনি অনেক লড়াই লড়েছেন হিন্দুরাজাদের বিরুদ্ধে। অনেক সময় সেনাপতির পূরো দায়িত্বও পালন করতে হয়েছে তাঁকে। দরবেশ শায়খ শাহ শফীর অর্থাৎ শাহ শফীউদ্দীনের আহ্বানে এক সময় তিনি সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁয়ের প্রত্যন্ত এলাকাতেও লড়েছেন দ্বীন ইসলামের খেদমতে। শায়খ শাহ শফীর বিশিষ্ট শিষ্যদের তিনিও একজন। বাহরাম খান যখন এককভাবে সোনার গাঁ ও সাতগাঁয়ের শাসনকর্তা, তখন সামরিক ও বেসামরিক— বহুমুখী অভিজ্ঞতার কারণে বাহরাম খান তাঁকে তাঁর জায়গীর (সৈন্য পালনের নিমিত্তে অর্থের বদলে প্রদত্ত ভূসম্পত্তি বা জোতদারী) থেকে এনে সার্বক্ষণিক-ভাবে সোনার গাঁয়ে রাখেন প্রশাসনিক প্রয়োজনে।

তাঁর অবসরপ্রাপ্তির প্রাক্কালে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সোনার গাঁয়ের শাসক হয়ে আসেন। তাই, গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের অধীনে প্রশাসনের খেদমত করার কয়েক দিন মাত্র সময় পান ফৌজদার সোলায়মান খান। তবু একই রকম স্বাধীনচেতা মন-মানসিকতার জন্যে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন এবং অবসর গ্রহণের পরও, বাহাদুর সাহেবের ইচ্ছায়, সোনার গাঁয়েই সরকারী আবাসে বসবাস করতে

থাকেন। এই সময়ে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর ফৌজদার সোলায়মান খানের কাছেই সোনার গাঁয়ের প্রশাসনের জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত হন এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রাথমিক প্রস্তুতির দিকদর্শন তাঁর কাছেই লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্থানীয় চক্রান্ত ও কেন্দ্রীয় চাপে পড়ে সরকারী আবাস ছেড়ে তাকে তাঁর জায়গীর ও বসতবাটি ভুলুয়ার এক প্রত্যন্ত এলাকায় ফিরে আসতে হয়। অবসরপ্রাপ্তির পর সরকারী জায়গীর তাঁর খারিজ হয়ে গেলেও অবসরের পর যতটুকু জোতভূঁই তাঁর প্রাপ্য, গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর তার চেয়ে অনেক বেশী জোতভূঁই তাকে দান করেন। তার ফলে, তখনও তিনি বেশ কিছু প্রজাপত্তন করে লোক-লস্কর নিয়ে ভুলুয়ার ঐ প্রত্যন্ত এলাকায় মোটামুটি শান-শওকতের সাথেই বসবাস করতে থাকেন। বাহরাম খানের সাথে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের লড়াইয়ের খবর বেশ কিছুটা বিলম্বে তাঁর কাছে পৌঁছে এবং সে খবর পাওয়ামাত্র দবির খাঁ সহ নিজের হাতে যে কয়জন লোক-লস্কর ছিল, তাই নিয়েই তিনি সোনার গাঁয়ের অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এত দ্রুত ও অতর্কিতে বাহরাম খান সোনার গাঁ আক্রমণ করে বসেন এবং বহাদুরের পক্ষ অবলম্বনকারী লোকের তৎক্ষণাৎ পিছটান দেয়ার দরুণ এত কম সময়ে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর পরাজিত ও নিহত হন যে, সোলায়মান খানের সোনার গাঁতক পৌঁছার আর অবকাশই থাকে না। পথিমধ্যেই এই দুঃসংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ভগ্নচিত্তে লোক-লস্কর সহকারে তিনি আবার নিজ মকানে ওয়াপস্ চলে আসেন।

সেই অবধি সোলায়মান খান সাহেব অত্যন্ত মর্মাহত আছেন। তাঁর লোকজন ও শুভাকাঙ্খীরা উৎকণ্ঠিত আছেন বাহরাম খানের কোন আক্রোশ এসে তাঁর উপর পড়ে কিনা — এই ভেবে। কোন নতুন লোক এলেই তাঁরা দিল্লীওয়ালাদের গুপ্তচর ভেবে ব্যস্ত হয়ে উঠছেন এবং অচেনা লোকের আনাগোনার উপর প্রখর নজর রাখছেন। ঐ আম্মিজানেরও উৎকণ্ঠা এই নিয়েই। সরল মানুষ, সবাইকে যেন সরলভাবে বিশ্বাস করে না বসেন— খান সাহেবকে এই নসিহত করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্দর মহল থেকে হাসিমুখে ওয়াপস্ এলেন ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব। শরীফ রেজাকে লক্ষ্য করে বললেন — খামাখা সব হৈচৈ বুঝলে, আজগুবী আতংক। আমাকে নিয়ে এদের আর কারো নিদঘুম নেই। বিষয়টি সুস্পষ্ট না হওয়ায় শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন — জি ?

ঐ একই রকম হাসি মুখে খান সাহেব বললেন — যত্তসব আউরাতী কারবার। বাড়ীর জেনানা-মর্দানা চাকর-নফর সকলেই সেই থেকে এক জুজুর ভয়ে উতলা হয়ে আছে। সবার উপরে ঐ আম্মিটা!

ঃ মানে ?

ঃ আমাদের একটা আম্মি আছে — আম্মিজান। সার্বজনীন আম্মিজান। সবার চেয়ে তারই বেশী আতংক যে, কখনবা কি হয় আমার। তোমাকে যেন ভেতরের খবর না বলি — রেখে ঢেকে সাবধানে বাত্‌চিৎ করি তোমার সাথে — এই নসিহত করার জন্যেই সে আমাকে ডেকেছিল।

ঃ বলেন কি ?

ঃ বেচারী খুব ঘাবড়ে গেছে। তোমার সাথে ইতিমধ্যেই নাকি কথা হয়েছে তার ? ঝোঁকের মাথায় যেসব কথা সে তোমাকে বলেছে, তাতে নাকি আসল খবর বিলকুলই ফাঁস হয়ে গেছে। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে — আমরা যে বাঙ্গালা মুলুকের আজাদী চাই, আমরা যে মনে প্রাণে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের পক্ষের লোক—তার কথা থেকে এদিকটা তোমার কাছে একদম খোলাসা হয়ে গেছে। আমি এত তাকে বলছি—এ নিয়ে কোন ভাবনা নেই, শরীফ আমাদের একান্তই নিজের লোক, কাশিম খাঁর মতো আদৌ সে বেঈমান বা মোনাফেক নয়, বরং আমাদের চেয়ে আজাদীর জন্যে সে অনেক বেশী তৎপর, তবু ভয়টা তার ফুরোচ্ছে না।

আম্মির কথা উঠতেই শরীফ রেজা অনুমান কিছু করেছিলেন। এবার তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে, এই আম্মিই সেই অসামান্যা সুন্দরী যিনি তাঁর পথ আগলে সওয়াল জবাব করলেন। এতে আরো উৎসাহী হয়ে উঠে শরীফ রেজা বললেন — আচ্ছা! বড় তাজ্জব ব্যাপার তো!

খান সাহেব বলেই চললেন — হাজার হলেও বয়স খুবই কাঁচাতো, একেবারেই ছেলে মানুষ। মনটাও খুব সরল। এ মুলুক স্বাধীন হোক — এতে তার বেজায় আগ্রহ, কিন্তু তাতে করে আমার কিছু হোক, এটাও আবার চায় না সে।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ বাপ মা মরা লেড়কি! আর তো কেউ নেই তার ভাই-বেরাদর-আত্মীয়-স্বজন নেই। আমি বলি, হেফাজত করার মালীক ঐ আল্লাহ! তবু তার ধারণা — আমার অভাবে সে একদম এতিম হয়ে যাবে। তার আর আশ্রয় কিছু থাকবে না। দবির খাঁর হুশবুদ্ধি তো খুবই কম, তার উপর ভরসা করা যায় না।

শরীফ রেজার উৎসাহ ক্রমে বেড়েই চললো। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলেন — উনি তাহলে কে আপনার ?

ঃ কে, ঐ কনকলতা ?

চমকে উঠলেন শরীফ রেজা। নামটা তার পরিচিত। ঠিক 'কনকলতা' নয়, 'লতা' নামটা পরিচিত। জিন্দেগীর চরম এক মুহূর্তে তিনি কয়েকবার শুনেছেন

ঐ নাম। সে মুহূর্ত এমনই এক মুহূর্ত যেখানে এ নাম তাঁর বিস্মৃত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। তাই. কনকলতা বলতে 'লতা' শব্দ উচ্চারিত হওয়ায় নিজের অজ্ঞাতেই বেশ একটু চমকে উঠলেন তিনি। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন — কনকলতা! কনকলতা কে?

ঃ ঐ আম্মি — মানে ঐ বেটি। ওর নাম কনকলতা।

ঃ ও। তা উনি আপনার কে? আপনার মেয়ে তো নয়?

ঃ না-না, আমার মেয়েও নয়, বা ঐ দবির খাঁ, যাকে ও বাবা বলে ডাকে, তার মেয়েও নয়। ও বেটি জাতিতে হিন্দু। এক হিন্দুর মেয়ে। কিন্তু তা হলে কি হবে, ও আমাদের — বিশেষ করে ও আমার — নিজের মেয়ের চেয়ে এখন এতটুকু কম নয়। বরং দরদের দিক দিয়ে অনেক আপন বেটির চেয়ে ও বাড়া।

ঃ আচ্ছা! উনি তাহলে হিন্দুর মেয়ে?

ঃ হ্যাঁ, এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মেয়ে।

ঃ কোন রাজকন্যা?

ঃ মানে?

ঃ উনি কি কোন রাজার মেয়ে?

হেসে ফেললেন ফৌজদার সোলায়মান খান। হাসতে হাসতে বললেন — তার ঐ খুব সুরাত দেখে বলছো? হ্যাঁ, বেটি আমার গড়নে-বরণে, চোখ-মুখ-চেহারায় কোন রাজকন্যার চেয়েই কোন অংশে কম নয়। বরং এতো মাত্রাধিক সুন্দরী রাজকন্যাও কেউ কোথাও দেখেছেন কিনা জানিনে। আর এই জন্যেই যে দেখে, সে-ই এই ভুলটা করে।

ঃ ভুল!

ঃ যে দেখে সে-ই ভাবে, রাজকন্যা। কেন, সুন্দরী মেয়ে শুধু রাজার ঘরেই জন্মায়? কোন সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মায় না? অনেক গরীব ঘরেও তো জন্মায়।

ঃ তা ঠিক — তা ঠিক।

ঃ ওর বাপ-মায়েরা ছিলেন বর্ণে-গোত্রে খুব উঁচু ঘরের অবস্থাপন্ন লোক। ভাগ্য বিপর্যয়ে তাঁরা সর্বশান্ত হন। কনকলতারা এসে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠে। কিন্তু বদনসীব! সে আত্মীয়েরাও আর এক বিপর্যয়ে বিরাণ হয়ে যায়।

ঃ বলেন কি! তা এখানকারই লোক এঁরা?

ঃ না, এখানকার নয়। কনকলতাদের বাড়ী ঐ ত্রিবেণীতে।

ঃ ত্রিবেণীতে! তাহলে এখানে এলেন কি করে?

ঃ ঐ ত্রিবেণী থেকেই আনা হয়েছে এখানে।

ঃ আনা হয়েছে!

ঃ সে অনেক কথা। অবসর মতো আর একদিন তা বলবো। ঐ দবির খাঁই এনেছে তাকে এখানে। তাও কয়েক বছর আগের কথা।

এরপর প্রশ্ন করা হয়তো আর চলে না। কিন্তু শরীফ রেজার চিন্তা-ভাবনা সে পর্যায়ে ছিল না। এরপরও তিনি প্রশ্ন করলেন — আপনার মকানেই থাকেন উনি?

ঃ আরে না-না, ঠিক আমার মকানে নয়। ঐ পিছের দিকে আমার মকানের সাথে সংলগ্ন এক আলাদা মকানে থাকে। ঐ তো ওখানেই যে কয়ঘর হিন্দু প্রজা আছে আমার, কনকলতা আচার-অনুষ্ঠান সমাজ-জামাত ওদের সাথেই করে।

ঃ তাজ্জব!

ঃ হ্যাঁ, তাজ্জবই বলতে পারো। সমাজ-জামাত যার সাথেই সে করুক, ওর চার প্রহর দিনের তিন প্রহরই আমার মকানে কাটে। এরপর ঐ দবির খাঁ। আম্মি বলতে অজ্ঞান। বেচারীর জাত-গোত্র কেউ ঠাহর করে, সাধ্যি কার?

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে খানিক পরে খান সাহেব প্রশ্ন করলেন — হুজুর কেমন আছেন?

চিন্তামগ্ন শরীফ রেজা মাথা তুলে বললেন — জি?

ঃ হুজুরের খোঁজ খবর আর রাখার সময় পাও?

ঃ কার, শায়খ হুজুরের?

ঃ হ্যাঁ, শায়খ হুজুরের। হুজুর সাহেবের হাল-তবিয়ত কেমন এখন?

ঃ আমি তো এখন কিছুদিন লাখ্‌নৌতিতে আছি। তবে মাঝে একবার সাতগাঁয়ে গিয়েছিলাম। তখন কয়দিন শায়খ হুজুরের খেদমত করার মওকা আমার মিলেছে। তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য আল্লাহর রহমে ভালই দেখেছি তখন।

ঃ তুমি তো এখন লাখ্‌নৌতিতেই অধিক সময় থাকছো। তাঁর তদবিরের কোন অসুবিধে হচ্ছে নাতো?

ঃ জি না, বেশ কয়েকজন শিষ্যমুরিদ তাঁর মোকামে হরওয়াক্তই হাজির থাকে। তাদের ভাল করে নসিহত করা আছে। এ ছাড়া, লাখ্‌নৌতি ফেরার কালে আবার তাঁর খোঁজ খবরটা নিয়ে যাবো—এ ইরাদা আছে আমার।

ঃ ভাল-ভাল। তা নকরী একদম ছেড়েই দিলে।

ঃ জি। ও আমার পোষায় না। তা ছাড়া, হুজুরের খোঁজ-খবর রাখাতেও বিঘ্ন ঘটে।

ঃ লাখ্‌নৌতিতে কোথায় আছো এখন? সরকারী আবাসে নয় নিশ্চয়ই?

ঃ জি না। আমার ইয়ার বন্ধু আর শুভাকাঙ্খী অনেকেই আছেন ওখানে। ওদের দাওয়াতই শেষ করতে পারিনে। এ ছাড়া রিস্তেদারও আছে কয়েক ঘর। থাকার আমার ওখানে কোন অসুবিধেই নেই।

ঃ তোমার নিজের মকানটা এখনও কি —
ঃ জি, আমার সেই রিস্তেদার সপরিবারে এখনও আছেন ওখানে।
ঃ তুমি কিছু বলো না ?
ঃ কি বলবো ? আমার তো মকানের কোন জরুরত নেই এখন।
ঃ আচ্ছা। তা তোমার সেই রিস্তেদার, মানে অর্থসচিব মালীক হুসামউদ্দীন আবু রেজা সাহেবের সাথে তোমার সম্পর্ক এখন কেমন ?

শরীফ রেজা থামলেন। একটু থেমে বললেন — সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, সেটা খুব উষ্ণও নয় — আবার ঠাণ্ডাও নয়। দূর দিয়ে হলেও ঐ মালীক হুসামউদ্দীন আবু রেজাই আমার বেশী নিকট আত্মীয়। কিন্তু তাঁর মাত্রাধিক 'জি-হুজুর' মানসিকতা খুবই না-পছন্দ আমার।

ঃ তোমার ইয়ার বন্ধুদের ? তাদের মনোভাব কি রকম ? মানে কি ধরনের মন-মানসিকতার লোক তারা ?

ঃ তাঁরাও অধিকাংশই নকরীগত প্রাণ। তবে ঐ রেজা সাহেবের মতো অত উগ্র কেউ নন।

ঃ হুঁউ! তোমাকে নিয়ে কথা হয় না লাখ্নৌতিতে ?
ঃ কথা!
ঃ তোমার মতো এমন একজন চৌকষ যোদ্ধাকে লাখ্নৌতিতে এভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে কেউ কিছু বলে না ?

ঃ তা বলবে কেন ? আসলেই তো আমি শায়খ হুজুরের লস্কর। হুজুরেরই খাদেম। হুজুরের হুকুমে কয়দিনের জন্যে নকরী কবুল করেছিলাম। এখন আবার হুজুরের কাজে আছি — এটা সবাই জানে।

ঃ লাখ্নৌতির ওয়ালী ঐ কদর খান সাহেব কি জানেন — তুমি এখন লাখ্নৌতিতেই থাকো ?

ঃ জি, খুব ভালভাবেই জানেন। কিছুদিন আগে উনি আমাকে ডেকেছিলেন তাঁর বিশেষ এক বাহিনীর দায়িত্ব নেয়ার জন্যে। কিছুটা অনুরোধই করেছিলেন।
ঃ তারপর ?
ঃ আমি আমার অপারগতা অত্যন্ত তাজিমের সাথে জানিয়ে দিয়েছি তাঁকে।
ঃ উনি এতে গোস্বা হননি ?
ঃ গোস্বা হওয়ার ব্যাপার তো নয়। নকরী আমি করবো না — কথাটাতো এই। তবু যদি গোস্বা হন উনি, হোন গে। তাতে আমার কি এসে যায় ?
ঃ শাব্বাশ্!

ফৌজদার সাহেব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। শরীফ রেজা বললেন — জি ?

ফৌজদার সাহেব বললেন — তোমার এই মানসিকতা আমার খুব পছন্দ। আল্লাহ্‌র রহমে তোমার দ্বারা অনেক কাজ হবে দেশের।

শরীফ রেজা মৃদু হেসে বললেন — কাজ কি হবে তা জানিনে। তবে ঐ বেঈমানদের মতো অকাজ কিছু আমার দ্বারা না হোক — এই দোআই চাই আমি।

ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমার উম্মিদ পুরা করুন। তা তুমি কি এখন তাহলে ঐ —
ঃ জি, সোনার গাঁয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছি। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগে আপনার কিছু নসিহত চাই।
ঃ নসিহত ?
ঃ জি। যদি তেমন কিছু থাকে।
ঃ না, এক্ষণে নসিহত করার মতো তেমন কোন দিক আমি দেখছিনে। তবে যথেষ্ট হুঁশবুদ্ধি থাকলেও, বয়সে তুমি নিতান্তই তরুণ। তাই তোমাকে কিছুটা হুঁশিয়ার করে দেয়া আমার উচিত। সোনার গাঁয়ের আবহাওয়া এখন অত্যন্ত গরম। কে যে কাকে কখন কোন ফ্যাসাদে ফেলছে, তার ঠিক ঠিকানা কি ? খুব সাবধানে এখন পা ফেলবে ওখানে, কথা বলবে চারদিকে চোখকান খোলা রেখে। রাজনৈতিক ব্যাপারে তোমার কোন আগ্রহ আছে, এমন কোন ভাবই তুমি কারো কাছে দেখাবে না।
ঃ জি আচ্ছা।
ঃ আমাদের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হওয়ার আপাতত আর মওকাই কিছু নেই। তাই, এখন আমাদের করার মতো কাজও কিছু নেই ওখানে। নয়া পরিবেশ পয়দা হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, এখন আমাদের কাজ শুধু নীরবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করা — ব্যস্! এর অধিক কিছু নয়।

ফৌজদার সাহেব থামলে শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন — আপনার জানামতে যথেষ্ট বিশ্বাসী লোক কে বা কারা আছেন ওখানে — যাদের সাথে কিছুটা ভাব বিনিময় করা যায় ?

ঃ আমার জানার আর কোন দাম নেই। কে যে বেঈমানী করে দিল্লীর দলে ভিড়েছে আর কে ভিরেনি, এখান থেকে তা এখন নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে একজন লোক আছেন, যাঁর সাথে কিছুটা নিশ্চিন্তে কথাবার্তা বলতে পারো।
ঃ কে তিনি ?
ঃ শাহ্ ফখরউদ্দীন।
ঃ মানে! ঐ বাহরাম খানের ডান হাত ফখরউদ্দীন ?
ঃ হ্যাঁ, তাঁর ঐ ডান হাত। লোকটার মধ্যে আগুন আছে।

অপারসীম বিস্ময়ে শরীফ রেজা কিছুক্ষণ ফৌজদার সোলায়মান খানের মুখের দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন। এরপর বললেন — এ আপনি কি বলছেন ? ও লোকতো দিল্লীর গোলামেরও গোলাম!

ফৌজদার সাহেব ঈষৎ হেসে বললেন — তাই হয়। জালিমদের প্রতিদ্বন্দ্বি জালিমদের ঘরেই পয়দা বা প্রতিপালিত হয়। এইটেই আল্লাহ্ তায়ালার বিধান। তুমি তাঁর সাথে কথা বলে দেখতে পারো।

ঃ কিন্তু —

ঃ না-উম্মিদ হওয়ার কারণ নেই। আমার কথা আগে তাঁকে বলবে। তারপর পরিস্থিতি অনুকূল হলে আলাপ সালাপ করবে, না হলে করবে না।

ঃ জনাব!

ঃ বেরিয়েছো যখন তখন আগে যাও ওখানে। একবার না হয় শুধু শুধুই ঘুরে এলে। ওখানকার অবস্থা তো দেখে আসতে পারবে কিছুটা ?

ঃ জি, তা পারবো।

ঃ তাতেও কাজ হবে। সোনার গাঁয়ের বর্তমান অবস্থাতো এখন আমাদের জানা খুব প্রয়োজন।

ঃ তা ঠিক — তা ঠিক।

ঃ শায়খ হুজুরের কাছে যতটুকু শুনেছি, তাতে তুমিই একমাত্র লোক, যে এই সময়ে যথেষ্ট কাজে লাগতে পারবে।

ঃ জি ?

ঃ এসব কাজে যথেষ্ট সাহস আর তাকতের প্রয়োজন। এর চেয়েও অনেক বেশী খতরনাক্ আর ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে সে সাহস-তাকতের পরিচয় তুমি নাকি সাফল্যের সাথে দিয়েছো।

ঃ জি না — জি না, তেমন কোন সাহস-তাকতের লোক আমি নই।

ঃ এই সময়ে সোনার গাঁয়ে যাওয়ার ইরাদায় এই যে তুমি নিজ গরজেই বেরিয়েছো, দিল্লীর কোন প্রিয়পাত্র না হয়েও ঐ উত্তপ্ত পরিবেশে প্রবেশ করার এই যে তোমার উৎসাহ , এইটেই বা কম সাহসের পরিচয় কি ? হুজুর সাহেব তোমার সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলেননি কিছু।

ঃ ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। মুরুব্বীদের দোয়া থাকলে, কোন কাজই কঠিন কাজ বলে মনে করিনে আমি — এই আর কি!

অতপর শরীফ রোজা নড়ে চড়ে উঠলেন এবং ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — তাহলে আমি আসি এখন।

ঃ এখনই যাবে ?

ঃ জি। বেলা আর বেশী নেই। দেরী হলে মুসিবত হবে।

ঃ তাতো ঠিক। কিন্তু তোমার খানাপিনা — মানে —

ঃ হোয়েছে। বেশ ভালভাবেই হয়েছে। পথেই আমার এক বিশেষ শুভাকাঙ্খী তাঁর মকানে নিয়ে গিয়ে আচ্ছামতো খাইয়ে দিয়েছেন আমাকে। ও নিয়ে আর ভাবনা নেই।

ঃ ঠিক তো ?

ঃ জি, বিলকুল ঠিক। আমি চলি। অনেক সময় কেটে গেল আমার এখানে। হিসেবের চেয়েও বেশী সময় ব্যয় হলো। আর দেরী করা আদৌ সমীচিন নয় আমার জন্যে।

উঠে দাঁড়ালেন শরীফ রেজা। অগত্যা খান সাহেবও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন — আচ্ছা এসো। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করুন তোমাকে।

সালাম দিয়ে শরীফ রেজা দহলীজ থেকে বেড়িয়ে এলেন। সালাম নিয়ে কিছুক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন অবসরপ্রাপ্ত ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব।

দহলিজ থেকে বেরিয়ে আঙ্গিনায় পা দিয়েই শরীফ রেজার অকস্মাৎ খেয়াল হলো কনকলতার কথা। খেয়াল হলো তাঁর সেই আকর্ষণীয় মন্তব্যটাঃ "ফৌজদার সাহেবের মকানের চারপাশে চোরা-নজর ফেললেই দেখতে পেতেন আমাকে"। একথা খেয়াল হতেই শরীফ রেজা ভাবলেন — হয়তো কনকলতা কোথাও না কোথাও আশেপাশেই রয়েছেন। সেই সাথে একবার তাঁর ইচ্ছে হলো — একটু এদিক ওদিক নজর দেয়ার। কিন্তু পরক্ষণে লজ্জায় তিনি সংকুচিত হয়ে গেলেন। এতোটা ছোট হতে মন তাঁর চাইলো না। ফলে, ঐ অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা মানসপটে নিয়েই তিনি নতমস্তকে খান সাহেবের আঙ্গিনাটা পেরিয়ে এলেন। চোরের মতো চোখ তুলতে গেলেন না।

কিন্তু নসীবের ব্যাপার বিচিত্র। সময় সংকীর্ণবোধে শরীফ রেজা পুনরায় সোজাপথই ধরলেন। যে পথে এসেছিলেন সেইপথেই দ্রুতপদে হাঁটতে লাগলেন। ঐ ফুলবাগানের কাছে আসতেই আবার সেই কণ্ঠস্বর — শুনুন —

আবার সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেলেন শরীফ রেজা। চোখ তুলেই দেখলেন — ঐ একই জায়গায় একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কনকলতা। এবার তাঁর শির অতি বিনম্র আর মুখমণ্ডলে অপরাধের গ্লানী। শরীফ রেজা চোখ তুলতেই কনকলতা দুই হাত জোড় করে বললেন — আমি আপনাদের কথপোকথন শুনেছি। তাই, আমি আপনার সময় খাটো করবো না। আমার স্রেফ একটি আরজ না জেনে, না চিনে, অনেক কটুকথা বলেছি আমি আপনাকে। ব্যবহারেও আমার কোন শালীনতা ছিল না। এ সবটুকুই অজ্ঞতার জন্যে বুঝলেন, ইচ্ছাকৃত বা দুষমনী

কিছু নয়। এর জন্যে আপনি আমাকে দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। আমি একজন আসলেই বালিকা আর বয়সে আপনার ছোট। আপনার ক্ষমা পাওয়ার হক আমার আছে।

এরপরেই মেয়েটি ফের অদৃশ্য হয়ে গেলেন। নিমেষ কয়েকের জন্যে পা তুলতেই ভুলে গেলেন বিহ্বল শরীফ রেজা।

২

সোনার গাঁ যুদ্ধান্তের সোনার গাঁ। লড়াই-লুট, খুন-জখমে জর্জ্জরিত সোনার গাঁ। মোসাহেবী-মোনাফেকীর মসীলিপ্ত সোনার গাঁ। রণাঙ্গনের তূর্যনাদ স্তব্ধ হয়ে গেলেও কলরব-কোলাহলের প্রতিষ্ঠিত প্রবাহমাঝে তখন সেখানে কোন স্থবিরতা আসেনি। ডাক-হাঁক হৈ হুল্লোরে সোনার গাঁয়ের পথঘাট তখনও উত্তপ্ত। প্রতিহিংসার বিষবাষ্পে সোনার গাঁয়ের বায়ু মণ্ডল তখনও বিষাক্ত। আতংকে ও তরাশে জনমন-পরিবেশ তখনও থমথমে।

শরীফ রেজা সোনার গাঁয়ে প্রবেশ করে দেখলেন, বেসামরিক লোকের চেয়ে প্রতিটি রাজপথে টহলদার সেপাইদের আনাগোনাই অধিক। প্রতিটি রাজপথের আদি থেকে অন্ততক্ সর্বত্রই বল্লমধারী সেপাইরা হল্লা করে ফিরছে আর করার কিছু না থাকায় পরস্পর পরস্পরের উদ্দেশ্যে অহেতুক গালমন্দ আর হাঁকাহাঁকি করছে। সাধারণ লোকের মন-মানসিকতার মধ্যেও আচানক এক পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন তিনি। সকলের কথাবার্তা আর আচরণের মধ্যে এমন একভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে যেন, সবাই এরা দিল্লী মুলুকের লোক, বাঙ্গালা মুলুকের সাথে কোনকালেই এদের কখনও যোগ সম্পর্ক ছিল না এবং দিল্লীর মতো এত উম্দা মানুষ আর মাটি এ ত্রিভূবনে আর কোথাও আছে, এ বিশ্বাস জান গেলেও করতে তারা নারাজ। যে একান্তই বাঙ্গালার ছাপ মুছে ফেলতে পারছে না, সেও দিল্লীর প্রসঙ্গ উঠলেই, বিশেষ করে বাহরাম খানের নামে, কথায় কথায় হাত ভুলছে কপালে।

শরীফ রেজা তাজ্জব হলেন। এর আগেও তিনি অনেকবারই সোনার গায়ে এসেছেন। তখনও সোনার গাঁয়ে দিল্লীর শাসন ছিল। প্রেম-প্রীতি পড়ে মরুক, দিল্লীর কোন নাম গন্ধও তখন তিনি দেহ-মনে চিন্তা-ভাবনায় এদের কারো দেখেননি। অথচ হঠাৎ করে এখন এই দিল্লীপ্রীতির প্লাবন স্রেফ দিল্লীর শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণেই পয়দা হলো — এটা তিনি মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি হাঁটতে লাগলেন আর ভাবতে লাগলেন — ব্যাপার কি?

রাজধানীর যে পথ ধরে শরীফ রেজা ভেতরের দিকে এগুচ্ছিলেন, নসীবগুণে সে পথের প্রবেশ মুখে তখন কোন টহলদার সেপাই বা সরকারী লোক ছিল না। তা থাকলে তিনি এমন নিশ্চিন্তে আর নির্বিবাদে শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারতেন না। রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে নয়া লোকের প্রবেশ এখন অনেকটা সাধ্যাতীত ব্যাপার। আর নাহোক, হাজারটা সওয়ালের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলে, তবেই সে এজাযত পাওয়া যায়। প্রবেশমুখে লোক না থাকায় সে ঝামেলা না হলেও, তিনি অবশ্য ঝুট্ ঝামেলা বিলকুলই এড়িয়ে যেতে পরলেন না। ঝামেলায় তাঁকে পড়তেই হলো, এবং বলা যায়, মহাফ্যাসাদে পড়তে হলো—যদিও তার পট-প্রসঙ্গ অন্যরকম। রাজপথের যে অংশে বাইরের লোকের চলাচল একেবারেই বিরল হয়ে এসেছে, সে অংশে এসে কিয়দ্দূর এগুতেই ইয়াব্বড় গোঁফওয়ালা এক বিপুল দেহী টহলদার বল্লম তুলে হাঁক দিলো — হুঁশিয়ার —

গোঁফওয়ালা টহলদারটি। অনেকখানি দূরে ছিল। শরীফ রেজাকে দেখেই সে দূর থেকে হাঁক দিয়ে লাফিয়ে এলো সামনে। সামনে এসেই বল্লম ঠুকে বললো — কৌন হ্যায়?

টহলদারের তম্বি দেখে শরীফ রেজা তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। দেবার মতো সুবিধেজনক পরিচয় তৎক্ষণাৎ তিনি তালাশ করে না পেয়ে ফস্ করে বললেন—মুসাফির।

ব্যস্! সঙ্গে সংঙ্গে প্রলয়।

ভূৎ দেখারও অধিক মাত্রায় আঁতকে উঠলো টহলদার। হাত-পা ছুড়ে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার শুরু করলো — কিয়াবাত্! মর্গিয়া-মর্গিয়া! বিলকুল মুর্দা হো গিয়া! এরপরই সে পিছন ফিরে হাঁক ছাড়তে লগলো — হৈ ছালে আল্সের পো আল্সে।

আব্বে হৈ ছালে বেঈমানের বাচ্চা, ইধার আও — জলদি —

ক্ষীণকায় দেহের উপর বিশাল আকার পাগ্ড়ি-আটা আর একজন টহলদার ছুটে আসতে আসতে চীৎকার করে বললো — কি হলো খাঁ সাহেব? কি হলো কি হলো —

জবাবে ঐ গোঁফওয়ালা টহলদার একই রকম আতংকের সাথে বললো — গজব-গজব! ইধার গজব হো গিয়া, একদম তুফান হো গিয়া।

গোঁফওয়ালার ভাব দেখে পাগ্ড়িওয়ালা টহলদার হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সেও থতমত করে বললো — তুফান!

ঃ বিলকুল তুফান! নকরী খতম!

ঃ সেকি!

ঃ আর সেকি! ছালে বগ্‌লা, ছিলে কোথায় এতক্ষণ ?

ঃ কোথায় ছিলাম মানে!

ঃ মানে তোমার মুণ্ডু। এ আদমী এখানে এলো কি করে ?

পেছন ফিরে গোঁওয়ালা কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান শরীফ রেজাকে দেখিয়ে দিলো। পাগড়িওয়ালা এতক্ষণও শরীফ রেজাকে দেখার মওকা পায়নি। গোঁফওয়ালার আতংকেই সে হয়রান ছিল এতক্ষণ। শরীফ রেজাকে দেখে এবার পাগ্‌ড়িওয়ালা রীতিমতো ভড়কে গেল। শরীফ রেজার সাথে তাঁর অশ্ব তখন ছিল না। শহরের উপকণ্ঠে এক পশুপালকের কাছে মোটা অর্থের বিনিময়ে শরীফ রেজা তাঁর অশ্বটাকে জমা দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পরণে তার আটশাট পোশাক এবং কোমরে তাঁর সুদীর্ঘ তলোয়ার তখনও বিদ্যমান ছিল। এটা লক্ষ্য করেই পাগড়িওয়ালা বেসামাল হয়ে গেল। সেও আঁতকে উঠে বললো — এ্যাঁ! তাইতো! একি, কে এ লোক ?

শুরু হলো বিতণ্ডা ও গালমন্দ। গোঁফওয়ালা ক্রোধভরে বললো —কে এ লোক ? ছালে, তোর বোনাই।

ঃ বোনাই!

ঃ দুলাভাই, তোর পেয়ারের দুলাভাই।

ক্ষেপে গেল পাগড়িওয়ালা টহলদারও। বললো — এ্যাঁ! আমার পেয়ারের দুলাভাই ? তবেরে উল্লু, আমার হবে কেন ? তোর। তোর পেয়ারের দুলাভাই।

ঃ নেহি-নেহি, তোর।

ঃ উহুঁ, নির্ঘাত তোর। তোর দুলাভাই না হলে, এ আদমী শহরে ঢুকলো কি করে ?

ঃ আব্বে ছালে, আমারও তো ঐ একই কথা — এ আদমী শহরে এলো কি করে ?

ঃ এ্যাঁ! তোরও ঐ একই কথা ? তা হলে ?

পাগড়িওয়ালা ভাবনায় পড়ে গেল। এরপর সে গোঁফওয়ালাকে আক্রমণ করে বললো — সওয়াল করে দ্যাখ্‌না উল্লু, এ আদমী কে ?

গোঁফওয়ালা উৎসাহভরে বললো — দেখেছি-দেখেছি!

ঃ দেখেছিস ?

ঃ বিলকুল দেখেছি।

ঃ কি বলে ?

ঃ মুসাফির।

ঃ সে কি! মুসাফির ?

ঃ খাশ মুসাফির।

পাগ্‌ড়িওয়ালা আরো বেশী ঘাবড়ে গেল। বললো—সর্বনাশ! তা হলে তো পরদেশী! এতক্ষণে গোঁফওয়ালার হুঁশ হলো. মুসাফির মানে পরদেশী। অন্ততঃ স্থানীয় লোক নয়। এ হুঁশ এর হতেই সে আর এক দফা আঁত্‌কে উঠলো। আত্‌কে উঠে বললো— এ্যাঁ! পরদেশী ?

ঃ স্রেফ পরদেশীই নয়, পরদেশী সেপাই।

ঃ সেপাই ?

ঃ নির্ঘাত দুষমন!

গোঁফওয়ালা মাথায় হাত দিলো! চোখ মুখ ফুটিয়ে তুলে সে চীৎকার শুরু করলো — কিয়ামত-কিয়ামত! দুষমন লোগ্‌ অন্দরমে আ-গিয়া! নকরী লুট হো গোয়ী, জরুর লুট হো গোয়ী।

দিশেহারা হয়ে পাগড়িওয়ালাও ক্ষণকাল হা করে চেয়ে রইলো। এরপর সে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে গোঁফওয়ালাকে ধমক দিয়ে বললো—থাম্‌ শালা! হাউ-হাউ করিস্‌ ক্যান্‌ ? রাস্তার মাথায় কে ছিল এতক্ষণ, তাই আগে বল্‌ ?

ধমক খেয়ে গোঁফওয়ালা থমকে গেল। চীৎকার বন্ধ করে সে প্রশ্ন করলো — কিয়া কাহা ?

ঃ সদর রাস্তার মাথায় কোন আহম্মক ছিল ?

ঃ কেঁউ ? তুই-ই তো ছিলি।

ঃ আমি! না-না, কখ্‌খনো না। আমি তো এখানে।

ঃ জরুর তুই ছিলি।

ঃ আরে, তবু বলে তুই ছিলি! তাহলে তুই-ই ছিলি। আমি এখন বিলকুল বুঝতে পারছি ব্যাপারটা।

ঃ হাম্‌ ?

ঃ আলবত্‌ তুই ছিলি। শালা উল্লু, নির্ঘাত কয়েক ছিলুমের পিরীতে তুই রাস্তা ছেড়ে দিয়েছিস্‌।

ঃ কভ্‌ভি নেহি, কভ্‌ভি নেহি। বিলকুল তোরই এ কাজ।

ঃ আমার ?

ঃ জরুর-জরুর। ছালে বগ্‌লা, তংকা খিচে লিয়ে তুই-ই ছালে চিচিমটা ফাঁক করে দিয়েছিস্‌।

এরপর উভয়েই বল্লম ঠুকে দাঁড়ালো। পাগড়িওয়ালা বললো — চুপ্‌ শালা দিল্লীর উল্লু, তোরই এ কাজ।

গোঁফওয়ালা বললো — খামুশ্‌ ছালে বাঙ্গালার বগ্‌লা, তেরই এ কাজ।

ঃ একশো বার তোর।

ঃ পান্‌শো বার তোর।

ঃ খবরদার —

ঃ হুশিয়ার —

উভয়েই বল্লম তুলে ধরলো। শরীফ রেজা এতক্ষণ এদের রঙ্গ দেখছিলেন। প্রথমে হক্‌চকিয়ে গিয়ে এবং পরে অত্যন্ত মৌজের সাথে এদের এই উজবকপনা ঠায় উপভোগ করছিলেন। কিন্তু এবার তিনি সত্যি সত্যিই আতংকিত হয়ে উঠলেন। এদের যা বুদ্ধির বহর আর খুনাখুনীতে এখন এরা যে রকম মশগুল, তাতে কার বল্লম যে অতর্কিতে কার উদরটা ভেদ করবে, তা কিছুই আন্দাজ করার উপায় নেই। শরীফ রেজা ভেবে দেখলেন — তাঁকে নিয়ে হঠাৎ যদি কোন খুন খারাবী হয়েই যায় এখানে, তা হলে তা তাঁর জন্যে মোটেই সুখের হবে না। হরেক রকম ফ্যাসাদসহ তাঁর এখানে সহজভাবে বিচরণের পথে হাজারটা বিঘ্ন এসে দাঁড়াবে। অতএব, তাঁকে বাধ্য হয়েই এই বুদ্দুদ্বয়ের দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করতে হলো। তিনি তাদের সামনে এসে বললেন — আরে ভাই খাঁ সাহাবরা, আপনারা সব করেন কি করেন কি ? আমি দুষমন নই, দোস্ত। আমাকে নিয়ে আপনাদের এত হয়রান হওয়ার কারণ নেই।

গোঁফওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে বললো — এ্যাঁ! দোস্ত ?

ঃ হ্যাঁ, দোস্ত। আমি আপনাদের মেহমান।

বল্লম নামিয়ে নিয়ে পাগড়িওয়ালা বললো — এ্যাঁ! মেহমান ?

গোঁফওয়ালা প্রশ্ন করলো — কোথা থেকে আসছেন আপনি ?

শরীফ রেজা বললেন — গৌড় থেকে।

ঃ গৌড় মানে ঐ লাখ্‌নৌতি ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, লাখ্‌নৌতি।

ঃ আমাদের দুস্‌রা হুজুর কদর খান সাহেবের মোকাম থেকে ?

ঃ হ্যাঁ, তাঁরই মোকাম থেকে।

ঃ কেয়া তাজ্জব! কদর খান সাহাবতো আমাদের লোক। আমাদের হুজুরে-আলার দোস্ত।

ঃ সেই কথাই তো বলছি। পাগড়িওয়ালা প্রশ্ন করলো —আপনি কি সেপাই ?

শরীফ রেজা বললেন — হ্যাঁ সেপাই।

ঃ লাখ্‌নৌতির সেপাই ?

ঃ হ্যাঁ, এককালে তাই ছিলাম।

ঃ কি আশ্চর্য! লাখনৌতির সেপাইরাতো শত্রু নয় সোনার গাঁয়ের, বন্ধু। আমাদের এই সোনার গাঁয়ের হুজুরে-আলার পক্ষে তাঁরা এন্তার লড়েছেন ঐ ব্যাটা বেয়াদপ-বেআক্কেল গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের বিরুদ্ধে। আপনিও তো লড়েছেন ?

ঃ না, মানে — আমি ঠিক লড়িনি। আমি লাখ্‌নৌতির সেপাই ছিলাম এর কিছুদিন আগে।

ঐ গোঁফওয়ালা লাফিয়ে উঠে বললো — না, তখনও আপনি ছিলেন। শরীফ রেজা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন—তখনও ছিলাম ?

ঃ জরুর ছিলেন আর আপনিও নির্ঘাত লড়েছেন। আপনি লাখ্‌নৌতির সেপাই। আপনি না লড়ে পারেন ?

শরীফ রেজা ফাঁপড়ে পড়লেন। বললেন—আরে ভাই, আমি তখন এই সোনার গাঁয়ে আসিনি। ঐ লাখ্‌নৌতিতে ছিলাম।

গোঁফওয়ালার মুখের জবাব ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে পাগড়িওয়ালা বললো – ঐ লাখ্‌নৌতি থেকেই তাহলে লড়েছেন। ঐ ব্যাটা গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর আমাদের হুজুরে-শান, হুজুরে-জান দিল্লীর শাহ্‌র দুষমন। তার বিরুদ্ধে না লড়ে পারেন আপনি ?

শরীফ রেজা বুঝলেন প্রতিবাদ এখানে শুধু অর্থহীনই নয়, বিপজ্জনকও বটে। সাধ করে নিতান্তই ঝুটঝামেলা ডেকে আনা। তাই তিনি এদের সাথেই সায় দিয়ে বললেন — তাহলেই এখন বুঝুন, আমি আপনাদের দুষমন, না দোস্ত!

খুশীতে জার জার হয়ে গোঁফওয়ালা বললো—দোস্ত-দোস্ত, হরগিজ দোস্ত।

পাগড়িওয়ালা বললো — আপনি কি আমাদের হুজুরে-আলা পেয়ারে-জান বাহ্‌রাম খানের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান ? মানে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন ?

অল্প একটু ভেবে নিয়েই শরীফ রেজা বললেন—অবশ্যই অবশ্যই। হুজুরে-আলার সাথেই হোক আর অন্য কোন হোম্‌ড়া চোমড়ার সাথেই হোক, সুযোগ সুবিধামতো সাক্ষাৎ তো আমি করবোই।

দুই চোখ বড় করে পাগড়িওয়ালা বললো — আচ্ছা!

ঃ অনেকের সাথেই মোলাকাত করার ইরাদা আমার আছে।

গোঁফওয়ালা তৎক্ষণাৎ আফসোসে ভেঙ্গে পড়লো। বললো — কেয়া কসুর! কেয়া কসুর! আপনি তো তাহলে জবরদস্ত আদমী। মাফ করে দিন হুজুর। পয়চান করতে না পেরে জব্বোর গলতি করে ফেলেছি।

পাগড়িওয়ালা বললো — হুজুর চিনতে না পেরে আমিও বড় বেয়াদবী করে ফেলেছি। দয়া করে ক্ষমা করে দিন এই অধমকে।

এই ফ্যাসাদ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে শরীফ রেজা বললেন — জরুর, জরুর। আপনাদের সবাইকে আমি ক্ষমা-মাফ — সব করে দিলাম। আমি এখানে মেহমান। আপনাদের কারো উপর কোন অভিযোগ নেই আমার।

গোঁফওয়ালা ফের সোচ্চার হয়ে উঠলো। প্রশ্ন করলো আপনি কার মেহমান হুজুর ?

কি চিন্তা করে লাফিয়ে উঠলো পাগড়িওয়ালা। বললো — কার আবার, আমার। আমার মেহমান। আসুন হুজুর, আপনার খাওয়া থাকার সব ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। কিছুই আপনাকে ভাবতে হবে না। কোন তক্‌লিফও হবে না।

চমকে উঠলো গোঁফওয়ালা। তার হুঁশ হতেই সে তীব্র প্রতিবাদ করে বললো কভ্‌ভি নেহি — হরগিজ নেহি।

পাগড়িওয়ালা থমকে গিয়ে বললো — কি নেহি?

ঃ এ মেহমান তোর নয়, আমার।

ঃ তোর!

ঃ জরুর। ছালে বগ্‌লা, কায়দা করে বাহবাটা তুই একাই নিবি? আসুন হুজুর, আপনার সব দায়িত্ব আমার। আপনার খানা-পিনা, আরাম-বিরাম, উঠা-বসা, নিদ-ঘুম, নাচ্‌না-গাহ্‌না তামাম দায়িত্ব আমার।

— বলেই গোঁফওয়ালা এসে শরীফ রেজার হাত ধরে টানতে লাগলো। এতদ্দৃশ্যে ছুটে এলো পাগড়িওয়ালাও। সে-ও দৌড়ে এসে শরীফ রেজার অপর হাতটা সবলে চেপে ধরে টানতে লাগলো আর গোঁফওয়ালার উদ্দেশ্যে দাঁত খিঁচে বলতে লাগলো — কখ্‌খনো না— কখ্‌খনো না। তুই শালা চিলিম্‌চিদার, হুজুরের মন যুগিয়ে টহলদারের পদ পেয়েছিস্‌। আর কি চাস্‌? আমি যে সেপাই সেই সেপাই-ই থেকে গেলাম। এই হুজুরের খেদমতটা আমি করেছি শুনলে, সিপাহসালার হয়তো এবার আমাকে আর এক কদম উপরে তুলে দেবেন।

এরপর সে শরীফ রেজাকে লক্ষ্য করে বললেন — আসুন হুজুর, আপনি আমার মেহমান। আপনার খেদমত করা তামামটুকুই আমার হক।

গোঁফওয়ালাও টান ধরে বললো — জি না হুজুর, আমার হক।

শরীফ রেজা বুঝতে পারলেন — নিরাপত্তা ব্যহত হলে যে কসুর হবে, সে কসুরের দায় দায়িত্ব নিতে এরা একজনও রাজী নয়। একে অন্যের ঘাড়ে সে দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চায়। অপর দিকে, তাঁর মেহমানদারী করার মধ্যে যথেষ্ট ফায়দা আছে ধারণায় সে ফায়দাটুকু প্রত্যেকেই এরা একাই নিতে আগ্রহী, তার হিস্যা তারা কাউকে দিতে রাজী নয়। এটুকু বুঝতে শরীফ রেজার মোটেই তকলিফ হলো না। কিন্তু ভেবে তিনি পেরেশান হতে লাগলেন যে ব্যাপারটি নিয়ে তাহলো — বুদ্দু বেয়াকুফ্‌ হলেও এতটা বেয়াকুফ্‌ মানুষ তো কখনও হয় না! এরা কি সত্যি সত্যিই এতটা বেয়াকুফ্‌, না অন্য কোন কারণ আছে এর

পেছনে? বিশেষ কোন কারণেই কি হুঁশ-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে এদের, না জন্মগতভাবেই এরা আওয়ারা?

এর উপর আরো যা বিস্ময়কর, তা হলো এই দুর্যোগের সময়ে সরকারী নিরাপত্তা বিধানের এত বড় এই দায়িত্বে এই কিসিমের বিকৃত মস্তিস্কের লোক এখনও বহাল আছে কেন? বাহরাম খানের পক্ষে কাজের লোকের এখানে কি এতই অভাব তাহলে?

এসব ভেবে শরীফ রেজা সাড়া হতেই লাগলেন শুধু, কোন কূল কিনারা পেলেন না। তদুপরি, এসব নিয়ে চিন্তে করার ফুরসুতও আবার অধিক তিনি পেলেন না। অচিরেই তিনি অনুভব করলেন — তাঁর দুই দিকের দুই বাহু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার তৎপরতায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। দুই টহলদার দুই দিক থেকে তাঁর দুই বাহু ধরে সমানে টানছে আর বলছে — আসুন হুজুর, আপনি আমার মেহমান।

শরীফ রেজা উভয়কেই সমঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনভাবেই কাউকে নিরস্ত করতে না পেরে বল প্রয়োগ করবেন কিনা ভাবতেই, ধোপদুরস্ত আঁটশাঁট পোশাকের এক নওজোয়ান ক্ষীপ্রপদে হাজির হলেন সেখানে এবং গরম কণ্ঠে বললেন — এয়, কি হয়েছে এখানে? এত হট্টোগোল করছো কেন তোমরা?

আগন্তুককে দেখামাত্রই আঁতকে উঠলো দুই বুদ্দু। শরীফ রেজাকে ছেড়ে দিয়ে তারা সামনে ছুটে এলো এবং সামরিক কায়দায় আগন্তুককে সালাম দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আগন্তুকের লেবাস, মেজাজ আর চেহারা দেখে শরীফ রেজা বুঝলেন, নিশ্চয়ই ইনি একজন সেনা বিভাগের পদস্থ লোক। বুদ্দুদ্বয় সালাম দিয়ে দাঁড়াতেই নওজোয়ান ফের শক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন — কি হলো, এখানে হৈ চৈ করলে কে?

ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গোঁফওয়ালার প্রতি ইঙ্গিত করে পাগড়িওয়ালা শশব্যস্তে বললো — আমি না হুজুর, ও-ও।

গোঁফওয়ালা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললো — ঝুট্‌ ঝুট্‌, বিলকুল ঝুটা ও হুজুর, ও।

গোঁফওয়ালা পাগড়িওয়ালাকে দেখালো আর সেই সাথেই পুনরায় বাহাজ শুরু হলো। সামনে তাদের উপরওয়ালা দণ্ডায়মান — একথা তারা পলকেই ভুলে গেল। গলার তেজ বাড়িয়ে দিয়ে পাগড়িওয়ালা বললো — কক্‌খনো না। ও, ঐ শালা বুদ্দু।

ঃ নেহি-নেহি, ঐ ছালে বেল্লির ছা —

ঃ অসম্ভব। ঐ শালার গাধার পুত, ঐ কাবলী খাশীর বাচ্চা —

ঃ কভভি নেহি! ঐ —

ধমকে উঠলেন আগন্তুক নওজোয়ান। কর্কশ কণ্ঠে বললেন — খামুশ্‌!

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো বৃদ্দ্বয়। হুজুর তাদের সামনে — এটা খেয়াল হতেই ফের তারা সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এক সাথে বললো — হুজুর!

আগন্তুকটি গোঁফওয়ালাকে ক্রোধভরে প্রশ্ন করলেন — কি করেছে ও?

আসল প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে ভুলে গেল দুই জনই। জবাব খুঁজে না পেয়ে গোঁফর ওয়ালা কেবলই আমতা আমতা করতে লগলো। পুনরায় ধমক দিলেন আগন্তুক। বললেন — বাতাও —

বিপুল বেগে পুনরায় কেঁপে উঠলো গোঁফওয়ালা। দুইহাত জোড় করে অসহায় কণ্ঠে বললো — হুজুর!

ঃ ও কি করেছে বাতাও!

ঃ মালুম নেহি হুজুর।

ঃ খবরদার —

ঃ বিলকুল মালুম নেহি।

ঃ তাজ্জব! এই তুমি বলো, এ উল্লুক কি করেছে? পাগড়িওয়ালাকে প্রশ্ন করলেন আগন্তুক। গোঁফওয়ালার অবস্থা দেখে পাগড়িওয়ালা কাঁপের উপরই ল। এবার সে ও আরো বেগে কেঁপে উঠে বললো — তাতো জানিনে হুজুর।

ঃ হুঁশিয়ার কম্‌বক্‌ত্‌ —

ঃ আমি কিছুই জানিনে।

ঃ তবেরে বেল্লিক! মস্করা পেয়েছো —

খ্যাঁচ করে আগন্তুক তাঁর তলোয়ার টেনে বের করলেন। এই সময় রোয়ানের লেবাস পরা এক ব্যক্তি সেখানে এসে হাজির হলো। নওজোয়ানকে াধ ভরে তলোয়ার টেনে বের করতে দেখেই সে দৌড়ে এসে বাধা দিয়ে লো — হুজুর, করেন কি — করেন কি! এই সেই দুই সেপাই যাদের মাথা র ঠিক নেই।

পাশ ফিরে চেয়ে আগন্তুক নওজোয়ানটি প্রশ্ন করলেন — মানে?

ঐ দ্বারোয়ান মাফিক ব্যক্তিটি সালাম দিয়ে বললো — ঐ যে ঐ ঘটনার পর দুই সেপাই আওয়ারা হয়ে গেছে, এরাই সেই দুইজন। এদের উপর রাগ তে নেই হুজুর।

ঃ তাই নাকি?

ঃ জি হুজুর আমার হুজুর তো এদের কথাই সেদিন আপনাকে বললেন।

ঃ কি কাণ্ড — কি কাণ্ড!

ঃ তলোয়ার কোষবদ্ধ করতে করতে নওজোয়ান ফের বললেন—তা দিদার আলী, তুমি এ দিকে কোথায়?

ঃ আমি হুজুর এই দিকেই এক জরুরী কাজে যাচ্ছি। আপনাকে এখানে পেয়ে ভালই হলো। আমার হুজুর আপনাকে সাক্ষাৎ করতে বলেছেন হুজুর, খুবই নাকি জরুরী।

ঃ এক্ষুণি?

ঃ জি না হুজুর। আপনার সুযোগ সুবিধে মতো যখন পারেন, তখন। তবে আজকের মধ্যে হলেই তা ভাল হয়।

ঃ আচ্ছা-আচ্ছা। আমি আজকেই দেখা করবো।

ঃ তাহলে আমি আসি হুজুর। আমার খুব তাড়া আছে। আর এদেরকে ছেড়ে দিন হুজুর। এদের ঘাঁটাতে যাওয়া মানেই ফ্যাসাদে পড়া।

ঃ তাই তো দেখছি।

সালাম দিয়ে ব্যস্তভাবে বিদায় হলো দিদার আলী। নওজোয়ানটি ঘুরে দাঁড়াতেই শরীফ রেজা সরাসরি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি ভেবে দেখলেন, এতটার পর বেয়াকুফের মতো এভাবে আর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে মোটেই সমীচিন হবে না। এই নওজোয়ানের দীলে তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণা পয়দা হওয়ার আগেই তাঁর কথা বলা উচিত। তিনি সামনে এসে নওজোয়ানকে সালাম দিয়ে দাঁড়ালেন। তা দেখে নওজোয়ানটি প্রশ্ন করলেন — আপনি! আপনি কে?

একটা প্রবাদ আছে — 'লাজ নেই হেলের আর লাজ নেই জেলের'। ধান জমিতে না হলেও, মাছ নদীতে না পেলেও, তাদের কাজ তারা করবেই — অর্থাৎ হাল বাইবেই, জাল বাইবেই। সেই সাথে প্রবাদটিতে 'লাজ নেই পাগলের'— এ কথাটা থাকলে প্রাসঙ্গিক হোক না হোক, মিথ্যা বলা হতো না। এত অনর্থের পরও শরীফ রেজা জবাব দেয়ার আগেই দুই বৃদ্ধ আবার একসাথে লাফ দিয়ে সামনে এলো এবং গোঁফওয়ালা বললো — মেহমান হুজুর, মেহমান। খাশ মেহমান।

পাগড়িওয়ালা বললো — জব্বোর আদমী হুজুর, ডাক সাইটে আদমী। খোদ হুজুরে-আলার দোস্ত।

নওজোয়ানটি কটমট করে তাদের দিকে তাকাতেই সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্দ্বয় চুপ্‌সে গেল আবার। "হুজুর মা-বাপ"— বলে সুড় সুড় করে ফের তারা পেছন দিকে সরে গেল।

নওজোয়ানটি মুখ ফেরাতেই শরীফ রেজা বললেন — আমি লাখ্‌নৌতি থেকে এসেছি। আমি একজন বেসরকারী লোক।

ঃ বেসরকারী লোক।

নওজোয়ানটি তাজ্জব হলেন। শরীফ রেজার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বললেন — কিন্তু আপনার লেবাসে তো মনে হচ্ছে — আপনি একজন সেপাই।

শরীফ রেজা স্মিতহাস্যে বললেন — জি, ফৌজী এলেম আমার কিছুটা আছে। এ ছাড়া লাখনৌতির ফৌজেও আমি নকরী করেছি কিছুদিন।

ঃ আচ্ছা। তা এখন ?

ঃ এখন আর কোন সরকারী চাকুরি করিনে। সে অবসর আমার নেই।

ঃ মানে ?

ঃ আসলে সাতগাঁয়ের শায়খ হুজুরের আমি একজন খাদেম। তাঁর খেদমতেই আমাকে প্রায় ব্যস্ত থাকতে হয়।

ঃ সাতগাঁয়ের শায়খ মানে ঐ —

ঃ শায়খ শাহ শফী হুজুর।

নওজোয়ানের দুইচোখ প্রসারিত হয়ে গেল। তিনি বিপুল উৎসাহে বললেন— সে কি!

ঐ বিখ্যাত সুফী — মশহুর দরবেশ শায়খ শাহ শফীর — মানে শাহ শফীউদ্দীনের খাদেম আপনি!

ঃ জি, ঐ হুজুরের নেক নজরেই আছি।

ঃ কি তাজ্জব — কি তাজ্জব! আপনারা তো তাহলে অলি আল্লাহ মানুষ! ভিন্ন জগতের লোক!

শরীফ রেজা পুনরায় স্মিতহাস্যে বললেন — জিনা–জিনা আমার হুজুর অলি-আল্লাহ মানুষ ঠিকই, কিন্তু আমি তা নই।

ঃ আপনি তো তাঁর খাদেম ?

ঃ জি তাঁর হুকুম তামিল করেই চলি।

ঃ কিন্তু আপনার লেবাস —

ঃ সেপাইয়ের, এই তো ? আসলে আমাকে লড়াইয়ের কাজই করতে হয়। অমুসলমান এলাকায় দ্বীন ইসলামের পয়গাম পৌঁছানোর কালে আমার হুজুরকে অনেক সময় অনেক ফ্যাসাদে পড়তে হয়েছে এবং এখনও কিছু কিছু মাঝে মধ্যেই হয়। এগুলো ঠেকানোর লোক চাই তো ?

ঃ মানে লড়াই করার ?

ঃ সোজা করে বলতে গেলে সেই কথাই বলতে হয়। গুমরাহীর আবর্তে নিমজ্জিত এলাকায় তৌহিদের পাক বার্তা প্রচার করতে গিয়ে আমার হুজুর অনেকবার অনেকের আক্রোশের শিকার হয়েছেন। এসব আক্রোশের

মোকাবেলায় হুজুরকে অনেক লড়াই লড়তে হয়েছে সাতগাঁয়ে। আমি বছপনকাল থেকেই হুজুরের কাছে আছি। আমি না লড়ে পারি ?

ঃ আচ্ছা।

ঃ হজরত শাহ জালালের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বেশী জানা আপনাদের। অলি-আল্লাহ পীর-দরবেশ মানুষ। তাঁকেও কি নির্বিঘ্নে দ্বীনের কাজ করতে দিয়েছে বিধর্মীরা — না নির্বিঘ্নে তা করতে তিনি পেরেছেন ? তাঁকেও তো লড়তে হয়েছে প্রচুর।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, এটা তো আমাদের খুবই জানা আছে। এই পূব এলাকারই ঘটনা।

ঃ ঐ হজরত শাহ্‌জালাল হুজুরও তো একাই লড়েননি সব লড়াইয়ে। তাঁর অনেক খাদেম আর ভক্তেরাও তো তাঁর পক্ষে লড়েছেন ?

ঃ অবশ্যই–অবশ্যই।

ঃ ঐ পশ্চিম এলাকার সাতগাঁয়ে আমার শায়খ হুজুরের পাশে দাঁড়িয়ে দুষমনের মোকাবেলা করার কিসমত আমারও অনেকবারই হয়েছে।

ঃ আচ্ছা! আপনি তাহলে ঐ বুজুর্গান দরবেশের সেনাপতি ?

ঃ তওবা–তওবা! সেনাপতি হুজুর নিজেই। আমি একজন হুকুমবরদার। হুজুরের বয়স হয়েছে। মানুষের ছোট খাটো বিপদে আপদে হুজুরের হুকুমে আমাকেই যেতে হয়।

ঃ বহুত্ খুব — বহুত্ খুব! আপনি তো তাহলে একজন সহিলোক দেখছি। পুন্যবান ব্যক্তি। তা জনাবের নাম ?

ঃ শরীফ রেজা।

ঃ জনাবের এখানে আগমনের হেতু ?

শরীফ রেজা শরম পেলেন। বললেন—দেখুন, আপনি বয়সে আমার কিছুটা বড়ই হবেন। মেহেরবানী করে 'জনাব–জনাব' করে আমাকে শরমিন্দা করবেন না। আপনি আমাকে আপনার ছোট ভাইয়ের মতো দেখতে পারেন।

ঃ তোফা–তোফা! তাহলে ভাই সাহেব এখানে—

ঃ এখানে আমি এর আগেও অনেকবার এসেছি। বিশেষ করে দিল্লীর হুকুমাতের নকরী করার কালে এখানে আমাকে অনেকবারই আসতে হয়েছে। এখন এখানে এত বড় একটা বিপ্লব হয়ে গেল! দিল্লীর নকরী আর করিনে বলেই এখানকার অবস্থা দেখতেও আসবো না, তা কি হয় ? তাই ঘুরতে ঘুরতে এলাম একবার এদিকে।

ঃ বেশ — বেশ! তাহলে কোথায় উঠেছেন আপনি এখানে ?

ঃ কোথাও এখনও উঠিনি। সবেমাত্র আসছি। উঠতে হবে কোথাও।

ঃ চেনাজানা কেউ আছে এখানে ?

ঃ জিনা। কারো মকানে উঠার মতো তেমন কোন চেনাজানা কেউ নেই। তবে কোন সরাই বা মুসাফিরখানায় উঠবো গিয়ে, এই ঠিক করেছি।

ঃ সে কি! আপনি থাকবেন সরাইয়ে ?

ঃ তা ছাড়া আর আপাততঃ যাবো কোথায়, বলুন ?

নওজোয়ানটি চিন্তামগ্ন হলেন। একটু চিন্তা করে বললেন—তা ঠিক, তা ঠিক। আমারও বড় বদনসীব বুঝলেন, আমি নিজেও থাকি অন্যের ঘাড়ে। আমার কোন নিজের মকান নেই এখানে। সাথে আমার কোন পরিবার-পরিজনও নেই। তা থাকলে আমি আপনাকে আমার মকানেই নিয়ে যেতাম।

ঃ সোবহান আল্লাহ! আপনার এই সহানুভূতি আর আন্তরিকতাই আমার পরম পাওনা ভাই সাহেব। এর জন্যেই আমি হাজার বার শুকরিয়া জানাই আপনাকে। কিন্তু আমাকে নিয়ে কিছুমাত্র পেরেশান আপনি হবেন না। এখন আমি মুসাফির। সরাই বা মুসাফিরখানা যা একটা কিছু পেলেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

ঃ সেতো আপনার কথা ভাই সাহেব। আপনি প্রশাসনিক ঝুটঝামেলার বাইরের লোক। এক কালে দিল্লী সরকারের লোকও ছিলেন। তদুপরি, পীর মুর্শীদ মানুষের আপনি খাদেম তথা কওমের একজন খাদেম। আপনার এখানে অসম্মান হওয়া মানেই, সোনার গাঁয়ের প্রাশাসনের একটা মস্তবড় বদনামী।

ঃ না-না, আপনি ওসব কিছু ভাববেন না।

ঃ সরকারী মেহমানখানায় তিল ধারণের ঠাঁই নেই! দিল্লী থেকে আগত মেহমানে মেহমানখানা এখন ভর্তি। ঠিক আছে, আপনি আমার সাথে আসুন। এখানে একটা বিশিষ্ট মুসাফিরখানা আছে। মোটামুটি আধা সরকারী মুসাফিরখানা বলা যায়। এখানে শধু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গই থাকেন. ফালতু লোক থাকে না বা থাকতে দেয়াও হয় না। আপনি আসুন, সেখানেই আমি আপনার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ঃ আপনি!

ঃ হ্যাঁ, আমি। আসুন —

ঃ কিন্তু —

ঃ আরে ভাই, আপনি এখানে মেহমান। আমরা আপনার মেজবান। এত ইতস্ততঃ করার কি আছে ?

ঃ তা ভাই সাহেবের পরিচয়টা —

নওজোয়ানটি সোচ্চার হয়ে উঠলেন। হাসিমুখে বললেন — ওহ্ হো, এই

দেখুন, আমার পরিচয়টা দেয়াই হয়নি আপনাকে। আমি এই সোনার গাঁয়ের ফৌজের এক সেপাই। আপাততঃ সহকারী সালারের পদে আছি।

ঃ তাই নাকি! মারহাবা-মারহাবা!

ঃ আমার নাম জাফর আলী। জাফর আলী খান।

ঃ এ্যাঁ! আপনার নাম জনাব জাফর আলী খান ?

শরীফ রেজা কিঞ্চিত উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন তা দেখে জাফর আলী বললেন — হাঁ। কিন্তু কেন বলুন তো ?

ঃ না মানে, আপনার নাম সাতগাঁয়ের আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নামের সাথে মিলে যাচ্ছে কিনা, তাই বলছি।

ঃ আচ্ছা! কে তিনি ?

ঃ তিনিও একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। অবশ্য তাঁর বড় পরিচয় সৈনিক হিসাবে। সাতগাঁ বিজয়ী লাখ্নৌতির বিখ্যাত বীর জাফর খান গাজী সাহেব। আমার খুবই পরিচিত জন।

ঃ ও হ্যাঁ-হ্যাঁ। তাঁর নাম তো জানি আমরা। তাঁকে না দেখলেও, তাঁর নাম সেনাবিভাগে অনেকের কাছেই পরিচিত।

ঃ তাই ?

ঃ হ্যাঁ ভাই সাহেব। উনি তো একজন মশ্হুর যোদ্ধা। আর দেখুন, নসীবগুণে আমার ওয়ালেদ সাহেব আমার নামও ঐ নামই রেখেছেন।

বলেই তিনি হাসতে লাগলেন। শরীফ রেজাও হাসতে হাসতে বললেন — ভালই হলো, আল্লাহ না করুন, আপনার সাথে আমার মোলাকাতের কিসমত আর যদি নাও হয় কখনও, আপনার নামটা আমার ইয়াদে চিরকাল তাজা থাকবে।

ঃ মা'শা আল্লাহ! তাহলে আসুন ভাই সাহেব, আসুন —

ঃ এ্যা ?

ঃ আরে আসুন —

ঃ শরীফ রেজাকে সাথে নিয়ে জাফর আলী সাহেব মুসাফির খানার দিকে রওনা হলেন। গোঁফওয়ালা ও পাগড়িওয়ালা—দুই টহলদার নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে এ দৃশ্য দেখতে লাগলো। জাফর আলীরা খানিক দূরে সরে যেতেই গোঁফওয়ালা পাগড়িওয়ালাকে বললো — কিয়া হুয়া ?

পাগড়ীওয়ালা রুষ্ট কণ্ঠে বললো — ঘোড়ার আন্ডা হুয়া! দিলে তো সব বরবাদ করে ?

ঃ হুঁ ভাই, চিড়িয়া উড় গিয়া। বিলকুল উড় গিয়া।

ঃ কি আশ্চর্য! আমার নয়, তোমার নয়, মেহমানটা বিলকুলই তার হয়ে গেলো!

ঃ তাজ্জব বাত! ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, পাত্তাই কিছু দিলো না।

ঃ দেবে কেন ? দেখলে না কতবড় দামী মেহমান ? এমন মেহমানের মেহমানদারী করার মওকা আরও দেয় কাউকে ?

গোঁফওয়ালা বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—ছালে লোগ্ সিপাহ্সালার হোনা মাংতা।

ঃ মাংগুক। শালা বড়রাই বড় হোক। চলো দোস্ত, আমরা শালা রাস্তার লোক, রাস্তাতেই ঐ গাছতলায় বিরাম করি চলো —

ঃ ঠিক-ঠিক। চলো ইয়ার, চলো —

পরমপিরীতে গলাগলি ধরে দুই বৃদ্ধ জাফর আলীদের বিপরীত দিকে হাঁটতে লাগলো।

জাফর আলী সাহেব শরীফ রেজাকে এনে যে মুসাফিরখানায় রেখে গেলেন—সেটা এক আজব দুনিয়া। প্রশস্ত এক আঙ্গিনার তিনপাশ ঘিরে মুসাফিরদের থাকার ঘর। অসংখ্য তার প্রকোষ্ঠ। ছোট-বড়-মাঝারী। পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে এক বা একাধিক মুসাফিরের অবস্থান ও নিশিবাসের আনযাম। আঙ্গিনার অপর পাশে পাকঘর ও গোছলখানা। তার পেছনে আস্তাবল। শরীফ রেজা এসে দেখলেন — বিশাল এই আবাসে যথা পরিমাণ না হলেও, মানুষ আছে অনেক, কিন্তু সাড়াশব্দ সে তুলনায় একেবারেই কিঞ্চিৎকর। অবস্থানকারী অতিথিরা আসছে এবং যাচ্ছে, — বারান্দায়ও আঙিগনায় ঘোরা ফেরা করছে, কিন্তু কথা বলছে সীমিত। যেন গোরস্তানে আগত লাশ দাফনের লোক এরা — ঘুরছে ফিরছে কাজ করছে—কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারো মুখে কথা নেই। কথাবার্তা যা কিছু, সব ঘরের মধ্যেই হচ্ছে। বাইরে এলেই মৌনতা। নিজ নিজ সঙ্গী সাথী ছাড়া মাথায় মাথায় ঢঁ-টুক্কর লাগলেও অচেনা কোন লোকের সাথে আলাপে কেউ আগ্রহী নয়। ভাবখানা — খাও দাও ঘুরে বেড়াও, মুখখানা কেউ খুলো না।

শরীফ রেজা বিস্মিত হলেন। হৈ-হুল্লোড়-হট্টগোলের তুফান ছুটছে শহরময়, অথচ সাবধান আর সর্তকতার বান ডেকেছে সরাইখানায়। ব্যাপার কি ? এর তাৎপর্য তৎক্ষণাৎ তিনি মালুম করতে পারলেন না। পারলেন খানিক পরে।

জাফর আলী সাহেব নিজে এসেছেন অতিথি নিয়ে — এটা জানামাত্রই মুসাফিরখানার তত্ত্বাবধায়ক একপাল খাদেম নফর নিয়ে ছুটে এলেন নিজে এবং উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত এক প্রকোষ্ঠ শরীফ সাহেবের একার জন্যে সাজিয়ে গুছিয়ে দিলেন। এ ছাড়া, জাফর সাহেবের নির্দেশে খাদেম-নফরদের নির্ধারিত খেদমতের অতিরিক্ত মুছাফিরখানায় দক্ষ এক খাদেমকে সার্বক্ষণিকভাবে শরীফ

রেজার খেদমতে মোতায়েন করে দিলেন। সকলেই জেনে গেল, বর্তমান প্রশাসনের পক্ষের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এসে ঠাঁই নিলেন মুসাফিরখানায়। অতএব — সাধু হুঁশিয়ার।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে দিয়ে জাফর আলী বিদায় নিলেন। এরপর অনেক সময় কেটে গেল। কিন্তু এত লোকের বাজারে শরীফ রেজা সাহেব যে একা, সেই একাই রয়ে গেলেন। মন খুলে কথা বলাতো দূরের কথা, খাদেম-নফর ছাড়া, সামান্যতম আলাপটিও মুসাফিরদের কারো সাথে হলো না। অর্ধবৃত্ত আকারের দীর্ঘ বারান্দাব্যাপী কয়েকবার আসা-যাওয়া করলেন তিনি, মুসাফিরদের অনেকেই সামনে পড়লো তাঁর, গা-ঘেঁষেও কয়েকজন এদিক ওদিক এলো গেলো — কিঞ্চিৎ সৌজন্য বা সামান্যতম ভদ্রতার খাতিরেও মুখটি কেউ খুললো না। দু' একজনকে জোর করেই দু' একটা প্রশ্ন করে দেখলেন — ঘাড় মাথা হেলিয়ে দায়সারা গোছের নির্বাক জবাব দিয়েই কেটে পড়ছে সকলে। নিতান্তই সেভাবে জবাব দেয়া না গেলে, সংক্ষিপ্ত জবাব ছাড়া অধিক কথার মধ্যে একজনও যাচ্ছে না।

কয়েকবার চেষ্টা করে হতাশ হলেন শরীফ রেজা। কথা বলার লোক না পেয়ে, ফিরে এসে চুপচাপ ঘরের মধ্যেই বসে রইলেন। বেলা আর বেশী নেই। তিনি স্থির করলেন, রাতটা চুপচাপ কাটিয়ে দিয়ে সকাল বেলা যেদিক হোক বেরুবেন। রহমানুর রহিমের অশেষ রহমে যে স্বাচ্ছন্দময় ও চিন্তাহীন হেফাজতি এই দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে লাভ করলেন তিনি, এই নিয়েই আপাতত তৃপ্ত থাকা উচিত।

কিন্তু কথা বলার লোক অভাবে শরীফ রেজাকে অধিকক্ষণ আফসোস্ করতে হলো না। তাঁর খেদমতে নিয়োজিত সেই সার্বক্ষণিক লোকটা যে নিজেই একটা বিরামহীন বাকযন্ত্র — বিশেষ করে চাটুবাক্যের বিশিষ্ট এক বিশারদ, সে পরিচয় অল্পক্ষণেই পেলেন তিনি। প্রথম থেকেই কথা বলার বেজায় এক আগ্রহ নিয়ে লোকটি কেবল উঠবোস্ করছিলো, কিন্তু শরীফ রেজা একজন জবরদস্ত আদমী বোধে মুখ খোলার সাহস-উৎসাহ পায়নি। একটু টোকা পড়তেই ছুটে গেলো আগ্নেয় গিরির মুখ।

ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে ছিলেন শরীফ রেজা। এটা ওটা কাজ নিয়ে সেই সার্বক্ষণিক খাদেমটিও ঘরের মধ্যেই ছিলো। অলস কৌতুকে শরীফ রেজা একসময় প্রশ্ন করলেন তাকে — ও মিয়া, তোমার নাম কি ?

বিপুল উৎসাহে মুখ ফেরালো খাদেমটি। বললো—হুজুর কি আমাকে কিছু বললেন ?

ঃ হ্যাঁ। নামটা কি তোমার ?

খাদেমটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ের রং কালো। ঘাম-ময়লা-অযত্নে মুখমণ্ডল আরো বেশী অন্ধকার। সেই অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুতের আকারে ঝিলিক দিয়ে উঠলো খাদেমটির দুই পাটি ধব্ধপে সাদা দাঁত। ওষ্ঠদ্বয় প্রসারিত করে সে বললো — হে-হে, নামটা আমার একটু অন্যরকম হুজুর, তবে শুনতে খারাপ লাগে না।

ঃ কি রকম ?

ঃ নাম আমার লাড্ডু মিয়া হুজুর। দিল্লীর লাড্ডুর খুবই কদর আছে কিনা. তাই আমার ওয়ালেদ আমার আসল নাম বাদ দিয়ে ঐ নামে ডাকতেন।

ঃ আসল নাম!

ঃ জি হুজুর। আমার আসল নাম লাল মোহাম্মদ। আম্মা বলতেন লালু মিয়া। কিন্তু আমার ওয়ালেদ সাহেব দিল্লীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কিনা, দিল্লীর হুজুরদের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাই তিনি দিল্লীর ঐ খাস্তা চিজ্ লাড্ডুর সাথে আমার নাম এক করে দিলেন।

ঃ তাই ?

ঃ জি-হাঁ। লালু মিয়া বাদ দিয়ে উনি আমাকে লাড্ডু মিয়া বলতেন। ব্যস্, আমার আসল নাম কয়দিনেই মরাগাছের বাক্লার মতো ঝুপ করে খসে গেল, আমি লাড্ডু মিয়া হয়ে গেলাম। এখন আমাকে সকলেই লাড্ডু মিয়া বলে।

ঃ তাতে তোমার রাগ হয় না ?

ঃ কেন হুজুর ?

ঃ লাড্ডু মিয়া কোন একটা নাম হলো ?

ঃ কেন হবে না হুজুর ? লাড্ডুর সাথে দিল্লীর একটা সুন্দর সম্পর্ক রয়ে গেছে না ? লাড্ডুর কথা বললেই আমাদের প্রাণপ্রিয় হুজুরদের পবিত্র দেশ দিল্লীর কথা মনে হয়। এটা একটা রীতিমতো গর্বের ব্যাপার হুজুর। এ নাম খারাপ হবে কেন ?

ঃ আচ্ছা।

ঃ এই মুসাফিরখানায় যখন আমি নকরী করতে এলাম, তখন আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে আমি কি কাউকে লালু মিয়া বলেছি হুজুর ? আমি নিজেই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি — নাম আমার লাড্ডু মিয়া। সোনা ছেড়ে আঁচলে গেরো দেবো ?

ঃ কেমন ?

ঃ হুজুর, কোথায় বাঙ্গালার ঐ পান্তা কেসিমের এতিম কথা — লাল মোহাম্মদ লালু, আর কোথায় দিল্লীপাকের তাগ্ড়া বাত্ লাড্ডু! কিসে আর কিসে!

ঃ বলো কি! দিল্লীটা এতোই পেয়ারা তোমার ?

ঃ সে কি হুজুর! দিল্লী আমার পেয়ারা হবে না মানে ? দিল্লী ভক্তের রক্তে আমার জন্ম। এ ছাড়া, দিল্লীর হুজুরেরা কত সুন্দর, মহৎ আর দরাজদীল ইনসান। তাঁদের পাশে এলেও জান্ডা জুড়িয়ে যায়। বাঙ্গালা মুলুকের মানুষের মতো তারা কি এত নাদান, আহম্মক, বেঈমান আর বেল্লির বাচ্চা আদমী যে, দিল্লীর কথা বাদ দিয়ে বাঙ্গালার কথা ভাবলো ?

ঃ এটা কি সত্যিই তোমার দীলের কথা ?

চমকে উঠলো লাড্ডু মিয়া। বললো — সেকি হুজুর! সন্দেহ হচ্ছে আপনার ?

ঃ না, ঠিক সন্দেহ নয়। তবে বাড়ীতো তোমার বাঙ্গালা মুলুকেই ?

ঃ জি-হাঁ হুজুর, নসীবগুণে জন্ম আমার এখানেই।

ঃ এই বাঙ্গালা মুলুকের লোক হয়ে দিল্লীর প্রতি এত দরদ —

ঃ অকারণে নয় হুজুর, বিলকুল অকারণে নয়। মানুষ আর মাটি — এই দুইদিক দিয়েই দিল্লীর পাশে বাঙ্গালাকে আমি স্থান দিতেই পারিনে। দিল্লীর মানুষগুলোও যেমন উম্দা আর ঈমানদার, দিল্লীর আবহাওয়াও তেমনি উম্দা আর আকর্ষণীয়। এই দেখুন না, বাঙ্গালার আবহাওয়াটা কেমন একটা উল্লুক রাশির আবহাওয়া। এই রোদ, এই বৃষ্টি, এই শুকনো, এই কাদা। এর সাথে মশামাছির ভ্যানভ্যানানী আবার আলাদা এক উৎপাত। অথচ দিল্লীর আবহাওয়া দেখুন কেমন টনটনে! শুক্নো, শক্ত, সিংহ রাশির আবহাওয়া। হাওয়া বইছে তো বইছেই, কোন মোনাফেকী নেই। সকালে বিকেলে সমানে হুজুরদের পদধূলীর পরশ ঘরে ঘরে বইয়ে দিয়ে সকলকে ধন্য করছে ঈমানদারীর সাথে। একেই বলে, মরদের এক বাত।

ঃ বটে!

ঃ কসম খেয়ে এখানে তো কোন লাভ নেই হুজুর। কোন কিছু ভাল লাগালাগিটা এক জনের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার। দীলের ব্যাপার। আমার দীল চায় দিল্লীর মাটি মানুষকে ভালবাসতে। কেন চায়, এটা তো যুক্তি দিয়ে আর একজনকে সমৃঝে দেয়া সম্ভব নয় হুজুর। বলুন, সম্ভব ?

ঃ না, তাতো অবশ্যই নয়।

লাড্ডু মিয়া উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বললো — এই যে হুজুর আপনাকে দিয়েই বলি, দিল্লীকে এতো ভালবাসেন, দিল্লীর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে এই যে আপনারা এত জান দিচ্ছেন, এটা তো আর একেবারেই অমনি অমনি নয় হুজুর, এই শাসনকে আপনাদের ভাল লাগে, দিল্লী আর ঐ দিল্লীর মানুষগুলোকে আপনাদের ভাল লাগে বলেইতো দিচ্ছেন ? ঠিক বলিনি হুজুর ?

ঃ আলবত-আলবত।

ঃ জাফর আলী খান হুজুর এই দেশেরই মানুষ, আপনাকেও তো হুজুর মনে হচ্ছে তাই। কিন্তু তা হলে কি হয়, ঐ দিল্লীর হুজুরদের নীতি আদর্শ আপনাদের মধ্যে আছে বলেই না আপনারা এত ভাল মানুষ, আপনাদের দীল এতটা বড় — মন এতটা খোলাসা ?

লাড্ডু মিয়া ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠলো। শরীফ রেজা বুঝতে পারলেন, লোকটা স্রেফ চাটুকারই নয়, একজন অত্যন্ত সেয়ানা ও পণ্ডিত লোক। দিল্লীর খাঁ সাহেবদের মগজগুলো অপেক্ষাকৃত শক্ত বোধে কোন কথার নিগূঢ় তত্ত্ব তাদের মগজে ঢোকে না। বাহরাম খানের তরুণ সালার জাফর আলী তাঁকে এনে এখানে রেখে গেছেন বোধে, লাড্ডু মিয়া বুঝে নিয়েছে, শরীফ রেজাও দিল্লীর ঐ সেবাদাসদেরই একজন এবং যেহেতু সেবাদাস, সেই হেতু দিল্লীর খাঁ সাহেবদের মতোই শরীফ রেজাও একজন ভোঁতা মগজের লোক। ভোঁতা মগজ না হলে তাজা মগজের লোক কেউ সেবাদাস গিরি করে না বা সে কাজে এমন জান ছেড়ে দেয় না। এইটে বুঝার ফলেই, লাড্ডু মিয়া তার তোয়াজের লাটাইটা খোশহালে ইচ্ছেমাফিক ঘোরাচ্ছে। শরীফ রেজাও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি অনেকটা নিঃসন্দেহ হলেন—ছাই টানলে এখানে কিছু আগুন বেরুতে পারে। তাই লাড্ডু মিয়ার কথায় তিনি সায় দিয়ে বললেন— তা যা বলেছো! এটা একটা সত্যিই কথার মতো কথা। তা ঐ গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সম্বন্ধে তোমার ধ্যান ধারণা কি ? মানে উনি কেমন লোক ছিলেন ?

ঃ বাজে। বাজে হুজুর — একদম বাজে!

ঃ বাজে!

ঃ একদম বাজে লোক। দিল্লীর হুজুর দয়া করে তোকে সোনার গাঁয়ের শাসনকর্তা বানালেন। তুই হুজুরের শুকরিয়া আদায় কর, হুজুরের হুকুম-আহকাম খোশদীলে পালন কর। না, উনি তা করবেন না। উনার কেবলই মাথা ব্যথা — দিল্লীর দরবারে ছেলেকে তার জামিন স্বরূপ পাঠালেই তাকে তারা যখন তখন কোতল করতে পারে! আরে, পারে তো কি হয়েছে ? করতে চায় করুক না। তুচ্ছ একটা ছেলে বইতো নয় ? হুজুরের নেক্ নজরটা বড়, না ছেলের দাম বড় ? আহম্মক কাঁহাকার! সারে জাহানে এত লোক থাকতে, হুজুর তোকে এই সোনার গাঁয়ের শাসনকর্তার এতবড় পদটা হাসতে হাসতে দিয়ে দিলেন, আর বিনিময়ে তুই কিনা সেই হুজুরের অবাধ্য হয়ে গেলি ? যেমন আক্কেল, ব্যাটা তেমনই এলেম পেয়েছে।

ঃ আচ্ছা! তা গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের সেই ছেলে এখন কোথায় ? বউ-বাচ্চা ?

ঃ জাহান্নামে-জাহান্নামে। খাশ জাহান্নামেই গেছে বোধ হয়। কে ওসব খোঁজ রাখে ?

ঃ ওর আত্মীয়-স্বজন ?

ঃ আত্মীয়-স্বজন!

ঃ হ্যাঁ। ওর আত্মীয়-স্বজন বা ওর পক্ষের কোন লোক আর কেউ নেই এখন এই সোনার গাঁয়ে ?

উল্টে গেল লাড্ডু মিয়ার ঠোঁট। বললো — ওহ্! থাকলেই হলো ? থেকে একবার দেখুক না মজাটা! ওর নিজের লোক কেন, ওর জন্যে কেউ 'আহা' করলে সে ব্যাটাকেই আর এখন ছেড়ে কথা আছে ?

ঃ কেন, কি করা হবে ?

ঃ দু'ফাক। এক কোপে ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দেয়া হবে না ? ঐ সেদিনও তো দুই ব্যাটাকে সরাসরি জাহান্নামের পরোয়ানা দিয়ে দিলাম পাঠিয়ে। হুঁ হুঁ, বাছারা ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদখানা দেখোনি!

শরীফ রেজা কৌতুক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন — তুমি পাঠিয়ে দিলে ?

লাড্ডু মিয়া হোঁচট খেলো। ঢোক চিপে বললো — হ্যাঁ আমি, মানে ঠিক আমি না হলেও, আমরাই। ব্যাটারা এই মুসাফিরখানায় এসেছিল গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের পক্ষ নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে। সবাই মিলে দিলাম ব্যাটাদের ধরিয়ে। এরপরও কান পেতে আছি, দেখি আর কয় ব্যাটা গোয়েন্দা এই মুসাফির খানায় ঘাপটি মেরে আছে।

ঃ গোয়েন্দা ?

ঃ ছেয়ে গেছে হুজুর, ছেয়ে গেছে। ঐ ব্যাটা নেমকহারাম গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের দরদে এই মুসাফিরখানা গোয়েন্দায় ছেয়ে গেছে।

ঃ বলো কি! তার পক্ষে এত গোয়েন্দা আছে এখনও এই সোনার গাঁয়ে ?

ঃ মানে থাকতে তো পারে হুজুর। বেশী না হোক দু'চারজন ? সে-ই বা কম কি ?

ঃ ও, তাই বলো।

ঃ তেমনিই আমার সোনার গাঁয়ের হুজুর পেয়ারেজান বাহরাম খান সাহেবও মরদের বেটা মরদ। তিনিও কয়েক কুড়ি গোয়েন্দা এনে এই মুসাফির খানায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন হুড় হুড় করে। একটু পাটুস্ পুটুস্ করলেই ব্যস! জাহান্নামের সনদ। এই কয়েকদিনের মধ্যেই তো প্রায় আধাকুড়ি বেআক্কেলকে পাকড়াও করা হয়েছে।

ঃ তারপর ?

ঃ ঐ যে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তো হয়েছেই। একমাত্র ঐ হাশরের ময়দান ছাড়া, ইহ দুনিয়ার কোথাও থেকে এখন কেউ তাদের হদিস খবর আনুক দেখি, কেমন বাপের বেটা। মাথা কুটলেও কোথাও খুঁজে পাবে না।

ঃ পাবে না ?

ঃ সে মওকা রাখিনি আমরা। এত সহজ ? আমরা কি মফুত্ বসে আছি এখানে ? নেমক খাইনে হুজুরে-আলা বাহরাম খান বাহাদুরের ?

ঃ তা তাদের দোষটা কি ছিল — মানে কি আলাপ করছিলো ?

ঃ অতটার দরকার কি ? একটু ফিস্ফাস্ করেই কেউ দেখুক না, আর ছেড়ে কথা বলি নাকি আমরা ?

ঃ আচ্ছা! ব্যাপারটা তাহলে এই ?

ঃ হুজুর —

ঃ তাইতো দেখছি এখানে সকলেই কেমন নীরব। কথাই বেশী বলছে না।

ঃ বলবে না, বলবে না। বড় চালাক হয়ে গেছে হুজুর।

ঃ কিন্তু একটা কথাতো বুঝিনে। ফিস্ফাস্ করলেই যে গোয়েন্দা হবে, তার তো কোন মানে নেই।

ঃ না থাকুক। মানে যে থাকতেই হবে এমন কোন কথা আছে ? ফিস্ফাস্ করলেই ব্যস্! আর ছাড়াছাড়ি নেই।

ঃ তাহলে তো ভয়েই কেউ মুসাফিরখানায় আসবে না ?

ঃ আসে কি সহজে ? দেখছেন না, এতবড় এই মকানে কম্ছে কম পাঁচশো লোক থাকার কথা। সে তুলনায় কয়জন আছে এখন ? যে ব্যাটার নেহাতই বড় গরজ, সোনার গাঁয়ে না এলে কোন উপায়ই নেই, সেই ব্যাটারাই কয়জন তো আছে এখন এখানে।

শরীফ রেজা থেমে গেলেন। একটু চিন্তা করে বললেন — কিন্তু স্রেফ সরাই আর মুসাফিরখানাতেই যে তোমাদের এই প্রশাসনের বিরোধী কেউ থাকতে পারে, বাইরে থাকতে পারে না, এমন তো কোন কথা নেই ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাও থাকতে পারে।

ঃ তাহলে শুধু এখানেই এত চাপ কেন ?

ঃ না হুজুর, তাদের ধরার জন্যে আমাদের গোয়েন্দা বাইরেও কিছু আছে। তবে এই সব অতিথিশালা, সরাইখানা আর মুসাফিরখানার উপরেই আমাদের সরকারের নজর বড় কড়া।

ঃ তা তোমাদের সরকারের বিরোধী শক্তি তো নির্মূল হয়ে গেছে, তবু—

লাড্ডু মিয়ার দুই চোখ মেলে গেল। শরীফ রেজার কথার মধ্যেই সে বিস্মিত কণ্ঠে বললো—সে কি হুজুর! 'তোমাদের সরকার—তোমাদের সরকার' বলছেন কেন ? এটা তো আপনারও সরকার ?

ঃ শরীফ রেজা স্মিতহাস্যে বললেন — কেন, আমার সরকার হবে কেন ?

ঃ তার মানে! আপনি দিল্লী সরকারের লোক নন ?

ঃ না।

ঃ সরকারী চাকুরী করেন না ?

ঃ না। আমি কোন সরকারী লোক নই।

ঃ তবে ?

ঃ বেসরকারী লোক। মকানও ভিন্ন এলাকায়। এই সোনার গাঁয়ের চৌহদ্দী মধ্যে নয়।

ঃ তাহলে কোথায় আপনার মকান ?

ঃ সাতগাঁয়ে।

ঃ সাতগাঁয়ে কোথায় ?

ঃ ঠিক মকান নয়, আমি আমার হুজুরের মোকামে মানে হুজুরের কা[ছে] থাকি।

ঃ হুজুর।

ঃ সাতগাঁয়ের শায়খ শাহ শফী হুজুর। আমি তাঁর খাদেম।

লাড্ডু মিয়া অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠলো। সে ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো — আপনার হুজুর ঐ সাতগাঁয়ের সূফী সাহেব ?

ঃ হ্যাঁ, ঐ সুফী সাহেব। ভিন্নজগতের লোক। দ্বীনের কাজে যতটু[কু] প্রয়োজন, তার বেশী রাজনীতি তাঁর নেই।

ঃ আপনি তাঁরই খাদেম ?

ঃ বললামই তো তাঁর।

ঃ তাহলে ঐ শায়খ হুজুরের অন্যান্য মুরিদদেরও চেনেন—মানে অনেককে চেনেন ?

ঃ হ্যাঁ, হুজুরের লোক যখন তখন তাঁর মুরিদদের চিনবো না কেন ?

ঃ লাড্ডু মিয়া শরীফ রেজার মুখের দিকে এক নজরে চেয়ে থেকে বলে — ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবকেও তাহলে চেনেন হুজুর ?

ঃ শরীফ রেজা এবার সজাগ হয়ে উঠলেন। বললেন — সোলায়মান খ[ান] সাহেব!

ঃ জি হুজুর, ঐ ভুলুয়ার এক পল্লীতে উনি থাকেন। ঐ শায়খ হুজু[রের] একজন নাম করা মুরিদ ?

ঃ হ্যাঁ চিনি। তো কি হয়েছে ?

লাড্ডু মিয়া খোশদীলে বললো — না, কিছু হয়নি। উনি আমারও চে[না] লোক কিনা, তাই বলছি।

ঃ তোমারও চেনা লোক ?

ঃ জি। উনি আগে এই সোনার গাঁয়েই নকরী করতেন তো!

ঃ ও-হ্যাঁ, তা বটে।

ঃ আপনি কি কখনও তাঁর ঐ ভুলুয়ার মকানে গিয়েছেন হুজুর ? মানে ঘোড়া-টোড়া নিয়ে ?

এবার শরীফ রেজা আরো বেশী সতর্ক হয়ে উঠলেন। বললেন —তার মানে ?

লাড্ডু মিয়া বিনয়ের সাথে বললো — না — মানে, কখনও আপনি তাঁর মকানে গিয়েছেন কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি। একই হুজুরের মুরিদ আপনারা। একের সাথে অন্যের পরিচয় থাকাতো অসম্ভব কিছু নয়। এ ছাড়া, সাতগাঁ থেকে ভুলুয়া অনেক দূরের পথ। কখনও যদি গিয়ে থাকেন ওখানে, ঘোড়া নিয়ে যাওয়াই তো স্বাভাবিক।

মুখের দিকে একই ভাবে চেয়ে রইলো লাড্ডু মিয়া। শরীফ রেজা কিঞ্চিৎ রুষ্ট কণ্ঠে কললেন—তুমি এসব প্রশ্ন করছো কেন আমাকে ? মতলব কি তোমার ?

ঃ দোহাই হুজুর, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি ওখানে গিয়েছেন কিনা, তাই বলছি।

লাড্ডু মিয়ার কণ্ঠে একটা গভীর আবেদন ফুটে উঠলো। শরীফ রেজা চিন্তা করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, লাড্ডু মিয়া কি যেন বলতে চায়। কথাটা একেবারেই চেপে যাওয়া ঠিক হবে না তাই বললেন — হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। শুধু ওখানে কেন, অনেক জায়গাতেই তো ঘোড়া নিয়ে যাই আমি ?

লাড্ডু মিয়ার মুখমণ্ডলে আলো ফুটে উঠলো। সে ছুটে গিয়ে ক্ষীপ্র হস্তে কক্ষের দুয়ার ভেজিয়ে দিয়ে এলো। তা দেখে শরীফ রেজা বললেন — ও কি! কি করছো ?

লাড্ডু মিয়া বিনীত কণ্ঠে বললো — দোহাই হুজুর, আমার একটা আরজ আছে।

ঃ আরজ ?

ঃ জি হুজুর,

একান্ত আরজ। ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব তো বেঁচে আছেন হুজুর ?

ঃ তার অর্থ ?

লাড্ডু মিয়া চঞ্চল হয়ে উঠলো। দুই হাত জোড় করে কাতর কণ্ঠে বললো — দোহাই আপনার, দয়া করে বলুন শিগিগর, উনি বেঁচে আছেন কিনা —

ঃ তুমি কি বলতে চাও ?

ঃ লাড্ডু মিয়া ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো—হুজুর গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের সাথে এখানে যখন বাহরাম খানের লড়াই শুরু হয়ে গেল, তখনই আমি খবর পাঠালাম ফৌজদার হুজুরের কাছে। অবশ্য খবরটা সেখানে

গিয়ে পৌছঁতে খানিকটা বিলম্ব হয়ে গেল। খবর উনি পেলেন এ পর্যন্ত জানি। আর এও জানি, দবির খাঁ সাহেবসহ আরো কিছু লোক লস্কর তাঁর হাতের কাছেই ছিল তখন। এতে আমি নিশ্চিত যে, ফৌজ নিয়ে অবশ্যই উনি বেরিয়েছিলেন। কিন্তু খবর দিয়ে খবর বাহক আমার কাছে ফিরে আসতে না আসতেই নিহত হলেন গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেব। যুদ্ধের গতি ঘুরে গেল। তখনই আমি ফৌজদার হুজুরকে সোনার গাঁয়ে আসতে নিষেধ করে আবার লোক পাঠালাম তাঁর কাছে। কিন্তু সে লোক আর ফেরেনি।

ঃ তারপর ?

ঃ আর আমি জানতে পারিনি, আমার এই পরের খবর উনি যথা সময়ে পেয়েছেন কি না। যদি না পেয়ে থাকেন, আর এখানে এসে এই ভাঙ্গা লড়াইয়ে শরিক হয়ে থাকেন, তাহলে আর তাঁদের কারো বেঁচে থাকার কথা নয়।

ঃ তা কথা, কি কথা নয় — সেটা তোমারই আগে জানার কথা কারণ এখানেই তুমি আছো।

ঃ জিনা হুজুর। এখানে থাকলেও তখন আর তা জানা আমার মোটেই সম্ভব ছিল না। তখন আমরা আত্মগোপনেই ব্যস্ত ছিলাম। লড়াইয়ের মাঠ তামামই তখন বাহরাম খানের দখলে। ওখানে কি হচ্ছে আর না হচ্ছে — এ খবর পাওয়ার তখন উপায়ই কিছু ছিল না।

ঃ আচ্ছা।

ঃ সেই জন্যেই জিজ্ঞাসা করছি হুজুর, উনি বেঁচে আছেন, না নেই? এটা কি কিছু জানেন আপনি ?

ঃ আমি অতশত কথার মধ্যে নেই। তবে ইনি বেঁচে আছেন, তা জানি।

লাড্ডু মিয়ার পাণ্ডুর মুখে তরতর করে রক্ত ফিরে এলো। দীর্ঘ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে বললো — আলহামদু লিল্লাহ! উনার কিছু হলে, বিশেষ করে দবির ভাই সহকারে ঐ দুই জনেরই কোন ক্ষয় ক্ষতি হলে, আর কিছু না হোক, একটা মেয়ে একেবারেই এতিম আর আশ্রয়হীন হয়ে যেতো।

চমকে উঠলেন শরীফ রেজা বললেন — একটা মেয়ে!

ঃ একটা সোনার মতো মেয়ে। বড় সুন্দর একটা স্বপন বা খায়েশ আছে তার দীলে।

ঃ কার কথা বলছো ?

ঃ কনকলতা নামের একটা মেয়ের কথা হুজুর। ফৌজদার হুজুরের আশ্রয়ে সে থাকে। ফৌজদার হুজুরের আম্মিজান। তার মকানের সকলেরই সে আম্মিজান। এমন কি আমারও।

ঃ সেকি! তুমি এসব কি করে জানলে ? মানে তুমি তাকে কি করে চিনলে ?

ঃ চিনবো না হুজুর ? আমি যে কয়েক বারই ওখানে গিয়েছি। অনেকবার অনেকদিন থেকেছি। ত্রিবেণী থেকে কনকলতাকে দবির ভাই যেদিন আনলেন, সেদিনও আমি ওখানেই ছিলাম।

বিপুল বিস্ময়ে শরীফ রেজা আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন — তারমানে! কে তুমি — মানে কে আপনি ?

লাড্ডু মিয়া স্মিতহাস্যে বললেন — আমি হুজুর ঐ গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের গোয়েন্দা বাহিনীরই এক গোয়েন্দা। খুব সম্ভব সে বাহিনীর একমাত্র জীবিত গোয়েন্দা।

ঃ আপনি গোয়েন্দা ?

ঃ জি হুজুর।

ঃ আমি বিশ্বাস করিনে।

ঃ কেন হুজুর ?

ঃ কোন গোয়েন্দা এত সহজে নিজের পরিচয় অন্য কাউকে দেয় না।

ঃ এত সহজে কৈ হুজুর ? অনেক কিছুর পরে তো।

ঃ পরে!

ঃ জি। প্রথম থেকেই আপনাকে আমি পর্যবেক্ষণ করছি। আপনার কথাবার্তা, প্রশ্নাদি আর অভিব্যক্তির মধ্যে আমি যা পেয়েছি, তাতে আমি প্রায় নিশ্চিত হয়েছি যে, আর যে-ই হোন আপনি, দিল্লীর কোন সেবাদাস আপনি নন বা দিল্লীর পক্ষ সমর্থনকারীও আপনি নন।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ আর তা হয়েছি বলেই এমন খোলামেলাভাবে দিল্লীর কিছু অবাস্তব ও ফালতু প্রশংসার ফাঁকে এত গোপন তথ্য তুলে ধরেছি আপনার সামনে। উদ্দেশ্য — যাতে করে আপনি এখানকার পরিবেশ অবহিত হয়ে সাবধানভাবে চলাফেরা করতে পারেন।

ঃ বলেন কি! এতটাই বুঝেছিলেন আপনি ?

ঃ হুজুর, আমি তো গোয়েন্দা মানুষ একজন। এটুকু জ্ঞান না থাকলে আমার চলবে কেন ?

ঃ আশ্চর্য!

ঃ আমাকে চিনতে পারলেন না হুজুর, আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি।

ঃ চিনতে পেরেছেন ?

ঃ জি হুজুর। আপনার নাম জনাব শরীফ রেজা।

ঃ সে কি! এটা আপনি জানলেন কি করে ?

ঃ ঐ ফৌজদার হুজুরের মকানেই হুজুর। আমার মুখের দিকে একটু ভাল করে চেয়ে দেখুন তো, কিছুই মনে পড়ে কিনা ?

ঃ মানে!

ঃ এই লড়াইয়ের বেশ কিছুদিন আগে, ওখানে ঐ ফৌজদার হুজুরের মকানে, আপনার ঘোড়াটা একবার হারিয়ে গিয়েছিল, তাই নয় হুজুর ?

ঃ শরীফ রেজা এবার সোচ্চার হয়ে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন — হ্যাঁ-হ্যাঁ, গিয়েছিল।

ঃ আপনি অনেক খুঁজে খুঁজে হয়রান হলেন —

ঃ হ্যাঁ, তাই হয়েছিলাম। ঘোড়াটা আমার তখন পুরোপুরি পোষ মানানো ছিল না।

ঃ অনেক লোক আপনার ঘোড়া খুঁজতে বেরুলো —

ঃ হ্যাঁ, তাই বেরুলো।

ঃ তাদের একজন এক ক্ষেত থেকে এক ঘোড়া ধরে এনে আপনাকে বললো — "হুজুর, দেখুন তো এই ঘোড়া আপনার কিনা ?"—

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো বলেছিলো।

ঃ সেই লোক আমি।

শরীফ রেজা বিহ্বল কণ্ঠে বললেন — এ্যাঁ! বলেন কি!

এরপর লাড্ডু মিয়ার মুখের দিকে এক ধিয়ানে চেয়ে রইলেন শরীফ রেজা।

লাড্ডু মিয়া বললেন — কিছুই চিনতে পারছেন না ?

ঃ পারছি-পারছি। মুখখানা সেই রকমই মনে হচ্ছে।

ঃ তখন মুখে এই দাড়ি আমার ছিল না। একদম চাঁছা মুখ ছিল।

ঃ এই ঠিক বলেছেন। এবার চিনতে পারছি।

ঃ পেরেছেন হুজুর ?

ঃ হ্যাঁ, পেরেছি। এক ঝলক দেখা তো। আর কোন আলাপও হয়নি আপনার সাথে।

ঃ ঠিক তাই। কিছুটা চেনা-চেনা মনে হলেও, আমিও আপনাকে প্রথমে চিনতে পারিনি। ঐ শায়খ হুজুরের নাম বলতেই আমার খেয়াল হলো এটা।

ঃ বিচিত্র!

ঃ তাই হুজুর, মানুষের জিন্দেগীটাই বড় বিচিত্র।

শরীফ রেজা এবার ব্যস্তভাবে বাধা দিয়ে বললেন — আরে, এরপরও আর 'হুজুর-হুজুর' করছেন কেন ? আমি তো আপনার কোন উপরওয়ালা নই। এ ছাড়া আপনার চেয়ে বয়সও আমার কম।

ঃ তা হোক, আপনি তো ঐ বিখ্যাত দরবেশের খাদেম।

ঃ তা হলেমই বা।
ঃ আপনাকে তাহলে অশ্রদ্ধা করতে পারি আমি ?
ঃ এতে শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার কি এলো ?
ঃ না হুজুর। সালার জাফর আলী সাহেব আপনাকে এখানে এনেছেন। তার মতো লোক, কোন তুচ্ছ লোক হলে, আপনাকে এত সম্মান করতেন না। আর ফৌজদার হুজুরের মকানেও আমি আপনাকে যে অবস্থায় দেখেছি, তাতে আমি নিশ্চিত, আপনি একজন উঁচু স্তরকার আর সালার শ্রেণীর লোক। আর না হোক, একজন গোয়েন্দা সেপাইয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনার সাথে আমি বেয়াদপী করি কি করে ?
ঃ আরে না না, তার জন্যে —
ঃ দোহাই হুজুর, এ নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করবেন না।
লাড্ডু মিয়া লাল মোহাম্মদ দুইহাত জোড় করলো। শরীফ রেজা দেখেশুনে হাল ছাড়তে বাধ্য হলেন। একটু থেমে বললেন—ফৌজদার সাহেবের সাথে আপনার এত ঘনিষ্ঠতা তাহলে কোন সূত্রে ?
ঃ জবাবে লাড্ডু মিয়া বললো — ঐ ফৌজদার সাহেবের এলাকারই লোক আমি। ফৌজদার সাহেবই আমাকে এই নকরীতে এনেছেন। তিনি তখন সোনার গাঁয়ের প্রশাসনে ছিলেন, তখন তিনি আমাকে এই নকরীতে নিয়োগ করেন।
ঃ আচ্ছা।
ঃ তার কথাতেই গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের পক্ষ প্রথম থেকেই অবলম্বন করি আমরা। আমরা মানে আমি আর আমার সঙ্গীরা। ফৌজদার সাহেবের অধীনে নকরী করার কালে অনেক স্নেহ পেয়েছি আমি তাঁর। আর সেই সুবাদেই তাঁর মকানে কয়েকবার আমার যাওয়ার কিস্‌মত হয়েছে।
ঃ ও, তাই বলো। এতক্ষণে সবকিছু পরিষ্কার হলো আমার কাছে। তা এখনও আর এই মুসাফিরখানায় খাদেমগিরি করছেন কেন ?
লাড্ডু মিয়া অল্প একটু হাসলো এবং হাসিমুখে বললো — এই খাদেমগিরিই ছদ্মপেশা আর ছদ্ম অবস্থান আমার। প্রথম থেকেই এই অবস্থান থেকে কাজ করছি আমি।
ঃ তাই ? কিন্তু এখনও আর আছেন কেন এখানে ? কাজের প্রয়োজন আপাততঃ আর তো নেই আপনার ?
ঃ না, আর তেমন নেই। তবে যাওয়ার আগে এই বাহরাম খানের পুরো রূপটা দেখে নিয়েই বেরিয়ে যেতে চাই। আমার অবস্থান এখানে নিশ্চিত। দিল্লীর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে আমার স্থান এখানে পোক্ত। জানের ভয়ে

আমার বিশেষ শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। তাই আমি অপেক্ষা করছি — এত দেখলাম এই বাহরাম খানের নির্মমতার শেষ পর্যায়টা দেখেই যাই। সবকিছু না দেখলে ফৌজদার হুজুরকে গিয়ে পুরো অবস্থাটা জানাবো কি ?
এরপর কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ। পরে শরীফ রেজা বললেন — নির্মমতা মানে ? বাহরাম খান কি খুবই নিষ্ঠুর আচরণ করছে ন ?
ঃ করছেন মানে কি ? গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের বংশের সন্ধান পাওয়া মতে তো আর কাউকেই রাখেননি, তাঁর সমর্থকদেরও প্রায়ই তিনি নির্মূল করে ফেলেছেন। বিশেষ করে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের উপর এই বাহরাম খান যে আচরণ করেছেন, তার নজীর আর আছে কিনা, আমার জানা নেই।
ঃ কি রকম ?
ঃ কেন শুনেন নি কিছু ?
ঃ না। আমি আজকেই সবে আসছি।
ঃ ফৌজদার হুজুরও জানেন না কিছু ?
ঃ না, উনিও কিছু জানেন না। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর যে নিহত হয়েছেন, শুধু এইটুকুই জানি আমরা।
ঃ তাঁকে শুধু হত্যা করাই হয়নি, হত্যার পর গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের গায়ের চামড়া তামামটাই তুলে নেয়া হয়েছে।
আঁতকে উঠলেন শরীফ রেজা। বললেন, সেকি! লাশের উপর এই জুলুম ?
ঃ হ্যাঁ, এই জুলুম। গরু খাশীর চামড়া ছড়ানোর মতো তাঁর গা থেকে চামড়াটুকু তামামই ছড়িয়ে নিয়ে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।
ঃ দিল্লী সরকার তাই চেয়েছিল ?
ঃ না। এ নিষ্ঠুরতা সবটুকুই ব্যক্তিগত — মানে বাহরাম খানের। কোন সরকার বা গোষ্ঠী তা চায়নি।
ঃ কি সাংঘাতিক!
ঃ সাংঘাতিক তো বটেই। যে দুই সেপাই দিয়ে এই ভয়ংকর কাজটি তিনি করিয়ে নিয়েছেন, তারা দুইজনই এখন উন্মাদ।
ঃ উন্মাদ ?
ঃ এই ভয়ংকর কাজ করতে গিয়ে আতংকে তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। সদর রাস্তায় বেরিয়ে একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন, তারা আবোল তাবল বকছে আর বল্লম হাতে ঘুরছে।
শরীফ রেজা শশব্যস্তে বললেন — হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখেছি দেখেছি। একজনের মুখে বিরাট গোঁফ আর একজনের মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি।
ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওরাই-ওরাই। ওরাই ঐ দুই হতভাগা সেপাই।

শরীফ রেজা থ মেরে গেলেন। একটু পরে বললেন — তাজ্জব কথা! তা ওদের এখন ঐ — টহলদারের — মানে নিরাপত্তার কাজে রাখা হয়েছে কেন? নিরাপত্তা বিধানের কি করবে ওরা?

ঃ ওদের উপর তো নিরাপত্তা ফেলে রাখা হয়নি। ওরা ফালতু হিসাবে ঘুরছে। ওদের দ্বারা আর কোন কাজই সম্ভব নয় দেখে, টহলদার বাহিনীর সাথে ওদেরকেও রাস্তায় অম্‌নি অম্‌নি নামিয়ে দেয়া হয়েছে। কাজ তো কিছু দিতে হবে একটা?

ইতিমধ্যেই বাইরে থেকে তত্ত্বাবধায়কের ডাক এলো — লাড্ডু মিয়া, আরে ও লাড্ডু মিয়াব্ব

লাড্ডু মিয়া সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। বললো — ঐ আমার ডাক পড়েছে। আমি যাই। কিন্তু সাবধান হুজুর, খুব সাবধান! এ বড় এক খতর্‌নাক পরিবেশে ঢুকে পড়েছেন আপনি। বেসামাল হলেই মহামুসিবত!

শরীফ রেজা বললেন — আল্লাহ ভরসা। এ ছাড়া আপনি তো আমার পাশে আছেনই। ভুল ভ্রান্তি হতে লাগলে, শুধরে দেবেন।

ঃ তবু হুঁশিয়ার হুজুর, হুঁশিয়ার!

এস্ত পদে লাল মোহাম্মদ লাড্ডু মিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৩

পরের দিন সবেরে মুসাফিরখানার বাইরে এলেন শরীফ রেজা। বাইরে এসে কিছুক্ষণ আশেপাশেই হাঁটাহাঁটি করলেন। এরপর বেলা বৃদ্ধির সাথে সাথে এক পা দু'পা করে তিনি সদর রাস্তায় চলে এলেন এবং লক্ষ্যহীনভাবে শহরের নানা দিকে ঘুরতে লাগলেন। এ শহরে আগেও তিনি এসেছেন। পথঘাট তাঁর অনেকটাই চেনা। সকাল থেকে একটানা শহরের মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাতে ঘুরে বেড়ালেন তিনি। কখনও বা টাংগাযোগে, কখনও বা পদব্রজে। তিনি লক্ষ্য করলেন, গ্রামের লোকের ভিড় কিছুটা কম হলেও এবং সদর রাস্তায় আর সদর এলাকায় বেসরকারী লোকজন আশানুরূপ না থাকলেও, শহরের অন্যান্য এলাকায় মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন বিরাজ করছে। সেখানে দোকান-পাট, কেনা-বেচা প্রায় আগের মতোই চলছে, কল-কারখানাগুলোতেও পুরোদমে কাজ শুরু হয়েছে, নিজ নিজ ধান্ধা নিয়ে আগের মতোই লোকজন ছুটোছুটি করছে। শহরের এই সমস্ত মফস্বল এলাকাতে যে জিনিসটা তাঁর

বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, তাহলো — হাসি-ঠাট্টা-গল্প-গুজব-হৈহোল্লা, সবই চলছে পূর্ববৎ, কিন্তু সদ্যঘটিত যুদ্ধ-লড়াই-দুর্যোগ নিয়ে কোথাও তেমন আলোচনাও নেই বা এমন একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যাথাও নেই। নিজ নিজ পেশা-নেশা আর খেয়াল খুশী নিয়েই সবাই বিভোর।

শহরের সদর এলাকাতেও আর অস্বাভাবিক অবস্থা তেমন নেই। পূর্বাবস্থা ফিরে আসছে ক্রমেই। নকরী-দপ্তর হুকুম-হাজিরা নিয়ে সবাই আগের মতোই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পেয়াদা-পাইক-হুকুমবরদার আগের মতোই হাঁকে ডাকে দপ্তর থেকে দপ্তরে ছুটোছুটি করছে। খৈনী খোড় দ্বারোয়ানরা লাঠির উপর ভর দিয়ে আগের মতোই দ্বারে দ্বারে ঝুমছে। হুজুর-হুকুম-প্রশাসনের আকস্মিক এই পবিবর্তন নিয়ে কারো মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। প্রতিক্রিয়া বলতে শুধু এ এলাকার অধিকাংশ লোকেরাই চলাফেরায় অত্যন্ত শংকিত ও ভীত। সেই সাথে দিল্লী ও বর্তমান হুজুরের প্রশংসায় ফী সাবীলিল্লাহ বলে জান ছেড়ে দেয়ার এক প্রশংসায় লিপ্ত। প্রতিবাদের ক্ষীণতম সুরও কোথাও নেই।

সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে শহরের সদর-মফস্বল সব এলাকায় এমনই ভাবে সারাদিন ঘুরে বেড়ালেন শরীফ রেজা। সহকারী সালার জাফর আলী খান সাহেব সদর এলাকায় ঘোরার কালে তাঁকে কিছুক্ষণ সঙ্গ দিলেন। এতে করে জাফর আলীর মেহমানরূপে শরীফ রেজার পরিচয়টা আরো বেশী পোক্ত হলো। সুফী সাহেবের খাদেম হিসাবে শরীফ রেজার নিজের একটা বিশেষ পরিচয় থাকলেও, জাফর আলীর পরিচয়টাই শরীফ রেজার এই শহরময় অবাধ বিচরণ কালে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কবজ হিসেবে কাজ দিলো। অচেনা অজানার প্রতি অন্যান্য সকলেই চোখ মুজে থাকলেও, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে যারা নিয়োজিত, তারা সবাই সর্বত্র সজাগ। সন্তোষজনক যুক্তি জবাব না থাকলে, তাদের হাত এড়িয়ে যাওয়া দুষ্কর। সন্দেহ তাদের তীব্র হলে — ঐ লাড্ডু মিয়ার কথা — জাহান্নামের সনদ। জাফর আলী সাহেবের সাথে তাঁর ঐ সৌহার্দ্যের খোশ কিস্‌মতি হওয়ায় শরীফ রেজা এসব ফ্যাসাদ অনায়াসেই এরিয়ে গেলেন।

লক্ষ্যহীনভাবে দিনমান একটানা ঘুরে বেড়ানের পর শরীফ রেজা সেদিনের মতো মুসাফিরখানায় ওয়াপস্ গেলেন। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির দপ্তরে বা মকানে নির্দিষ্ট কোন আলাপ নিয়ে গেলেন না।

তার পরের দিন শরীফ রেজা বেরুলেন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির দপ্তর বা বাসস্থান লক্ষ্য করে। লাখনৌতির ফৌজে নকরী করার কালে সোনার গাঁয়ের অনেক লোকের সাথেই শরীফ রেজার পয়পরিচয় ঘটেছিল। অনেকের সাথে অনেকখানি ঘনিষ্ঠতাও ছিল তাঁর। এদের অনেকেই দেশভক্তির অনেক কথাই

বলতেন। জন্মভূমির প্রেমে কেউ কেউ জাল্‌সা-জামাত-বৈঠকখানা গরম করে তুলতেন। জন্মভূমির যাঁরা একদম কুপুত্র ছিলেন, শরীফ রেজার অসাধারণ রণনৈপুণ্যের কারণে তাদেরও অনেকেই যারপর নেই খাতির করতেন শরীফকে। এ ছাড়া তাঁর একজন বিশিষ্ট আত্মীয়ও নকরী করতেন সোনার গাঁয়ে। লাখ্‌নৌতির অর্থ সচিব মালিক হুসামউদ্দীন আবু রেজারই এক বৈমাত্রেয় ভাই। সোনার গাঁয়ের প্রশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন তিনি। প্রথমে তিনি লাখ্‌নৌতির রাজস্ব বিভাগে ছিলেন। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মানুষ। বিভাগীয় অধিকর্তার অত্যধিক মাতবরী না-পছন্দ হওয়ায় নকরীতে ইস্তফা দেন সেখানে। পরে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেব তাঁকে সোনার গাঁয়ে এনে সোনার গাঁয়ের প্রশাসনে নিয়োগ করেন। "নকরীগত প্রাণ" "জি হুজুরের ছানা" ইত্যাদি বলে লাখ্‌নৌতিতে থাকা কালে তিনি তাঁর জেষ্ঠভ্রাতা হুসামউদ্দীন আবু রেজাকে প্রায়শঃই ঠাট্টা করতেন। তাঁরও বয়স অনেক এবং একজন ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তিও তিনি বটেন।

এদেরকে লক্ষ্য করেই শরীফ রেজা আজ বেরুলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন — বিগত লড়াইয়ে তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের দু একজনের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলেও, অন্যান্যরা সকলেই নিজ নিজ অবস্থানে খোশ হালেই আছেন। শরীফ রেজা সবার আগে এঁদের কাছেই গেলেন। কিন্তু এখানেও তিনি হোঁচট খেলেন। তিনি সবাইকে চিনলেও, এদের অনেকে তাঁকে চিনতেই চাইলেন না। চিনলেন যাঁরা, তাঁরাও আবার শরীফ রেজার সাথে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল কিছু, এমন ভাব দেখালেন না। কেউ কেউ আবার এও বললেন — কি ব্যাপার! আপনি এখানে এ সময়ে? মতলব কি আপনার?

হতাশ হয়ে শরীফ রেজা তাঁর সেই রিস্তেদার বা আত্মীয়ের খোঁজ করলেন। তাঁকে তিনি ঠিক জায়গাতেই পেলেন। তিনি তাঁকে চিনতে ভুল করলেন না। আত্মীয় বলে অস্বীকারও করলেন না। কিন্তু তিনি এখন একেবারেই অন্য মানুষ। শরীফ রেজাকে উষ্ণভাবেই গ্রহণ করলেন তিনি। কিন্তু শরীফ রেজা যতক্ষণ তাঁর সান্নিধ্যে থাকলেন, তার বারোআনা সময়ই তিনি একটানা দিল্লীর গুণগান করে আর নয়া হুজুর বাহরাম খানের অবাস্তব ও অলৌকিক গুণাবলীর বিরামহীন কেচ্ছা গেয়ে কাটালেন। শরীফ রেজা ডুবুরীর মতো ডুবেও ভদ্রলোকের মধ্যে আগের সেই মানুষ আর মনটিকে তালাশ করে পেলেন না। ইতিমধ্যেই তাঁর স্বাধীনচেতা মনটাকে ভৃত্যের আনুগত্য গোটাই গিলে ফেলেছে।

শরীফ রেজা বুঝলেন — বহুদর্শী রাজনীতিবিদ ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব একবিন্দুও ভুল কিছুই বলেননি। সত্যিই আর কোন আশা নেই। আশা-ভরসা আপাততঃ তামামই খতম। বাহরাম খানের অবস্থান সোনার

গাঁয়ের মাটিতে অত্যন্ত শক্তিশালী ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহাপ্রলয় ছাড়া, ক্ষুদ্র কোন প্রচেষ্টায় এ ভিতের কোথাও ফাটল ধরানো সম্ভব নয়। লাল মোহাম্মদ লাড্ডু মিয়ার সেই সোনার মতো মেয়ে কনকলতার সোনার স্বপন, স্বপন হয়েই রয়ে গেল। তা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা এখন অনেক দূরের পাল্লা। বেঈমান আর মোনাফেকদের মোনাফেকীর কারণে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর বাঙ্গালা মুলুককে আজাদ করতে ব্যর্থই শুধু হলেন না, বাঙ্গালার বুকে দিল্লীর শিকল দীর্ঘমেয়াদী হয়ে গেল।

সামরিক ও বেসামরিক মহলের অকল্পনীয় আনুগত্য দেখে হতাশদীলে রাজপথে ফিরে এলেন শরীফ রেজা। নির্জ্জন এক এলাকায় আনমনে হাঁটতে লাগলেন। ফৌজদার সাহেবের নির্দেশ মতো বাহরাম খানের একান্ত সহচর শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের সাথে মোলাকাত করার এক প্রবল আগ্রহ নিয়ে শরীফ রেজা এই সোনার গাঁয়ে এসেছিলেন। চারদিকের অবস্থা দেখে তাঁর সে আগ্রহ তেলহীন দীপের মতো আস্তে আস্তে নিভে গেল। তিনি এখন ভাবতে লাগলেন — ফখরউদ্দীন সাহেবের সাথে মোলাকাতের প্রয়াস স্রেফ ব্যর্থ প্রয়াসই হবে না, বিপজ্জনকও হতে পারে। পরিচিত বন্ধুবান্ধব আর স্বাধীনচেতা বাঘ সিংহেরাই যেখানে মেদমজ্জাহীন ক্লীবের মতো বাহরাম খানের আজ এত অনুগত, সেখানে বাহরাম খানের একান্ত অনুচর ও বিশ্বস্ত বাহন, ফখরউদ্দীনের কাছে যাওয়ার একমাত্র অর্থ এখন — সালাম ঠুকতে যাওয়া — এর অধিক কিছু নয়। তিনি ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন, ফখরউদ্দীন সাহেব এখন বাহরাম খানের একজন অনুচরই নন শুধু, সোনার গাঁয়ের প্রশাসনের তিনি একজন অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ও অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী। প্রশাসনের তা বড় — তা বড় লোকেরাই এখন তাঁর চত্বরে পা দিতে থর থর করে কাঁপে।

শরীফ রেজা আকাশের দিকে তাকালেন। সূর্যাস্তের দেরী আছে অনেক। এ সময় মুসাফিরখানায় ওয়াপ্‌স যাওয়া মানেই এই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে গুম হয়ে বসে থাকা। এটা ভাবতেও তিনি অস্বস্তি বোধ করলেন। কিঞ্চিৎ চিন্তা করে শহরের এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের বাইরে কোথাও এক খোলা ময়দানে যাবেন বলে স্থির করলেন।

অতপর হাঁটতে লাগলেন শরীফ রেজা। দ্রুতপদে হেঁটে শহরের উপকণ্ঠে এক খোলা ময়দানে চলে এলেন। যেখানে তিনি এলেন সে জায়গাটা মনোরম। মস্ত এক দূর্বাঢাকা ময়দান। সমতল ও মসৃণ। ময়দানের একপাশে ক্ষীণকায় এক স্রোতস্বিনী। স্বচ্ছ পানির প্রবহমান নির্মল এক ধারা। স্রোতস্বিনীর তীর বেয়ে রাস্তা। গাড়ী ঘোড়া লোকজনের ছায়াঘেরা পথ। প্রশস্ত ও পরিষ্কার। রাস্তা ও স্রোতস্বিনী এক লম্বা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নেমে এই মুক্ত মাঠের কোল ঘেঁষে ছুটে গেছে দূরে, হারিয়ে গেছে গ্রামাঞ্চলে।

অপর একজন বললো — ঠিক, ঠিক। চোর না হলে বাক্সো নিয়ে ওভাবে দৌড়াবে কেন? নিশ্চয়ই ব্যাটা চোর —

সংগে সংগে চারদিকে রব উঠলো — চোর গেল, ধর-ধর —

আগে ছুটছে টাংগা, তার পেছনে বাক্সো হাতে শরীফ রেজা এবং সবার পিছে হৈ হৈ করে ছুটে আসছে চারপাশের তামাম লোক। তারা চোর ধরতে চায়। শরীফ রেজার সামনে যারা ছিল, তারা বিষয়টি বুঝে উঠার আগেই শরীফ রেজা সে লোকদের কাটিয়ে কাটিয়ে ছুটে যেতে লাগলেন। বুঝে উঠার পর তারাও পিছু নিলো — চোর, চোর — ধর, ধর —

হাস্যোদ্দীপক হলেও দৃশ্যটি মর্মান্তিক!

শরীফ রেজা দেখলেন, টাংগাটার নাগাল ধরতে না পারলে এক অকল্পনীয় মুসিবতে পড়তে হবে তাঁকে। বাক্সোটা যে টাংগা থেকে পড়ে গেছে — চুরি তিনি করেননি — এই উৎক্ষিপ্ত জনতাকে তাৎক্ষণিকভাবে তা তিনি বুঝিয়ে উঠতে পারবেন না। আর তাতে করে ফলটি যা দাঁড়াবে, তা অবশ্যই আনন্দের কিছু হবে না।

প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন শরীফ রেজা। প্রাণপণে হাঁকতে লাগলেন কোচোয়ানের উদ্দেশ্যে। ভাগ্যের জোরে শহরের নিকটবর্তী আসার দরুণ অশ্বটির গতি শ্লথ হয়ে এসেছিল এবং অপর দিকে ঘটনাচক্রে দুর্ধষ সৈনিক শরীফ রেজার ছুটন্ত অশ্বের গতির সাথে পাল্লা দেয়ার তাকত ছিল বলেই সম্ভাব্য অঘটনটি ঘটলো না। ধাওয়াকারী জনতা শরীফ রেজার নিকটবর্তী হওয়ার আগেই শরীফ রেজা টাংগাটির অনেক কাছে চলে এলেন এবং টাংগাটির পিছে পিছে ছুটতে লাগলেন। টাংগার পিছে নিমেষ কয়েক এইভাবে ছোটার পরই শরীফ রেজার চেহারা যা হলো, তা বর্ণনাতীত। তাঁর কাপড় জামা আর চোখেমুখে ধূলোবালীর পুরুষ্টু এক আবরণ পড়ে গেল। মাথার চুল আর চোখের ভ্রূ ধূসর আকার ধারণ করলো। কিন্তু শরীফ রেজার তখন আর কোন দিকে খেয়াল নেই। তিনি সমানে দৌড়াতে লাগলেন আর হাঁকতে লাগলেন। পিছে তাঁর বিরাট এক জনতা তখনও দৌড়াচ্ছে আর হাঁকছে —ধর-ধর —

পেছনের এই হৈ চৈ এতক্ষণে কানে গেল কোচোয়ানের। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বের লাগাম টেনে ধরলো কোচোয়ান। টাংগাটি দাঁড়াতেই টাংগার কাছে পড়িমরি ছুটে এলেন শরীফ রেজা। বাক্সোটি তুলে ধরে বললেন —এই যে —এই যে —

বাক্সোর উপর নজর পড়তেই আঁত্কে উঠলেন তরুণীটি। নিজের কোলের দিকে চকিতে একবার নজর দিয়েই ফের তিনি নজর দিলেন বাক্সের দিকে। দুই চোখ কপালে তুলে বললেন —

এ্যাঁ! ওটা ওখানে! সে কি?

শরীফ রেজা ঝটপট জবাব দিলেন — গাড়ী থেকে পড়ে গেছে।

ঃ পড়ে গেছে! কোথায়?

ঃ ঐ ওখানে। অনেক দূরে।

ঃ কি সর্বনাশ! দিন-দিন।

তরুণীটি সাগ্রহে হাত বাড়ালেন। শরীফ রেজা বাক্সো এনে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। ইতিমধ্যেই পেছনের ঐ জনতা এসে 'চোর-চোর' বলে ঘিরে দাঁড়ালো শরীফ রেজাকে। তারা তরুণীটিকে লক্ষ্য করে বললো — চুরি করেছে, এই ব্যাটা চুরি করেছে বাক্সোটা।

বাক্সোটা তরুণীর কোলের মধ্যে ছিল। তাঁরা ছুটছেন টাংগাতে। চুরি করার প্রশ্নই কিছু উঠে না। তরুণীটি বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললেন — না, না। চুরি করবেন কেন? উনি কুড়িয়ে পেয়ে এনেছেন।

একথা জনতার কানেই কারো গেল না। তারা সমানে চীৎকার করতে লাগলো চোর, ব্যাটা পাক্কা চোর! পাক্ড়াও ব্যাটাকে — হাঁকাও কোৎকা।

শরীফ রেজাকে আঘাত করতে এগিয়ে এলো জনতা। শরীফ রেজাও রুখে দাঁড়ালেন গরম চোখে। টাংগাতে উপবিষ্ট খাঁ সাহেবও বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। তিনি তৎক্ষণাৎ টাংগা থেকে লাফ দিয়ে নামলেন এবং তাঁর ঐ সুদীর্ঘ তলোয়ার কোষ মুক্ত করে হুংকার দিয়ে উঠলেন — হুঁশিয়ার —

চমকে উঠলো জনতা। শরীফ রেজার মেজাজ দেখেই তারা কিঞ্চিৎ থমকে গিয়েছিল। এবার বিশাল এই খাঁ সাহেবের প্রকাণ্ড তলোয়ার দেখে আঁত্কে উঠে সকলেই পেছন দিকে ছিট্কে গেল এবং "ওরে বাপ্‌রে" বলে সবাই তারা নানা দিকে দৌড় দিলো।

এরপর শরীফ রেজাও প্রস্থান উদ্যোগ করলেন। তা দেখে তরুণীটি ব্যস্তকণ্ঠে বললেন — একি! এই যে শুনুন, আপনি যাচ্ছেন কেন?

ঘুরে দাঁড়ালেন শরীফ রেজা। বললেন — জি?

তরুণী ফের বললেন — এতবড় মহা উপকার করে আপনি অম্‌নি অম্‌নি চলে যাচ্ছেন?

শরীফ রেজা আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগলেন। বললেন — তা, মানে —

ঃ কে আপনি?

ঃ জি, আমি একজন মুসাফির।

ঃ মুসাফির! কোথায় থেকে এসেছেন?

ঃ এসেছি লাখ্‌নৌতি থেকে। থাকি আমি সাতগাঁয়ে।

ঃ আপনার নামটা?

ঃ শরীফ রেজা।

ঃ উঠেছেন কোথায় এখানে ?

ঃ এই শহরের এক মুসাফিরখানায়।

ঃ কাজ কাম কি করেন, মানে আপনার পেশাটা কি আসলে — ?

শরীফ রেজা মুস্কিলে পড়লেন। তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তা দেখে ফের তরুণীটি বললেন — অবশ্য, এত প্রশ্ন করছি বলে মনে কিছু করবেন না। এত বড় উপকার যিনি করলেন তার খোঁজ খবরটা নেয়ার স্বাভাবিক একটা আগ্রহ সব লোকেরই হয়।

ঃ জি, তা ব্যাপারটা হলো, কোন নির্দিষ্ট কাজ কাম কিছু এখন আর করিনে। অনেকটা ভবঘুরে।

ঃ সেকি! এত যে ময়লা মাটি লেগেছে, তবু তো মনে হচ্ছে, আপনি একজন পদস্থ লোক, খানদান ঘরের আদমী।

শরীফ রেজা শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন — না–না, ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। মেয়েটিও হাল ছাড়লেন। বললেন — আচ্ছা তা যাক, এই যে এই বাক্সোটা যে আমার টাংগা থেকেই পড়ে গেল — এটা আপনি দেখেছিলেন ?

ঃ জি হাঁ। দেখেই তো এটা নিয়ে আপনাদের পিছে ছুটলাম। আর ছুটতে দেখেই তো লোকে ভাবলো, আমি একটা চোর, চুরি করে পালাচ্ছি।

শরীফ রেজা অল্প একটু হাসলেন। সেই হাসিতে যোগ দিয়ে মেয়েটিও বললেন — না ছুটলে তো কেউ তা ভাবতো না, না কি বলেন ?

ঃ জি না, তা হয়তো ভাবতো না।

ঃ এটা যদি তুলে নিয়ে চুপি চুপি চলে যেতেন আপনি, তাহলে কি দেখতে পেতো কেউ ? মানে আপনার কাছে কোন লোক ?

ঃ জি–না। তখন আমার কাছে কোলে কোন লোকই ছিল না। যখন দৌড়াতে শুরু করলাম, তখনই দূর দূরান্তের লোকের নজর আমার উপর পড়লো।

তাজ্জব হলেন তরুণী। বললেন — তাহলে তো এটা আপনি অনায়াসেই নিয়ে যেতে পারতেন! তা গেলেন না কেন ?

তাজ্জব হলেন শরীফ রেজাও। বললেন — একি বলছেন আপনি ? নিয়ে যাবো মানে ? আমি নিয়ে যাবো কেন ?

ঃ চুপচাপ নিয়ে গেলে তো আপনার বাক্সো বলেই সবাই ভাবতো। চোর বলে ধাওয়া করতে আসতো না ?

মিটিমিটি হাসতে লাগলেন মেয়েটি। শরীফ রেজা ক্ষুণ্ন হলেন। বললেন — কি বলতে চান আপনি ? লা–ওয়ারিশ মাল হলেও তো মালের মালিককে তালাশ করা প্রয়োজন। আর আমি নিজের চোখে দেখলাম, বাক্সোটা আপনার টাংগা থেকেই পড়ে গেল। আমি তা নিয়ে যাবো, একথার অর্থ ?

তরুণীর মুখের হাসি তবুও ফুরালো না। হাসিমুখেই আরো কিছুক্ষণ তিনি শরীফ রেজার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এরপর কিছুটা গর্বের সাথে প্রশ্ন করলেন — কি আছে এই বাক্স আপনি জানেন ?

ঃ কি করে জানবো ? আমি তো আর খুলিনি বাক্সোটা!

ঃ অনেক মূল্যবান জেওর। প্রায় বিশ হাজার তংকা এর দাম ?

ঃ বলেন কি!

ঃ সেই জন্যেই তো বলছি, বাক্সোটা নিয়ে গেলে, এই বিপুল অর্থের মালীক হতেন আপনি।

এবার রীতিমতো গোস্বা হলেন শরীফ রেজা। তিনি বুঝলেন, মেয়েটি তাকে নিয়ে সত্যি সত্যিই মস্করা শুরু করেছেন। গরীবকে নিয়ে ধনীরা যেমন খেলায়, অনেকটা সেই রকমের। আর তাঁকে প্রশ্রয় দেয়া চলে না। তিনি উষ্ণ কণ্ঠে বললেন — বিশ লক্ষ তংকার মাল হলেও পরের সম্পদ আত্মসাতে অভ্যস্ত নই আমি। আল্লাহ হাফেজ —

পুনরায় ঘুরে দাঁড়ালেন শরীফ রেজা। সামনের দিকে পা বাড়াবেন। তা দেখে তরুণী ফের ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি ব্যস্তকণ্ঠে বললেন — আরে এই যে, শুনুন–শুনুন —

অল্প একটু ঘাড় ঘুরিয়ে শরীফ রেজা বললেন — মাফ করবেন। বেলা প্রায় ডুবে গেছে। অনেকখানি হাটতে হবে আমাকে।

একই রকম ব্যস্ত কণ্ঠে তরুণীটি বললেন — আচ্ছা–আচ্ছা, ঠিক আছে। দয়া করে এই মুদ্রা কয়টি নিন —

শরীফ রেজা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন — মুদ্রা!

ঃ জি। এতবড় উপকার করলেন। এত তকলীফ করে এত টাকার মাল এনে পৌঁছে দিলেন, তার বিনিময় তো প্রাপ্য আপনার কিছুটা ?

ঃ কি, পারিশ্রমিক ? জিনা– জিনা। ওসব কিছু লাগবে না।

এবার কথা বললেন খাঁ সাহেব। তিনি বললেন — আরেবাপ্! বকশিশ্ তো কুচ লেনা পড়েগা জরুর!

ঃ বকশিশ্!

ঃ হঁ–হঁ, বকশিশ্! আমার এই বেটি বহুত দরাজদীল আউরাত। কম্‌তি কুচ হাতে তার আসে না। দো–তিন মাহিনা আপনার খোশহালে চলে যাবে। লিজিয়ে–লিজিয়ে —

শরীফ রেজা শুকনো হাসি হাসলেন। বললেন — শুকরিয়া খাঁ সাহেব। ওসবের জরুরত নেই। স্রেফ আমার জন্যে দোআ করবেন আপনারা ব্যস্!

— বলেই তিনি দ্রুতপদে সেখান থেকে সরে গেলেন। হতভম্ব তরুণীটি কি বলবেন, তা আর তৎক্ষণাৎ ঠাহর করতে পারলেন না। তিনি থ মেরে শরীফ রেজার গমন পথে চেয়ে রইলেন।

মুসাফিরখানায় ওয়াপস্ এসে লাল মোহাম্মদ লাড্ডু মিয়াকে এ কাহিনী বলতে সে হেসেই আকুল হলো। এরপর সে উল্লাস ভরে বললো — বকশিশ্? আপনাকে বকশিশ্? তাও আবার আউরাতের? মারহাবা–মারহাবা!

শরীফ রেজা বললেন — আরে! এর মধ্যে এত উৎফুল্ল হওয়ার কি দেখলেন আপনি?

কপট বিস্ময়ে লাড্ডু মিয়া বললো — বলেন কি হুজুর! এই দুর্যোগের বাজারে একজন সুন্দরী নওজোয়ানীর নজরে পড়াই যেখানে একটা রীতিমতো কিস্‌মতের ব্যাপার, সেখানে আবার ঐ সুন্দর হাতের উপুরি পাওনা — মানে বকশিশ্, এটা একটা ফালতু কথা হলো হুজুর?

ঃ বটে!

ঃ তা আউরাতটি কে হুজুর? তা কি কিছু জেনেছেন?

ঃ শরীফ রেজা সচকিত হয়ে উঠলেন। বললেন — তাইতো! তাতো জানা হয়নি!

ঃ নামটা?

ঃ না, সেটাও জানিনে।

ঃ বলেন কি হুজুর! এত ঘটনা ঘটে গেল, আর কে তিনি, কি নাম, কোথায় মকান, কার বেটি — এসবের কিছুই আপনি জানলেন না?

ঃ কি করে জানবো — বলুন? তিনি যদি নিজে তা না বলেন, তাহলে আমি তো আর একজন নওজোয়ানীর নাম–ধাম নিয়ে ব্যস্ত হতে পারিনে?

লাড্ডু মিয়া থামলো। একটু থেমে বললো — তা অবশ্যি ঠিক। তা বকশিশ্‌টা কবুল করলে হয়তো সবই তিনি বলতেন। চাই কি তাঁর মকানে দাওয়াতও হয়তো দিয়ে বসতেন একটা।

শরীফ রেজা গম্ভীর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন — ভুল করলেন লাল মোহাম্মদ মিয়া! এত ঝানু লোক হয়েও মানব চরিত্র বুঝতে আপনি ভুল করলেন।

ঃ হুজুর!

ঃ উপকারের বিনিময়ে যে বকশিশ্ দেয়ার জন্যে মুদ্রা বাড়িয়ে ধরে, নিজের নাম পরিচয় দেবার বা নিজ মকানে দাওয়াত দেয়ার অভিপ্রায় তার মধ্যে সততই থাকে না।

ঃ হ্যাঁ, কথা আপনার কায়েমী হুজুর। তবে —

ঃ বকশিশ্ লোক কাকে দেয়? যার প্রতি করুণা হয়, তাকেই লোকে বকশিশ দিয়ে ধন্য করতে চায়। করুণা আর সৌজন্য এক কথা নয়। অনুরাগ তো নয়ই। সাগ্রহে যাকে নাম পরিচয় দেবে, নিজ মকানে দাওয়াত করবে, তার হাতে বকশিশ্‌রূপে কয়েকটি মুদ্রা তুলে দেয়ার কথা কেউ কখনও চিন্তাই করতে পারে না।

ঃ আপনার একথাও বিলকুলই ঠিক, তবে —

ঃ তবে আমি ভাবছি আর এক কথা।

ঃ হুজুর!

ঃ লেবাস আর শানশওকতে মনে হলো — কোন আমীরজাদী বা উমরাহ্‌জাদী। কিন্তু আমি লোকটাকে, বকশিশ্ দেয়া যায় কিনা — এসব কিছু না জেনে বা না ভেবেই উনি বকশিশ বাড়িয়ে ধরলেন — এটা কি করে হয়? হুঁশবুদ্ধি কি এতই এদের কম, না ঝোঁকের মাথায় ভুল করলেন উনি?

ঃ দু'টোই হতে পারে হুজুর। সেই কথাই তো বলছি।

ঃ কি কথা?

ঃ এখানে অনেক আমীর আছেন, যাঁরা সুবিধে লাভের লালচে হুজুরের তোয়াজ করেই অষ্টপ্রহর কাটান। এই কিসিমের আমীরজাদী হলে, হুঁশবুদ্ধি আদব–আক্কেল যে কম হবে, এ আর বিচিত্র কি?

ঃ ঠিক–ঠিক, তাই হয়তো হবে।

ঃ কিন্তু এর বাইরেও তো আর একটা কথা থেকে যায় হুজুর?

ঃ যেমন?

ঃ যে চেহারা নিয়ে এই মুসাফিরখানায় ওয়াপস্ এলেন আপনি, তাতে আমি অনুমান করতে পারছি — ওখানে আপনার চেহারা তখন কোন্ পর্যায়ের ছিল। আপনার তখনকার ঐ উদ্ভট চেহারা দেখেই উনি আপনাকে হয়তো নিতান্তই সাধারণ লোক ছাড়া অন্য কিছু ভাবার মওকা পাননি?

ঃ হ্যাঁ, তাও হতে পারে।

ঃ নইলে, এই চেহারা নজরে পড়লে কোন নওজোয়ানী ইন্‌কার করবে আপনাকে, এটা কখনও হতে পারে না।

ঃ কি রকম ?

ঃ আপনার যা চেহারা হুজুর, তাতে যে কোন নওজোয়ানীর কলিজা ঘায়েল হতে খুব বেশী সময় লাগার কথা নয়।

ঃ আহ! লাড্ডু মিয়া, আবার তোয়াজ শুরু করলেন ?

ঃ কি করবো হুজুর, অভ্যাস্ হয়ে গেছে । তবে এটা কিন্তু তোয়াজের কথা নয়। একদম যা বাস্তব তাই বলছি।

ঃ থাক, আর বাস্তব বলে কাজ নেই। এবার আমাকে একটা পরামর্শ দিন।

ঃ পরামর্শ ?

ঃ হ্যাঁ, একটা তোফা পরামর্শ।

ঃ কোন ব্যাপারে হুজুর ?

ঃ শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবকে চেনেন ?

ঃ শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব!

ঃ সোনার গাঁয়ের হাল মালীক বাহরাম খানের একান্ত সহচর শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব। চেনেন তাঁকে ?

লাড্ডু মিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বললো — সেকি হুজুর! তাঁকে কেন চিনবো না ? এই সোনার গাঁ শহরে এমন কোন্ লোক আছে, যে তাঁকে চেনে না বা নামটা তাঁর শুনেনি ?

ঃ আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই।

ঃ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ! কেন হুজুর ?

ঃ না, কারণ কিছু নেই তেমন। অনেককেই তো দেখলাম, যাবার আগে তাঁকেও একটু দেখে যাই. মানে একটু কথা বলে দেখি, তাঁর মানসিকতাটা কেমন ?

ঃ স্রেফ সাক্ষাৎ করতে যাবেন ? কোন জরুরী বা যুক্তিসঙ্গত কাজ নিয়ে নয় ?

ঃ না, কাজ কিছু নেই। বলতে পারেন সৌজন্য সাক্ষাৎ।

লাল মোহাম্মদ লাড্ডু মিয়া নীরব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ দম ধরে থাকার পর নির্জীব কণ্ঠে বললো — ফায়দা কিছু হবে বলে মনে করিনে হুজুর।

ঃ কেন-কেন ?

ঃ প্রথমতঃ, বাহরাম খানের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আনুগত্য নিয়ে তিনি এতই বিভোর হয়ে আছেন যে, এর বাইরে আর কোন দুনিয়া তাঁর কাছে আছে — এটা খুব বেশী লোকের জানা নেই।

ঃ আচ্ছা!

ঃ দ্বিতীয়তঃ, আপনি দেখা করতে চাইলেই যে উনি দেখা করবেন একজন অচেনা লোকের সাথে, আমি এটাও ভাবতে পারিনে।

ঃ না পারার কারণ ?

ঃ সে সৌজন্যবোধ তাঁর মধ্যে থাকলেতো ?

ঃ নেই ?

ঃ আমার সন্দেহ আছে। কারণ বাহরাম খানের পক্ষের না বিপক্ষের লোক, এটা আগে নিশ্চিত না হয়ে বিনা প্রয়োজনে উনি কারো সাথে আলাপ করতে আগ্রহী কখনও হোয়েছেন, এটা আমাদের জানা নেই।

ঃ কিন্তু আগে তো উনি শুনেছি —

ঃ আগের দিন আগে দিয়েই গেছে হুজুর। নিজের চোখেই তো দেখছেন সব। আগের কথা এখন টেনে আর লাভ নেই।

ঃ তাজ্জব! তাহলে কি বলেন, যাওয়া ঠিক নয় ?

আবার খানিক চিন্তা করলেন লাড্ডু মিয়া। চিন্তা করে বললেন — ইরাদা যখন করেছেন তখন যান হুজুর।

ঃ যাবো ?

ঃ অন্য কেউ হলে আমি সরাসরি না করেই বসতাম। কিন্তু আপনি হুজুর একজন বিশিষ্ট মেহমান—শায়খ শাহ শফী হুজুরের পেয়ারা আদমী। তার উপর, সহকারী সালার জাফর আলী সাহেবের মতো লোকেরও আপনি আস্থা অর্জন করেছেন। কাজেই চেষ্টা করে দেখতে পারেন একবার। বলা তো যায় না, কখন কার মেজাজ মর্জি কোন দিকে খোলে!

ঃ তাহলে —

লাড্ডু মিয়া উৎসাহ দিয়ে বললেন — দেখেন হুজুর, দেখেন। কোশেশ করতে দোষ কি ? আমাদের তো কিছুতেই না-উম্মিদ হলে চলবে না ? ঝুঁকি আমরা কেউ কিছু না নিলে, স্রেফ ঘরে বসে বড় বড় খোয়াব দেখে ফায়দা কি ?

ঃ লাড্ডু মিয়া!

ঃ তবে কথা ঐ একটাই হুজুর, সবসময়ই হুশিয়ার থাকতে হবে, হুশিয়ার হয়ে বাত্চিৎ করতে হবে, কিছুতেই বেফাঁস হলে চলবে না।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি তাহলে এসো এবার। রাত বোধহয় অনেকখানিই হলো। আমি শুয়ে শুয়ে ভেবে দেখি।

ঃ জি আচ্ছা হুজুর, জি আচ্ছা —

সালাম দিয়ে বেরিয়ে গেল লাল মোহাম্মদ লাড্ডু মিয়া।

ফখরউদ্দীন। শাহ ফখরউদ্দীন। বাহরাম খানের বর্তমান প্রশাসনের বিশিষ্ট এক ব্যক্তিত্ব। তকদীর আর তদবির যে মানুষকে কত উপরে তুলতে পারে, শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর অতীত নাম ফোকরা। দিল্লীর

সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের পালিত পুত্র তাতার খানের বর্মবাহক (সিলাহ্দার) বা তলোয়ার বাহক রূপে তাঁর জিন্দেগীর শুরু। সেই তাতার খানই আজকের এই বাহরাম খান — সোনার গাঁয়ের হাল মালিক বাহরাম খান। সেই ফোক্‌রাই আজকের এই শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব — বাহরাম খানের প্রিয়পাত্র ও প্রতাপশালী উমরাহ্ শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব। অনেক চরাই উৎরাই তরিয়ে তর তর করে উর্ধ্বমুখে উঠে যাচ্ছেন তিনি।

পরের দিন শরীফ রেজা সরাসরি শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের মকানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথ চিনে আসতে কোন অসুবিধাই তাঁর হলো না। এক কথায় সবাই তাঁকে দেখিয়ে দিলো মকানটা। সুরক্ষিত মকান। বিশাল এক এলাকা জুড়ে মকানটি অবস্থিত। মকানের সামনে বিস্তৃর্ণ এক প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণসহ মকানটি সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

শরীফ রেজা এসে এই সুরক্ষিত মকানের ফটকের সামনে দাঁড়ালেন। ফটকের পর প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণটার মাঝ দিয়ে পথ। প্রাঙ্গণ পেরিয়ে এলে শাহ ফখরউদ্দীনের মহল। দুইতলা মহল। বহু কক্ষবিশিষ্ট সুরম্য ইমারত। মহলের সামনেও ফের স্বল্প উচ্চ আবেষ্টনী। আবেষ্টনীর সাথে ছোট্ট আর এক ফটক। এই ফটক পেরুলেই তবেই সেই মহল।

শরীফ রেজা ফটকে এসে দাঁড়াতেই হৈ হৈ করে ছুটে এলো ফটকরক্ষী শান্ত্রী। সে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিলো — কোন্ হ্যায় ?

শরীফ রেজা বললেন — এটা কি শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের মকান ?

জবাবে ফটক রক্ষক বললো — জরুর, জরুর।

ঃ আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই।

ঃ কার সাথে ?

ঃ জনাব শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের সাথে।

ফটক রক্ষক শরীফ রেজার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো — আপনি!

শরীফ রেজা বললেন — হ্যাঁ, আমি।

ঃ কে পাঠিয়েছেন আপনাকে ?

ঃ কে পাঠিয়েছেন মানে ?

ঃ মানে কোন উমরাহ্ ?

ঃ উমরাহ্ আমাকে পাঠাবে কেন ?

ঃ তবে কি খোদ হুজুরে-আলার লোক আপনি ? মানে হুজুরে-আলা শানে-শওকত খান বাহরাম খান সাহেব পাঠিয়েছেন আপনাকে ?

ঃ কেন, তিনি আমাকে পাঠাবেন কেন ?

ঃ ঐ যে বললেন, আমার এই হুজুর বাহাদুরের সাথে মোলাকাত করতে চান আপনি ?

ঃ হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো এসেছি।

ঃ তাহলে! ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। আপনি দিল্লী থেকে এসেছেন। দিল্লীর হুজুর পাঠিয়েছেন আপনাকে, তাই না হুজুর ?

ঃ আরে ফ্যাসাদ! বলছিই তো — কেউ আমাকে পাঠায়নি ? আমি নিজেই এসেছি তাঁর সাথে মোলাকাত করতে।

ঃ তাজ্জব! আপনি আমাদের বাঙ্গালার বা দিল্লীর কোন হুজুরের লোক নন ?

ঃ না, আমি বাইরে থেকে এসেছি।

ঃ তাহলে আপনি আবার কোন মুলুকের উমরাহ্ ?

ঃ উমরাহ!

ঃ চেহারা খানা জৌলুশদার হলেও, লেবাস তো কোন উমরাহ্র লেবাস নয়?

ঃ কেন, আমি উমরাহ্ হবো কেন ?

ঃ তাহলে কে আপনি ?

ঃ একজন ভিন এলাকার লোক। মানে আমি একজন ভ্রমণকারী।

ঃ তার মানে! মুসাফির ?

ঃ হ্যাঁ, তা-ই ভাবতে পারো।

লহমা কয়েক হা করে শরীফ রেজার মুখের দিকে চেয়ে রইলো ফটকরক্ষী। তারপর সে হাত ইশারায় শরীফ রেজাকে বললো — আরে ও মিয়াভাই, আইয়ে, থোরা ইধার আইয়ে —

শরীফ রেজা আরো খানিক সামনে আসতেই তাঁর মাথার প্রতি ইঙ্গিত করে ফটকরক্ষী বললো — ঐ যন্তরটা ঠিক্‌ঠাক্ হ্যায়তো জনাব ? না তামামটুকুই গড়বড় হো গিয়া ?

শরীফ রেজা বুঝতে পারলেন, ফটক রক্ষী তাঁকে এখন তাচ্ছিল্য করা শুরু করেছে। তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন — কি বলছো তুমি ?

ঃ বলছি, মাথামুণ্ড ঠিক আছে আপনার, না বিলকুল এক দিউয়ানা আদমী আপনি ?

ঃ মানে ?

ঃ আপনি স্রেফ একজন মুসাফির। কোন আমীর উমরাহ্ নন বা এই প্রশাসনের কোন কর্মকর্তাও নন। 'তেরা দুয়ারে খাড়া এক মুসাফির' — এই পয়গাম পাওয়া মাত্র আমার হুজুর বাহাদুর পড়িমরি মহল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবেন আপনার মোলাকাতে, — এটা ভাবলেন কি করে ?

ঃ তা উনি কি করবেন সেটা আমি বুঝবো। তুমি সরো, আমাকে ভেতরে যেতে দাও।

ঃ আপনাকে ভেতরে যেতে দেবো ? আপনি বললেন আর অমনি ?

ঃ কি বলতে চাও ?

ঃ আমার বালবাচ্চা নেই ? ঘরে বউ বেটি নেই ?

ঃ থাকবে না কেন ?

ঃ আমি না থাকলে তাদের রোটি যোগাবে কে ? তুমি ?

ঃ তুমি না থাকলে মানে ?

ঃ তোমাকে ভেতরে যেতে দিলে আর আমি থাকবো এই দুনিয়ায় ? আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলানো হবে না ? সরো– সরো, যত্তসব পাগেলা আদমীর কারবার ?

বলেই সে ফটকে গিয়ে ফটক আরো শক্ত করে বন্ধ করতে লাগলো। তা দেখে শরীফ রেজা ব্যস্তকণ্ঠে বললেন —আরে করো কি, করো — কি ? শুনে —

নিজের কাজ করতে করতে ভ্রূক্ষেপহীনভাবে সে বললো—আর শুনার কি আছে ?

শরীফ রেজা বুঝলেন, সহজ কথায় কাজ এখানে হবে না। তিনি শক্ত হলেন এবং শক্ত কণ্ঠে বললেন — জরুর আছে। শুনো, শুনো শিগ্‌গির এদিকে —

দ্বাররক্ষী থমকে গেল। সে পেছন ফিরে চাইতেই শরীফ রেজা দু'ইচোখ গরম করে বললেন — দারোয়াজা খোল্ দে — জলদি —

ঃ মানে ?

ঃ তোমার হুজুরের সাথে আমার জরুরী আলাপ আছে। আমি সালার জাফর আলীর দোস্ত্। খোলো দরজা! বেয়াদপ কাঁহাকার —

দ্বাররক্ষক চমকে উঠে বললো — জি হুজুর, কি বললেন ? আপনি কার দোস্ত্ ?

একই রকম মেজাজের সাথে শরীফ রেজা বললেন — কান নেই তোমার ? শুনতে পাওনি ? সালার জাফর আলী খান সাহেবের। আমাকে ফিরিয়ে দেয়ার মজাটা —

দুই চোখ কপালে তুলে দ্বাররক্ষী এবার ভীত কণ্ঠে কললো — সেকি! কি কাণ্ড ? কি কাণ্ড! সে কথা তো আগে বলবেন হুজুর ! আসুন–আসুন, মেহেরবানী করে আসুন —

ছুটে গিয়ে দ্বার রক্ষী ফটক খুলে দিলো এবং এক পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু কাঁপতে লাগলো। শরীফ রেজা ফটক পেরিয়ে আসতেই সে দুই হাত জোড় করে সামনে এসে দাঁড়ালো এবং বললো — চুনোপুঁটি হুজুর, এ গোলাম একেবারেই চুনোপুঁটি মানুষ। চিনতে না পেরে ঢের ঢের গল্‌তি করে ফেলেছি। ঐ সালার হুজুরকে মেহেরবানী করে এসব কথা বলবেন না হুজুর! তাহলে আমার উপর মস্তবড় গজব নেমে আসবে। চাই কি জানডাও —

শরীফ রেজা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন — বটে!

ঃ জি হুজুর। আপনারা হলেন গিয়ে বাঘ সিংহ মানুষ — রুই কাত্‌লা সকলেরই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। চুনোপুঁটি মেরে আপনাদের ফায়দা কি হুজুর ?

ঃ আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

ঃ দোহাই হুজুর, এই গুনাহ্‌গারের আরজটা ভুলে যাবেন না যেন। আসলে, প্রথমেই যদি এই পরিচয় দিতেন হুজুর, তাহলে কি আর এমন কোন বেয়াদপী আপনার সাথে করি আমি ? খুব একটা কসুর আমার নেই হুজুর।

ঃ বললামই তো, দেখবো সেটা। এবার তুমি সরো —

ঃ জি হুজুর জি আচ্ছা —

সরে দাঁড়ালো ফটক রক্ষক। শরীফ রেজা সামনের দিকে এগুতে লাগলেন আর তাজ্জব হয়ে ভাবতে লাগলেন — কি ব্যাপার! জাফর আলী সাহেবের এত কদর এখানে ? তাঁর দোহাই অন্যত্র খাটলেও এখানকার মতো এত তপ্ত তো নয়! এখানে তার মাত্রাধিক প্রতিপত্তি আছে বলেই মনে হচ্ছে। জাফর আলী কি তাহলে আবার এই শাহ ফখরউদ্দীনের ডানহাত, ফখরউদ্দীন যেমন ডানহাত বাহরাম খানের ?

ইতস্ততঃ ভাবতে ভাবতে এগুতে লাগলেন শরীফ রেজা। ইমারতের কাছে এসে দেখলেন, হাত আড়াই উঁচু আর এক আবেষ্টনী দেয়াল এবং একদম সামনের কামরার সামনেই এই আবেষ্টনীর ফটক। এই আবেষ্টনীর ওপারে পাঁচ সাত হাত প্রশস্ত এক ফালী আঙ্গিনা। এরপরেই কামরা। শরীফ রেজা আন্দাজ করলেন — এই সামনের কামরাই দহলীজ। দহলীজের দিকে এগুতেই তিনি দেখলেন — এখানেও আর একজন দ্বাররক্ষী। ফটকের সামনে আসন পেতে আলস্যে ঝিমুচ্ছে। শরীফ রেজা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আসল লোক পড়েই রইলেন, দারোয়ানদের ফ্যাসাদেই বুঝি ওয়াপস্ যেতে হয় তাঁকে। আরো খানিক কাছে আসতেই আশ্বস্ত হলেন তিনি। এ দারোয়ান চেনা দারোয়ান। এ দারোয়ান দীদার আলী। পয়লাদিন একেই তিনি দেখেছিলেন জাফর আলী সাহেবের সাথে কথা বলতে। দীদার আলীর হুজুর জাফর আলী সাহেবকে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন — এই কথা বলতে। দীদার আলীর হুজুর তাহলে অন্য কেউ নয়, এই শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব ?

বুকে কিছুটা বল নিয়েই শরীফ রেজা দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। মানুষের পদশব্দ পেয়েই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো দারোয়ান দীদার আলী। ব্যস্ত কণ্ঠে বললো — এ্যাঁ! কে ? শরীফ রেজা সহজ কণ্ঠে বললেন — আমাকে চিনতে পারছো দীদার আলী মিয়া ?

আমতা আমতা করে দীদার আলী বললো — এ্যাঁ ? হ্যাঁ — মানে জার্‌রা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন দেখেছি।

ঃ ঐ যে সেদিন ঐ সদর রাস্তায়। জাফর আলী সাহেব যখন ঐ পাগলা দুই টহলদারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার টেনে বের করলেন, তখনই তো তুমি গিয়ে হাজির হলে সেখানে ?

ঃ হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই গিয়েছিলাম।

ঃ ঐ ওখানেই তো ছিলাম আমি ঐ সেপাইদের পেছনে!

ঃ তাই ? তা হলে ওখানে এক ঝলক দেখেছিলাম। তা এখানে ?

ঃ এই মকানের সাহেবের সাথে, মানে জনাব শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের সাথে মোলাকাত করতে চাই।

দীদার আলীর চোখের ভ্রূ টান হলো। সে তাঁকে নিরীখ করে প্রশ্ন করলো — আপনি কি তার কোন আত্মীয় ?

ঃ না, আত্মীয় নই। তবে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি তাঁর পরিচিত।

ঃ কোথা থেকে আসছেন আপনি ?

ঃ আপাততঃ ভুলুয়া থেকে।

ঃ কে পাঠিয়েছেন আপনাকে ?

বলতে গিয়েই চেপে গেলেন শরীফ রেজা। ফৌজদার সাহেবের প্রসঙ্গটা সবার সামনে না টানাই ভাল। কথাটা ঘুরিয়ে তিনি বললেন — তাঁর কথা তোমাকে তো বলে কোন লাভ নেই। কারণ, তুমি তাঁকে চিনবে না। কিন্তু তোমার হুজুর তাঁকে চেনেন।

ঃ কোন খত্ এনেছেন তাঁর কাছ থেকে ?

ঃ না, কোন খত্‌টত্ আনিনি। তবে —

ঃ হুজুরের সাথে কাজটা কি আপনার ?

ঃ কাজ মানে একটু দেখা—সাক্ষাৎ করা আর কিছু আলাপ সালাপ করা।

দীদার আলীর চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে উঠলো। সে ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো — মাফ করবেন জনাব। হুজুরের কাছে একথা বলাই আমার সম্ভব নয়।

ঃ কেন ?

ঃ আল্‌তু ফাল্‌তু লোকের সাথে সাক্ষাৎ উনি করেন না। সঠিক পরিচয় না পেলে তো অচেনা লোকের সাথে নয়ই।

ঃ তা আমি খুব দামী লোক নই ঠিকই, তবে সাতগাঁয়ের শায়খ হুজুরের আমি একজন খাদেম।

ঃ কার ? সাতগাঁয়ের দরবেশ শায়খ শাহ শফী হুজুরের ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাঁরই।

ঃ তাঁর খাদেম হলেও হয়তো দেখা করতে পারেন উনি। তবু তার প্রমাণ চাই। শুধু মুখে তাঁর খাদেম বললেই, চরম পরিচয় হলো না।

ঃ তুমি কি বলছো ?

বিব্রত দীদার আলী বিনয়ের সাথে বললো — কেন আমাদের মতো গরীব মানুষের ভাত মারবেন হুজুর ? বলছিই তো উপযুক্ত কাজ বা সঠিক পরিচয় ছাড়া সবার সাথে সাক্ষাৎ উনি করেন না ?

ঃ আমার পরিচয় সালার জাফর আলী সাহেব জানেন। তাঁর সাথে যথেষ্ট খাতির আছে আমার ?

ঃ তাহলেও আমার হুজুর হয়তো মোলাকাতে রাজী হবেন। কিন্তু ঐ জাফর আলী সাহেবের খত্ থাকতে হবে. নচেৎ ঐ হুজুরকে সঙ্গে আনতে হবে তা না হলে আমাকে বলে ফায়দা নেই। আমার দ্বারা আপনার কোন উপকারই হবে না।

ঃ আহা, আমার কথাটা তোমার হুজুরকে গিয়ে বলোই না একবার!

ঃ পাগল হয়েছেন হুজুর! দুই একবার এই রকম অনুরোধ রক্ষে করতে গিয়ে ঢের আক্কেল হয়েছে আমার। আপনি যে—ই হোন, উপযুক্ত পরিচয় নিয়ে আসুন, আমি সসম্মানে আপনাকে আমার হুজুরের কাছে নিয়ে যাবো, — ব্যস্!

শরীফ রেজা সত্যিই এবার মহামুস্কিলে পড়লেন। হতাশ কণ্ঠে বললেন — তাহলে ?

ঃ এরপর আর তাহলে কিছু নেই। যা বললাম — তাই করুন, তা না হলে ফিরে যান। আর আমি কত বলবো আপনাকে ?

ঃ ফিরে যাবো ?

ঃ আরে! বলেন কি ? ফিরে যাবেন নাতো কি ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন ওখানে ?

ঃ কিন্তু —

ঃ সহজে না গেলে সেপাই ডাকতে হবে আমাকে। যদি মানী লোক হোন, তাহলে আর খামাখা মানটা হারাতে যাবেন কেন ? যান-যান —

একদম চরম জবাব এরপর আর কথাই কিছু চলে না। শরীফ রেজা পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন — লাল মোহাম্মদ লাড্ডু মিয়ার সত্যি সত্যিই দিব্য দৃষ্টি আছে। অচেনা লোককে নিয়ে দিল্লীর এসব ধামাধরা উমরাহ্‌দের সত্যি সত্যিই জানে বড় আতংক। পদ আর জান হারানোর ভয়ে এরা একদম মেপে মেপে ধাপ ফেলতে অভ্যস্ত। অতিরিক্ত কথা আর অচেনা লোকের সঙ্গ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এরা পরিহার করে বসে আছেন। অতএব, আর অধিক চেষ্টা অর্থহীন। একমাত্র জাফর আলী সাহেবকে ব্যবহার করা গেলেই হয়তো ফখরউদ্দীন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ তাঁর সম্ভব, নচেৎ তাঁকে এ খাহেশ সুবিধা বালকের মতো দীল থেকে বিদায় করে দিতে হবে।

দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ এসব চিন্তা করে অবশেষে পেছন দিকে ঘুরতে গেলেন শরীফ রেজা। ঠিক এই সময় তাঁর কানে এলো এক নারী কণ্ঠের আওয়াজ — দিদার আলী, ওঁকে আসতে দাও —

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন শরীফ রেজা। সামনের দিকে চোখ তুলেই তিনি তাজ্জব বনে গেলেন। দেখলেন, দহলীজের থামের আড়ালে দাঁড়ানো গতকালের টাংগার সেই যুবতী। মাথায় তাঁর বোরকা আছে ঠিকই, কিন্তু মুখের ঢাকনা তোলা। আলতোভাবে থামের আড়ালে থাকলেও, শরীফ রেজা মুখখানা তাঁর সরাসরি দেখতে পেলেন। আর দেখেই তাঁকে চিনতে পারলেন।

তরুণীটির ডাক শুনেই দীদার আলী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সে শশব্যস্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো — জ্বি-আপা —

তরুণী তাকে পুনরায় আদেশ করলেন — উনাকে আসতে দাও —

ঃ জ্বি আপা, জ্বি—জ্বি —

তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে দীদার আলী ফটকের দ্বার মেলে ধরলো এবং একান্ত বিনয়ের সাথে পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলেন — যান। হুজুর, যান। মেহেরবানী করে যান।

হতভম্ভ শরীফ রেজা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তা দেখে তরুণী ফের ঈষৎ হেসে বললেন — ওরা হুকুমের গোলাম। ওদের উপর যা নির্দেশ আছে, তাই ওরা করেছে। ওটা মনে নেবেন না। আসুন —

ভেতরে প্রবেশ করে শরীফ রেজা ধীরে ধীর দহলীজের বারান্দার কাছে এলেন। মুখের ঢাক্না নামিয়ে দিয়ে তরুণীও আরো সামনে বেরিয়ে এলেন এবং বিনম্র কণ্ঠে বললেন — আসুন আসুন —

শরীফ রেজা তবুও সহজ হতে পারলেন না। কুণ্ঠিত ভাবে বললেন — কিন্তু আপনি এখানে! মানে —

বাধা দিলেন তরুণী। বললেন — আহা, ওসব কথা পরে। বসবেন তো আগে। আসুন —

অগত্যা তরুণীটির পিছে পিছে দহলীজে প্রবেশ করলেন শরীফ রেজা। খোলা মেলা আলোক উজ্জ্বল প্রশস্ত এক কক্ষ। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে কক্ষটি সুসজ্জিত। আসবাবপত্র তামামই মূল্যবান ও সুরুচি সম্পন্ন। দেয়াল মেঝে পরিচ্ছন্ন। আসবাবপত্রের আধিক্য নেই। উৎকট ও চোখ ঝলসানো রংবর্ণের বাহার নেই। কক্ষের ভেতর নজর দিয়েই শরীফ রেজা অনুভব করলেন — বাইরে থেকে যত কর্কশই মনে হোক এঁদের, ভেতরটা অনেকখানি মসৃণ।

একটি বসার আসন দেখিয়ে দিয়ে তরুণীটি শরীফ রেজাকে বসার অনুরোধ করলেন। শরীফ রেজা বসলে, কিয়দ্দূরে সামনেই আর এক আসনে তরুণীও উপবেসন করলেন এবং সহাস্যে ও সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন — তারপর, হঠাৎ এখানে কি মনে করে?

শরীফ রেজা নত মস্তকে বললেন — জি?

ঃ আমার খোঁজে নাকি?

ঃ আপনার খোঁজে! জিনা-জিনা —

দমে গেলেন তরুণী। প্রশ্ন করলেন — আপনি আমার খোঁজে আসেননি?

শরীফ রেজাও বিস্মিত হলেন। বললেন — জিনা। আপনি এখানে আছেন, তাতো আমি জানিইনে।

ঃ তাহলে আপনি এখানে কার কাছে এসেছেন?

ঃ এই মকানের মালীকের কাছে — অর্থাৎ জনাব শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের কাছে।

ঃ তাঁর কাছে?

ঃ জি। কিন্তু আপনি —

ঃ আমার নাম ফরিদা বানু। বেগম ফরিদা বানু। ঐ শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবই আমার আব্বা।

শরীফ রেজা অতিশয় তাজ্জব হলেন। বললেন — বলেন কি! এতো অদ্ভুত এক যোগাযোগ দেখছি!

ঃ তাইতো। আপনি আমার কাছে আসেননি, তবু আমার সাথেই আবার আপনার সাক্ষাৎ হলো।

ঃ আপনি দেখা মাত্রই চিনতে পারলেন আমাকে?

ঃ জি?

ঃ দেখেই আমাকে চিনতে পারলেন?

ঃ কেন, এ প্রশ্ন করছেন কেন?

ঃ না মানে গতকাল আমি যে অবস্থায় ছিলাম — অর্থাৎ আমার যে অবস্থা হয়েছিল, আজ আর তো সে অবস্থায় নেই আমি, তাই বলছি।

ঃ হ্যাঁ তা অবশ্যি ঠিকই বলেছেন। আমি ঐ উপরতলার বারান্দায় ছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি — আপনার মতোই কে একজন কথা বলছেন দীদার আলীর সাথে। বারান্দার কিনারে এসে নীচের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম। লক্ষ্য করে তো খানিকটা থমকেই গিয়েছিলাম। আমার একটু সন্দেহই হয়েছিল — সত্যি সত্যিই আপনি, না অন্য কেউ — এই ভেবে।

ঃ কেন; দূরে ছিলাম বলে?

ঃ না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আসলে এত সুন্দর চেহারা আপনার, গড়নে বরণে এমন একজন নিখুঁত আর আকর্ষণীয় মানুষ আপনি, খানিকটা আঁচ করলেও, কাল এতটা বুঝে উঠতে পারিনি। শুধু আপনার মুখখানা ভালভাবে চেনা ছিল বলেই আমার ঐ সন্দেহটা বেশীক্ষণ টিকেনি।

ঃ আচ্ছা!

ঃ সংগে সংগে নেমে এই বারান্দায় এসে দেখি—হ্যাঁ, ঠিকই আপনি।

বলেই ফরিদা বানু মুখ নীচু করলেন। বোরকা ঢাকা থাকলেও শরীফ রেজা অনুমান করলে—ভদ্রমহিলা মৃদু মৃদু হাসছেন। জবাবে কি বলবেন তা ঠিক করার আগেই তরুণী ফের মুখ তুলে বললেন—তা চেহারা আপনার যত ভালই হোক, মানুষটি আপনি বদরাগী।

ঃ বদরাগী ?

ঃ খুবই বদরাগী!

এবার ফরিদা বানুর কথার সাথেই হাসির শব্দ ধ্বনিত হলো। শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন — কেন বলুন তো ?

ঃ ভুল যে আমার হয়েছিল, পরেই বুঝতে পেরেছিলাম। আপনার চেহারার মধ্যেই ইঙ্গিত ছিল — আপনি উঁচু তবকার লোক, বকশিশ্ নেয়ার লোক নন। কিন্তু সেটা তো বুঝতে পারলাম পরে। তার আগেই আপনি ক্ষেপে গেলেন ? এত রাগ আপনার ?

ঃ ক্ষেপে গেলাম ?

ঃ গেলেন না ? ঐ হুড়হাঙ্গামার মধ্যে ভুল করে বকশিশ্ না হয় দিতেই চাইলাম আমি, আপনি তো পুরুষ মানুষ, কোন কমবুদ্ধির আউরাত নন, আপনি সেটা হাসি মুখে ক্ষমা করতে পারলেন না ? বকশিশ্ দিতে চাইলাম আর অমনি আপনি গোস্বা হয়ে সরে গেলেন ওখান থেকে ?

শরীফ রেজা সংকটে পড়ে গেলেন। কি জবাব দেবেন এর, দিশে করতে পারলেন না। অবশেষে নত মস্তকে বললেন — না-না, আপনি যতটা ভেবেছেন, ব্যাপারটা আসলে —

বলেই চলে ফরিদা বানু — এতবড় একটা উপকার করলেন, এত অর্থের মাল এত তকলিফ করে পৌঁছে দিলেন আমাকে, আর তার বিনিময়ে একটা দীল খুলে ধন্যবাদ দেয়ার সুযোগ বা আপনাকে একটা দাওয়াত দেয়ার মওকা — কিছুই আমাকে দিলেন না ? আচ্ছা লোক আপনি যা হোক!

ঃ দেখুন, বুঝার ভুল আপনারও, বুঝার ভুল আমারও। তা নিয়ে আর —

ঃ দেখা না হলে তা নিয়ে আর বলতেই তো যেতাম না কিছু। কিস্‌মতের জোরে দেখাটা হঠাৎ করে হয়ে গেল বলেই বলছি। আমি ভেবে অবাক হই আমি একজন মেয়েছেলে, চেহারা আমার যত কুৎসিতই হোক, এত মূল্যের অলংকার আমার সাথে আছে যখন, তখন আমি লোকটা কে, কোথায় আমার বাড়ী — এ নিয়েও এতটুকু আগ্রহ আপনার মধ্যে রইলো না ? একজনের বিপদ দেখলেন; উপকার করলেন — ব্যস্ ? তার সাথে সম্পর্ক আপনার শেষ ? আমি বুঝে উঠতে পারছিনে, কোন কিসিমের ইনসান আপনি!

শেষের দিকের কথা কয়টি মেঝের দিকে নজর রেখে বলে গেলেন ফরিদা বানু। এরপর তিনি নজর তুলেই হক্‌চকিয়ে গেলেন। শরমে ও সংকোচে শরীফ রেজার মাথাটা ইতিমধ্যেই নীচের দিকে ঝুলে গেছে। তা দেখেই আবার তিনি হৈ হৈ করে উঠলেন। বললেন — ছিঃ–ছিঃ–ছিঃ! এই দেখুন, কি বেয়াদপী কি বেয়াদপী! বাড়ীতে ডেকে এনে আবার আমি কি কসুর করে ফেললাম! দোহাই আপনার, আপনি শরমিন্দা বোধ করবেন না।

আস্তে আস্তে মাথা তুলে শরীফ রেজা বললেন — জি ?

ঃ আমি আপনাকে খাটো করার জন্যে বা রাগ মেটানোর জন্যে এসব কথা বলছিনে। আপনার নির্লোভ আচরণ আর প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ আমাকে মুগ্ধ করেছিলো বলেই আমি ভুলতে পারিনি আপনাকে। আপনার প্রতি আমার একটা দরদ জন্মে গিয়েছিল। আর সেই জন্যেই আপনাকে আপনার যোগ্য সম্মান না দিতে পারার আফসোস্ বড়ই পীড়া দিচ্ছিলো আমাকে। আপনাকে এই আচানকভাবে পেয়ে যাওয়ায় অনেকটা অম্‌নি অম্‌নি হড় হড় করে বেরিয়ে গেছে এসব কথা আপনি কিছু মনে নেবেন না, দোহাই আপনার!

ফরিদা বানুর আচরণে শরীফ রেজা পুনরায় সজীব হয়ে উঠলেন। বললেন — না–না, মনে করার কথাটা এখানে কি আছে ?

আশ্বস্ত হলেন ফরিদা বানু। একটু নড়ে চড়ে বসে হাসি মুখে বললেন — এবার আপনার কথা বলুন। আব্বার সাথে কি দরকার আপনার ? তাঁর সাথে কি আপনার আগে থেকেই পরিচয় আছে ?

ঃ জি না। উনার এক পরিচিত ব্যক্তিই আমাকে বলেছিলেন — সোনার গাঁ এসে পারলে উনার সাথে সাক্ষাৎ করতে।

ঃ আচ্ছা! তা কে তিনি ?

ঃ তিনি এককালে এই সোনার গাঁয়ের ফৌজেই নকরী করতেন। ফৌজদার ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন।

ফরিদা বানুর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বলেন জনাব সোলায়মান খান সাহেব কি ? ঐ ভুলুয়ায় বাড়ী ?

শরীফ রেজাও সোচ্চার হয়ে উঠলেন। বললেন — সে কি! আপনি তাঁকে চেনেন ?

ঃ আরে বলেন কি ? উনি তো আমার বড় আব্বা হন। নিজের না হলেও আমাদের সম্পর্কটা ঐ রকমই ছিল। জনাব বাহরাম খানের প্রথম আমলে উনি যখন এই সোনার গাঁয়ের প্রশাসনে ছিলেন তখন এক সময় আমরা পাশাপাশি থাকতাম।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ উনি কত স্নেহ করতেন আমাকে। তখন আমি ছোট। কতদিন আমি উনাকে কত ভাবে জ্বালিয়েছি। আমার কত আব্দার উনাকে যে পূরণ করতে হয়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। আমার আব্বাকেও খুব ভাল বাসতেন তিনি। ছোট ভাইয়ের মতো দেখতেন।

ঃ তাজ্জব!

ঃ আপনি তাঁর কে ? মানে উনি আপনার কে হোন ?

ঃ না, নিজের কেউ নন। ঐ আপনারই মতো ব্যাপার। উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।

ঃ আচ্ছা! তা আপনাদের পরিচয় হলো কি ভাবে ?

ঃ সাতগাঁয়ের ঐ সুফি সাহেব, মানে ঐ দরবেশ শায়খ শাহ শফী হুজুরের উনি একজন বিশিষ্ট মুরিদ। আমি ঐ শায়খ হুজুরের এক নগণ্য খাদেম। এই সুবাদে প্রথমে আমাদের পরিচয়।

ফরিদা বানু আর এক দফা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন — ঐ সাতগাঁয়ের শায়খ হুজুরের খাদেম আপনি ? কি আশ্চর্য! আব্বাও তো ঐ দরবেশ হুজুরের পরম ভক্ত। উনার প্রতি খুবই শ্রদ্ধা আব্বার।

ঃ সেকি! আপনার আব্বাও কি আমার হুজুরের মুরিদ ?

ঃ না, ঠিক মুরিদ নন। সুফী দরবেশদের প্রতি এমনিতেই আব্বা খুব শ্রদ্ধাশীল। তবে ঐ সাতগাঁয়ের সুফী সাহেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাটা খুব বেশী।

ঃ আপনার আব্বার পরিচয় আছে তাঁর সাথে ?

ঃ দেখা তো তিনি তাঁর সাথে করেছেনই কয়েকবার। এই বাহরাম খান সাহেবের সাথে সাঁতগাঁয়েও অনেকদিন ছিলাম আমরা।

ঃ শাব্বাশ্! তাইতো কথায় বলে সারা জাহানের মোমেন মুসলমান সব এক।

ঃ জি ?

ঃ এই দেখুন না, ঘুরে ফিরে আমরা খুব কাছের লোক হয়ে গেলাম!

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো তাহলে আব্বাকে ডেকে দেই। আপনাকে পেলে উনি খুব খুশী হবেন।

ঃ জি–জি, দিন। আর শুনুন, গতকাল যে খাঁ সাহেব কে দেখে ছিলাম, উনি কে ?

ঃ উনি আব্বার দপ্তরের খাশ পাহারাদার। খুব ঈমানদার আদমী। আমাদের মকানেই থাকেন। আমরা—ছোটরা সবাই তাঁকে চাচা বলে ডাকি।

ঃ ও-আচ্ছা!

ঃ তাহলে পাঠিয়ে দেই আব্বাকে —

উঠে দাঁড়ালেন ফরিদা বানু। শরীফ রেজার আর একটু সামনে এসে অপেক্ষাকৃত সংযত কণ্ঠে বললেন — দেখুন, বাচালের মতো অনেক কথা বলে ফেলেছি আপনাকে। একজন অপরিচিত লোকের সাথে এত অল্পতে এত আলাপ আমার জীন্দেগীতে এই পয়লা। হয়তো পরিস্থিতিই সম্ভব করলো এতটা। আমার আদব-আক্কেল নিয়ে আপনার দীলে যে ধারণাই পয়দা হয়ে থাকুক, আজ আমার একটা আরজ রাখতেই হবে আপনাকে।

ঃ আরজ ?

ঃ জি। আজ এখানে দুটো খেয়ে তবে যাবেন।

শরীফ রেজা সংকুচিত হয়ে গেলেন। বললেন — সেকি! খেয়ে ?

ঃ বিনিময় দেয়ার কথা আমি বলবো না। তবে আমার এমন একজন বিশিষ্ট উপকারীকে দাওয়াত দিয়ে এক বেলা খাওয়াতেও পারবো না, এটা কোন কথার কথাই নয়। সান্ত্বনা বলে আমারও তো একটা কিছু আছে ?

মুখখানা ঈষৎ কাত করে আগ্রহ ভরে চেয়ে রইলেন ফরিদা বানু। তা লক্ষ করে শরীফ রেজা উষ্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করতে গিয়ে বললেন — মঞ্জুর!

ঃ জি ?

ঃ আরজ মঞ্জুর। আপনার দাওয়াত আমি কবুল করলাম।

ফরিদা বানু খোশদীলে বললেন — ঠিক তো ?

ঃ আলবত। এরপর আর না করার উপায় আছে ? তবে আপনার আব্বার তরফ থেকে —

ঃ ভাববেন না — ভাবনে না, ও নিয়ে মোটেই আপনি ভাববেন না। এ মকানে মেহমানদারীর ব্যাপারে আমার রায়ই চূড়ান্ত রায়। এ ছাড়া, আপনার এই উপকারের কথা আব্বাকে কাল বলতেই উনি বরং আমাকে দোষারোপ করেই বললেন — পরের সম্পদ আত্মসাৎ যে করে না, বকশিশ্ও নেয় না – এমন লোককে ভদ্রতা করে একটা দাওয়াত দিতেও পারলিনে ? খেতে খেতে তার সাথে আলাপ সালাপ করা যেতো।

দুই চোখ বিস্ফারিত করে শরীফ রেজা বললেন — বলেন কি ?

ফরিদা বানু সহাস্যে বললেন — জি, ঘটনা এই রকমই।

অতপর দ্রুতপদে অন্দরের দিকে চলে গেলেন ফরিদাবানু এবং দ্রুতপদে উপর তলায় উঠতে লাগলেন। দহলীজে বসে বসে শরীফ রেজা ফরিদা বানুর সিড়ি ভাঙ্গার শব্দ শুনতে লাগলেন। অভিভূত দীলে তাঁর এলোমেলো হরেক রকম চিন্তা।

ইতিমধ্যে আর এক শব্দে শরীফ রেজার মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হলো। দহলিজের অপর দরজায় অত্যন্ত ভারী আর এক পদ শব্দে শরীফ রেজা তৎক্ষণাৎ সেই দিকে নজর দিলেন। দেখলেন—সেই খাঁ সাহেব। পাহারাদার খাঁ সাহেব। ফরিদা বানুর সাথে গতকাল টাংগায় একেই তিনি দেখেছিলেন। মোটা মোটা খাতার বিরাট এক স্তুপ বেড়ালের বাচ্চার মতো কাঁধে করে নিয়ে সে দরজা পেরিয়ে আসছে। শরীফ রেজাকে দেখে কাঁধে ঐ স্তুপ নিয়েই খুশীতে লাফিয়ে উঠলেন খাঁ সাহেব। বললেন — আরে সাহাব! আপ্ ইধার আ গিয়া? কেয়া তাজ্জব-কেয়া তাজ্জব!

শরীফ রেজা খাঁ সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তা দেখে খাঁ সাহেব ফের বললেন — আমাকে পয়চান করতে পারছেন না? আদিল খাঁ-আদিল খাঁ। ঐ যে কাল পথের উপর মোলাকাত। ছালে লোগ্ সব আপনার উপর হামলা করতে এলো?

ঃ হ্যাঁ, তা কথা হলো —

ঃ ঐ যে ফরিদা আম্মার জেওরের ডিব্বা —

ঃ আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ। চিনতে তো পেরেছি। তা আপনার নাম আদিল খাঁ?

ঃ আদিল খাঁ-আদিল খাঁ। আদিল খাঁ আফগানও বলে অনেকেই।

ঃ কেন, আফগান বলে কেন?

ঃ আমি যে আফগান মুলকের লোক।

ঃ ও। তা এ মুলুকে কবে এসেছেন? মানে কতদিন হলো এখানে?

অল্প একটু হিসাব করে আদিল খাঁ প্রত্যয়ের সাথে বললেন — বিছ বরছ কমছে কম। দিল্লী মুলুকে এসে এই হুজুরের নজরে পড়ে গেলাম। মুহাব্বত হয়ে গেল। আর নিজ মুলুকে যাইনি।

শরীফ রেজার আগ্রহ বেড়ে গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন — বলেন কি! ওখানে মানে ঐ আফগান মুলুকে — কেউ আর নেই আপনার?

ঃ আলবত আছে। এক বেটা — এক জোয়ান বেটা ঐ মুলুকে আছে। পাঁচ বরছ আগারী বেটা একবার এ মুলুকে এসেছিল।

ঃ আপনাকে দেশে যেতে বললে না?

ঃ হঁ—হঁ। বললে জরুর।

ঃ তবু আপনি যান নি?

ঃ আরে বাপ! যাবোটা আমি কোথায়? ও মুলুকে গিয়ে কোথায় থাকবো আমি?

ঃ কেন, বেটার সাথে থাকবেন।

ঃ তওবা-তওবা! বেটা থাকে তার শ্বশুরের মকানে। শ্বশুরের সাথে তেজারতি করে। আমি যাবো সেই মকানে? নেহি-নেহি। ও বড় দিগ্‌দারী বাপ্! ও কভ্‌ভি নেহি হোগা।

ঃ আচ্ছা!

ঃ বেটা আমার কুয়ীবাত্ শুনলে না। শাদী করে শ্বশুরের মকানে চলে গেল। আমিও দিল্লী মুলুকে চলে এলাম — ব্যস্!

ঃ তাই নাকি?

ঃ এই মকানই আমার মকান। বহুৎ মিঠা মকান। নকরী করতে এসে আপন হয়ে গেছি। হুজুর আমাকে পেয়ার করেন, ফরিদা আম্মা দরদ করে — আর কি চাই? এসব ছেড়ে আমি আর যাবো কোথায়?

ঃ ঠিক ঠিক!

ঃ এই মুলুকই আমার মুলুক বাপ্। আর আমার দুস্‌রা মুলুক নেই।

ঃ শাব্বাশ্! আল্লাহ আপনার ভালাই করুন।

ঃ হুজুর মেহেরবান! ফরিদা আম্মাকে ডেকে দেবো?

ঃ না—না। দেখা হয়েছে। উনি আমাকে বসতে বলে গেছেন।

ঃ বহুত আচ্ছা। তাহলে আমি যাই —

এতক্ষণে শরীফ রেজার খেয়াল হলো — বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বেচারা, যদিও সে জন্যে কোন তলিফের আভাসই বেচারার মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন — হ্যাঁ, হ্যাঁ, যান। তা ও গুলো?

ঃ এগুলো সব পুরানো কাগজ। হুজুরের দপ্তরে যাবে।

ঃ আচ্ছা যান — যান —

সালাম দিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন খাঁ সাহেব। সে দিকে চেয়ে শরীফ রেজা পুলক-বিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন — এই এক কিসিমের ইনসান এরা। চালাকি নেই, চাতুরী নেই, কায়দা করে কথা বলার অভ্যাস নেই — দীলখোলা মানুষ। আদেশ পালন করা ছাড়া, কোন সাতে পাঁচেও নেই — অতিরিক্ত কথার মধ্যেও নেই। মনে এলো, একান্তই নিজের কয়টা কথা হড়হড় করে বলে গেল। রাখা-ঢাকার ধারে কাছেও গেলো না। একটু দরদ আর মমতা পেলেই এরা আপনের চেয়েও আপন। বিচিত্র এই পৃথিবী আর বৈচিত্রময় মানসিকতার মানুষের বাস এখানে।

সিঁড়ির উপর পদশব্দ শুনে শরীফ রেজা তৎক্ষণাৎ পূর্বাবস্থায় ফিরে এলেন এবং সংযত হয়ে বসে শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের এন্তেজার করতে লাগলেন।

একলয়ে পদশব্দ নেমে এলো নীচে এবং পরক্ষণেই দহলীজে প্রবেশ করলেন এক গুরু গম্ভীর মানুষ। বুদ্ধি, নিষ্ঠা আর ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁর মুখমণ্ডলে ভাস্বর। দহলীজে প্রবেশ করেই তিনি শরীফ রেজাকে প্রশ্ন করলেন —তুমিই শরীফ রেজা ?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন শরীফ রেজা। সালাম দিয়ে বললেন —জি–জি —

সালাম নিয়ে নিজ পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন —আমিই শাহ ফখরউদ্দীন।

অতপর শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব একনজরে শরীফ রেজাকে লহমা খানেক নিরীখ করলেন। পরে বললেন —হ্যাঁ, তুমিই তো! মস্তবড় হয়েছো তুমি এরই মধ্যে।

ঃ জি।

ঃ শায়খ শাহ শফী হুজুরের মোকামে তোমাকে আমি দেখেছিলাম। ঠিক পুরোপুরি নওজোয়ান তোমাকে বলা যায় না তখন। সবেমাত্র নওজোয়ান হয়ে উঠছো। হুজুরকে তোমার বাহাদুরীর অনেক তারিফ করতে সেদিন শুনেছি। মোলায়েম আর সুন্দর সেই চেহারাটা এই কয় বছরে আরো অনেক তাগড়া আর জৌলুশদার হয়েছে দেখছি।

শরীফ রেজা যারপরনেই তাজ্জব হয়ে বললেন — বলেন কি! আপনি আমাকে —

ফখরউদ্দীন সাহেব বললেন — হ্যাঁ, তুমি আমাকে না চিনলেও তোমাকে আমি চিনি। এসো- উপরে এসো —

ঃ উপরে ?

ঃ হ্যাঁ, উপরেই বসি চলো। একটু নিরিবিলিতে খোলামেলা আলাপ করা যাবে।

ঃ তা হলে তো আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতেন। আপনি আবার তকলিফ করে —

শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের ওষ্ঠদ্বয়ে মৃদু একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি বললেন — এতক্ষণ বসে বসে ফরিদার কাছেই শুনলাম সব। স্রেফ ফরিদার ঐ উপকারীই হতে যদি তুমি, তাহলে অবশ্যই তাই করতাম। কিন্তু তুমি তো অন্যলোক। তোমার সাথে কি সে আচরণ করতে পারি আমি ? এসো–এসো —

ফখরউদ্দীন সাহেব অগ্রসর হলেন। শরীফ রেজাও অগত্যা তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

উপরতলার নিরিবিলি ও পরিপাটি এক কক্ষে শরীফ রেজাকে এনে শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব তাঁর মুখোমুখী বসলেন এবং বললেন — তারপর ? এবার বলো, এই অসময়ে সোনার গাঁয়ে কি মনে করে ?

শরীফ রেজা সংযত কণ্ঠে বললেন —না, এমন কিছুই নয়। একটু ঘুরে ফিরে দেখতে এলাম।

ঃ কবে এসেছো ?

ঃ তা কয়েকদিন হচ্ছে।

ঃ কেমন দেখলে ?

ঃ জি ?

ঃ ঘুরে ফিরে দেখলে কেমন ?

কি উত্তর দেবেন এ প্রশ্নের, এ নিয়ে শরীফ রেজা অল্প একটু ভাবলেন। ঝুট্ঝামেলায় না গিয়ে সহজ কথা বললেন — সচরাচর যা হয় তাই। কোন স্থান যুদ্ধ বিধ্বস্ত হলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে সময় লাগে। এখানে অবশ্য সে সময়টা খুব বেশী লাগেনি দেখলাম। খুব তাড়াতাড়িই পূর্বাবস্থা ফিরে আসছে।

ঃ আর কি দেখলে ?

ঃ লোকজনের কর্মতৎপরতা বেড়েছে, প্রশাসনের প্রতি আনুগত্য বেড়েছে, প্রেমপ্রীতিও বেড়েছে দেখলাম চরম। বর্তমান প্রশাসনকে পেয়ে জনগণ যে যথেষ্ট খুশী হয়েছে — মনে হয় এতে আর সন্দেহ কিছু নেই।

ঃ কি করে বুঝলে ?

ঃ এই প্রশাসনের প্রশংসা জনগণের মুখে মুখে খইয়ের মতো ফুটছে। এরপরও আর সন্দেহ থাকবে কেন ?

ঃ এর মধ্যেই রাজনীতিটা এতখানি রপ্ত করে ফেলেছো ?

শরীফ রেজা হোঁচট খেলেন। বললেন —জি ?

ঃ তোমার মুখে এসব কথা শুনবো বলে, তোমাকে নিয়ে এই নিরিবিলিতে বসিনি।

ঃ তা কথাটা ঠিক —

ঃ লোকজনের এই কর্মতৎপরতা, প্রশাসনের প্রতি এই আনুগত্য ও প্রীতি এবং প্রশাসনের এই ভূয়সী প্রশংসা — তামামই যে সকলের অন্তর ফুটে বেরুচ্ছে —তোমার মতো এমন একজন বুদ্ধিদীপ্ত নওজোয়ানের পক্ষে এমন ভাবার পেছনে কোন যুক্তি নেই।

ঃ জনাব —

ঃ সত্যটা তুমি স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছো।

ঃ তা মানে —

ঃ এ সমস্তের সাথে অন্তরের যোগ নিতান্তই কম। এর অধিকাংশই তোয়াজ এবং তোয়াজের মাধ্যমে সুবিধা ভোগের প্রয়াস। বাদবাকীটা ভীতি। জানের ভয়েও এ প্রশাসনের গুণ গাইছে অনেকে। এটুকু বোঝার জ্ঞান অবশ্যই তোমার আছে।

শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের মুখের দিকে বিস্মিতভাবে চেয়ে থেকে শরীফ রেজা বললেন —বলেন কি!

ঃ প্রশংসায় যারা পঞ্চমুখ তারা আসলে শতকরা নব্বুই জনই বেঈমান। এ প্রশাসনের প্রতি তিল পরিমাণ প্রেমও কারো নেই। স্রেফ সুবিধা আর মতলব হাসিলের খাতিরেই এদের এই উচ্ছ্বাস! বেঈমানের বাচ্চারা!

ঃ জনাব —

ঃ কিছু পরিমাণ লোক অবশ্য ভয় পেয়েছে খুব। আর তাই তারা আতংকে ঐ গুণগান করছে।

ঃ কিন্তু —

ঃ সব বেঈমান আর ভীরু। এখানে মানুষ খুঁজে পাবে না।

শরীফ রেজা বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বাহরাম খানের একান্ত আপনজন এই শাহ্ ফখরউদ্দীন সাহেব কি বলতে চান তাহলে? তিনি নীরবে শাহ্ সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তা লক্ষ্য করে ফখরউদ্দীন সাহেব ঈষৎ হেসে বললেন — আমার কথা শুনে তুমি খুব অবাক হচ্ছো, তাই না?

ঃ জি?

ঃ আমার মুখ থেকে এসব কথা বেরুবে, এ ধারণা কি তোমার মধ্যে ছিল কিছু?

ঃ তা ব্যাপারটা আমি —

ঃ তুমি এখানে আসার আগে ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের সাথে মোলাকাত করেই তো এসেছো?

ঃ জি—জি —

ঃ তিনি তোমাকে বলেন নি কিছু?

ঃ জি, বলেছেন। আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং সম্ভব হলে কিছু আলাপ করতে বলেছেন।

ঃ তাহলে আর আলাপে এই জড়তা কেন তোমার?

ঃ কিন্তু আপনি যা বলছেন তাতো এই প্রশাসনের পুরোপুরি পক্ষের কথা নয়?

ঃ এই প্রশাসনের পক্ষ নিয়েই আমি আলাপ করবো তোমার সাথে, এই ধারণাই কি তিনি তোমাকে দিয়েছেন?

ঃ জি না —। উনি যা বলেছেন —

ঃ উনি যা বলেছেন সেটা তুমি খোলাসা করে না বললেও আমি তা বুঝি, আর সেই আলাপই তোমার সাথে করছি।

দ্বিধা মুক্তির জন্যে শরীফ রেজা এবার খোলাখুলি প্রশ্ন করলেন — আচ্ছা জনাব, আপনি যে আমাকে চেনেন একথা কি ফৌজদার সাহেব জানেন কিছু?

ঃ না। সেটা তাঁর জানার কথা নয়। ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে তাঁর মুখেও নাম তোমার শুনেছি কয়েকবার। এ ছাড়া সেপাই হিসাবে তোমার

যে খুব তারিফ আছে সাতগাঁয় আর লাখ্নৌতিতে আর দিল্লীর প্রভুত্ব মানতে চাও না বলেই যে লাখ্নৌতির নকরীটা ছেড়ে দিয়েছো তুমি – এটাও কানে পড়েছে আমার।

ঃ সে কি!

ঃ ফৌজদার সাহেবের মানসিকতাকে শ্রদ্ধা করি বলেই তোমাদের মতো লোকদের ছিটে ফোঁটা কিছু খবর আমার কান পর্যন্তও গড়ায়। এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই।

ঃ জনাব!

ঃ ফিরে গিয়ে ফৌজদার সাহেবকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে – সোনার গাঁয়ে আর মানুষ নেই। তাঁর চেনাজানা প্রায় লোকই খোলস বদল করেছে। কাজেই এখন আর অধিক আগ্রহী হয়ে কাজ নেই। এ মুলুকের মুক্তির সম্ভাবনা নাগালের অনেক বাইরে চলে গেছে। এখন স্রেফ সবুর করার সময়।

ঃ সে কি! আপনি —

ঃ একটা দেশকে আজাদ করা এক লহমার ব্যাপার নয়। সেজন্যে অনেক ধৈর্য আর সাধনার প্রয়োজন।

ঃ জনাব!

ঃ কাঁচা ফল জোর করে পাকাতে গেলে অবস্থা ঐ গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের চেয়ে উন্নত কিছু হবে না। বেচারা! তাঁর চারপাশের মানুষদের ভাল করে না চিনেই আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

ঃ গোস্তাকী মাফ করবেন জনাব, আমি আর কৌতুহল চেপে রাখতে পারছিনে।

ঃ বলো —

ঃ আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে — এই বাঙ্গালা মুলুক আজাদ হোক — এটা আপনারও ঐকান্তিক কামনা বা এর আপনি সমর্থক।

ঃ অবশ্যই।

ঃ কিন্তু আপনি তো দিল্লীর পক্ষের লোক। দিল্লীর নকরী করেন।

ঃ আমি দিল্লীর পক্ষের লোক নই, আমি বাহরাম খানের পক্ষের লোক। আর নকরীও আমি দিল্লীর হুকুমাতের করিনে। করি বাহরাম খানের।

ঃ সে তো ঐ একই কথা হলো। বাহরাম খান সাহেব তো ঐ দিল্লীর হুকুমাতেরই লোক। আপনিও তো স্বাধীনতার বিরুদ্ধেই লড়েছেন?

ঃ জরুর লড়েছি। কিন্তু তাই বলে দেশটা আজাদ হোক, এ আকাঙ্খা দীলে আমার থাকবে না— এটা কোন কথা নয়।

ঃ দেশটা আজাদ হোক, এটা আশা করবেন আবার আজাদীর বিরুদ্ধে লড়বেন — এটাতো বুঝলাম না জনাব?

ঃ আমি বাহরাম খানের নকরী করি। তাঁর কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে আকণ্ঠ ঋণী। তিনি হুকুম করলে, একবার নয়, দশবার আমাকে আজাদীর বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলতে হবে এবং ঈমানের সাথে লড়াই করতে হবে। যতদিন তিনি জীবিত আছেন, নেমক খেয়ে নেমকহারামী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি এমন কি বীর যে, আমি বিরুদ্ধে লড়ছি বলেই আজাদী আর আসছে না?

ঃ জনাব!

ঃ গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের এই পরিণতির জন্যে বা বাঙ্গালার আজাদী বিঘ্নিত হওয়ার জন্যে এই শাহ ফখরউদ্দীনের বিরোধিতা আদৌ কোন মুখ্য কারণ নয়।

ঃ তা মানে—

ঃ যাদের উপর ভরসা করে তিনি এই ঝুঁকি নিলেন, তাদের মোনাফেকী আর বেঈমানীই এই ভরাডুবি ঘটিয়েছে। যে হিম্মত নিয়ে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেব লড়লেন, তাতে তারা যদি ঈমানের সাথে একজোটে রুখে দাঁড়াতো আমাদের বিরুদ্ধে, আমাদের সাধ্য ছিল না সোনার গাঁয়ের মাটিতে অধিক সময় দাঁড়িয়ে থাকার। কিন্তু সোনার গাঁয়ে ঢুকে কি দেখলাম —

ঃ কি দেখলেন?

ঃ দেখলাম — গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেব নিতান্তই একা। তাঁর পক্ষের লোকেরা দলে দলে ছুটে আসছে আমাদের বরণ করতে, আমাদের পক্ষে যোগ দিতে। আমাদের পক্ষ সমর্থন করার আদৌ কোন ইচ্ছা-ইরাদা যাদের দীলে ছিল না, অবস্থার এই নিদারুণ পরিবর্তন দেখে, তারাও এসে ঢুকে পড়লো আমাদের ছাউনিতে।

ঃ তাজ্জব! তা এমনটি হওয়ার পেছনে কারণটা কি মনে করেন জনাব? গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের দুর্ব্যবহার? তাঁর অসততা?

শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব ক্লিষ্ট হাসি হাসলেন। বললেন মোটেই না, মোটেই না।

ঃ তবে?

ঃ এর অত্যন্ত স্পষ্ট আর একমাত্র কারণ — ইসলামের বিরোধী শক্তি এখানে বড় সোচ্চার। একথা তো জানো যে, এই মাত্র কয়েক বছর আগেও সোনার গাঁ অমুসলমানদের এলাকা ছিল। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের এলাকা ছিল। এই অল্পদিন আগে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের পিতা সুলতান শামসুউদ্দীন ফিরোয শাহ এই সোনার গাঁ অধিকার করেন এবং এখানে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এরই মধ্যে এই অঘটন। ইসলামের শিকড় সুগভীরে না যেতেই এই ধাক্কা আসায়, সোনার গাঁ এলাকার ইসলাম বিরোধী বিপুল জনতা — এমন কি সুবিধা লাভের আশায় হালে মুসলমান

হওয়া কমতি ঈমানের লোকেরা, লুফে নিয়েছে এই সুযোগ। সোনারগাঁ থেকে ইসলামকে উৎখাত করার গভীর এক পরিকল্পনা সামনে নিয়ে তারা বিপুল আগ্রহে যোগ দিয়েছে দিল্লীর ফৌজের সাথে।

ঃ এটা আবার কেমন কথা হলো জনাব? দিল্লীর লোকেরাও তো মুসলমান। দিল্লীর অধিকারও তো মুসলিম অধিকার?

ঃ আপাততঃ তাই মনে হলেও, নিগূঢ় রহস্যটা এখানেই। একটি অমুসলমান এলাকায় মুসলমানদের হুকুমাত তখনই স্থায়ী হয়, যখন সেই হুকুমাতের কর্ণধারগণ শুধু দেশ জয় করেই ক্ষান্ত হন না, ইসলামের আদর্শ প্রচার করে সে এলাকায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মুসলিম হুকুমাতের পক্ষের লোক আর সমর্থক তৈয়ার করেন। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজী বাঙ্গালা মুলুক দখল করেই এখানে মুসলমান সমাজ গড়ে তোলার জন্যে ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে উঠে পড়ে লাগেন বলেই শেষ পর্যন্ত তাঁর এই বিজয় ফলপ্রসূ হয়। বাঙ্গালাকে যখনই কোন স্বাধীন শাসক নিজের দেশ ও নিজের রাজ্য বলে গন্য করবেন, তখনই তিনি এই মুসলমান সমাজ গড়ে তোলায় সোচ্চার হবেন। তখনই তিনি সাহায্য নেবেন সুফী দরবেশদের এবং জানপ্রাণ দিয়ে সাহায্য করবেন সুফী দরবেশদের ইসলাম প্রচারের কর্মকাণ্ডকে। আসলে, রাজারা তো রাজনীতি নিয়েই পেরেশান থাকেন সবসময়। তাঁদের হয়ে আসল কাজ এই সুফী দরবেশরাই করেন। সুলতানদের আগ্রহ আর মদদটুকুই প্রয়োজন শুধু।

ঃ জনাব!

ঃ কিন্তু মুসলমান হলেও দিল্লীর এই শাসকেরা এ মুলুকে উপস্বত্ত্ব ভোগকারী শাসক। এরা অধিকাংশেরাই দিল্লীর কর্মচারী ও ভোগবিলাসী শাসক। বাঙ্গালা মুলুকে এঁরা আসেন অর্থ সংগ্রহ করতে, আমোদ ফূর্তি করতে আর প্রভুত্ব বা পরের ধনে পোদ্দারি করতে। ইসলামের স্বার্থ নিয়ে এদের অধিকাংশেরই আদৌ কোন মাথা ব্যথা নেই। দিল্লীর সুলতানদেরও প্রায় সবারই অর্থ আর প্রভুত্বটুকুর সাথেই সম্পর্ক। ইসলাম নিয়ে দিল্লীতে তাঁরা যা-ই করুন, এখানে তাঁদের ওটা নিয়ে তেমন গরজ বড় একটা দেখা যায়নি। ফলে, সুলতান শামসুউদ্দীন ফিরোয শাহর পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালার পরিধিও বাড়েনি। নিজের দেশ হিসেবে স্বাধীনভাবে কাজ করেছেন বলেই তিনি রাজ্যটা এতদূর তক্ প্রসারিত করেছেন এবং মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বা ইসলামের ভিত সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে হজরত শাহজালাল, শাহ শফী প্রমুখ ইসলামের দিকপালদের সাথে সহযোগিতা করেছেন। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর জয়ী হলে কি হতো? দিল্লীর এই শাসকদের মতো তাঁর পেছনে তো আর দিল্লীর শক্তি থাকতো না! তাঁকে এখানে টিকে থাকতে হতো স্থানীয় শক্তির উপর। আর সেই জন্যেই তাঁর শক্তি ও সমর্থক

বৃদ্ধি করার প্রয়াসে ইসলামকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে পুরোমাত্রায় মুসলমান সমাজ গড়ে তোলাই তাঁর অগ্রগণ্য কাজ বা প্রধান কর্তব্য হতো। ইসলাম এখানে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক, এখানকার অমুসলমান লোকেরা তা চাইবে কেন ? ইসলামের বাঁধন এখানে একেবারেই ঢিলেঢালা হয়ে যাক, এটাইতো চাইবে তারা — যাতে করে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার পথ অতি সুগম হয়।

শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের এই গভীর অর্ন্তদৃষ্টির পরিচয় পেয়ে শরীফ রেজা একেবারেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বিস্ময়াভিভূতভাবে তিনি বললেন — কি আশ্চর্য। এটাতো কঠিন এক বাস্তব উপলব্ধি! এত গভীরে তলিয়ে গিয়ে চিন্তা করেছেন আপনি ?

ঃ দিল্লীর শাসন দূরের শাসন, সোনার গাঁয়ের স্থানীয় শাসন নয়। দিল্লীতে কোন গোলযোগ দেখা দিলেই এই নকরী করা ভাড়াটে শাসকদের এক দাবাড়ে তাড়িয়ে দিয়ে এটা আবার ইসলাম মুক্ত এলাকা করতে সক্ষম হবে তারা। দিল্লীর শাসন ভাসমান শাসন। কিন্তু গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর বা এ দেশের কোন স্বাধীন সুলতান বাঙ্গালা মুলুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে কি আর তা পারবে তারা ? কাজেই, তারা বাঙ্গালা মুলুকে মুসলমানদের স্বাধীন শাসন কখনও চাইবে না।

ঃ জনাব!

ঃ তাদের এই দিল্লী প্রীতি ইসলামকে এ মুলুক থেকে উৎখাত করার প্রীতি, ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার নয়।

ঃ তাজ্জব! আপনার ভেতরে এত আগুন জনাব! তাইতো বহুদর্শী ফৌজদার সাহেব আমাকে আপনার কাছে আসার উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন – অন্যের উপর ভরসা নেই। তুমি তাঁর কাছেই যাও। আগুন আছে লোকটার মধ্যে। এখন দেখছি তাঁর কথা —

শরীফ রেজাকে শেষ করতে না দিয়ে শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব উত্তেজিতভাবে তৎক্ষণাৎ ফের বললেন – আগুনটা আমার মধ্যে যতটুকুই থাক, আমার মুনীব খান বাহরাম খান সাহেব সে আগুন আরো দশগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন এই সোনার গাঁয়ে এসে।

ঃ জনাব —

ঃ গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের গায়ের চামড়া তুলে নেয়া হয়েছে, তাতো শুনেছো ?

ঃ জ্বি-হাঁ জনাব। এখানে এসে তাই শুনলাম।

ঃ লাশের উপর এই জুলুম করার পেছনে ঐ অপশক্তিই কাজ করেছে। কোন সত্যিকারের মুসলমান এমন কাজ সমর্থন করতে পারে না।

ঃ তাইতো! বাহরাম খান একজন মুসলমান হয়ে —

ঃ এরা এই জাতের মুসলমান!

শাহ ফখরউদ্দীনের মুখাকৃতি কঠিন হয়ে এলো। হাত তাঁর অজ্ঞাতেই মুষ্টিবদ্ধ হলো। তিনি পুনরায় বললেন — কৃতজ্ঞতার রজ্জুতে কণ্ঠ আমার রুদ্ধ থাকার দরুন নীরবে দাঁড়িয়ে ঐ পাশবিক আচরণ সহ্য করতে হলো। একজন স্বাধীনতার দূত চোখের সামনে নির্যাতীত হলো, তলোয়ার কোমরে থাকা সত্ত্বেও তলোয়ারের বাঁটে আমি হাত রাখতে পারলাম না।

ঃ সত্যিই বড় মর্মান্তিক!

ঃ বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতানদের প্রতি দিল্লীওয়ালাদের যে কি মানসিকতা, তা আমার চেয়ে অধিক খুব বেশী লোক জানে না।

শরীফ রেজা ইতস্ততঃ করে বললেন — তা হাতটা একবার তলোয়ারের বাঁটে আনার কোশেশ করা যায় না জনাব ?

শাহ ফখরউদ্দীনের দুই চোখ দপ করে জ্বলে উঠলো। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন — না।

ঃ কেন জনাব ?

ঃ নেমকহারামী জীবনে যখন করিনি কখনও, তখন আর তা করে দীলটা কলুষিত করতে চাইনে। দ্বিতীয়তঃ, এখন সে প্রয়াস হবে নিতান্তই এক বেয়াকুফী। এই মুহূর্তে সে পদক্ষেপ নেয়া মানে মউত ডেকে আনা। কামিয়াবীর তিল পরিমাণ সম্ভাবনাও নেই।

ঃ আচ্ছা।

ঃ বরং আমার মুনীব যদি কখনও এই মঞ্চ থেকে অপসারিত হন, এবং পরিবেশ যদি অন্ততঃ কিছুটা অনুকূলে আসে, সে চিন্তা তখন করা যাবে, এখন নয়। তোমাদেরও আমি এখন খুব সংযত হয়ে চলার জন্যে বিশেষভাবে বলবো। বেসামাল হলেই এখন মুসিবত পদে পদে।

ঃ তাহলে —

ঃ আজ আর এর বেশী নয়। একটা খোশ পয়গাম আছে। অতি শিগগির আমি ভুলুয়ার শাসনকর্তা হয়ে সপরিবারে ভুলুয়াতে আসছি। ব্যবস্থা সব পাকা। বুদ্ধিদীপ্ত হলেও তুমি এখনও ছেলেমানুষ। অনেক বলেছি তোমাকে ভুলুয়াতে বসে ঐ জ্ঞানবৃদ্ধ ফৌজদার সাহেবের সাথে এসব নিয়ে আরো বিস্তারিত আলাপ করা যাবে। অবশ্য তুমিও সাথে থাকবে তখন।

ইতিমধ্যেই চটপট আওয়াজ তুলে ফরিদা বানু এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং হাসি মুখে বললেন — আব্বা, তোমাকে তো বলেই গেলাম — আমি মেহমানকে দাওয়াত করেছি এখানে দুটো খাওয়ার জন্যে। কিন্তু তুমিতো দেখছি কথা খাইয়েই উদরটা ভর্তি করলে মেহমানের। উনি আর খাবেন কি ?

৭

মেয়ের এই কথায় হো হো করে হেসে উঠলেন শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব। বললেন — তাই নাকি ?

ফরিদা বানু বললেন — খানা তৈয়ার। বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেলো যে।

ঃ এ্যাঁ! ও — আচ্ছা। চলো হে সৈনিক, চলো-চলো —

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব। ফরিদা বানু বললেন— হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি এসো তোমরা, আমি গিয়ে দেখি ওদিকে —

ফরিদা বানু বেরিয়ে গেলেন। এই ফাঁকে শরীফ রেজা বললেন – জনাব, আর একটা কথা। এখানে লাড্ডু মিয়া নামে একজন —

তাঁর মুখ থেকে কথা নিয়ে শাহ ফখরউদ্দীন বললেন— লোক আছে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের পক্ষের – তথা বাঙ্গালার আজাদীর পক্ষের। গোয়েন্দা। খুবই বিশ্বস্ত এবং নিবেদিত প্রাণ। আমার নজর আছে তার উপর। ওটা নিয়ে ভেবো না।

পুনরায় বিপুল বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হলেন শরীফ রেজা। বিস্মিত কণ্ঠে বলেন — জনাব!

ঃ কে কোথায় কাজ করছে তার মোটামুটি একটা হদিস তো আমার কাছে আছে। ওঁর কোন মুসিবত আল্লাহর রহমে আমি এখানে থাকা তক্ হবে না।

ঃ কি তাজ্জব! আপনি এতটা জানেন, আর একজন গোয়েন্দা হয়ে আপনার এই মানসিকতার বিন্দু -বিসর্গও তিনি জানলেন না!

শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব আবার একটু হাসলেন। তারপর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন — আমাকে যদি সবাই এত সহজে সনাক্ত করতে পারতো, তাহলে আমার অবস্থান আজ এখানে আসতো না। অনেক আগেই আমি লাশ হয়ে যেতাম!

ঃ আশ্চর্য!

ঃ তোমাকে এসব বলা আমার প্রয়োজন, তাই বললাম। নখে গোনা কয়জনের মধ্যে আজ তুমিও একজন হলে। এটা তোমার মধ্যেই রাখবে। এক ফৌজদার সাহেব ছাড়া, আর দুস্‌রা কারো সাথে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে না। ঐ লাড্ডু মিয়াকে কিছুটা আভাস দিতে পারো, এই মুহূর্তে তার বেশী নয়।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

খানার জন্যে পুনরায় তাকিদ এলো। ব্যস্তসমস্তভাবে শাহ ফখরউদ্দীন বললেন — এসো-এসো, খানা ফেলে আলোচনা স্রেফ নির্বুদ্ধিতা —

উভয়েই দ্রুতপদে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন।

৪

আরো দু' একদিন সোনার গাঁয়ে কাটানোর পর শরীফ রেজা ভুলুয়ায় ওয়াপস্ এলেন। ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের মকানে এসে শুনলেন, ফৌজদার সাহেব নেই। দূরবর্তী এক এলাকায় তাঁর কিছু লোকজনের খোঁজ খবরে গেছেন তিনি। ফিরতে তার দু'একদিন দেরী হবে। এ খবরে শরীফ রেজা একদম চুপ্‌সে গেলেন। সোনার গাঁয়ের গরম গরম অনেক তথ্য নিয়ে তিনি ফৌজদার সাহেবের উদ্দেশ্যে ছুটতে ছুটতে এলেন। এসে শুনলেন— যে লোকটিকে উদ্দেশ্য করে এত আগ্রহে এলেন তিনি, সেই লোকটিই নেই। এতে শরীফ রেজার তামাম ইরাদা বানচাল হয়ে গেল। আঙ্গিনার একপাশে অশ্বটা বেঁধে রেখে নির্জীবভাবে এসে তিনি ফৌজদার সাহেবের দহলিজে বসলেন। তাঁর ইরাদা ছিল — ফৌজদার সাহেবের মেহমান হয়ে দু' একদিন থাকবেন তিনি এখানে। সম্ভব হলে, ভুলুয়ার সদর দপ্তরটা গিয়ে একবার দেখে আসবেন একনজর। তারপর রওনা হবেন সাতগাঁয়ে। ফৌজদার সাহেব নেই শুনে তাঁকে তাঁর পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হলো। তাঁর ওয়াপস্ আসার খবরসহ সোনার গাঁয়ের দু'চারটি মোটামুটি খবর এই মকানের কারো কাছে পৌঁছে দিয়েই সাতগাঁয়ের পথ ধরবেন তিনি — এই ইরাদা নিলেন।

তাঁকে দহলীজে প্রবেশ করতে দেখেই হন হন করে ছুটে এলো দবির খাঁ। এসেই সে খোশদীলে বললো — মা-শা-আল্লাহ! আপ্ ওয়াপস্ আ-গিয়া ? বহুত আচ্ছা — বহুত আচ্ছা!

তাকে পেয়েই শরীফ রেজা জিজ্ঞাসা করলেন — তা শুনুন, মকানে এখন কে আছেন ?

এর জবাবে দবির খাঁ বললো — সবাই আছেন। তামাম আদমী । স্রেফ হুজুর নেই। পরশু তক্ ওয়াপস্ আসবেন হুজুর।

ঃ একজন কাউকে ডেকে দিন তো তাহলে। কিছু খবর আছে।

ঃ খবর ?

ঃ হ্যাঁ সোনার গাঁয়ের খবর।

ঃ সোনার গাঁয়ের খবর ? শাব্বাশ। তা সে খবর হুজুর এলে দেবেন ? দুস্‌রা কাউকে দিয়ে তো কুচ্ ফায়দা নেই।

ঃ কিন্তু আপনার হুজুর তো আসবেন সেই পরশু না কবে ?

ঃ হুঁ–হুঁ, জরুর। পরশুদিন সবেরাতেই ওয়াপস্ আসবেন জরুর।

ঃ কিন্তু আমি তো তখন থাকবো না।

ঃ কিয়াবাত্! থাকবেন না মানে ?
ঃ আজই আমি সাতগাঁ চলে যাচ্ছি।
ঃ আরে তাজ্জব! সাতগাঁ যাবেন কি ?
ঃ কি করবো! আপনার হুজুর যখন নেই, তখন —
ইতিমধ্যেই কনকলতা কখন যে এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কেউ লক্ষ্য করেননি। তিনি শরীফ রেজার কথা ধরে বললেন — সাতগাঁ যাওয়া ছাড়া আপনার আর গতি নেই, এইতো ?
শশব্যস্তে শরীফ রেজা চোখ তুলে চাইলেন। তাঁর সামনে আবার সেই মুখ! সেই মনোমোহিনী রূপ! চোখ তুলেই তিনি থতমত করে বললেন — এ্যা! না — কথা হলো —
অভিযোগের সুরে কনকলতা বললেন — বড়বাপ নেই বলে কি এ মকানে আর কেউ নেই ?
ঃ না আমি তা বলছিনে —
ঃ তিনি নেই বলেই আপনাকে এই অবেলায় সাতগাঁ ছুটতে হবে ?
ঃ কিন্তু —
ঃ মেহমানদারী করার লোকের এখানে অভাব আছে, না সে দীল কারো নেই এখানে ?
ঃ জি ?
ঃ তেতে পুড়ে সোনার গাঁ থেকে এইমাত্র এলেন আপনি । আমরা সবাই আপনার অপেক্ষায় কান পেতে আছি। আর বড়বাপ নেই দেখেই আপনি সাতগাঁ চলে যাবেন ? আচ্ছা লোক তো আপনি।
ঃ তা ব্যাপারটা হচ্ছে —
ঃ যান তো দেখি, কেমন করে যাবেন ?
— বলেই কনকলতা দবির খাঁকে বললেন — বাবা, সহিসকে ডেকে উনার ঘোড়াটা আস্তাবলে নিয়ে যেতে বলো তো।
সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠলো দবির খাঁ। বললো — ঠিক ঠিক, ইয়ে এক ঠিক বাত্ আভ্ভি আমি বলছি —
দবির খাঁ তৎক্ষণাৎ বাইরের দিকে ছুটতে গেল। তাকে থামিয়ে দিয়ে কনকলতা ফের বললেন — স্রেপ আস্তাবলে নিয়ে গেলেই চলবে না বাবা। বহুৎ দূর থেকে ঘোড়াটা হয়রান হয়ে এসেছে। ঘোড়াকে দানা দিতে হবে
দবির খাঁ ব্যস্ত কণ্ঠে জবাব দিলো — জি আচ্ছা, জি আচ্ছা —
ঃ আরো কথা আছে বাবা।
ঃ বাতাও —

শরীফ রেজাকে আঁড়চোখে কটাক্ষ্য করে কনকলতা হাসিমুখে বললেন — সওয়ার যখন এত লাজুক, তাঁর ঘোড়াটাও লাজুক হবে নিশ্চয়ই। অন্য ঘোড়ার সাথে যেমন তেমন করে এ ঘোড়াকে দানা দিলে খাবে না কিন্তু।
ঃ তব্ ?
ঃ আলাদাভাবে দেবে। আলাদা করে ভাল খাবার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেওয়াবে তুমি।
ঃ ঠিক হ্যায় — ঠিক হ্যায়।
ঃ আর সহিসটাকে বলে দেবে, ঘোড়াটার যেন বিশেষভাবে যত্ন নেয়া হয়। পরে আমি নিজে গিয়ে দেখবো কিন্তু।
ঃ আচ্ছা-আচ্ছা। বিলকুল বাত্ মাফিক কাজ হবে।
ঃ যাও —
দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল দবির খাঁ। কনকলতা ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখটিপে হাসতে হাসতে বললেন — এবার যান দেখি ?
শরীফ রেজা ইতস্ততঃ করে বললেন — কিন্তু এ আপনি কি করলেন?
অমনিভাবে হাসি মুখে কনকলতা বললেন — খারাপ কিছু করিনি। আপনি যেতে চাইলেই আপনাকে যেতে দিতে পারি আমরা ?
ঃ কিন্তু ফৌজদার সাহেব —
ঃ উনি না থাকুন, আমরা তো আছি। উনি এসে যখন শুনবেন — এখানে আপনার ঠিকমতো সমাদর করা হয়নি — আর তাই আপনি এসেই ফের চলে গেছেন — তখন কষ্ট পাবেন না উনি ? গোস্বা হবেন না আমাদের উপর ?
ঃ কিন্তু আমি তো পরে আসবো আবার। সোনার গাঁয়ের খবর যা এনেছি, পরে এসে তামামই শুনিয়ে যাবো।
ঃ আমরা কি বাঘ ভাল্লুক ? পরে আসবেন এ চিন্তা না করে একদেড় দিন সবুর করলে ক্ষতিটা কি আপনার ?
ঃ না, ক্ষতি কিছু নেই। তবে —
আবার হাসলেন কনকলতা ? বললেন — শরম পাচ্ছেন, এইতো ? বুঝি বুঝি!
আপনি লোকটা হিম্মতদার হলে কি হবে, এখনও ছেলে মানুষ।
যিনি বলছেন, তিনি নিজে যে বুড়ি মানুষ নন, শরীফ রেজা তা বোঝেন। কিন্তু বিতর্কে না গিয়ে তিনি বললেন — না, মানে, উনি নেই অথচ আমি থাকবো — এই ঝুটঝামেলা —
ঃ কে পোহাবে ? অন্য লোকের দরকার কি ? আমিই তো যথেষ্ট।

ঃ আপনি!

কনকলতার মাথা এবার নীচু হলো। সংযত হয়ে তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন — আপনার জন্যে এটুকু না করলে, সেদিনের বেয়াদপীটা খণ্ডন হবে কি করে — বলুন?

ঃ বেয়াদপী!

ঃ অন্ততঃ আপনার তো বুঝতে হবে, এই আমি মানুষটার মধ্যে শুধু বেয়াদপীই নেই, ভক্তি—শ্রদ্ধাও আছে কিছুটা?

ঃ আচ্ছা।

ঃ আপনি বসুন, আমি আপনার মেহমানদারীর ব্যবস্থা দেখি।

ঃ কিন্তু —

ঃ আবার কিন্তু কি? বড়বাপের অনুপস্থিতিতে আপনি এলে, বড়বাপ আপনাকে থাকতে বলেই গেছেন।

ঃ আপনি তো জানি আলাদা মকানে থাকেন। এ মকানে আপনি —

ঃ তাতে কি হয়েছে? বড়বাপ নেই। আমি কিংবা বাবার হুকুম ছাড়া, এ মকানের লোকজন কেমন করে বুঝবে — কার মেহমানদারী করতে হবে?

ঃ বলেন কি?

ঃ এ ছাড়া আমি নিজে তদারক না করে স্রেফ চাকর নফরের উপর আপনাকে ফেলে রাখা সম্ভব?

ঃ মানে? এ বাড়ীর লোকজন —

ঃ বড়বাপ ছাড়া এ মকানে তেমন তো কোন উপযুক্ত লোক নেই। চাকর নফরদের উপরই ভরসা করে চলতে হয় বড়বাপকে। আমি না দেখলে দেখবে কে? তা ছাড়া, আপনার তদবিরে কোন কসুর হলে বড়বাপের কাছে সে জবাবদিহি তো আমাকেই করতে হবে। আপনি বসুন। আমি দেখি ওদিকে —

দ্রুত পদে কনকলতা অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন। কনকলতার এই আগ্রহে শরীফ রেজার দীলে একটা খোশ প্রবাহ বইতে লাগলো। সেই সাথে মেয়েটির এই খোলামেলা ও নিঃসঙ্কোচ আচরণ দেখে শরীফ রেজা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন — কি অদ্ভুত এক চরিত্র! জ্ঞানবুদ্ধি উপলব্ধি তামামই গভীর। অনুভূতিও তীব্র। অথচ সংকোচ নেই কিছুতেই। বালিকা তিনি নন। কিশোরীও নন। যৌবন তাঁর সর্বাঙ্গে ভর করেছে পুরোপুরিই। কিন্তু যৌবন তাঁর বালিকা সুলভ দ্বিধাহীন স্বভাব এখনও মুছে ফেলতে পারেনি। এমন সরল-সহজনির্ভিক এই আচরণ কোথা থেকে পেলেন ইনি?

বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন কনকলতা। এসে বললেন — আসুন —

শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন — কোথায়?

কনকলতা শক্ত কণ্ঠে বললেন— আহা, দিনরাত সবসময় এই দহলীজেই বসে বসে কাটাবেন? আসুন —

ফৌজদার সোলায়মান খানের দহলীজটা পূব দুয়ারী। পূব দিকেই বাহির আঙ্গিনা। শরীফ রেজাকে নিয়ে কনকলতা যে কক্ষটিতে এলেন, সে ঘরটি ফৌজদার সাহেবের মকানের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। ছোটখাটো ছিমছাম এক দক্ষিণ দুয়ারী বাইরের ঘর। বারান্দাও দক্ষিণ দিকে। ঘরটার পাশ দিয়েই অন্দরে যাবার সরু একটা পথ। বারান্দার নীচ দিয়ে পরিচ্ছন্ন আর এক পথ মকানের বহিরাংশ ঘেঁষে পশ্চিম দিকে গেছে। ঘরটা বোধ হয় অনেক দিন ধরেই ফাঁকা ছিল। শরীফ রেজা এসে দেখলেন, ঘরের বারান্দা ও বাহির দিক তখনও চাকর-নকর মিলে ঝাড়া মুছা করছে। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এনে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ঘরের মধ্যে সদ্যই বিছানা পাতা হয়েছে। বারান্দায় উঠে বিছানার দিকে ইঙ্গিত করে কনকলতা শরীফ রেজাকে বললে —

যান, বিরাম করেন কিছুক্ষণ। খানার ব্যবস্থা শিগ্‌গিরই হচ্ছে।

শরীফ রেজা বললেন — তা এ ঘরে? এখানে কে থাকতো আগে?

ঃ আপাততঃ কেউ থাকতো না। বড়বাপ সেদিন বলেছিলেন, ঘরখানা ছাফা করে রাখতে হয়। শরীফ রেজা এসে এখানে ওখানে থাকবে এটা ঠিক নয়। ওকে মাঝে মধ্যেই প্রয়োজন হবে এখন। ওর জন্যে আলাদা একটা কামরা থাকা দরকার। তাই আজকেই ঘরখানা ছাফা করে ফেললাম। আর এই জন্যেই দেরী হলো। এখন থেকে যখন আসবেন, এই ঘরেই থাকবেন আপনি।

ঃ এই ঘরে?

ঃ হ্যাঁ। আর এই যে বারান্দার নীচে রাস্তা দেখছেন, এই রাস্তা দিয়ে ডাইনে কিছুটা এগুলেই আমার মকান। অবশ্য বাবার ঘর আমার মকানের আগেই।

ঃ বাবা মানে ঐ —

ঃ হ্যাঁ, ঐ দবির খান সাহেব। উনি যে ঘরে থাকেন, সে ঘরটা আমার মকানে যাওয়ার পথেই সামনে পড়ে।

ঃ আপনার মকানে আর কে আছে?

ঃ আছে-আছে। মেয়েছেলে মানুষ আমি, একেবারেই একা থাকিনে। আস্তে আস্তে সব দেখতে পাবেন। আপনি যান, আরাম করুন।

— বলেই কর্মরত লোকদের আরো কিছু দেখিয়ে-বুঝিয়ে দিয়ে কনকলতা অন্দরের দিকে গেলেন।

আহার বিরাম অন্তে শরীফ রেজা ঘরের মধ্যে একা একাই বসেছিলেন। দবির খাঁকে সঙ্গে নিয়ে ফৌজদার সাহেবের বিশিষ্ট লোক লস্কর ও পরিজনেরা তাঁর সাথে মোলাকাত করতে এলেন। কিছুক্ষণ গল্প-আলাপ করে সবাই তাঁরা

বিদেয় হলে, ঘরে ঢুকলেন কনকলতা। শরীফ রেজা খাটের উপর গা এলিয়ে ছিলেন। কনকলতা এসে একটা কুরসী টেনে বসলেন। তা দেখে শরীফ রেজা সোজা হয়ে উঠে বসতেই কনকলতা বললেন — এবার সোনার গাঁয়ের কথা বলুন। আমরা তো ভেবে আকুল, কি-না-কি মুসিবত আপনার হয় ওখানে। যে দুষমন পুরীতে গেলেন আপনি ?

এর জবাব না দিয়ে শরীফ রেজা হাসিমুখে পাল্টা প্রশ্ন করলেন— তার আগে আপনি বলুন, আমি এসে দহলীজে প্রবেশ করার সাথে সাথেই আপনি এসে হাজির হলেন কি করে ? অন্য কেউ দেখতে পাওয়ার আগেই আপনি আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন ?

কনকলতাও হাসিমুখে জবাব দিলেন — তা না পেলে সবার আগে এলাম আমি কি করে ?

ঃ তাজ্জব! আপনি কি তাহলে রাস্তা পথেই ঘুরে বেড়ান সবসময় ?

কনকলতা না-খোশ হলেন। বললেন — রাস্তা পথেই ঘুরে বেড়াই মানে ?

ঃ মানে বাড়ীতে এত লোক থাকতে কেউ দেখতে পেলো না, আর আপনিই পেলেন আগে ?

ঃ আগে দেখতে পাবো কেন, আগে শুনতে পেয়েছি।

ঃ শুনতে পেয়েছেন! কি শুনতে পেয়েছেন ?

ঃ ঘোড়ার পায়ের শব্দ। আপনি যে ঘোড়া ছুটিয়ে এই দিকে এলেন, আগে সেই শব্দ শুনতে পেয়েছি।

ঃ সে তো অনেকেই শুনতে পেয়েছেন। আপনি একা পাবেন কেন ?

ঃ আপনার পথ চেয়ে যে ঐ অনেকেই হা-পিত্তেস্ করে আছে, তাই ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনেই তারা ছুটে বেরুবে — কে এলো তাই দেখতে।

শরীফ রেজার দীলে সুবাসের পরশ লাগলো। তিনি সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন — আপনি বুঝি তাই ছিলেন ?

কনকলতা কোন রকম পুলকের মধ্যে ছিলেন না। শরীফ রেজার নিরাপদে ফিরে আসার প্রসঙ্গে তিনি ছিলেন উদ্বেগের মধ্যে। তিনি স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলেন —

ছিলামই তো। যেখানেই থাকি, কান আমার সবসময়ই খাড়া ছিল।

ঃ তাই নাকি ? তার কারণ ?

কনকলতা হতভম্ব হয়ে গেলেন। কিছুটা উষ্মার সাথে বললেন —আরে! এত বলছি, তবু আপনি বুঝতে পারছেন না কেন ? আপনাকে নিয়ে যারপর নেই চিন্তার মধ্যে ছিলাম আমরা। বড়বাপ যা বললেন, তাতে আমি তো রীতিমতো ভয় পেয়েই গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আপনাকে এই সময় সোনার গাঁয়ে

যাওয়ার উৎসাহ দিয়ে তিনি ভুল করেছেন মস্তবড়। এই যাওয়াই আপনার শেষ যাওয়াও হতে পারে। যে হিংস্র লোক ওরা, যদি একবার বুঝতে পারে, আপনি গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের পক্ষের লোক, তাহলে আর নিস্তার নেই। একদম খুন করেই ফেলতে পারে ওরা আপনাকে। বড়বাপের মুখে এসব কথা শুনার পর, কান খাড়া না রেখে আর নাক ডাকিয়ে ঘুমানো যায় ?

এবার শরীফ রেজা সত্যি সত্যিই অভিভূত হয়ে গেলেন। খানিক নীরব থেকে ইতস্ততঃ করে বললেন — আচ্ছা, আমার একটা কথার সঠিক জবাব দেবেন ?

ঃ সঠিক জবাব! জবাবটা আবার বেঠিক দিলাম কখন ?

ঃ না, আমি তা বলছিনে। বলছি, আমাকে তো সেবার ঐ একদিনেই দেখেছিলেন। তাও আবার প্রথমে না-খোশই ছিলেন আপনি আমার উপর। এর পরেই হঠাৎ আমার প্রতি আপনার এই অনুগ্রহ, একান্ত আপনজনের মতো এই সেবা—যত্ন—দরদ, আমাকে নিয়ে আপনার এই অতিশয় দুঃশ্চিন্তা — কি করে সম্ভব হলো এসব ?

ঃ তড়িৎ বেগে মাথাটা সোজা করলেন কনকলতা। সরাসরি দৃষ্টি ফেললেন শরীফ রেজার চোখের উপর। কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থাকার পর তিনি নজরটা ফের আস্তে আস্তে নামিয়ে নিলেন। এরপর নত মস্তকে হলেও স্বচ্ছ কণ্ঠে বললেন — হঠাৎই হবে কেন ? কত ভাবে জেনে নেয়ার পরেই না আপনাকে এত ভাল লেগেছে আমার! ভাল মানুষের সংখ্যা তো খুবই কম। তার উপর আপনার মতো মানুষ তো তালাশ করে দশটা পাওয়া যায় না। হঠাৎ যদি পাওয়াই গেল একটা মানুষ, তাঁকে কি কেউ অসম্মান করতে পারে ? না তাঁকে কেউ দরদ না করে পারে ? যেমন তেমনভাবে সে মানুষটা খতম হয়ে যাক, এটা চিন্তা করা যায় ?

ঃ আচ্ছা!

ঃ আপনি তো শুধু ভাল মানুষই নন, আপনার আরো কতগুণ! বাহাদুর, নির্ভীক, সৎ আর স্বাধীন-চেতা মানুষ আপনি। দেশের জন্যে জানটা আপনি যখন তখন দিতে পারেন। কয়টা আছে এমন লোক ? এমন লোকের প্রতি দরদ বা ভক্তিশ্রদ্ধা কার না দীলে পয়দা হয় ?

ঃ তাজ্জব! তা এই যে আমার এত শত গুণের কথা বলছেন, কোথায় পেলেন এসব ?

ঃ বড়বাপের কাছে। বড়বাপই তো বললেন — আপনি একজন মস্তবড় বাহাদুর। আপনার এই জিন্দেগীতে অনেক লড়াই লড়েছেন নাকি আপনি। সে লড়াইগুলো সব নাকি মারাত্মক লড়াই ছিল। সে সব লড়াইয়ে যে বীরত্ব দেখিয়েছেন আপনি, তার নাকি তুলনাই হয় না!

ঃ কিন্তু আমি যখন লড়েছি ফৌজদার সাহেব তখন তো আমার সাথে ছিলেন না বা তিনি দেখেনওনি লড়াই আমার। উনি ছিলেন বাঙ্গালা মুলুকের এই পূব প্রান্তে আর আমি লড়েছি ঐ পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে। আমার লড়াইগুলোর সব কথা, আমি বাহাদুর না বুজ্‌দীল — এসব কথা, উনি জানবেন কি করে ?

ঃ যানা মুখে শুনেছেন। ঐ সাতগাঁয়ের শায়খ হুজুরও বলেছেন। আপনার সততার আর বাহাদুরীর নাকি এন্‌তার তারিফ করেন ঐ শায়খ হুজুর। এর চেয়ে আর বড় প্রমাণ কি লাগে ?

ঃ তাই ?

ঃ তা ছাড়া বড়বাপের সাথে তো ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে আপনার। বড়বাপ নিজেও আপনার অনেক কথাই জানেন।

ঃ হ্যাঁ, তাতো জানেনই। ফৌজদার সাহেবের সাথে আমার ঢের দিনের পরিচয়। ঐ শায়খ হুজুরই প্রথমে পরিচয় করিয়ে দেন আমাদের।

ঃ তাহলে ? আপনি বীর, আপনি সৎ, আপনি ঈমানদার। কারো গোলামী করা পছন্দ করেন না আপনি। একটা মানুষের আর কত গুণ থাকলে তবে তাঁকে ভক্তি করে মানুষ ?

এমন সময় ঘরে ঢুকলো দবির খাঁ। সে এসে বললো — সাহাব, আপনি আপনার ঘোড়ার হাল দেখতে চাইলেন, যাবেন এখন সেখানে ? শরীফ রেজার ধ্যান ভঙ্গ হলো। তিনি থতমত করে বললেন — এ্যাঁ! তা-মানে — দবির খাঁ বললো — আপনার ঘোড়ার কথা বলছি। শরীফ রেজা কনকলতার মুখের দিকে তাকালেন। কনকলতা উৎসাহ দিয়ে বললেন — যান, নিজের জিনিসে নজর থাকা ভাল। আমি বসছি —

দবির খাঁর কথাই ঠিক। তাঁর হিসেবের সেই পরশুদিন সবেরাতেই ফিরে এলেন ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব। ভোর বেলায় এসে শরীফ রেজাকে দেখেই তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। শরীফ রেজা সহিসালামতে ফিরে আসায় দুঃশ্চিন্তা-মুক্তির প্রবল এক অভিব্যক্তি তাঁর মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। স্বস্থির এক বিপুল প্রবাহ তাঁর কথার মধ্যে উৎসারিত হতে লাগলো। এরপর হাত মুখ ধুয়ে এসে তিনি শান্তভাবে বসলেন এবং সোনার গাঁয়ের খবর শুনতে লাগলেন। শরীফ রেজার মুখে যখন শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে শিগ্‌গিরই ভুলুয়ায় আসার কথা শুনলেন, তখন খুশী ও হেফাজতির

আমেজে তিনি আল্লাহ তায়ালার পুনঃ পুনঃ শোকরগুজারী করতে লাগলেন। শরীফ রেজা একে একে সোনার গাঁয়ের তামাম অবস্থা তুলে ধরে শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের নসিহত ও হুঁশিয়ারী সবিস্তারে বয়ান করে শোনালেন। সেই সাথে লাল মোহাম্মদ লাড্ডু মিয়ার কথাও তিনি ফৌজদার সাহেবকে জানালেন। লাল মোহাম্মদ এখনও জীবিত এবং কর্তব্যপরায়ণ আছে শুনে ফৌজদার সাহেব তার ভূয়শী প্রশংসা করলেন এবং গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের লাশ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়ার কথা শুনে তিনি নিদারুন শোক প্রকাশ করলেন। অতপর খুঁটিনাটি অন্যান্য খবরাদি শ্রবণান্তে পরবর্তী পরিকল্পনা শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের ভুলুয়ায় আসার পর স্থির করবেন — এই সিদ্ধান্ত নিলেন এবং শায়খ হুজুরের তদবির আর খবর নেয়ার স্বার্থে শরীফ রেজার তাড়াতাড়ি সাতগাঁয়ে যাওয়ার প্রশ্নে তিনি এবারের মতো অধিক আপত্তি তুললেন না।

দু'একদিনের মধ্যেই শরীফ রেজা সাতগাঁয়ে রওনা হবেন — এই কথাই স্থির হলো। পরের দিন কথায় কথায় ফৌজদার সাহেবের মুখে যখন শরীফ রেজা জানলেন — ফৌজদার সাহেবের মকান থেকে ভুলুয়ার সদরের পথ দুর্গম কিছু নয়, বরং সোনার গাঁয়ের দিকে যাওয়ার পথের চেয়ে সে পথ অনেকটা উন্নত, তখন শরীফ রেজার খাহেশ হলো — অচিরেই যে ভুলুয়া তাঁদের একটা কেন্দ্রীয় স্থানে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে, সে ভুলুয়ার সদরটা তিনি এক নজর দেখে আসবেন সাতগাঁ যাওয়ার আগে। এ খায়েশ তাঁর আগে থেকেই ছিল। তদুপরি যখন জানলেন — এমন কোন দূর বা দুর্গম জায়গা নয়, শক্তিশালী অশ্ব হলে একবেলার মধ্যেই গিয়ে আবার ফিরে আসা যায় সেখান থেকে, তখন তাঁর সে আকাঙ্খা প্রবল হয়ে উঠলো। শরীফ রেজার এ উৎসাহে উৎসাহ দিলেন ফৌজদার সাহেবও। তিনি তাঁকে জানালেন — অবসর থাকলে ফৌজদার সাহেব নিজেই তাঁকে সঙ্গ দিতেন। কিন্তু কয়দিন তিনি অতিশয় ব্যস্ত আছেন বলে তা পারছেন না। শরীফ রেজা ইচ্ছে করলে, এখান থেকে যে কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন।

শরীফ রেজা দেখলেন — এটা তাঁর স্রেফ একটা আনন্দ সফর। নিজের খেয়াল খুশী মতো তিনি যেদিকে ইচ্ছে যাবেন, যখন ইচ্ছে ফিরবেন, এর মধ্যে আর লোক জড়িয়ে ঝামেলায় যাওয়া ঠিক নয়। এক দৌড়ে যাবেন আর এক দৌড়ে ফিরবেন — এমনই একটা ইরাদা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন শরীফ রেজা।

ফৌজদার সাহেবের বিবরণটা সম্পূর্ণ সত্য। পথটা খুবই ভাল। আর ভাল পথ বলেই আশাতীত কম সময়ে ভুলুয়ার সদরে এসে হাজির হলেন শরীফ রেজা। একটা ছোটখাটো শহর। বড় রকম গঞ্জও বলা চলে। সরকারী দপ্তরাদি যে এলাকায় অবস্থিত সেটা একটা শহরের রূপ নিয়েছে। এরপরেই ছেঁড়া ছেঁড়া

গঞ্জ মাফিক স্থান। দোকান—পাট, হাট—বাজার হেথা হোথা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। পাশেই একটা নদী থাকায় তেজারতির সুন্দর একটা মোকাম এটা। কিন্তু নদীটা কিঞ্চিৎ ফারাগে হওয়ায়, মূল শহর আর গঞ্জ—বাজার ছেঁড়া ছেঁড়া হয়েছে। শরীফ রেজা দেখলেন তেজারতির খাতিরে নৌকাযোগে, গো—শকটে, অশ্বপৃষ্ঠে এবং নেহায়েত পদব্রজেও দূর দূরান্তের চেনা অচেনা অনেক লোকেরই এই সদরে যাতায়াত। অকস্মাৎ রাজনৈতিক পরিবর্তনে সোনার গাঁয়ে যে ভীতি আর সতর্কতা বিদ্যমান, সোনার গাঁয়ের এলাকা ও শাসনভুক্ত হলেও ভুলুয়ায় সে উগ্রতা নেই। এখানে সবাই মোটামুটি খোলামেলা ও সহজভাবেই চলাফেরা করছে। অচেনা বা বহিরাগত লোকজনের চলাফেরার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। প্রশাসনিক দপ্তর কুঠির মধ্যে কিছুটা ফিশ্‌ফাশ্‌ বা সতর্কতা থাকলেও, অচেনা লোকের হদিস করার গরজ এখানে নেই বা তেজারতির মোকাম হিসাবে সে মওকাটাও নেই।

অশ্বটাকে পেশাদার এক অশ্ব রক্ষকের জিম্মায় রেখে শরীফ রেজা কিছুক্ষণ স্বচ্ছন্দে এদিক ওদিক বেড়ালেন। বন্দর—বাজার দেখলেন, সরকারী কুঠি—কামরার আশে পাশে ঘুরলেন এবং ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে ভুলুয়ার প্রশাসকের বাসভবনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। এই বাসভবনটা দেখার পরই ওয়াপস্‌ যাবেন আজ, এমনি একটা ধারণা। বাসভবনটা দেখে খানিক তাজ্জবই হলেন শরীফ রেজা। প্রশাসনিক ঐতিহ্যটা এখানেই। শহরটা ছোট হলেও বাসভবনটা ছোট নয়। রীতিমতো একটা ছোটখাটো প্রাসাদ। কারুকার্য, পরিকল্পনা—পরিবেশ — সবকিছুই মনোরম। বাসভবনের পাশে এসেই তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন — অনেক লোক ব্যস্ত হয়ে পরিচ্ছন্ন ভবনটির দেয়াল-মেঝে-আঙ্গিনাগুলো আরো অধিক পরিচ্ছন্ন করার কাজে ছুটোছুটি করছে। দেখেই তিনি বুঝলেন, নয়া প্রশাসক শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের এন্তেজারেই ঐ সাফা—অভিযান চলছে। পাশেই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করে জানলেন — অনুমান তাঁর ঠিক। বাসভবনে অন্যকোন প্রশাসক এখন নেই। সোনার গাঁয়ের বিশেষ এক ব্যক্তিত্ব শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব এখানে অচিরেই আসছেন।

কিছুক্ষণ দেখার পর ওয়াপস্‌ যাওয়ার উদ্যোগ করতেই তাঁর কানে এলো এক পরিচিত কণ্ঠস্বর — আরে! উস্তাদ নন? মানে শরীফ রেজা সাহেব?

চমকে উঠে শরীফ রেজা পেছন ফিরে তাকালেন। তাকিয়েই তিনি দেখলেন ইনসান আলী। তাঁর সমবয়সী সামরিক লোক ইনসান আলী। লাখ্‌নৌতির ফৌজে নকরী করার কালে সোনার গাঁয়ের যে সমস্ত ফৌজী লোকের সাথে তাঁর পত্র—পরিচয় ঘটে, ঘনিষ্ঠতা জন্মে, এই ইনসান আলীও তাদের মধ্যে একজন। শুধু একজনই নন, শরীফ রেজার দুর্লভ সামরিক পারদর্শিতায় মুগ্ধ ও অভিভূত

হয়ে শরীফ রেজার যে কয়জন কাছের লোক তাঁর পরমতম ভক্ত বা সাগ্‌রিদে পরিণত হন, এই ইনসান আলী তাঁদেরই একজন। এই ইনসান আলীর মতোই শরীফ রেজার অন্যান্য পরমতম ভক্তেরা সোনার গাঁয়ে কেউই খাতির করাতো দূরের কথা, চিনতেই চাননি শরীফ রেজাকে। এখানে আবার ইনসান আলী। ইনসান আলীটা অবশ্য একটু আলাদা কিসিমের ছিলেন। তবু বলা যায় না মানুষের মনের গতি! কখন যে কোন দিকে ঘোরে হদিস রাখে — সাধ্য কার!

ইনসান আলীকে এখানে দেখে বিস্মিত হলেন শরীফ রেজা। তিনি কিছু বলার আগেই ইনসান আলী দ্রুত পদে নিকটে এলেন এবং অতিশয় উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন —

হ্যাঁ, তাইতো! উস্তাদই তো! কি ব্যাপার উস্তাদ, আপনি হঠাৎ কোত্থেকে?

শরীফ রেজা ঘরপোড়া গরু। অধিক উৎসাহে না গিয়ে তিনি ঠাণ্ডা কণ্ঠে বললেন —

চিনতে পারছেন তাহলে?

ইনসান আলী আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন — সে কি উস্তাদ! চিনতে পারবো না মানে? আপনাকে চিনতে আমার ভুল হবে কেন?

ঃ না, অনেকেই আজকাল চিনতে পারে না কিনা?

ঃ তওবা—তওবা! অনেকের কথা জানিনে উস্তাদ। আপনাকে চিনতে ভুল হওয়া মানেই এই ইনসান আলীর ইনসান থেকে জানোয়ার হয়ে যাওয়া। এতটা আমার অধঃপতন ঘটেছে, এমন ধারণা হলো আপনার কি করে?

ইনসান আলীর চোখে মুখে বেদনা ফুটে উঠলো। শরীফ রেজা বললেন — না মানে —

বেদনাসিক্ত কণ্ঠে ফের ইনসান আলী বললেন — আমার প্রতি কি কারণে হঠাৎ এমন না—খোশ আছেন উস্তাদ, আমি তা জানিনে। তবে আল্লাহ সাক্ষী, আপনার সেই ইনসান আলী, ইনসান আলীই আছে উস্তাদ! আজও সে আপনার জন্যে জান দিতে তৈয়ার।

শরীফ রেজা অপ্রতিভ হলেন। না জেনেই হঠাৎ আর পাঁচজনের মতো ইনসান আলীকে চিন্তা করা ঠিক হয়নি তার! এই ভুল শুধরে নেয়ার জন্যে শরীফ রেজা নিজেই এবার হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ইনসান আলীকে এবং হাসতে হাসতে বললেন — আরে না—না, ও কিছু নয়। এমনই একটু বাজিয়ে নিলাম আপনাকে।

ইনসান আলীর মন কিছুটা হাল্‌কা হলেও তিনি ভারী কণ্ঠে বললেন — না উস্তাদ, এভাবে বাজিয়ে নেয়া উচিত হয়নি আপনার। আমার দীলে বড় চোট লেগেছে।

শরীফ রেজা আরো বেশী মুখর হয়ে বললেন — বলেন কি! তাই ? আরে দূর! এ নিয়ে আপনি এতটা পেরেশান হবেন, আমি তো তা ভাবতেই পারিনি। আচ্ছা বাবা, ভুল হয়েছে, মাফ করে দিন —

শরীফ রেজা ইনসান আলীর হাতের দিকে হাত বাড়ালেন। ইনসান আলী চমকে উঠে বললেন — আরে উস্তাদ, করেন কি — করেন কি! ঠিক আছে — ঠিক আছে, আমারই ভুল হয়েছে — মানে বুঝতে না পেরে আমিই বরং বেশী ভেবে ফেলেছি! তা যাক ওসব কথা এবার বলুন উস্তাদ, হঠাৎ আপনি এখানে ? এখানে আপনাকে দেখতে পাবো — এতো কল্পনাই করতে পারিনি আমি!

ঃ এদিকেই এক মফস্বলে এসেছিলাম। তাই ভাবলাম, ভুলুয়ার সদরটা একটু দেখেই যাই।

ঃ আচ্ছা। কবে এসেছেন তাহলে ?

ঃ কবে নয়, এই আজকেই। আপনি এখানে কবে থেকে ?

ঃ সেই থেকেই উস্তাদ। ঐযে আপনার ফৌজ থেকে ওয়াপস্ এলাম সোনার গাঁয়ে, তার কয়েকদিন পরেই ফের এখানে আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানের এক ছোটখাটো সৈন্য বাহিনীর দায়িত্বে আছি এখন।

ঃ বাহ্-বাহ্। খুব ভাল কথা। সেই থেকে আর তাহলে নড়েননি ?

ঃ না উস্তাদ। সোনার গাঁয়ের সব ঘটনাই শুনেছেন বোধহয় ইতিমধ্যে ?

ঃ হ্যাঁ, কিছু কিছু শুনেছি।

ইনসান আলীর মুখখানা ফের ভারী হলো। বললেন — আমার উপর হুকুম হলো হাঁকাও বাহিনী সোনার গাঁয়ে, হঠাও ব্যাটা গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরকে। আমার শরীরটাও তেমন ভাল ছিল না তখন। আর তাছাড়া উৎসাহও তেমন ছিল না। তাই অন্যের মাধ্যমে এখানকার উপস্থিত সেপাইদের নিয়ে গঠিত এক বাহিনী সেখানে গেল, বীমারীর মতো বিছানাতেই পড়ে রইলাম, আমি আর গেলাম না।

ঃ কেন-কেন ?

চকিতে এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে ইনসান আলী বললেন — সত্যিটা আপনাকে বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই। দু'দিন আগেই সেই যে দেশপ্রেম নিয়ে বাঘ সিংহ মারতাম আমরা, দু'দিন পরেই ফের উল্টোগীত গাই কি করে ?

ঃ ইনসান আলী সাহেব ?

ঃ যদিও নেমকের প্রশ্ন আছে একটা, কিন্তু ঈমানতো আমার তেমন মজবুত নয় উস্তাদ, তাই নেমকের দামটা পুরো দিতে পারলাম না।

ঃ কেন ?

ঃ বিবেক আমার সায় দিলো না উস্তাদ।

ঃ আচ্ছা।

ঃ গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের প্রতি প্রেম কিছু নেই আমার। কিন্তু দেশটাকে যখন আজাদ করতে চান তিনি তখন নেমকহারামী হবে বলে তাঁর পক্ষ নিতে না পারি, তাঁর বিপক্ষে লড়ার শক্তিটা হাতে আমার আসে কোত্থেকে বলুন ?

ঃ তাতো বুঝলাম। কিন্তু এসব কথা যে আমার কাছে বলছেন, আপনার ভয় নেই দীলে ?

ঃ এ্যাঁ! আপনাকে বলতে ভয় ?

— হো হো করে হেসে উঠলেন ইনসান আলী। ফের বললেন — না উস্তাদ, আপনাকে বলতে ভয় করবো কেন ? আপনার দ্বারা আমার কি কোন ক্ষতি হতে পারে যে ভয় করবো তাই ?

ঃ পারে না ?

ঃ আমি বিশ্বাস করিনে।

ঃ এমন বিশ্বাস অন্যখানেও প্রয়োগ করেন নাকি ?

ঃ উস্তাদ, আমি আপনাকে এত চিনি, আর আপনি আমাকে চিনলেন না ? বুকে পাথর মেরেও দুস্‌রা কেউ আর এসব কথা পাবে কখনও আমার কাছে ? জিন্দেগীভর কোশেশ করলেও নয়।

ঃ শাব্বাশ্!

ঃ না উস্তাদ, বাহবা পাওয়ারও তেমন একটা হকদার আমি নই। নকরীর জিঞ্জিরে যাদের হাত-পা বাঁধা, তাদের অনুভূতি আর লাশের নিদ্ এক জিনিস উস্তাদ। লাশের নিদ্ যেমন কোন দিনই ভাঙ্গে না, গোলামের অনুভূতিও তেমনই কোন কাজেই আসে না।

ঃ ইনসান আলী সাহেব!

ঃ তা যাক সে কথা। বলুন উস্তাদ, কোথায় আপনি উঠেছেন এখানে এসে ?

ঃ কোথাও উঠিনি। আজকেই ফিরে যাবো।

ঃ পাগল! তা যেতে চাইলেই যেতে দিলাম আমি ? এতদিন পরে দেখা —

ঃ না—না ভাই সাহেব, আমি এখন ব্যস্ত খুব।

ঃ আরে রাখেন উস্তাদ! জীবনে কোন্‌দিন ব্যস্ত আপনি থাকলেন না যে, আপনি ব্যস্ত বলে তা নিয়ে আমি ব্যস্ত হতে যাবো ? অশ্বটা কৈ আপনার ? না নৌপথে এসেছেন ?

ঃ না, অশ্ব নিয়েই। অশ্বটা বাজারে ঐ —

ঃ অশ্ব রক্ষকের জিম্মায় আছে ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ চলুন-চলুন —

ঃ মানে ?

ঃ অশ্বটা নিয়ে আমার মকানে যাবেন, চলুন —

ঃ না-না, তা কি করে হয় ?

ঃ হয় উস্তাদ, হয়। অনেক দিন পরে আপনাকে আমি পেয়েছি। কত কথা কত ব্যথা বুকে আমার জমা হয়ে আছে। আজ যখন হঠাৎই পেয়ে গেলাম আপনাকে, আর আমি ছাড়তে পারি ? সারারাত আজ শুধু গপ্প করবো। চলুন-চলুন —

ঃ কিন্তু —

ঃ আহা উস্তাদ, আপনি তো জানেনই, এরপর আর আমার হাত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় আপনার ? কোনদিন আমার আব্দার এড়িয়ে যেতে পারেননি আপনি। খামাখা কেন সময় নষ্ট করছেন ?

ঃ তা মানে —

ঃ যতখানি জরুরী ব্যাপার হলে হাল আমি ছেড়ে দেই, ততখানি জরুরী কোন ব্যাপার আপনি দেখাতে আমাকে পারবেন বলে আমি মনে করতে পারছিনে। কাজেই, অকারণে দীলে আমার চোট লাগাবেন কেন ?

অত্যন্ত আনন্দের সাথে শরীফ রেজা অনুভব করলেন, সেদিনের সেই ইনসান আলী আজও ঠিক ঐ ইনসান আলীই আছে। এতটুকুও বদলায়নি। সেই সাথে ভাবতে লাগলেন — তাঁর ঐ সোনার গাঁয়ের দোস্তরাও ইনসান, আবার এই ইনসান আলীও ইনসান। ইনসান এরা সবাই। অথচ ফারাগটা কি বিশাল!

আপত্তি তুলে যে ফায়দা বেশী হবে না, এটা বুঝতে পারলেন শরীফ রেজা। কাজেই অধিক দ্বন্দ্বে গেলেন না। ইনসান আলীর মেহমানদারী খোশদীলে কবুল করে, তাঁর পিছে পিছে হাঁটতে লাগলেন।

ইনসান আলী বিপত্নীক। প্রায় কৈশোরেই তার স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। আম্মা আর এক ছোট ভাই নিয়ে তাঁর সংসার। ঝি-চাকরের উপরেই তিনি নির্ভরশীল। তবু ইনসান আলীর আতিথেয়তার আধিক্যে শরীফ রেজা রীতিমতো পেরেশান হয়ে গেলেন। এর উপর আবার শুরু হলো গুরু—শিষ্যের গপ্প। গপ্পের পর গপ্প। শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবকে নিয়েও উভয়ের মধ্যে অনেক কথা হলো। এতে করে গপ্পের মধ্যেই কেটে গেল অনেক রাত। ফলে, ফজরের নামাজ পড়েও আবার ঘুমুতে হলো তাঁদের। ঘুম থেকে উঠলেন যখন, তখন বেলা অনেক।

তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লেন শরীফ রেজা। নিশি যাপন করবেন এখানে— এমন কোন আভাসই তিনি ফৌজদার সহেবের মকানে কাউকে দেননি। এ নিয়ে তাঁরা চিন্তায় আছেন নিশ্চয়ই। শরীফ রেজাকে কিছুপথ এগিয়ে দেয়ার ইরাদায় আর একটি অশ্ব নিয়ে ইনসান আলীও বেরুলেন। দুই অশ্ব ছুটতে লাগলো পাশাপাশি।

কিয়ৎ পথ পেরিয়ে এসে এক গ্রামের মধ্যে ঢুকতেই সামনের এক বাড়ীতে বিপুল হৈ চৈ দেখে অশ্বের লাগাম টেনে ধরলেন দুইজন। যে বাড়ীতে গোলমাল হচ্ছে, পথটা তার পাশ দিয়েই। এঁরা দুইজন সেখানে এসে থামতেই সংগে সংগে কয়েক জন মুরুব্বী কিসিমের লোক রাস্তায় ছুটে এলেন। ভুলুয়ারই প্রজা এঁরা। ইনসান আলীকে এঁরা সবাই চেনেন। এদেরই একজন মস্তবড় উপরওয়ালা এই ইনসান আলী সাহেব। মুরুব্বীরা এসেই সালাম দিয়ে বললেন — হুজুর, আমরা একটা মস্তবড় ফ্যাসাদে পড়ে গেছি। কিছুতেই মিট্‌মাট্ করতে পারছিনে। আপনি যখন উপস্থিত, তখন মেহেরবানী করে বিচারটা আপনিই করে দিয়ে যান হুজুর। কয়েক লহমার ব্যাপার। সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে যেটা আপনি ন্যায্য মনে করবেন, সেই হুকুমটা দিয়েই আপনি চলে যাবেন, আপনার রাস্তা খাটো করবো না।

মুরুব্বীরা অতিশয় মিনতি করতে লাগলেন। ফলে, ইনসান আলী আর তা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। শরীফ রেজাকে সাথে নিয়েই সেই বাড়ীর উপর উঠে এলেন। এসেই তাঁরা দেখলেন, দুই দলের গোলমাল। একপাশে এক বরকে নিয়ে একদল এবং অপর পাশে এক বধুকে নিয়ে আর এক দল গোলমালে লিপ্ত হয়েছে। বর-বধু দুইজনেরই বয়স খুবই কম। বরটাকে একেবারে বালক বলা না গেলেও, বধুটিকে বালিকা বলাই যায়। দুই কিশোর কিশোরীর ব্যাপার। গোলমালটা এই বিয়ে নিয়ে।

ঘটনার বিবরণ ঃ— বালিকার এটা মামার বাড়ী। মামার বাড়ীতে কয়দিন আগে বেড়াতে আসে বালিকা। ইতিমধ্যে এই ছেলেটাকে পছন্দ হওয়ায় মেয়ের মামা এদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। খবর পেয়ে মেয়ের বাপের বাড়ীর লোকজন হৈ হৈ করে ছুটে এসে বর পক্ষের লোকের সাথে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ বিয়ে তাঁরা মানেন না। বংশে তাঁরা উচু। একজন সাধারণ ঘরের ছেলের সাথে তাঁদের মেয়ের বিয়ে হোক, এটা কল্পনাও তাঁরা করেন না। ইনসান আলী সাহেব আরো অবাক হয়ে দেখলেন—সবার চেয়ে অধিক মুখরা দুলহিনের আম্মাজান। ভদ্রমহিলা এই নিয়ে খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। দুলাহ্ পক্ষের লোকজনদের তটস্থ করে তুলেছেন। দুলাহ—দুলহীনের শাদী ইতিমধ্যেই বিধিমতে কবুল করানো হয়েছে। এই গায়ের মুরুব্বীরা এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না। রাত থেকে এ পর্যন্ত চলছেই এই গণ্ডোগোল।

ইনসান আলী দুলহীনের আম্মাজানকে ডেকে বললেন — এ শাদী মেনে নিতে চান না আপনি ?

আপত্তির ঝড় তুলে ভদ্রমহিলা বললেন —না–না, কক্‌খনো না, কিছুতেই না।

ঃ শাদীটা যে হয়ে গেছে ?

ঃ তা হোক, আমি মানি না।

ঃ কেন ?

ঃ মেয়ে আমার নাবালিকা। মেয়ের বাপ না থাকলেও আমি আছি। আমার মতামত ছাড়া এ শাদী জায়েয নয়। এটা আমি মানিনে।

ঃ মেয়ে তো আপনার একেবারেই বালিকা নয়, মোটামুটি বোঝার জ্ঞান তার হয়েছে। সে যে কবুল করেছে এ শাদী ?

ঃ করুক, তবু আমি মানি না।

ঃ আপনার মেয়েও কি মানে না ?

ঃ তা মানতেই সে পারে না। কক্‌খনো না।

ঃ তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছেন ?

ঃ দেখতে হবে কি ? আমার মেয়েকে চিনিনা আমি ? এ বিয়ে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

ঃ কেন ?

ঃ তার মামাটা যে জোর করেই দিয়ে দিয়েছে এ বিয়ে!

ঃ সত্যি বলছেন ?

ঃ দেখুন-দেখুন, নিজেই আপনি মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন — এ বিয়ে সে কক্‌খনো স্বীকার করে নাকি ? আমার কখনও অবাধ্য হতে পারে সে ?

ঃ যদি স্বীকার করে ?

ঃ বলছিই তো, তা করতেই সে পারে না।

ঃ ঠিক আছে, আমি তাহলে জিজ্ঞাসা করেই দেখি —

দুলহীনের দিকে অগ্রসর হলেন ইনসান আলী। এই ফাঁকে একবার তিনি বরের দিকে তাকালেন। বরটার মুখ দেখে তাঁর মনে হলো — খুনের আসামীবৎ মুখখানা তার শুকিয়ে গেছে। গাঁ–ভরা লোকের সামনে কি রায় তার বিবাহিতা পত্নী এখন দেয়, মুখ তার উজ্জ্বল করে, না দুনিয়ার তামাম কালী তার মুখে এনে ঢেলে দেয় — এই চিন্তায় মুখে যে তার তামাম রক্ত উঠে গেছে, এটা বুঝতে ইনসান আলীকে বেগ পেতে হলো না।

ইনসান আলী এগিয়ে এসে মেয়েটিকে প্রশ্ন করলেন — বিয়ে তোমাদের হোয়েছে ?

মেয়েটির মাথাটা আরো খানিকটা নীচু হলো। কোন উত্তর সে দিলো না।

ইনসান আলী আবার বললেন— বলোনা বোন, লজ্জার কি আছে ? যেটা সত্যি সেইটে তুমি বলবে।

মেয়েটি এবার অল্প একটু নড়ে চড়ে উঠলো। তা দেখে ইনসান আলী উৎসাহ দিয়ে বললেন— বলো বলো, বিয়ে তোমাদের হয়েছে ?

ঃ মাথাটা একটু কাত করে মেয়েটা এবার বললো — জি।

ঃ এ বিয়ে তুমি স্বীকার করো ?

সম্মতি সূচকভাবে ঘাড়খানা ফের কাত করে সে বললো — জি।

ঃ ছেলেকে তুমি স্বামী বলে স্বীকার করো ?

শরমে এবার মেয়েটি জড়োসড়ো হয়ে গেল। এর জবাব সে দিলো না। তাকিদ দিয়ে পুনরায় ইনসান আলী বললেন — বলো-বলো, তোমার জবাবের উপর সবকিছু নির্ভর করছে। তোমার তো চুপ থাকলে চলছে না।

মেয়েটি এবার স্পষ্টভাবে বললো — জি, করি।

ইনসান আলী পুলকিত হয়ে বললেন — ছেলেটির সাথে তোমার কি আগে থেকেই পরিচয় ছিল ?

ঃ জি-না।

ঃ দেখেছো তাকে কখনও ?

ঃ জি-না।

ঃ তা হলে ?

ঃ মামা তো দেখেই বিয়ে দিয়েছেন।

ঃ তাতেই তুমি স্বীকার করো।

ঃ না করলে তো আবার আমাকে বিয়ে দেবে অন্যখানে। একটা মানুষের কয়বার করে বিয়ে হয় ?

বিপুলবেগে চীৎকার করে ইনসান আলী বললেন — শাব্বাশ্!

সেই ফাঁকে আবার তিনি নজর দিলেন বরের দিকে। দেখলেন, দুনিয়ার তামাম আলো ভিড় করে এসে দুলাহ মিয়ার মুখমণ্ডলে লুটোপুটি খাচ্ছে।

মেয়েটির জবাব শুনে সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। ইনসান আলী রায় দিলেন — এই বিয়েই কায়েমী বিয়ে। যে ব্যক্তি না করবে, তার গর্দান নিয়ে টানাটানি শুরু হবে — হুঁশিয়ার —

রাজ আদেশ অমান্য করে সাধ্য কার। নত মস্তকে সকলেই তা মেনে নিলেন। সমাধান হলো সমস্যার। অবসান হলো গণ্ডোগোলের।

শরীফ রেজাকে নিয়ে ফের রাস্তায় নেমে এসে ইনসান আলী সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন— আচ্ছা উস্তাদ, বিচার আমার ঠিক হলো না ভুল হলো — এ নিয়ে তো ওখানে কোন কথাই বললেন না ? বরং এদিকে কান না দিয়ে ঐ বরটার মুখের দিকেই তাকিয়ে রইলেন এক নজরে। ব্যাপার কি ?

শরীফ রেজা অত্যন্ত উদাস কণ্ঠে বললেন — মুখের দিকে নয় ভাই সাহেব, আমি চেয়ে ছিলাম ঐ বরটির কপালের দিকে।

ঃ কপালের দিকে!

ঃ হ্যাঁ, দেখছিলাম — তার কপালের কোথাও কাটা-ফাটা আছে কিনা।

ঃ কাটা–ফাটা!

ঃ আমার কপালটা কাটাতো। তাই দেখলাম, ও বেচারার কপালটা ফের কি রকম।

হো হো করে হেসে উঠলেন ইনসান আলী। বললেন, কি যে বলেন উস্তাদ, কাটার একটা দাগ আপনার কপালে আছে বলেই সবার কপাল কাটা হবে — এটা কোন কথা হলো ?

ঐ একই রকম উদাস কণ্ঠে শরীফ রেজা বললেন — তা ঠিক তা ঠিক।

ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের বাহির আঙ্গিনায় শরীফ রেজার ঘোড়া এসে পৌঁছতেই আঙ্গিনায় ছুটে এলেন কনকলতা। রীতিমতো অভিযোগ এনে কনকলতা বললেন — কি রকম লোক আপনি বলুনতো ? সবাইকে এভাবে ভাবিয়ে মারার অর্থ কি ?

শরীফ রেজা হেসে বললেন — কেন, কি হলো ?

ঃ আপনি যে কাল আসবেন না, সে কথা তো বলে যাবেন ?

ঃ হ্যাঁ, বলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা বলে যাইনি বলেই এমন কি হয়েছে ?

কনকলতার দুইচোখে আগুন জ্বলে উঠলো। তিনি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন — আরে! কি হয়েছে মানে ? ভুলুয়ার সদরটাতো আপনার শ্বশুরবাড়ী নয়। ওটাও ঐ দুষমনদের একটা ডেরা। ঐ বাহরাম খানের গোলামেরাই রাজত্ব করে সেখানে। গিয়েই আপনি হাওয়া হয়ে গেলেন। আমরা সবাই নিশ্চিন্ত থাকি কি করে ?

ঃ না, ব্যাপারটা হলো —

ঃ বড়বাপ আপনাকে দুই একজন লোক নিয়ে যেতে বললেন — তাও আপনি শুনেননি। একা একাই বেরিয়ে গেলেন গোঁয়ার্তুমী করে। না! আপনার শুভাশুভ নিয়ে আপনার যেসব আপনজনেরা ভাবেন, তাঁদের মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই। সত্যিই একটা মস্তবড় বেয়াড়া লোক আপনি!

ইতিমধ্যে আরো দু'একজন চাকর-নফর বেরিয়ে এলো। সবশেষে ফৌজদার সাহেবও বেরিয়ে এলেন বাহির আঙ্গিনায়। তিনিও এসে ঐ একই রকম উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। শরীফ রেজা নত মস্তকে সব অভিযোগ মেনে নিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তা দেখে কনকলতা ফের বললেন—আচ্ছা লোক আপনি যা হোক! এরপরও হাসি থাকে আপনার মুখে ? আসুন-আসুন, খাওয়া-বশ্রাম কোথায় কি হয়েছে, কে জানে। আর বাহাদুরী করে কাজ নেই। তাড়াতাড়ি গোছলটা সেরে নিন।

ফৌজদার সাহেব বললেন — ঠিক — ঠিক। তুমি যাও, ঘোড়ার ব্যবস্থা দেখছি আমরা —

বলেই তিনি একজন উপস্থিত নফরকে হুকুম করলেন — মুইজুদ্দীন, সহিসটাকে আসতে বলো —

আহার বিশ্রাম অন্তে সেদিনই ভুলুয়ার খবর নিয়ে কথাবার্তা যা কিছু তামামই শেষ হলো। পরের দিন প্রত্যুষেই শরীফ রেজা সাতগাঁয়ে রওনা হওয়ার উদ্দেশ্যে তৈয়ার হয়ে গেলেন। কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার প্রাক্কালে কক্ষে এলেন কনকলতা। শরীফ রেজা বিস্মিত হয়ে দেখলেন — কনকলতার সদা প্রফুল্ল মুখমণ্ডল হঠাৎ করে অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে, চলাফেরার গতিতে স্থবিরতা এসেছে, আবেগ-উচ্ছ্বাস মিলিয়ে গেছে বিলকুল। কনকলতা এসে ধীর কণ্ঠে বললেন — কবে নাগাদ আবার আপনি আসছেন এখানে ?

শরীফ রেজা বললেন — সেটা তো সঠিক করে বলার উপায় নেই, তবে যথাসম্ভব সত্বরই ফিরে আসবো আবার।

এরপর লহমা খানেক চুপ করে থেকে কনকলতা পুনরায় ধীর কণ্ঠে বললেন — অনেক বেয়াদপী আর ছেলেমানুষী করে ফেলেছি আপনার সাথে। এসবের কোন কসুর দীলে নিয়ে যাচ্ছেন নাতো ?

শরীফ রেজা অনুতাপের সুরে বললেন — তওবা-তওবা। এসব কথা বলবেন না। আপনার এই সেবাযত্ন আর আন্তরিকতায় আমার দীলটা যে কতখানি তাজা হয়ে উঠেছে, তা আমি বোঝাতে আপনাকে পারবো না। আসলে, আপনার মতো এত দীল খোলা আর দরদপূর্ণ সাহচর্য কোন মেয়েছেলের আর কখনও পাইনি তো! তাই, এটা আমার জিন্দেগীতে একটা মনোরম আর স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকছে। কসুর নেয়ার প্রশ্নই এখানে উঠে না।

শরীফ রেজার মুখের দিকে স্থির নয়নে চেয়ে থেকে কনকলতা বললেন — কোন মেয়েছেলের সেবাযত্ন জীবনে কখনও পাননি ?

ঃ জি-না। সে কিসমত আমার হয়নি।

ঃ আপনার মা—বোনেরাও ভালতো যত্ন নেয় না আপনার ?

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস চেপে শরীফ রেজা বললেন — আমার তো মা–বাপ ভাই–বোন কেউ নেই।

কনকলতার দুই চোখ প্রসারিত হলো। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন — কেউ নেই ?

ঃ জি-না।

ঃ একদম এতিম ?

ঃ জি।

আর এক পোঁজ কালী পড়লো কনকলতার মুখ মণ্ডলে। তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন — এই রকমই হয়। কেন যেন বেশীর ভাগ ভাল লোকেরাই এ দুনিয়ায় দুঃখের বোঝা টানেন!

পরিবেশটা চাঙ্গা করে তোলার জন্যে শরীফ রেজা হাসিমুখে বললেন — আরে না না। ও নিয়ে দীলে আমার দুঃখ কিছু নেই। আল্লাহ তায়ালা যখন যাকে যেভাবে রাখেন, সেইটেই উত্তম বলে মনে করি আমি।

কনকলতার দীল এতে চাঙ্গা কিছু হলো কিনা, কিছুই বোঝা গেল না। তিনি শরীফ রেজার মুখের দিকে নিষ্পলক নয়নে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এরপর আগের মতোই ধীর কণ্ঠে বললেন — কয়দিন ধরেই একটা কথা বলি বলি করে বলা হয়নি আমার। আজ সেটা বলতে চাই।

ঃ জি বলুন- বলুন।

ঃ আপনার কপালের ঐ যে ঐ ছোট কাটা দাগটা — ওটা কি কোন লড়াই কালে কাটা, না বাল্য কালে অন্যভাবে কেটেছে ?

ঃ কেন, হঠাৎ এ প্রশ্ন করছেন কেন ?

সচকিত হয়ে শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন। কনকলতা ঘাব্‌ড়ে গিয়ে ইতস্ততঃ করে বললেন — না, মানে — অন্য কিছু নয়। চাঁদের কলংকের মতো আপনার এই সুন্দর মুখে ঐ দাগ আর একটা আলাদা বিশেষত্ব কিনা, তাই বলছি। কাটাটা খুব বড় নয়। যখন কেটে গেল তখনই ভাল কিছু দাওয়াই লাগালেই ও দাগ মিলিয়ে যেতো। এখন বুঝতে পারছি, মা–বাপ কেউ না থাকার কারণেই সঙ্গে সঙ্গে ওটার যত্ন নেয়া হয়নি।

আবার হাসলেন শরীফ রেজা। বললেন — আরে, মা–বাপ থাকলেই বা কি হতো ? এ কাটা লড়াইকালে কাটা। যারা লড়াই করে তাদের গায়ে এমন কত ক্ষত চিহ্ন থাকে। মা–বাপ থাকলেও বাড়ীতে তাঁরা থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে যত্ন নিতে লড়াইয়ের ময়দানে আসবেন কখন তাঁরা ?

কনকলতা কি একটু ভাবলেন। তারপর ফের প্রশ্ন করলেন — লড়াইকালে কাটা ?

শরীফ রেজা উদাস হলেন। জবাব দিলেন — হ্যাঁ।

ঃ সে লড়াইটা জব্বোর লড়াই ছিল বুঝি ?

ঃ জ্বি-না, ছোট্ট লড়াই।

ঃ ছোট্ট লড়াই ? তাহলে সে লড়াইয়ে জয়লাভও আপনার অতি সহজেই হয়েছিল, না কি বলেন ?

ঃ জ্বি ?

সে লড়াইয়ে জয়ীতো নিশ্চয়ই হয়েছিলেন ?

শরীফ রেজা আরো অধিক উদাস হলেন। বললেন — না।

ঃ সে কি ! জয় হয়নি ?

ঃ না, পরাজয় হয়েছে।

ঃ পরাজয় ?

ঃ আমার জিন্দেগীর চরমতম পরাজয়।

ঃ বলেন কি! লড়াই বলছেন ছোট, আর পরাজয় চরমতম!

শরীফ রেজার বুক ফেঁড়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। তিনি শূন্যের পানে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ। এতবড় পরাজয় আর আমার জিন্দেগীতে কখনও আসেনি। এতবড় চোটও দীলে আর কখনও লাগেনি। এতবড় কলংকও নয়।

কনকলতা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন — বড় আফসোস। সৈন্যসামন্ত সবই তাহলে খতম হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারছি। ভাগ্যে আপনার জানের উপর হাত পড়েনি।

এমন সময় এক নওকর এসে বারান্দার নিচে দাঁড়ালো। ওখান থেকেই সে উচ্চকণ্ঠে বললো — হুজুর, ঘোড়া আপনার তৈয়ার। আমাদের হুজুরের বাহির আঙ্গিনায় আনা হয়েছে। আমাদের হুজুর সেখানে এন্তেজারে আছেন। আপনার কি বের হতে দেরী হবে ?

শরীফ রেজা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ব্যস্তকণ্ঠে বললেন — না–না, আমি আসছি, এক্ষুণি!

সঙ্গে সঙ্গে শরীফ রেজা কক্ষ থেকে বেরুলেন। কনকলতাও বেরিয়ে এলেন পিছে পিছে। বারান্দায় এসে শরীফ রেজা থামলেন এবং পাশ ফিরে কনকলতাকে বেদনাসিক্ত হাসি মুখে বললেন — আসি তাহলে। আপনিও কোন কসুর নেবেন না আমার। আল্লাহ হাফেজ।

শরীফ রেজা ব্যস্তপদে বারান্দার নিচে নেমে গেলেন। কনকলতা নিশ্চলপদে ওখানেই একটু দাঁড়িয়ে ফের দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেন বাহির আঙ্গিনার দিকে।

৫

সাতগাঁর দিকে ছুটে চলেছে শরীফ রেজার অশ্ব। ছুটছেন শরীফ রেজা উদাস দীলে ভাবছেন — কনকলতা তাঁর কপালের এই কাটা দাগের হদিস নিতে চান! জানতে চান তাঁর জিন্দেগীর সেই চরমতম লজ্জার কথা। তাঁর এই জিন্দেগী যে স্রেফ একটা শূন্য পাত্র — স্বাদ-গন্ধহীন নিরর্থক এক অস্তিত্ব, কত চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিয়ে কেবলই তিনি চরম এক শূন্যতার দিকে এগুচ্ছেন — কয়জন জানেন সেসব কথা আর কাকেই বা বলবেন তিনি এসব। আউল-বাউল দীলে নানা কথা ভাবতে ভাবতে ক্রমেই তিনি হারিয়ে গেলেন সুদূর এক অতীতে এবং ক্রমেই এসে দাঁড়ালেন অতীতের বিশাল এক প্রেক্ষাপটের সামনে ঃ

লাখ্নৌতির তখতে তখন গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের পিতা সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুয শাহ অধিষ্ঠিত। শামসউদ্দীন ফিরুয শাহ তামাম বাঙ্গালা জুড়ে বখতিয়ারের ছোট রাজ্য প্রসারিত করলেন। তাঁর এই রাজ্য বিস্তার প্রক্রিয়ার সাথে দুইজন বিশিষ্ট সুফীর নাম জড়িত। এঁদের একজন শ্রীহট্ট বা সিলেটের হজরত শাহ জালাল, অন্যজন সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁয়ের শায়খ শাহ শফীউদ্দীন।

হযরত শাহ্ জালাল তিনশত তেরজন শিস্য নিয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর তুরস্কের কুনিয়া শহর থেকে বাঙ্গালা মুলুকে আসেন। তিনি প্রথমে বাঙ্গালা মুলুকের সাতগাঁয়ে আসেন এবং সেখান থেকে শ্রীহট্টে গমন করেন। এই সময় শ্রীহট্টের এক নিরিবিলি এলাকায় বুরহানউদ্দীন নামক এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান তাঁর পুত্রের জন্ম উপলক্ষে গরু জবেহ করলে চিলের মুখে একখন্ড গোমাংস শ্রীহট্ট রাজ গৌরগোবিন্দের মন্দিরে গিয়ে পড়ে। এতে গৌরগোবিন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে বুরহানউদ্দীনের ডান হাত কেটে দেন এবং তার পুত্রকে হত্যা করেন। বুরহানউদ্দীন বাঙ্গালার সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুয শাহের শরণাপন্ন হলে, সুলতান তার ভাগিনেয় সিকান্দর গাজীকে সসৈন্যে শ্রীহট্টে প্রেরণ করেন এবং রাজা গৌরগোবিন্দের সাথে লড়াই চলতে থাকে। প্রথমদিকে অবশ্য সিকান্দর গাজী দুই দুইবার ব্যর্থ হন। হযরত শাহ জালাল সিকান্দর গাজীর সাথে এই লড়াইয়ে এই সময় এসে যোগ দেন এবং প্রকাশ্য লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। সৈয়দ নাসিরউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি হজরত শাহ জালালের

শিস্যদের সিপাহসালার নিযুক্ত হন। অতপর গৌরগোবিন্দ পরাজিত হয়ে পলায়ন করলে শ্রীহট্ট মুসলমানদের অধিকারে আসে এবং বাঙ্গালার সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুয শাহর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দরবেশ শাহ শফীউদ্দীন বা শায়খ শাহ শফীও এই সময় সাতগাঁয়ে ইসলাম প্রচারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বরখুরদারের লোক ছিলেন এবং পানিপথ কর্নালের বিখ্যাত দরবেশ বু-আলী কলন্দরের শিস্য ছিলেন। বাঙ্গালা মুলুকের সাতগাঁয়ে এসে দরবেশ শাহ শফী পাণ্ডব রাজা নামক এক সামন্ত রাজার রাজ্যের পাশে মোকাম স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। শ্রীহট্টে বা সিলেটের মতোই এই পাণ্ডব রাজ্যে বসবাসকারী এক মুসলমান গরু জবেহ্ করলে পাণ্ডব রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে সেই মুসলমানকে হত্যা করেন। শুধু তাই নয়, তার প্রতিবেশী অন্যান্য মুসলমানদের বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে দিয়ে তাদেরও তিনি রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। এই বিতাড়িত ও নির্যাতিত মুসলমানগণ শায়খ শাহ শফীর শরণাপন্ন হলে, শিস্য-মুরিদ সহকারে শায়খ শাহ শফী এই জুলুমের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ান এবং সেই থেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। অতপর এই এলাকার মুসলমানদের উপর হিন্দু রাজাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি একটি জঙ্গী দল গড়ে তোলেন এবং দল নিয়ে মজলুমদের রক্ষায় নানা স্থানে জেহাদ করে বেড়াতে থাকেন।

দল নিয়ে এমনইভাবে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার পথে শায়খ শাহ শফী একদিন কিছুটা দূর থেকে দেখতে পেলেন — একটা পাড়ার মধ্যে ঢোকার মুখে পথের উপর লড়াই হচ্ছে। এক পক্ষে আট দশজন সশস্ত্র সেপাই, অন্য পক্ষে বিশ পঁচিশ জন বেসামরিক লোক। ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো বিভিন্ন বয়সের গ্রামবাসী লোকের এক শৃংখলাহীন দল। এই গ্রামবাসীরা বাঁশ, লাঠি, খুন্তি, কুড়াল নিয়ে শিক্ষিত ও সশস্ত্র সেপাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে শুধু হৈচৈ ও ছুটোছুটি করছে। শায়খ সাহেব সদলবলে এগিয়ে এলেন। মাঝে কিছু গাছ-গাছড়া আর ঝোপঝাড়। ফলে, লড়াইরত লোকেরা শায়খ সাহেবদের কাউকেই দেখতে পেলো না। ঘটনাস্থলের নিকটে এসে এক ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে শায়খ সাহেব দেখলেন — যে কয়জন লড়ছে তার চেয়ে অনেক গুণে বেশী লোক পাড়াটার এদিক ওদিক দিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। দশ বারো বছরের এক বালক লাঠি হাতে লড়ছে আর চিৎকার করে পলায়মান লোকদের লড়াইয়ে এসে শরীক হতে ডাকছে। কিন্তু কেউ তারা আসছে না। দেখলেন —

এই বেসামরিক লড়াইয়াদের সুবিধাদী লোকেরা লড়াই থেকে ক্রমেই কেটে পড়ছে দেখে অন্যান্য লড়ায়েরাও হতাশ হয়ে ইতস্ততঃ করতে করতে এক সময় সকলেই হুড় হুড় করে পেছন দিকে দৌড় দিয়ে লড়াই ফেলে পালিয়ে গেল।

সঙ্গী-সাথি সহকারে শায়খ সাহেব তাজ্জব হয়ে দেখলেন — সকলেই পালিয়ে গেল কিন্তু ঐ বালকটি পালালো না। সবাইকে ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে আবার ফিরে এসে লাঠি হাতে দাঁড়ালো এবং পাড়ার মধ্যে সেপাইদের অনুপ্রবেশ রোধ করার কোশেশ করতে লাগলো। কিন্তু দশ-বারোজন সশস্ত্র সেপাইকে ঐ একটা শিশু কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না বা পারছেও না। শায়খ সাহেব এটা যেমন লক্ষ্য করলেন, তেমনি আরো তাজ্জব হয়ে লক্ষ্য করলেন ছেলেটির দুর্বার সাহস ও অদ্ভুত রণকৌশল। ক্ষিপ্ত ও ক্রোধোন্মত্ত সেপাইরা তাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আটক করতে পারছে না। তাকে ঘিরে ধরার চেষ্টা করতেই সে ক্ষিপ্রবেগে বেরিয়ে আসছে আবেষ্টনীর বাইরে এবং ঘুরে ফিরে এসে তাদের অগ্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।

নিমিষে কয়েক এ দৃশ্য অবাক হয়ে দেখতেই শায়খ সাহেবের খেয়াল হলো এ অবস্থা অধিকক্ষণ আর চলতে দেয়া যায় না। দুশমনদের বর্শা বল্লমের নিশানা যতই সে কায়দা করে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হোক, এ অবস্থা অধিক স্থায়ী হলে যে কোন মুহূর্তে ঐ এলোপাতাড়ি বর্শা বল্লমের একটা না একটা তার বক্ষভেদ করবেই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এসে সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেপাইদের উপর এবং পলক কয়েকের মধ্যেই বেঁধে ফেললেন সবাইকে।

হতভম্ব বালকটি এক পাশে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলো এবং অকস্মাৎ এমন মদদ কোথা থেকে এলো একথা ভাবছিল। দুশমনদের বেঁধে একপাশে বসিয়ে রেখে শায়খ শাহ শফী সাহেব বালকটির দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি তাকে হাত ইশারায় ডাকতেই বালকটি তাঁর কাছে চলে এলো। শায়খ সাহেব লহমাখানেক বালকটির সুদর্শন চেহারার প্রতি এক নজরে চেয়ে রইলেন। এরপর প্রশ্ন করলেন — তোমার নাম ?

বালকটি নির্ভয়ে জবাব দিল — শরীফ রেজা।

ঃ ওয়ালেদের নাম ?

ঃ সাদিক রেজা।

ঃ এই গাঁয়েই মকান তোমার ?

ঃ জ্বি না। মকান আমার লাখ্‌নৌতিতে।

ঃ লাখ্‌নৌতিতে!

ঃ জ্বি। এখানে আমি বেড়াতে এসেছি।

ঃ আচ্ছা। তা এই সেপাই — এরা কারা ?

ঃ পাণ্ডব রাজার সেপাই।

ঃ পাণ্ডব রাজার ?

ঃ জি। এই ছোট্ট পাড়াটার তামাম লোকই মুসলমান। এরা এই পাড়াটা লুট করতে এসেছিল।

ঃ বলো কি!

ঃ এই আশেপাশের গাঁগুলিতে হেথা হোথা আরো কিছু মুসলমান আছে। এসব সেপাইরা প্রায়ই এসে সেসব বাড়ী লুট করে। জেনানাদের উপরও এরা হামলা করে শুনেছি। শায়খ সাহেবের দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো। তিনি সক্রোধে বললেন, বটে! সবসময়ই করে এরা এসব ?

সাহস পেয়ে এদিক ওদিক থেকে ছোট বড় সব কিসিমের লোক দু'একজন করে এসে জড়ো হতে লাগলো। তাদের মধ্যে থেকে এক বৃদ্ধ মুসলমান সামনে এসে সালাম দিয়ে বললেন — ও ছেলে এটা বলতে পারবে না হুজুর, আমি বলছি। এসব সেপাইদের অত্যাচার আগে এতটা ছিল না। রাজার লোকেরা আমাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলেও, এতটা জুলুম এর আগে তেমন করেনি। এখন এই অত্যাচার বেড়ে গেছে খুব।

শায়খ সাহেব বললেন — আচ্ছা!

বৃদ্ধটি ফের বললেন — ইদানিং আবার শুনছি — আমাদের এই পাণ্ডব রাজা কোন মুসলমানকেই তার রাজ্যে আর বসত করতে দেবে না। মেরে পিটে তুলে দেবে সব।

কারণটা শায়খ সাহেব নিজেই জানেন। ঐ গরু জবেহর পর থেকেই এই চিন্তা রাজার মাথায় ঢুকেছে। এ ছাড়া এখন এ অঞ্চলের সব রাজারাই জোট বাঁধছে ক্রমেই। শুধু এই এলাকা থেকেই মুসলমানদের উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা মাথায় এঁদের নেই, লাখ্‌নৌতির মুসলমান শাসনটাই এঁরা উৎখাত করতে ইচ্ছুক। এসব নিয়ে বৃদ্ধের সাথে আলোচনায় না গিয়ে তিনি উপস্থিত জনতার দিকে ইঙ্গিত করে বৃদ্ধকে ফের বললেন, এতলোক এখানে আপনারা থাকতে, এই একটিমাত্র বালক এই জালিমদের প্রতিরোধ করতে লাগলো আর জোয়ান লোকেরা এভাবে পালিয়ে গেল কেন ? এ রকম ভীরু আর কমজোর হলেতো মেরেপিটে তুলে আপনাদের দেবেই। শক্তের ভক্ত এ দুনিয়া। শক্ত হয়ে দাঁড়ান

একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ান এই জুলুমের বিরুদ্ধে, দেখবেন কেউ আর আপনাদের ধারে কাছে আসছে না।

বৃদ্ধটি সমর্থন দিয়ে বললেন — তা ঠিক, তা ঠিক। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। গায়ে আর জোর পাইনে। ঐ ছেলেটার ডাক শুনে আমি সবাইকে এত করে বললাম, পালাও কেন তোমরা? একটা শিশুর যে সাহস আছে তাও তোমাদের নেই? ছেলেটার মতো রুখে দাঁড়াও সবাই। ঐ কয়টা সেপাই বেগতিক দেখলেই ওরা দৌড় দেবে। কিন্তু তামামই বুজদীল হুজুর, আমার কথা কেউ কানে তুললে না। আর এতে করে প্রমাণ হয়ে গেল — ঐ একটা মাত্র বাচ্চা ছাড়া বাহাদুর বলতে এতগুলো লোকের মধ্যে আর একজনও নেই।

শায়খ সাহেবও এই প্রসঙ্গেই এলেন। বললেন, কে এই ছেলেটা?

ঃ আমার ভাতিজার এক আত্মীয়ের সাথে এসেছে হুজুর। বাড়ী এর গৌড়ে, মানে লাখনৌতিতে।

ঃ লাখনৌতিতে কোথায়?

ঃ সদরেই হুজুর। খুব সৎ বংশের ছেলে। কিন্তু এক্ষণে এতিম।

ঃ কি রকম?

বৃদ্ধটি বর্ণনা দিলেন — শরীফ রেজার পিতা সাদিক রেজা লাখনৌতির একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান। অত্যন্ত সৎ, জ্ঞানবান আর সাহসী লোক হিসেবে লাখনৌতি শহরে তাঁর খুব নাম ডাক। লাখনৌতির দরবারেও তাঁর কদর ছিল খুব। কিন্তু নসীবগুণে এই শরীফ রেজার মাতা-পিতা দুইজনই পর পর ইন্তেকাল করেছেন। পিতার সে একমাত্র সন্তান। পিতার একটা মস্তবড় মকান থাকা সত্ত্বেও ঠিকানাবিহীনভাবে আত্মীয়স্বজন রিস্তেদারের বাড়ীতে থেকে মানুষ হচ্ছে শরীফ রেজা। এখন আবার কোন রিস্তেদারের বাড়ীতেও বেশী থাকে না। অন্যের বাড়ীতেই অধিক দিন তার কাটে। তার মকানটা ফাঁকা পেয়ে তার এক নাম-কা-ওয়াস্তে রিস্তেদার বালবাচ্চা নিয়ে উঠে পড়েছে সেখানে এবং এখনও সে-ই সেখানে আছে।

শায়খ সাহেব প্রশ্ন করলেন — আপনারাও কি তার রিস্তেদার?

ঃ জিনা হুজুর। শরীফ আমাদের কেউ নয়। শরীফ এখন লাখনৌতিতে যে বাড়ীতে থাকে, সে বাড়ীর পাশেই সেখানে আমার ভাতিজার একঘর আত্মীয় বাস করে। তারা অবশ্য গরীব মানুষ। তবু তাদের সাথে এই শরীফ রেজার খুব ভাব। খুব খায়-খাতির। তাদের সাথেই কয়দিন আগে শরীফ এখানে বেড়াতে এসেছে। এসেই এই অবস্থা।

শায়খ সাহেব ভাবতে লাগলেন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন — গড়ে

তুললে ছেলেটি ইস্পাতের চেয়েও ধারালো এক অস্ত্র হয়ে গড়ে উঠবে এবং দেশ ও কওমের প্রভুত খেদমত করতে পারবে। অথচ কাণ্ডারীহীন কিস্তির মতো সে এইভাবে ভেসে বেড়ালে, ঐ বিশাল সম্ভাবনাটি বিলকুলই নসাৎ হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করেই দরবেশ শাহ্ শফীউদ্দীন সাহেব শরীফ রেজাকে প্রশ্ন করলেন — আমি যদি তোমাকে আমার মোকামে নিয়ে যাই, যাবে তুমি আমার সাথে?

শরীফ রেজা একপলক অবাক হয়ে শায়খ সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এরপর সে বললো — আপনি! আপনি কে?

জবাবে শায়খ সাহেব হাসিমুখে বললেন — আমি শাহ্ শফীউদ্দীন। সবাই বলে দরবেশ শাহ্ শফীউদ্দীন। এইতো এই পাণ্ডব রাজার এলাকার পাশেই মোকাম আমার।

বৃদ্ধটি এবার সালাম দিয়ে বিপুল বিস্ময়ে বললেন, বলেন কি হুজুর। আপনিই সেই বিখ্যাত দরবেশ?

সালাম নিয়ে শায়খ সাহেব বললেন — বিখ্যাত কিছুই নই। আমি একজন দ্বীনের খাদেম।

এরপর আবার তিনি শরীফ রেজাকে প্রশ্ন করলেন — যাবে আমার মোকামে? শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন — কি হয় ওখানে?

শায়খ সাহেব উৎসাহ দিয়ে বললেন — অনেক অনেক। এলেম শিক্ষা দেয়া হয়, লড়াই শেখানো হয়, দ্বীন ইসলামের জ্ঞান বিতরণ করা হয়, মজলুমের জুলুম লাঘব করার জন্যে দল ধরে বেরুতে হয় আরো অনেক কিছু হয়।

শরীফ রেজার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো — এত কিছু হয় ওখানে?

ঃ হয়ইতো!

ঃ যা বললেন, তামামই!

ঃ তামামই।

ঃ আমি গেলে তামামই শিখতে পারবো?

ঃ তামামই শিখতে পারবে। যাবে তুমি?

ঃ জি জি। নিয়ে গেলে এখনই যাবো।

শরীফ রেজা অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠলো। তার চোখমুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু পরক্ষনেই হঠাৎ আবার তার মুখমণ্ডলের তামাম আলো দপ করে নিভে গেল। সে হতাশ কণ্ঠে বললো — কিন্তু —

ঃ কিন্তু কি ?

ঃ আমার সাথে তো পয়সা কড়ি নেই তেমন, ওখানে গিয়ে —

শায়খ সাহেব হেসে উঠলেন। হাসি মুখে বললেন, আরে না না ওখানে থাকতে পয়সা কড়ি লাগে না। আমি তো রাখবো তোমাকে। এলেম শিক্ষা দেবো। সব খরচ আমার।

শরীফ রেজা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বললো — আপনার! মানে সব খরচ —

ঃ হ্যাঁ, আমার।

ঃ সত্যিই আমাকে নিয়ে যাবেন ?

ঃ সত্যিই।

ঃ আজই ?

ঃ গেলে আজই। কিন্তু তুমি কি আজই যেতে পারবে?

ঃ কেন, পারবো না কেন ?

ঃ কাউকে তোমার বলতে হবে না ?

ঃ কাকে বলবো ? আমার কেউ নেই যে ?

ঃ লাখ্নৌতিতে যে বাড়ীতে থাকতে —

ঃ তাঁরা তো আমার নিজের কেউ নন। তাঁরা আমাকে খাতির করেন, তাই আমি থাকি।

এ ছাড়া ওখানেইতো বরাবর থাকিনে আমি, এই কিছুদিন হলো আছি।

ঃ তাহলে ?

ঃ আমি এখানে যাঁদের সাথে এসেছি, তাঁরাই লাখ্নৌতিতে ওয়াপস্ গিয়ে তাঁদের বলে দেবেন — আমি আপনার কাছে আছি।

ঃ তাহলেই হবে ?

আবার ঐ বৃদ্ধটি কথা বললেন — কেন হবে না হুজুর ? যত উঁচু ঘরের ছেলেই ও হোক, ওর অভিভাবক তো কেউ নেই। ও-ই ওর অভিভাবক। সবাই ওকে ভালবাসে, আর তাই ও যে বাড়ীতে যায়, তারাই ওকে রাখে। যতদূর আমি শুনলাম, এইভাবে ভেসে বেড়ানোর কারণে ওর এলেম শিক্ষাও ঠিক মতো হচ্ছে না। আপনি ওকে আশ্রয় দিলে, সেটা তো ওর জন্যে একটা মস্তবড় খোশ কিসমতি হুজুর।

ঃ তাহলে আপনিও অনুমতি দিচ্ছেন একে নিয়ে যাওয়ার ?

ঃ অনুমতি দেয়ার আমি কেউ নই হুজুর। তবে যেটা ওর জন্যে ভাল, তা আমি বলবো না কেন ? আপনি ওকে নিয়ে যান হুজুর। আমার ঐ ভাতিজার আত্মীয়েরা লাখ্নৌতিতে ফিরে গিয়ে খবরটা ওর শুভাকাংক্ষীদের জানালেই চলবে।

ঃ আলহামদু লিল্লাহ।

সেই দিনই শায়খ শাহ্ শফীউদ্দীন শরীফ রেজাকে তাঁর মোকাম বা আস্তানাতে নিয়ে এলেন এবং নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে তাকে এলেম ও অস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগলেন। শরীফ রেজাও অত্যন্ত আগ্রহ আর বিস্ময়কর সাফল্যের সাথে উভয় এলেম গ্রহণ করতে লাগলেন।

দিন কাটতে লাগলো।

বালক থেকে কিশোর, কিশোর থেকে এসে শরীফ রেজা এখন যৌবনের মুক্তদ্বারে পদার্পণ করছেন। তিনি এখন পোক্ত একজন আলেম আর শক্ত একজন লড়াইয়া। শায়খ শাহ্ শফীউদ্দীন সাহেবের লোকলস্কর ও সেপাই এখন অনেক। অনেকগুণে অধিক ব্যস্ত তিনি এখন। বহুত গুণে বেড়ে গেছে তাঁর জেহাদ। হরওয়াক্ত তাঁকে এখন ময়দানেই ছুটতে হয়। হাজার গুণে বেড়ে গেছে হিন্দু রাজাদের অত্যাচার। পাণ্ডব রাজা, মাননৃপতি, ভূদেব নৃপতি, বংশীরাজ ও অন্যান্য সামন্ত রাজারা উড়িষ্যার গঙ্গ বংশীয় রাজা ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য হিন্দুশক্তির শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ইসলামের উৎখাতে উঠে পড়ে লেগেছেন। সাতগাঁ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী কোন মুসলমান আর এদের নৃশংসতায় টিকে থাকতে পারছে না। এদের সাথে হামলা করছেন ঐ গঙ্গ বংশীয় রাজারা নিজেরাও। তাঁরা সাতগাঁয়ে প্রবেশ করে হুংকার ছেড়ে ফিরছেন। শায়খ শাহ্ শফী একা আর কিছুতেই সামাল দিতে পারছেন না। একদিক সামলাতেই অন্যদিকে হাহাকার পড়ে যাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত ঐ সম্মিলিত হিন্দুরাজাদের শক্তিকে একা তিনি এঁটে উঠতেও পারছেন না। তিনি লাখ্নৌতির সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুয শাহর নিকট কাসেদ প্রেরণ করলেন।

ইখ্তিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর লাখ্নৌতি রাজ্য এ পর্যন্ত অনেকটা বিহার ও বরেন্দ্র অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাঢ় অঞ্চলে তেমন একটা ঢুকেইনি এখন তক। শামসউদ্দীন ফিরুয শাহের পূর্ববর্তী সুলতান কাইকাউসের আমলেই সবেমাত্র রাজ্য বিস্তার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুয শাহ্ মসনদে উঠেই এই প্রক্রিয়া মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেন। সাতগাঁ বিজয়ের উদ্দেশ্যে তিনি ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং শায়খ শাহ্ শফীর কাসেদের মুখে তামাম বৃত্তান্ত শুনে তিনি দুধর্ষ্য সেনাপতি ও প্রসিদ্ধ আলেম জাফর খান গাজীকে সসৈন্যে সাতগাঁয়ে প্রেরণ করেন। সেই সাথে দরবেশ শাহ্ শফীকে তিনি জাফর খান গাজী সাহেবের সাথে সংযুক্ত হয়ে এক জোটে কাজ করার অনুরোধ করে পাঠান।

পূর্ববর্তী সুলতান কাইকাউসের আমলে এবং কাইকাউসের উৎসাহেই সেনাপতি জাফর খান গাজী সাহেব ত্রিবেণী জয়ে অগ্রসর হন এবং পরবর্তী সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুয শাহের সহায়তায় ত্রিবেণী জয় সমাপ্ত করে সেখানে এক মাদ্রাসা স্থাপন করেন ও বিখ্যাত বীর আর প্রখ্যাত পণ্ডিত বা আলেম রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। একজন বীর ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসাবে জাফর খানের পূর্ব পরিচয় ছিল। এবার ত্রিবেণীর ময়দানে হিন্দুরাজাদের বিশাল বাহিনী পরাজিত করে নিরংকুশ জয় অর্জন করায় এবং শহীদ না হয়ে জীবিত থাকায় সে এলাকার লোকজন তাঁর নামের সাথে গাজী উপাধি যোগ করে, এবং অচিরেই তিনি জাফর খান গাজীরূপে সুপরিচিত হন।

সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুয শাহের আদেশে ত্রিবেনী বিজয়ী বীর জাফর খান গাজী সসৈন্যে এসে সপ্তগ্রামে হাজির হলে শায়খ শাহ শফীও তাঁর লোক লস্কর নিয়ে এসে জাফর খান গাজী সাহেবের ফৌজের সাথে সামিল হন। শায়খ শাহ শফীর পেছনে এই দরবেশ বাহিনীর নেতৃত্বে যিনি দাঁড়ান, তিনি শরীফ রেজা। ইতিমধ্যেই শায়খ সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে হিন্দু হামলার বিরুদ্ধে নানা লড়াইয়ে লড়ে শরীফ রেজা অসামান্য তারিফ হাসিল করেছেন।

সাতগাঁয়ের এক ময়দানেই শুরু হলো লড়াই। লাখনৌতির মুসলিম শাসন উৎখাত করতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যাঁরা, সাতগাঁও ফের মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হোক, এটা তাঁরা কল্পনা করতেও পারেন না। ফলে এক বা একাধিক সামন্ত রাজা নয়, উড়িষ্যার গঙ্গ বংশীয় রাজাদের সাথে অন্যান্য তামাম হিন্দুশক্তি ও সামন্ত রাজগণ একজোটে ছুটে এসে মুসলমান সৈন্যদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেলেন। সংখ্যায় তাঁরা অনেক। তাঁদের সম্মিলিত সৈন্য মুসলিম সৈন্যের চেয়ে কমছে কম পাঁচ ছয় গুণে অধিক। বাঙ্গালামুলুকে মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করার হিন্দু রাজাদের এইটেই সর্বশেষ প্রচেষ্টা। ফলে সাতগাঁয়ের যুদ্ধ অচিন্তনীয়ভাবে এক ভীষণতর যুদ্ধে রূপান্তরিত হলো। সাতগাঁয়ের ময়দান বাঙ্গালা মুলুকে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক ময়দানে পরিণত হলো। বিশাল ও জমাট বাঁধা পর্বত শ্রেণীর মতো মাঠ জুড়ে দাঁড়িয়ে দুশমনদের কাতার — সীমাহীন সংখ্যাহীন। তার বিরুদ্ধে লড়ছে মুসলমানদের ক্ষুদ্রকায় এক বাহিনী। বিখ্যাত যোদ্ধা জাফর খান গাজী এবং আংশিকভাবে শাহ শফীও খানিকটে টলমলে হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ লড়েও তাঁরা বিশেষ কিছু সুবিধে করতে পারলেন না। হতাশাটাই বাড়তে লাগলো ক্রমে।

এমতাবস্থায় দুই জন তরুণের অসামান্য বীরত্ব, অসাধারণ সাহস ও অদম্য উদ্যোগ আচানকভাবে ঘুরিয়ে দিলো যুদ্ধের গতি। তাঁদের বিস্ময়কর পদক্ষেপ ও কার্যকলাপ আকস্মিকভাবে ফিরিয়ে আনলো মুসলিম সেনাপতিদের মনোবল। তাদের প্রেরণা মুসলমান সৈন্যদের দুর্বার করে তুললো। এই দুইজন তরুণের একজন জাফর খানের আওলাদ উলুগ জিয়া খান এবং অন্যজন শরীফ রেজা।

শরীফ রেজার তুলনায় উলুগ জিয়া খান বয়সে বেশ বড়। পুরোপুরি যুবক তিনি। শরীফ রেজা বলতে গেলে তখনও কিশোর। যৌবনের দুয়ারে উঁকি দিচ্ছেন সবেমাত্র। বয়েসের ফারাগটা অনেকখানি লক্ষণীয় হলেও লড়াইয়ের ময়দানে নেমে ইতিমধ্যেই এই দুইয়ের মাঝে চরম এক সমঝোতা ও সেই সুবাদে হৃদ্যতা পয়দা হয়েছে। উভয়েই তারা মরিয়া। নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে উভয়েই এ লড়াইয়ে শত্রু বাহিনীর দুই প্রান্তে একযোগে এমন কঠিন ও দুনির্বার আঘাত হানতে লাগলেন যে, দুশমন বাহিনীর দুই কিনারে অচিরেই আতংক দেখা দিলো এবং মাঝখানে লড়াইরত দুশমনেরা এ নিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলো। শত্রুবাহিনীর কাতারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সম্মুখ লড়াইয়ে এ লিপ্ত ছিলেন জাফর খান গাজী সাহেব, শায়খ শাহ শফী সাহেব ও অন্যান্য মুসলমান সালারেরা। দুশমনদের মাঝে এই অস্থিরতা পয়দা হওয়ায় সবাই তাঁরা বিপুলভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং তাঁদের সেপাইদের মাঝে এক অদম্য প্রেরণা এবং দুরন্ত এক উৎসাহ দেখা দিল। সবাই তাঁরা এক সাথে "আল্লাহু আকবর আওয়াজ" দিয়ে দুশমনদের উপর নব উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুশমনেরা হকচকিয়ে গেল এবং প্রকাণ্ড ময়দান ভর্তি বেশুমার দুশমনের দুর্ভেদ্য পাহাড় অকস্মাৎ কেঁপে উঠলো ভিত সমেত। উভয় প্রান্তে তখনও জয়োল্লাসে হাঁকছে ঐ দুই তরুণের সেপাইরা। মাঝখানে এই বাঘের থাবা। দুশমনেরা পিছু হটতে লাগলো।

দুশমনদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ার সাথে সাথে মুসলমানদের মনোবল দশগুণে বেড়ে গেল। মুসলমানদের এক একটা সেপাই এবার এক একটা লৌহদণ্ডবৎ এই ফাটল ধরা পাহাড়ে আঘাত হানতে লাগলো। ভেঙ্গে পড়লো পাহাড়। ময়দান ফেলে দুশমনেরা সদলবলে পালিয়ে গিয়ে ঠাঁই নিলো অরণ্যে।

পয়লা ও প্রবল ধাক্কা শেষ হলো। পরবর্তীতে যে লড়াই শুরু হলো, সে লড়াইয়ে শরীফ রেজা এবং তাঁর দেখাদেখি পরক্ষণে উলুগ জিয়া খানও যে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন এক কথায় তা অনন্য। সম্মুখ লড়াই শেষ হতেই

ক্ষিপ্র বেগে খণ্ড হামলা চালিয়ে পশ্চাদপদ দুশমনদের এমনভাবে ছত্রভঙ্গ করে রাখলেন তাঁরা এবং বিনা বিরামে অহর্নিশ এমনইভাবে এই ক্ষিপ্র হামলায় নিয়োজিত রইলেন তাঁরা, যা দেখে তাবড় তাবড় সালারসহ জাফর খান গাজী ও শাহ শফী নিজেও তাক লেগে গেলেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, দুরন্ত এই হামলার ফলে দুশমনেরা আর কিছুতেই এক হতে পারছে না। তাঁরাও আর এ সুযোগের অপচয় করলেন না। দুশমনদের আর জোট বাঁধার কোন মওকা না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও ধাওয়া করলেন দুশমনদের এবং খুঁজে খুঁজে ঐ ছত্রভঙ্গ অবস্থাতেই দুশমনদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হলো। উড়তে লাগলো লাখ্‌নৌতির রাষ্ট্রীয় পতাকার সাথে দ্বীন ইসলামের নিশান।

সাতগাঁয়ে মুসলমানদের নতুন এক প্রশাসনিক দপ্তর খোলা হলো এবং সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুয শাহের আদেশে জাফর খান গাজী সাতগাঁয়ের ওয়ালী বা শাসনকর্তার পদে নিয়োজিত হলেন। ওয়ালী পদে নিযুক্ত হয়েই জাফর খান গাজী এবার নজর দিলেন সামন্ত রাজাদের দিকে। পাণ্ডব রাজা ইতিমধ্যেই পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। ছিলেন দূরবর্তী রাজারা। উড়িষ্যা বা উৎকলের কাছাকাছি উৎকলের কয়েকটি সামন্ত রাজা, যাঁরা সাতগাঁয়ের ময়দানে জান বাঁচাতে পেরেছিলেন, তাঁরা নিজরাজ্যে ফিরে এসে পূর্ববৎ রাজ্য চালনা করছিলেন। এঁদের মধ্যে মাননৃপতি ও ভূদেব নৃপতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাননৃপতির রাজ্য কিছুটা সামনে কিন্তু ভূদেব নৃপতির রাজ্যটা আরো খানিক ভেতরে। অপার মন্দার বা হুগলি জেলার মধ্যে। তাঁরা তখনও মুসলমানদের উৎখাত করার আশা পোষণ করছিলেন এবং মুসলমান প্রজাদের উপর পূর্ববৎ জুলুম চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

জাফর খান গাজী তাঁর বাহিনী নিয়ে প্রথমে মাননৃপতির রাজ্যে এসে হানা দিলেন। তাঁর সাথে পূর্ববৎ শরীফ রেজা সহকারে শাহ শফীও ছিলেন। জাফর খান গাজীর ছেলে উলুগ জিয়া খানতো ছিলেনই। উলুগ জিয়া খান আগে থেকেই সহকারী সালার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাতগাঁ জয়ের পর তিনি পুরোপুরি সালারের পদ পেলেন এবং শরীফ রেজা, সরকারী নকরীভুক্ত না হলেও, জাফর খান গাজী তাঁকে মর্যাদায় সমঅবস্থান দান করলেন। শায়খ শাহ শফী তাঁকে দরবেশ বাহিনীর পুরোপুরি সালারের দায়িত্ব দিয়ে নিজে রইলেন দরবেশ বাহিনীর উপদেষ্টার ভূমিকায়।

সবাইকে নিয়ে এসে জাফর খান গাজী মাননৃপতির প্রাসাদসহ সদর এলাকা ঘিরে ফেললেন। রাজা হিসাবে মাননৃপতি তেমন কোন বিরাট রাজা ছিলেন না। তিনি ছিলেন বড় একজন জমিদার বা জমিদার শ্রেণীর রাজা। ফলে এই সম্মিলিত আক্রমণের সামনে মাননৃপতি বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারলেন না। তিনি দেখলেন, যে শক্তিকে সবাই মিলে পরাভূত করা যায়নি, সে শক্তির বিরোধিতা করা নেহাত নির্বুদ্ধিতা। তাই অল্প কিছু লড়েই তিনি আত্মসমর্পণ করলেন এবং খানিকটা নিজের ও পরিবারের ইষ্ট কামনা করে এবং খানিকটা ইসলামের নীতি আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইনাম স্বরূপ জাফর খান গাজী নামমাত্র কর প্রদানের শর্তে তাঁর রাজ্য ঐশ্বর্য তামামই তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন।

মাননৃপতির পাত্রমিত্র ও কর্মচারীদের অনেকেই ইসলাম কবুল করলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গের প্রায় সকলেই ইসলাম কবুল করলেন। করলেন না তাঁর রানী। মাননৃপতির মহিষী হিরামতি দেবী এক কট্টোরপন্থী ব্রাহ্মনের কন্যা ছিলেন। ধর্মমতে পিতার মতো তিনিও ছিলেন গোঁড়া। তাই তিনি কিছুতেই ইসলাম কবুল করলেন না। রাজা তাঁকে অনেকভাবে বোঝালেন। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল হয়ে রইলেন। শুধু তাই নয়, নিজে তো ইসলাম কবুল করলেনই না, তাঁর বালিকা কন্যাকেও মুসলমান হতে দিলেন না। সর্বোপরি, মুসলমানদের সংস্রব থেকে দূরে থাকার নিমিত্তে সেদিনই তিনি রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে কন্যাসহ প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেলেন এবং তাঁদেরই আত্মীয় ভূদেব নৃপতির প্রাসাদে এসে আশ্রয় নিলেন। মাননৃপতির প্রাসাদ থেকে পালিয়ে আসার কালে তাঁর সঙ্গে এলো এক দাসী আর দুই দারোয়ান। পথের নিরাপত্তা বিধানে তাঁর কয়েকজন অন্যান্য শুভাকাংক্ষীরাও গোপনে সাহায্য করলেন তাঁকে।

মাননৃপতির রাজ্য জয়ের পর জাফর খান গাজী আরো কয়েকটি সামন্ত রাজ্য জয় করলেন। এ সমস্ত বিজয় অত্যন্ত সহজে ও অবহেলে সম্পন্ন হতে লাগলো। হাজির হওয়ার সাথে সাথেই ভয়ে প্রতিপক্ষ হয় আত্মসমর্পণ নয় সর্বস্ব ফেলে পলায়ন করতে লাগলো। এতে করে সতর্ক হয়ে অভিযান করার গুরুত্ব জাফর খান গাজীর কাছে ক্রমেই গৌণ হয়ে যেতে লাগলো। পরবর্তীকালে তিনি একেবারেই মুষ্টিমেয় সেনাসৈন্য নিয়ে এদিক ওদিক রাজা জমিদারদের পরাভূত করতে লাগলেন। সুফী শাহ শফীকে তো নয়ই, এমন কি তাঁর ছেলে উলুগ জিয়া খানকেও আর সঙ্গে রাখার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাঁদের উপর সাতগাঁয়ের হেফাজতি

ফেলে রেখে তিনি খেলে বেড়ানোর ভঙ্গিতে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সাতগাঁয়ের চার পাশের এলাকাগুলো শত্রুমুক্ত করতে লাগলেন। এমনইভাবে একদিন তিনি হাজির হলেন ভূদেব রাজার রাজ্যে এবং ভূদেব রাজার প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু ভূদেব রাজা বা ভূদেব নৃপতির রাজ্য অনেক বড় রাজ্য। অনেক তার সৈন্য বল। রণকৌশল ও সামরিক পারদর্শিতার দিক দিয়েও ভূদেব নৃপতির ফৌজের খ্যাতি আছে অনেক। এসব কোন খোঁজখবর না নিয়েই জাফর খান গাজী সাহেব একেবারেই প্রস্তুতিহীন অবস্থায় ভূদেব নৃপতির রাজ্যে এসে হানা দিলেন। তবু হয়তো বিপর্যয় কিছু আসতো না, যদি চোখ কান খাড়া রেখে অগ্রসর হতেন তিনি। কিন্তু মাননৃপতির ও অন্যান্য সামন্ত রাজদের শক্তি সাহস দেখে ভূদেব নৃপতির শক্তিকেও একেবারেই তুচ্ছ জ্ঞান করে তিনি পরিকল্পনাহীন ও ঢিলেঢালাভাবে অপরিচিত এলাকায় অচেনা শক্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে লাগলেন। হয়তো নিতান্তই অদৃষ্টলিপির কারণে তাঁর মতো বিখ্যাত এক রণবিশারদ এই কিসিমের ছেলে মানুষী করে বসলেন। জীবনে এই প্রথম তিনি শত্রুকে তুচ্ছজ্ঞানে অবহেলা করলেন, আর এইটেই তাঁর জিন্দেগীর শেষ ভ্রান্তি হয়ে রইলো।

ভূদেব নৃপতি সম্মুখ যুদ্ধে এলেন না। রাজধানী থেকে পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে জাফর খান গাজীর সামনে তামাম পথ ফাঁকা করে রেখে ভূদেব নৃপতি সসৈন্যে এসে এক জঙ্গলাকীর্ণ সরু রাস্তার দুই পাশে ওৎ পেতে রইলেন। জাফর খান গাজী সসৈন্যে ঐ মরণ ফাঁদে পা দেয়ার সাথে সাথে দুইদিক থেকে অতর্কিতে ভূদেব নৃপতি চড়াও হলেন তাঁদের উপর। শুরু হলো যুদ্ধ। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় থেকেও জাফর খান গাজী সাহেব বীরত্বের সাথে লড়তে লাগলেন। কিন্তু অকস্মাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে অদৃশ্য ও বিষাক্ত এক তীর এসে তাঁর বক্ষ ভেদ করলে তিনি অশ্ব থেকে পড়ে গেলেন এবং কয়েক লহমার মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর সেপাইরা তাকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে রণভঙ্গ দিলেন এবং তাঁর লাশ নিয়ে শত্রুর চক্ষু এড়িয়ে পালিয়ে গেলেন ত্রিবেণীর দিকে।

জাফর খান গাজীর ইন্তেকালের খবর যখন লাখ্‌নৌতিতে এসে পৌছলো তখন বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো প্রথমে সবাই হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, পরে শোকে অভিভূত হয়ে গেলেন এবং সবশেষে ক্রোধে সবাই উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। লাশের সৎকার করে এসেই পিতৃহত্যার বদলা নেয়ার আক্রোশে উলুগ জিয়া খান তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠলেন অশ্বের পিঠে। কিন্তু

অশ্বের লাগাম টেনে ধরলেন শরীফ রেজা। যে ভুল তাঁর বহুদর্শী ওয়ালেদ জাফর খান গাজী করে গেলেন, পুত্র জিয়া খান ফের সেই ভুলই করুক, এটা কেউ চাইলেন না। সবাই বললেন — বিখ্যাত বীর জাফর খান গাজী নিহত হলেন যেখানে, সেখানে ঝোঁকের মাথায় এমনি হাল্কাভাবে অগ্রসর হওয়া আদৌ সমীচিন নয়। দেখেশুনে বুঝেসুঝে তবেই এগুনো বেহতর। শায়খ শাহ শফী বললেন — ইন্নাল্লাহা মাআ- চ্ছাবেরীন।

সবুর তাঁকে করতেই হলো। সাতগাঁয়ের প্রশাসনিক শূন্যতা পূরণ হওয়ার আগে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব তাঁর হলো না। জাফর খান গাজীর মৃত্যুর খবর লাখ্‌নৌতিতে পৌছলে লাখ্‌নৌতির সুলতানও শোকাভিভূত হলেন এবং সাতগাঁয়ের ওয়ালী পদে জাফর খান গাজীর পুত্র উলুগ জিয়া বা জিয়াউদ্দীন খানকে নিযুক্তি দান করলেন। সাতগাঁয়ের ওয়ালী হয়ে বসেই উলুগ জিয়া খান তাঁর দোস্ত ও অনুজপ্রতীম শরীফ রেজাকে সাতগাঁয়ের ফৌজে সালার হিসাবে যোগ দেয়ার বিশেষ অনুরোধ করলেন। কিন্তু পরম উপকারী ও মহাপূণ্যবান দরবেশকে ছেড়ে এসে নকরী গ্রহণ করার কথা শরীফ রেজা চিন্তাই করতে পারলেন না। তিনি পূর্ববৎ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব সবসময়ই ফৌজ চালনা করার ব্যাপারে রাজী হলেন এবং শায়খ শাহ শফীও আগের মতোই লোকলস্কর নিয়ে সাথে সাথেই থাকবেন বলে উলুগ জিয়া খানকে ভরসা দিলেন।

প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন করতে এবং অন্যান্য ঝুটঝামেলা সামাল দিয়ে নিতে অনেক সময় কেটে গেল। জাফর খান গাজীর মৃত্যু ও ভূদেব নৃপতির সাথে জাফর খান গাজীর যুদ্ধ অনেক পুরানো খবর হয়ে গেল।

সবকিছু সামাল দিয়ে নিয়ে উলুগ জিয়া খান ও শরীফ রেজা এবার এদিকে নজর দিলেন। প্রাথমিকভাবে অল্প কিছু সেনা সৈন্য নিয়ে তাঁরা মাননৃপতির রাজ্যে চলে এলেন। বিশেষ একটি গোয়েন্দা দল পাঠিয়ে দেয়ার পরও, সেনা সৈন্যদের সেখানে সতর্ক করে রেখে ভূদেব নৃপতির রাজ্যের পথঘাট ও ভূদেব নৃপতির শক্তি সামর্থের সঠিক হদিস সংগ্রহ করার ইরাদায় উলুগ জিয়া খান ও শরীফ রেজাও ছদ্মবেশে বেরুলেন। জাফর খান গাজীর ঐ বিপর্যয়ই খোঁজ-খবরের জন্যে এই সবিশেষ তৎপরতার কারণ।

ছদ্মবেশে এসে তাঁরা ভূদেব নৃপতির রাজ্যের সীমান্তের পাশে প্রতিদিন ঘুরতে লাগলেন। ভূদেব নৃপতি ও মাননৃপতির রাজ্যের মাঝখানে একটা প্রশস্ত খাল এবং খালটির উভয় পাড়ে পাতলা পাতলা বনারণ্য। এই খালটাই এই দুই রাজ্যের সীমানা। প্রথমে তাঁরা ভূদেব নৃপতির রাজ্যের

এই সীমান্তের পাশ দিয়ে দু'চারদিন ঘুরলেন। পারিপার্শ্বিক পরিচিতি সংগ্রহ করার পর তাঁরা খাল পেরিয়ে এলেন। খাল পেরিয়ে এসে তাঁরা বস্ত্র ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ভূদেব নৃপতি রাজ্যের এই সীমান্তের প্রান্ত এলাকায় ঘুরতে লাগলেন এবং ব্যবসায়ের নামে ঘুরে ঘুরে ভূদেব নৃপতির লোক-লস্করের পরিমাণ, তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার রাস্তাঘাটও অন্যান্য হদিস সীমান্তবর্তী লোকজনের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে লাগলেন। তাঁদের নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ গোয়েন্দার অতিরিক্ত দ্বিতীয় আর এক দল গোয়েন্দা আরো খানিক অভ্যন্তরে অগ্রগামী হয়ে ভেতরের দিক আগলে ফিরতে লাগলো এবং বেশ কয়েকজন সুশিক্ষিত সেপাই ছদ্মবেশে তাঁদের আশেপাশেই রইলো।

এমনইভাবে খাল পেরিয়ে এসে সীমান্ত দেশে ঘোরাফেরা করার কালে উলুগ জিয়া খান একদিন পোঁটলা-পাটলী সহকারে শরীফ রেজাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এক বৃক্ষতলে বসিয়ে রেখে পানির খোঁজে বেরুলেন। স্থানটি ছিল ভূদেব নৃপতির এই সীমান্তের এক আনন্দ বিহার বা প্রমোদ ভবনের কাছাকাছি। বিনোদনের নিমিত্তে বছরে দু'একবার কখনও রাজা নিজে বা কখনও তাঁর পরিবারবর্গের কেউ এ বিহারে এসে কয়েকদিন আমোদ-ফূর্তিতে কাটান এবং তারপরে ফের রাজ প্রাসাদে চলে যান। স্থানটি এই বিহারের কাছাকাছি হলেও তাঁরা বিশ্বস্তভাবে খবর নিয়ে জেনেছেন — ঝোপঝাড়ে ঘেরা এই স্থানটি ঐ বিহারটির একেবারেই এক মফস্বল এলাকা। এই হাল্কা পাতলা ঝোপঝাড়ের পশ্চিম দিকে খোলামেলা এক এলাকা ও লোক বসতি। লোক বসতির পরে তবেই সেই বিহার। এই বিহারে প্রায়ই কেউ থাকে না। এক্ষণে কয়জন আউরাত আছেন মাত্র। কয়েকজন পাইক নিয়ে বেড়াতে তাঁরা এসেছেন। প্রাসাদেরই আউরাত এঁরা। কয়দিন পরই প্রাসাদে আবার চলে যাবেন।

এই ঝোপঝাড় বা বনাঞ্চলটি দক্ষিণ-পশ্চিমে বেঁকে নিকটেই এক নদীর তীরে পৌঁছেছে। নদীর তীরে এসে বন যেখানে শেষ হয়েছে তার পাশেই এক প্রশস্ত নদীঘাট। ঘাটের পাশেই রাস্তা পথ, লোক বসতি এবং সবশেষে ঐ প্রমোদ ভবন বা বিহার। প্রমোদ ভবনের দিক থেকে ঘাটে আসার পথ আর বনাঞ্চলের দিকে থেকে ঘাটে আসার পথ কোণাকোণীভাবে নিকটবর্তী হতে হতে ঘাটে এসে এক হয়ে গেছে। বিহার থেকে ঘাটটি বেশ দূরে এবং বনাঞ্চলের এ পথে লোক চলাচল বিরল। তাই পাত্র হাতে জিয়া খান নিশ্চিন্তে নদীর দিকে এগুতে লাগলেন।

বনের ধার বেয়ে বেয়ে জিয়া খান নদীর কাছে এসে দেখলেন — তাঁর ডাইনে একটু ভাটিতে সেই ঘাট। মাঝখানে অল্প একটু ফারাগ। ঘাটটি বেশ প্রসস্ত। কিন্তু সে তুলনায় লোকজনের ভিড় কম। পুরুষের ভিড় আরো কম। কিছু বয়সী ও দু'চারজন যুবতী মহিলা পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে নদীর ঘাটে এসেছেন এবং পানিতে নেমে স্নানের সাথে গল্পগুজব ও হাসিঠাট্টা করছেন। গুটি কয়েক বালিকাও স্নানার্থে এসেছে এবং সাঁতার কাটার নামে স্রেফ হাতপাগুলো ছুঁড়ছে। সেই সাথে আরো দেখলেন ফিটফাট পোশাকের দুই তিন জন মাঝ বয়সী আউরাত ঘাটের পাড়ে বসে থেকে হাই তুলছেন পুনঃ পুনঃ।

উলুগ জিয়া খানের হাতের বাঁয়ে ছোট আর এক ঝোপ এবং ঝোপের পরেই নদী। ঘাটে যাওয়া সমীচিন নয় বোধে জিয়া খান সেই ঝোপটি বাঁয়ে রেখে নদীতে নামতে গেলেন। এমন সময় ঝোপটির ধারে অকস্মাৎ এক হাসাহাসি, ধুপধাপ আর ডালপালা নড়ানড়ির শব্দে তিনি চমকে গেলেন। হাসাহাসিটি দ্বৈতকণ্ঠের এবং কণ্ঠ দুইটিই আউরাতের। ব্যাপার কি দেখার জন্যে কয়েক কদম এগিয়ে একটু আড়াল থেকে যা তিনি দেখলেন — তা যেমনই রসোদ্দীপক তেমনই বিস্ময়কর। দুই দুইটি মেয়েছেলে। পরণে তাদের মূল্যবান ও রাজকীয় পোশাক। একটি মেয়ে যুবতী। যুবতীই শুধু নন তিনি, উপছেপড়া যৌবনের যুবতী। সুডৌল ও সুদৃশ্য দেহের গড়ন। মুখশ্রী সুন্দর, উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়। এক কথায় এক রূপবতী যুবতী। অপরটি কিশোরী। কিন্তু জিয়া খান সেই কিশোরীর দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলেন না। এই বয়সেই এই কিশোরীর সর্বাঙ্গে যে রূপচ্ছটা বিদ্যমান জিয়া খান তার কোন রকম উপমা খুঁজে পেলেন না বা এমন খুবসুরাত জিন্দেগীতে আর কোথাও দেখেছেন বলে খেয়াল করতেও পারলেন না। তুলনাহীন রূপের এক সুদর্শনা কিশোরী। যুবতীটি নিঃসন্দেহে রূপবতী। কিন্তু এই কিশোরীটি এই বয়সেই যুবতীটির বিপুল ঐ রূপ লাবণ্য ম্লান করতে চাইছে। কিশোরীটিকে দেখেই জিয়া খানের মনে হলো কিশোরোত্তীর্ণ যুবক শরীফ রেজার কথা। উপযুক্ত জুটি। এই কিশোরীর জুটি শরীফ রেজা ছাড়া বা শরীফ রেজার জুটি এই কিশোরী ছাড়া দুসরা কেউ হতে পারে — উলুগ জিয়া খান এমনটি আর ভাবতেই পারলেন না।

কিন্তু এ খোয়াব তাঁর অধিক স্থায়ী হলো না। আর এক দফা হাসির ধাক্কায় ছুটে গেল খোয়াব তাঁর। তিনি দেখলেন — মেয়ে দু'টির মাথার উপর ফল ভারে ভারী এক বৃক্ষের ডাল হেলে পড়ে আছে। ডালের সাথে

থোকা থোকা টক-মিষ্টি স্বাদের এক কিসিমের পাকা ফল ঝুলছে। বালক-বালিকা কিশোর-কিশোরীর অত্যন্ত প্রিয় ফল। সেই ফলের দিকে হাত বাড়িয়ে পুনঃ পুনঃ লাফ দিচ্ছেন যুবতীটি। অল্পের জন্যে ব্যর্থ হয়ে সেই ব্যর্থতার গ্লানী তারা হাসির ঝংকার তুলে ঢেকে দিচ্ছেন। কিশোরীটি যুবতীর চেয়ে উচ্চতায় ঈষৎ খাটো হওয়ায় সে লাফ দেয়ার বদলে সতৃষ্ণ নয়নে ঐ ফলের দিকে চেয়ে থেকে যুবতীটির হাসির সাথে তাল মিলিয়ে হাসছে।

পুনঃ পুনঃ কোশেশ করলেন নওজোয়ানী। কিন্তু প্রতিবারেই ব্যর্থ হয়ে ক্লান্ত হতে লাগলেন। অথচ ঐ ডাল থেকে একটা লতা নেমে এসে তাদের পাশেই ছোট এক গুল্ম জাতীয় গাছের উপর উঠে আছে। ওটা ধরে টান দিলেই তামাম ফল একদম তাদের নাগালের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু ওদিকে তাদের লক্ষ্য নেই বা ওটা তারা আদৌ খেয়াল করেননি। লাফিয়ে উঠে ফল নামানোর একমাত্র চিন্তা নিয়েই বিভোর হয়ে আছেন তারা। ইতিমধ্যেই বেশখানিক লাফিয়েছেন যুবতীটি। ঘেমে গেছেন রীতিমতো। জিয়া খান বুঝলেন আর একটু পরেই 'এ ফল খুব টক' এই সান্ত্বনা নিয়েই তাদের ওয়াপস্ যেতে হবে।

মায়া হলো জিয়া খানের। কিন্তু কি করবেন তিনি এই মুহূর্তে তাও ঠিক করতে পারলেন না। শব্দ করলেই শরমে হয়তো দৌড় দেবেন আউরাতদ্বয়। কিংবা হয়তো ভয়ে চিৎকার দিয়েও উঠতে পারেন। চিৎকার দিলে ফলাফলটা নিতান্তই অপ্রীতিকর হবে। ভেবে কোন কুলকিনারা না পেয়ে জিয়া খান এমন ভাব করলেন যেন তিনি দেখতেই পাননি তাদের। এমনই ভাব করে তিনি সামনে এগিয়ে আসতে লাগলেন। মানুষের পায়ের শব্দ শুনে মেয়ে দু'টি থেমে গেলেন এবং জিয়া খানকে অবাক করে দিয়ে যুবতীটি হুকুমের সুরে ডাক দিয়ে বললেন, এয় কে ওখানে ? একটু এদিকে এসোতো ?

জিয়া খান এগিয়ে এসে বললেন — জি বলুন ?

যুবতীটির ধারণা ছিল আশেপাশেরই চেনা বা অগ্রাহ্য কেউ হবে। কিন্তু জিয়া খান সামনে আসায় তিনি কিঞ্চিত থমকে গেলেন। কিন্তু তা ক্ষণিকের। ইতিমধ্যেই কিশোরীটি প্রশ্ন করলো — গাছে চড়তে পারেন ?

জিয়া খান বললেন — পারি।

যুবতীটি হুকুম করলেন — তাহলে চড়ো দেখি এই গাছে। ঐ ফল কয়টা নামিয়ে দাওতো।

প্রাথমিক ঐ কুণ্ঠাটুকুর পর যুবতীর মধ্যে আর কোন কুণ্ঠা বা সংকোচ কিছু রইলো না। তার কথার প্রেক্ষিতে জিয়া খান বললেন — ঐ ডালটা হেলিয়ে দিলে হবে না ?

যুবতী বললেন — হ্যাঁ হ্যাঁ তাও হবে। দাও —

সতৃষ্ণ নয়নে কিশোরীটি ফলের দিকে চেয়ে রইলো। হাতের আস্তিন কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে জিয়া খান এগুলেন। অনেক ফলের ভারে চিকন ঐ ডালটি ভেঙ্গে পড়ার অবস্থাতেই ছিল। উলুগ জিয়া খান ঐ লতা ধরে টান দিতেই ফলসহ ডালটি সশব্দে ভেঙ্গে পড়লো। জিয়া খান তাজ্জব হয়ে দেখলেন, ডালটি ভেঙ্গে পড়ার সাথে সাথেই কিশোরী তো বটেই ঐ যুবতীও হাসি মুখে ছুটে এসে লুটোপুটি করে ডাল থেকে ফল ছিঁড়তে লাগলেন।

শরম পেলেন উলুগ জিয়া খান নিজেই। তিনি সেখান থেকে সরে কয়েক কদম ফাঁকে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে থেকে তিনি সকৌতুকে ভাবতে লাগলেন — পর্দানশীন মুসলমান মেয়ে আর অমুসলমান মেয়ের মধ্যে পার্থক্যটা এখানেই। কোন পর্দানসীন মুসলমান মেয়ের পক্ষে এরপরও আর এখানে থাকা কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু শিশুকাল থেকেই এই মেয়েদের শিক্ষা-অভ্যাস আলাদা। খোলা-মেলা ও সংকোচহীন অবস্থায় উৎসব-পার্বন-অনুষ্ঠানে পুরুষ মানুষের সংস্পর্শে সততই এদের যাতায়াত। অহরহ মেলামেশা। পর্দা করে চলা এদের ধর্মীয় বিধান নয়। ফলে, মানসিকতায় এরা অনেকটা পৃথক। নারীসুলভ সংকোচ বা কুণ্ঠাটুকু ছাড়া, পুরুষ মানুষ এদের কাছে বিশেষ কোন শংকার বা লজ্জার ব্যাপার নয়। এদের আচরণে সে জড়তা নেই। বিশেষ করে উপর মহলের মেয়েরাতো আরো বেশী জড়তাহীন। এই দুইজন মেয়ে আর নাহোক উজির-নাজির জাতীয় পদস্থ লোকের কন্যা। ঘাটে ঐ নিকটেই অনেক লোক বিদ্যমান। তদুপরি ছদ্মবেশী জিয়া খানও এখন একটা স্রেফ আটপৌরে মানুষ। শংকা বা কুণ্ঠার কোন বালাই এদের নেই।

ফল নিয়ে মেয়ে দু'টি লুটোপুটি করতে লাগলেন। জিয়া খান তা লহমা কয়েক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে নদীর দিকে পা বাড়ালেন। তা দেখে ঐ যুবতী মেয়েটি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — আরে এই, যাও কেন ?

জিয়া খান ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, জি ?

ঃ বাড়ীতে কোন ছেলেপুলে নেই ? গুটি কয় নিয়ে যাও ?

জিয়া খান হাসিমুখে বললেন — জিনা, আমার কোন ছেলেপুলে নেই।

ঃ তুমি খাও না এসব ?

ঃ হ্যাঁ তা খাই বৈকি।

ঃ তবে ? নাও নাও, গুটিকয়েক নিয়ে যাও —

আঁচল থেকে আঁজলা ভরে ফল তুলে যুবতী তা জিয়া খানের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। জিয়া খানও তার দুই হাত প্রসারিত করে ফলগুলো গ্রহণ করলেন। জিয়া খানের আস্তিন আগে থেকেই গুটানো ছিল। এবার হাত দু'টি প্রসারিত করায় তাঁর বাহু দু'টি আরো খানিক অনাবৃত হলো। ফলগুলো হাতে দিয়েই যুবতীটি তাজ্জব হয়ে জিয়া খানের বাহুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ছদ্মবেশের প্রয়োজনে বাইরের অঙ্গে কারুকাজ কিছু থাকলেও, আস্তিনের তলে বাহুতে তা ছিল না। সুডৌল, সবল, মসৃণ ও কাঁচা সোনা বরণের উজ্জ্বল ঐ বাহু দু'টি দেখে যুবতীটি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন — তার মানে! তুমি — মানে আপনি কে ?

জিয়া খান স্মিতহাস্যে বললেন — জি, আমি একজন পরদেশী, পরদেশী ব্যবসায়ী।

ঃ পরদেশী ব্যবসায়ী ?

ঃ জি। তেজারতের ব্যাপার নিয়ে আমি এদেশে এসেছি।

ঃ আপনি তেজারতি করেন ? মানে সওদাগর ?

ঃ হ্যাঁ। মানে —

ঃ কি আশ্চর্য ! আপনিতো তাহলে ধনী মানুষ! সম্ভ্রান্ত লোক! আমি ভেবেছি হয়তো কোন কামিন-মযদুর। ছিঃ ছিঃ ছিঃ !

ঃ না, কথাটা হলো —

ঃ আপনি আমার ত্রুটি নেবেন না। আমি বেয়াদবী করে ফেলেছি।

যুবতীর কণ্ঠে অনুশোচনা ধ্বনিত হলো। এই ফাঁকে জিয়া খান বললেন — আমার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল।

যুবতীটি সাগ্রহে বললেন — বলুন বলুন।

ঃ আপনি, মানে কে আপনি ?

ঃ আমি ? আমার নাম কুমারী চন্দ্রাবতী। আমি এই রাজ্যের রাজার মেয়ে।

ঃ আপনি রাজকুমারী ? মানে রাজকন্যা ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তা আপনি এখানে?

ঃ ঐ তো, ঐ নিকটেই আমাদের প্রমোদ ভবন বা আনন্দ বিহার। দাসদাসী নিয়ে কয়দিনের জন্যে আমরা বেড়াতে এসেছি এখানে।

ঃ ও, আচ্ছা। আর উনি ?

কিশোরীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন জিয়া খান। উত্তরে কুমারী চন্দ্রাবতী বললেন— ও আর একজন রাজকন্যা। এই যে আমাদের এই

রাজ্যের পাশেই মাননৃপতির রাজ্য ? এখন মুসলমান হয়েছেন মাননৃপতি। এটা তাঁরই মেয়ে।

ঃ তাই ? তা উনি এখানে ?

ঃ আমাদের আত্মীয় যে! ওর মা আর ও আমাদের প্রাসাদেই থাকেন। ওঁরাতো আর মুসলমান হননি। তাই আমাদের সাথে থাকেন।

ঃ তা আর একটা কথা ?

ঃ বলুন —

ঃ আপনারা মানে রাজার মেয়ে আপনারা হুকুম করলে কত উৎকৃষ্ট ফলমূল আপনাদের সামনে এসে হাজির হবে। আপনারা কেন কষ্ট করে এই বনে এসেছেন ফল নামাতে ?

এবার চন্দ্রাবতী মুখ টিপে হাসলেন। হেসে বললেন — ফল নামাতে আসিনিতো! ঐতো আমাদের দুই তিনজন দাসী ঐ ঘাটের উপর বসে আছে। আমরা এসেছি স্নান করতে। হাঁটতে হাঁটতে এদিকে একটু বেড়াতে এসেই দেখি — এখানে এতসব ফল পেকে রয়েছে।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আর তাছাড়া , ঘরে বসে তোলা ফল খাওয়ার চেয়ে গাছ থেকে নামিয়ে খাওয়ার একটা আনন্দই তো আলাদা।

মুখ নিচু করে চন্দ্রাবতী হাসতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই ঘাটে বসা ঐ দাসীদের একজন দ্রুতপদে এদিকে আসতে লাগলো আর হাঁকতে লাগলো — কৈ গো মা-মনিরা, আপনারা সব গেলেন কৈ ?

চকিত হয়ে উঠে চন্দ্রাবতী অল্প একটু উচ্চ কণ্ঠে সাড়া দিলো। এই যে, এখানে এরপর কিশোরীটিকে লক্ষ্য করে বললেন — এই আয়, অনেকক্ষণ হয়ে গেল। ওরা আবার হৈচৈ বাধিয়ে দেবে।

সব শেষে চন্দ্রাবতী জিয়া খানকে লক্ষ্য করে হাসিমুখে বললেন যাই —

তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে রওনা হলেন চন্দ্রাবতী। কিশোরী তাকে নীরবে অনুসরণ করতে লাগলো।

পানি নিয়ে ফিরে এসে উলুগ জিয়া খান শরীফ রেজাকে বললেন, বুঝলে ইয়ার, লড়াই করতে এদেশে আমরা আসি আর না আসি, চুরি করতে আসতে হবে একবার।

শরীফ রেজা এর অর্থ কিছুই বুঝলেন না। হাসিমুখে বললেন, বলেন কি! চুরি করতে?

ঃ লুট করতে। এই রাজার প্রাসাদে লুট করতে আসতেই হবে আমাদের।

ঃ প্রাসাদে লুট করতে ? কি লুট করবেন ? সোনাদান ?
ঃ উহুঁ উহুঁ! ওসব সোনাদানা পয়সাকড়ি নয় কিছু।
ঃ তবে ?
ঃ মানুষ
ঃ মানুষ!
ঃ তাজা এবং জ্যান্ত মানুষ!
ঃ কি বলছেন আবোল-তাবোল।
ঃ আবোল-তাবোল মানে! লুট না করলে তোমাকে নিয়ে ফ্যাসাদ হবে মস্তবড়।
ঃ আমাকে নিয়ে ফ্যাসাদ হবে মানে ?
ঃ শাদি কোন দিন দিতে হবে না তোমাকে ? লুট না করলে পাত্রী পাবো কৈ ?
ফের শরীফ রেজা হাসলেন। হেসে বললেন — ও এই কথা ? তা এ দুনিয়ায় কি আউরাতের এতই অভাব ঘটেছে যে, লুট না করলে কেউ শাদি করার পাত্রী খুঁজে পাবে না?
ঃ পাবে না কেন ? একশবার পাবে। কিন্তু তুমি পাবে কোথায় ? তোমাকে তো আর বুনোবাগদী যে কোন কিসিমের আউরাত হলেই শাদি দেয়া যাবে না ? মানানসই হওয়া চাই। রূপে গুণে মানান সই জুটি।
ঃ আচ্ছা!
ঃ তুমি খামাখা এমন এক চেহারা ফেঁদে বসে আছো, যার উপযুক্ত জুটি এখন দুনিয়া খুঁজে মেলে না।
ঃ তাই নাকি ?
ঃ অদ্যতক একটাও নজরে আমার পড়েনি। বয়সতো কম হয়নি আমার ? কম দেশও ঘুরলাম না। কিন্তু তোমার জুটি হতে পারে, এমন একটা মেয়ে চোখে পড়ুক! না কোথাও দেখলাম না। এই সবেমাত্র দেখতে পেলাম একটা।
ঃ একটা দেখতে পেলেন ? তা কোথায় ভাই সাহেব ? রাজার ঐ প্রমোদ ভবনে ?
ঃ হাঁ প্রমোদ ভবনের পাশেই।
ঃ রাজকন্যা বুঝি ?
ঃ জরুর-জরুর। রাজকন্যা না হলে যে কোন মেয়ে যোগ্য হতে পারে তোমার ?
ঃ ঐ ভূদেব রাজার মেয়ে ?

ঃ না না ইয়ার, অতটা উপরে নজর দিও না। ওটা না হয় আমার জন্যে রেখে দাও। তুমি আমার বয়সে ছোট। তাই তুমি একটু নিচের দিকে তাকাও।
ঃ নিচের দিকে ?
ঃ একটু ছোট রাজার মেয়ের কথা ভাবো।
ঃ তার মানে ? কেবলই কিন্তু হেঁয়ালী করছেন ভাই সাহেব!
ঃ এ্যা হেয়ালী ? হ্যাঁ হ্যাঁ তাইতো। রসিকতা করতে গিয়ে আসল কথা হারিয়ে বসে আছি। শোন, যে মেয়েটির কথা আমি বলছি — সেও এক রাজকন্যা। ঐ মাননৃপতির মেয়ে। ঐ যে মাননৃপতির মহিষী তাঁর মেয়েকে নিয়ে হারিয়ে গেলেন মাননৃপতির প্রাসাদ থেকে ? উনারা এখন এই ভূদেব নৃপতির প্রাসাদে এসে আছেন।
ঃ বলেন কি ?
ঃ উঃ! তখন যদি জানতাম — মাননৃপতির মেয়েটা এত সুন্দরী, তাহলে কি আর পালানোর কোন মওকা দিতাম আমি ? ওখানেই ধরে তোমার সাথে গেঁথে ফেলতাম ওকে। হাতের পাখী ছেড়ে দিয়ে এখন দেখো, তাড়িয়ে ধরতে হবে আবার ঐ ভূদেব নৃপতির ঘরে গিয়ে।
ঃ নাইবা ধরলেন তাড়িয়ে। এত তকলিফ করার দরকার কি ?
ঃ আরে! দরকার কি আর সাধে ? বলছিইতো তোমার সাথে মানাতে হবে এমন মেয়ে চাই আমার।
ঃ ভাল ভাল ! তা তাঁর খুব সুরোত্তটা খুবই বুঝি উমদা ?
ঃ জাহানে নেই, জাহানে নেই। সারে জাহান যদি চষেও বেড়াও তুমি, এমনটি কোথাও পাবে না।
ঃ পাবো না ?
ঃ না। আমি হলপ করে বলতে পারি।
ঃ তাজ্জব!
ঃ কিসমতে যদি থাকে তোমার, তাহলে তাকে পাওয়ার পর মিলিয়ে তুমি দেখো সেদিন, কাঠখোট্টা বেরসিক এই সেপাইয়ের বাচ্চা সেপাই একবিন্দুও বাড়িয়ে কিছু বলেনি।
হঠাৎ কিছু কথাবার্তা কানে পড়ায় সচকিত হয়ে তারা দেখলেন — দুই তিনজন পাইক কলরব করতে করতে এই পথেই আসছে। পাইক দেখে তাঁরা কিছুটা আড়ালে সরে গেলেন।

ভূদেব নৃপতির সীমান্তে আরো কয়দিন ঘুরে ফিরে তাঁরা নিজেরা এবং গোয়েন্দা দলের মাধ্যমে, তামাম হদিস যোগাড় করলেন উলুগ জিয়া খান ও শরীফ রেজা। তাঁরা জানলেন — ভূদেব নৃপতির সামরিক শক্তি আর পাঁচজন সামন্ত রাজার চেয়ে অনেকটা অধিক পরিমাণ হলেও তা এমন কিছু নয় — যা তাঁদের এঁটে উঠা কঠিন। দরবেশ বাহিনী সহকারে তাঁদের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে এ শক্তি নগণ্য। জাফর খান গাজীর মৃত্যুর কারণ — আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা আর উপলক্ষ আকস্মিক ও প্রতিকূল পরিস্থিতি — ভূদেব নৃপতির সামরিক শক্তি নয়। তাঁরা আরো জানতে পারলেন — সাতগাঁয়ের মাঠে মার খেয়ে উৎকল বা উড়িষ্যার ঐ গঙ্গ বংশীয় রাজারা ঐ যে ছুটে গিয়ে নিজ মুলকে ঢুকেছেন, এই রাঢ় অঞ্চলের সামন্ত রাজারা ডেকেও আর তাঁদের বাইরে আনতে পারছেন না। আশেপাশে সামন্ত রাজার সংখ্যাও আর এখন নেই তেমন। জাফর খান গাজী এঁদের অধিকাংশকেই বিলীন করে দিয়ে গেছেন। যে দু'একজন টিকে আছেন এখনও, সবারই তাঁদের ইয়া নফসী অবস্থা এখন। অন্যের দিকে তাকাবার ফুরসুৎ নেই।

এসব খবরের সাথে রাস্তাঘাটের অবস্থাদি সঠিকভাবে জেনে নিয়ে জিয়া খান আর শরীফ রেজা সরাসরি সাতগাঁয়ে ফিরে এলেন।

অতপর তাঁরা সাতগাঁয়ে অবস্থিত তামাম সৈন্যের সাথে দরবেশ শাহ শফী সাহেবের লোকলস্করের সুসমন্বয় ঘটিয়ে বিশাল এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তুললেন এবং শায়খ শাহ শফী ও সাতগাঁয়ের আরো কয়জন সালারসহ বাহিনী নিয়ে এসে তাঁরা মাননৃপতির রাজধানীতে অপেক্ষামান সেনাসৈন্যের সাথে মিলিত হলেন।

এরপর শুরু হলো অভিযান। তাঁরা ভূদেব নৃপতির রাজ্যে এসে হানা দিলেন। সংবাদ পেয়ে ভূদেব নৃপতি এবারও অনেক কলাকৌশল খাটালেন। কিন্তু কোন কিছু করেই তিনি এই মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করতে পারলেন না। মার মার রবে এসে মুসলিম বাহিনী ভূদেব নৃপতির প্রাসাদের সামনে হাজির হলো।

তবুও ভূদেব নৃপতি হাল ছেড়ে দিলেন না। সমুদয় সৈন্য নিয়ে প্রাণপণে লড়তে লাগলেন তিনি। তুমুল লড়াই চলতে লাগলো রাজ প্রাসাদের সামনে। যথাসাধ্য চেষ্টা করে অনেকক্ষণ যাবত মুসলিম বাহিনী ঠেকিয়ে রাখলেন ভূদেব নৃপতি। কিন্তু শেষ রক্ষে হলো না। পরে যখন তাঁর সেনাপতিরা একে একে সকলেই গড়িয়ে পড়তে লাগলেন এবং তাঁর

সৈন্য সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এলো, তখন তিনি বুঝলেন — আর চেষ্টা অর্থহীন। পালানোরও পথ নেই। এখন সামনে দু'টি পথ ঃ হয় আত্মহত্যা নয় আত্মসমর্পণ। কি করবেন ভাবতেই তিনি সংবাদ পেলেন — তাঁর মহিষী ও কন্যা চন্দ্রাবতী ইসলাম কবুল করার জন্যে ইতিমধ্যেই দরবেশ শাহ শফীর কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন। রাজকুমারী চন্দ্রাবতী ইতিমধ্যেই কি একভাবে জেনে গেছেন, সেদিনের ছদ্মবেশী ঐ তেজারতদার বা সওদাগর অন্য কেউ নন. তিনি সাতগাঁয়ের তরুণ শাসক উলুগ জিয়া খান এবং সেই জিয়া খানের সাথেই লড়াই হচ্ছে তাঁদের। তাঁর সাথে লড়াই করেই চন্দ্রাবতীর পিতা ভূদেব নৃপতি পাত্রমিত্র ও পরিজনবর্গ সহকারে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন।

এ ধ্বংস রাজকন্যার আদৌ কাম্য নয়। রাজকন্যার উমেদারীতে রাজমহিষীও এ ধ্বংস চান না। তাঁরা শুধু সন্ধি করতেই আগ্রহী নন, মুসলমানদের সাথে তাঁরা একাত্ম হতে চান। এ সংবাদ পাওয়ার পর ভূদেব নৃপতিও ভাবতে লাগলেন। আশেপাশের তামাম রাজাই এই অপরাজেয় শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। অনেকেই তাঁরা ইসলাম কবুল করেছেন। তার অধিকাংশ আত্মীয়েরাই এখন মুসলমান। তিনি একা এই জিদ ধরে থেকে অনর্থক সবাইকে ধ্বংস করে লাভ কি ? ওদিকে আবার আত্মহত্যাও মহাপাপ! আত্মসমর্পণ করলে হয়তো ইসলাম কবুল না করা লাগতে পারে। কিন্তু তাদের মাঝে এইভাবে অপাংক্তেয় হয়ে থেকেই বা ফায়দা কি ? মুসলমানদের সাথে এক হয়ে গেলে একটা সম্মানজনক অস্তিত্ব ও অবস্থান তাঁর থাকবে। এ ছাড়া ইসলামের নীতি আদর্শগুলোওতো আদৌ তুচ্ছ করার মতো নয়। যেমনই সুন্দর তেমনই ওগুলো আকর্ষণীয়।

এসব কথা চিন্তা করে তিনিও স্থির করলেন, শুধু আত্মসমর্পণই নয়, ইসলাম কবুল নিজেও তিনি করবেন। এটা স্থির করেই ভূদেব নৃপতি অস্ত্র সম্বরণ করলেন এবং শায়খ সাহেবের কাছে তাঁর প্রস্তাব পেশ করলেন। শুনে শায়খ সাহেব খুশী হলেও তাঁকে ভেবে দেখতে বললেন। শায়খ সাহেব ভূদেব নৃপতিকে জানালেন — আত্মসমর্পণ করলেই তা যথেষ্ট। করদ রাজা হিসাবে তাঁকে তাঁর রাজ্য ঐশ্বর্য তামামই ফেরত দেয়া হবে। ইসলাম কবুল করতে হবে, এর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম কবুল দীলের ব্যাপার। বিশেষভাবে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ঝোঁকের মাথায় কাউকে দ্বীন ইসলাম কবুল করতে দিতে তিনি রাজি নন বা কেউ তা করুক, তা তিনি চান না।

ফিরে এলেন ভূদেব নৃপতি। স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে তিনি বসলেন। তাঁরাও রাজাকে ইসলাম কবুলে উৎসাহিত করলেন। পরে আবার মহিষী ও কন্যাসহ ভূদেব নৃপতি শায়খ সাহেবের শরণাপন্ন হলে শায়খ সাহেব তাঁদের সবাইকে বিধিমতে দ্বীন ইসলামে দীক্ষিত করলেন।

রাজকুমারী চন্দ্রাবতীর আন্তরিক ইচ্ছা আঁচ করে ভূদেব নৃপতি আর এক কদম এগিয়ে এলেন। তিনি শায়খ সাহেবকে বললেন, হুজুর, এতই যখন হলো, তখন আর একটা আকাংখা ছিল দীলে আমার। আপনারা সম্মত হলেই আমার সে আকাংখা পূরণ হয়।

শায়খ সাহেব বললেন, জি বলুন, কি সে আকাংখা আপনার ? ভূদেব নৃপতি বললেন, আমার কন্যা চন্দ্রাবতীকে তো দেখেছেন। যদি আপনাদের পছন্দ হয়, তাহলে আমার ইচ্ছা, উলুগ জিয়া খানের সাথে আমার চন্দ্রাবতীর শাদি হোক।

শায়খ সাহেব বললেন, এতো অতি উত্তম প্রস্তাব। আপনার কন্যাকে আমার খুব পছন্দ। কিন্তু দুলাহ–দুলাহীনের ব্যক্তিগত মতামত বলে একটা দিক আছে। তারা রাজি হলে আমাদের কোন আপত্তিই নেই।

মতামত যাচাই করা হলো। প্রথমে জিয়া খানের মত জানতে চাওয়া হলো। জিয়া খান আনন্দের সাথে লুফে নিলেন এ প্রস্তাব। দুলহীন চন্দ্রাবতীও সলজ্জ হাসিমুখে রাজি হলেন শাদিতে। লড়াইয়ের দামামার স্থানে শাদির বাজনা বেজে উঠলো। দুঃখ ও আতংকপূর্ণ প্রাসাদে পুনরায় আনন্দ প্রবাহ বইতে লাগলো।

নিজের শাদি স্থির হতেই জিয়া খান ছুটে এলেন শরীফ রেজার প্রস্তাব নিয়ে। শরীফ রেজার চেহারা দেখে আর তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় পেয়ে বর্তে গেলেন ভূদেব নৃপতি। আবার তিনি ছুটলেন শায়খ সাহেবের কাছে। এবারও শায়খ সাহেব দুলাহ–দুলহীনের মতামতের প্রশ্ন আনলেন। জিয়া খানের সুপারিশে শরীফ রেজা রাজি হলেন এবং চন্দ্রাবতীর সুপারিশে মান নৃপতির কিশোরী কন্যা খানিকটা বুঝে আর খানিকটা তালে পড়ে এ শাদিতে সম্মতি দান করলেন। মাননৃপতির পক্ষে ভূদেব নৃপতিই এখন এ মেয়ের অভিভাবক। ভূদেব নৃপতির সানন্দ সম্মতিতো ছিলই। ফলে রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর শাদির সাথে মাননৃপতির কন্যারও শাদির আনযাম চলতে লাগলো।

মাননৃপতির মহিষী হিরামতি দেবী প্রথম ধাক্কায় তাঁর কিশোরী কন্যার শাদির ব্যাপারে 'হ্যাঁ–না' কোনটাই সঠিকভাবে বললেন না। তাঁর মতামত

চাওয়া হলে তিনি শুধু বললেন, লতা যা ভাল বুঝে, তাই সে করুক. আমি আর কি বলবো ?

ভূদেব নৃপতি বললেন, লতা তো ছেলে মানুষ। আপনি তার মা। আপনার মতামতটা তো দরকার।

হিরামতি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, আমার মতের দরকার কি ? ভাত খায়না লতা ? তার যা ইচ্ছে তাই সে করুক। আমাকে এতে জড়াবেন না।

দেখেশুনে ভূদেব নৃপতি হিরামতির মত নিয়ে আর ব্যস্ত হতে গেলেন না। তার নিজের মতই চূড়ান্ত বলে মনে করলেন তিনি।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এলো। নওশাদ্বয়কে সজ্জিত করে এনে মহারাজের বালাখানায় বসানো হলো। শায়খ সাহেব তাঁর দুইজন বয়োবৃদ্ধ আলেমকে অন্তঃপুরে পাঠালেন। তারা এসে মাননৃপতির কন্যাকে যথা নিয়মে ইসলাম কবুল করালেন। তাঁরা তার নাম দিলেন —— লতিফা বানু বেগম। অতপর বিধানমতে দুলহীনদ্বয় ও দুলাহদ্বয়কে শাদি কবুল করানো হলো। আনন্দ-উল্লাস ও ধুমধামের তুফান ছুটলো প্রাসাদে। মিষ্টি এলো ভারে ভারে। খানাপিনা ও অনুষ্ঠানাদির সাথে দোয়া–দরূদ চলতে লাগলো।

পশ্চিম আকাশে হারিয়ে গেল পঞ্চমীর চাঁদটা। বাড়তে লাগলো রাত। এরপর দুলহীনদ্বয়ের পাশে দুলাহদ্বয়কে দাঁড় করানোর নিমিত্তে দুলাহদ্বয়কে অন্তঃপুরে নেয়া হলো। শরীফ রেজা তাঁর কিশোরী বধুর অসামান্য রূপের কথা শুনেই শুধু আসছেন। চোখে কখনও দেখেননি। সে রূপটা কেমন রূপ তা দেখার এক দুর্নিবার আগ্রহ নিয়ে শরীফ রেজা অন্দর মহলে এলেন। কিন্তু সবই বৃথা!

অন্দর মহলে এসে সবাই হতবাক হয়ে দেখলেন, লতা বা লতিফা বানু নেই। সেই সাথে দেখলেন, তাঁর মা হিরামতিও নেই। মান নৃপতির আলয় থেকে আগত সেই দারোয়ান দু'জনও নেই। দাসীও নেই। এর উপর আরো তাঁরা দেখলেন ভূদেব নৃপতির দুই দাসী, রান্নার ঠাকুর এবং মন্দিরের পূজারীও নেই। রাতের অন্ধকারে আট-নয়জন লোকের পুরো এক কাফেলা মুসলমানদের সংশ্রব ত্যাগ করে প্রাসাদ থেকে উধাও হয়ে গেছে।

খোঁজ–খোঁজ রব উঠলো তখনই। সেনা-সৈন্য, পাত্র–মিত্র ভিন্ন ভিন্ন দল নিয়ে বিভিন্ন দিকে ছুটলেন। নিদারুণ এই লজ্জায় মর্মাহত হয়ে শরীফ রেজাও তাঁর দরবেশ বাহিনী নিয়ে স্ত্রীর খোঁজে বেরিয়ে গেলেন।

শরীফ রেজা চিন্তা করে দেখলেন — পূর্ব দিকে মুসলিম রাজ্য। তাঁদের এদিকে যাওয়ার সম্ভবনা খুব কম। পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অপার মন্দারের পরেই ধলভূম, ময়ূরভঞ্জ, উৎকল ইত্যাদি হিন্দুরাজ্য। যদি ইসলাম কবুল করার ভয়ে তাঁরা পালিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে এদিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই চিন্তা করেই তিনি সেই দিকে ছুটলেন।

অনেক দূরতক এসেও শরীফ রেজা কোন রকম সাড়া শব্দ বা হদিস খবর পেলেন না। এদিক ওদিক ঘোড়া ছুটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে অনেকভাবে খোঁজাখুঁজির পর যখন তিনি ক্রমেই হতাশ হয়ে আসছেন, এমন সময় তাঁর কানে এলো অনেক কণ্ঠের আর্তনাদ — বাঁচাও বাঁচাও। অপারমন্দার থেকে যে এক কাঁচা রাস্তা ধলভূমের দিকে গেছে, আওয়াজ আসছে সেদিক থেকে। সঙ্গীদের ইশারা করেই শরীফ রেজা সেই দিকে অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন। বিপুল বেগে ছুটে এসে দেখলেন — কয়েকজন সেপাই একদল নরনারীকে হামলা করে তল্লাশি চালাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে তারা এক একটা আউরাতকে দৌড়ে গিয়ে ধরছে আর নিরিখ করে দেখার পর বিরক্তি ভরে বলছে — 'না না এটা নয়, এটাও লতা নয়।' এরপর যাকে তারা হাতের কাছে পাচ্ছে তাকেই ধরে মারধোর করছে আর বলছে — বল, লতা কোথায় বল ?

আতংকিত নরনারী ছুটোছুটি করছে আর আর্তনাদ করছে। রাতের অন্ধকারেই শরীফ রেজা বুঝতে পারলেন, এরাই সেই পলাতক কাফেলা। শরীফ রেজা ভাবলেন, এই সেপাইরা হয়তো তাঁরই মতো আর একটা সন্ধানকারী দল। কিন্তু কিয়ৎকাল এদের আচরণ লক্ষ্য করেই বুঝলেন — না, এরা আদৌ তা নয়, এদের মতলব ভিন্ন। বুঝতে পেরেই শরীফ রেজা হুংকার দিয়ে উঠলেন — হুঁশিয়ার! আর একটা মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছো, না মরেছো!

সেপাইরা সংখ্যায় দশ পনের জন। তারাও অশ্বারোহী। শরীফ রেজা উদ্ভ্রান্তের মতো তাঁর সঙ্গীদের পেছনে ফেলে একাই এসে ঘটনাস্থলে পৌঁছিলেন। শরীফ রেজাকে একা দেখে ঐ দশ পনের জন সেপাই ঘিরে ধরলো তাঁকে। শুরু হলো লড়াই। অদ্ভুত এক লড়াই। কে কাকে আঘাত করছে, কোথা থেকে আঘাত আসছে, রাতের অন্ধকারে কিছুই আঁচ করার জো নেই। জায়গাটার চার পাশে হেথাহোথা বড় বড় গাছপালা থাকার দরুন আঁধারটা এখানে আরো জমাট বেঁধে গেছে। এমতাবস্থায় লড়ে শরীফ রেজা দুশমনদের দুই তিনজনকে ধরাশায়ী করলেন। কিন্তু এই হাতড়ানো লড়াইয়ে তিনিও নিজে অক্ষত রইলেন না। কোন না কোন দিক

থেকে দুশমনের এক তরবারির আঘাত এসে শরীফ রেজার ডান কপালে লাগালো এবং মাথার চুলের কোল ঘেঁষে অনেকখানি কেটে গেল। কেটে যাওয়ার সাথে সাথে ক্ষত বেয়ে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগলো। কিন্তু শরীফ রেজা তা নিয়ে মোটেই কাতর হলেন না। ঐভাবেই প্রাণপণে লড়তে লাগলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর গোটা বাহিনী এসে ঘিরে ধরলো দুশমনদের এবং কয়েক লহমার মধ্যেই দুশমনদের ইহ জিন্দেগীর লেনাদেনা খতম করে দিলো। দুশমনদের একজনের জান তখনও ছিল। চাপ দিতেই মরোন্মুখ দুশমনটি যা জানালো, তা হলো তারা সবাই ভূদেব নৃপতির সেপাই। ভূদেব নৃপতির এক তরুণ সেনানীর বড় লোভ ছিল মাননৃপতির ঐ কিশোরী কন্যার উপর। সে তাকে লুট করতে চায়। তার ঐ অসাধারণ খুপসুরাত দেখে সে প্রায় আওয়ারা হয়ে গিয়েছিল। এঁদের আজ এইভাবে পালিয়ে আসার সন্ধান পেয়েই ঐ কিশোরীকে হরণ করার উদ্দেশ্যে এঁদের পিছু নেয় এই সেনাপতি। তারা সবাই তার বাহিনীর সেপাই। সেনাপতিটির হুকুমেই এই হীন কাজে আসতে হয়েছে তাদের।

এরপরই সে ঐ সেনাপতিকে দেখিয়ে দিলো। অন্ধকার হলেও শরীফ রেজা দেখলেন — তাঁদের একদম পাশেই ভবের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ঐ সেনাপতি।

বিপদমুক্তির আনন্দে পলাতক কাফেলাটির সকলেই চারদিক থেকে ছুটে এসে ঘিরে ধরলেন শরীফ রেজাকে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সবাই তাঁরা মুখর হয়ে উঠলেন। মাননৃপতির স্ত্রী হিরামতি দেবী পড়িমরি ছুটে এসে নানা ভাষায় শরীফ রেজাকে দোয়া-আশীর্বাদ করতে লাগলেন এবং সস্নেহে তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। শরীফ রেজাও তাঁকে কখনও দেখেননি। তিনিও শরীফ রেজাকে চেনেন না। "বেঁচে থাকো বাবা, দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমাকে চিরসুখী করুন, যশমান দান করুন! যে বিপদ থেকে আজ তুমি আমাদের বাঁচালে, ভগবান তোমার জীবনের সকল বিপদ হরণ করুন"— ইত্যাদি বলতে বলতে হিরামতি শরীফ রেজার গায়ে মাথায় হাত বুলানোর কালে শরীফ রেজার কপালে তাঁর হাত পড়তেই আঁতকে উঠলেন তিনি। বললেন — ওমা! একি! এযে অনেক খানি কেটে গেছে! রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে! হায় — হায় — হায়! এখনও বাঁধা হয়নি কপালটা।

— বলেই তিনি তাঁরপাশে নত মস্তকে দণ্ডায়মানা তাঁর কন্যাকে সম্বোধন করে বললেন — লতা, শিগগ্রির দেতো মা এক টুকরো নেক্‌রা বা যা হোক একটা কিছু। পৌটলাটাতো তোর কাছেই আছে। দে দে, শিগগ্রির দে —

পোঁটলাটা তাঁর কখন যে হাত ছাড়া হয়ে গেছে লতা তা নিজেও জানেন না। মায়ের এই নিরতিশয় ব্যস্ততায় দিশেহারা হয়ে তিনি তাঁর পরণের শাড়ীটারই এক প্রান্ত পড় পড় করে ছিঁড়ে ফেললেন এবং তা তাঁর মায়ের হাতে দিলেন। হিরামতি দেবী তখন শরীফ রেজার রক্ত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কোথা থেকে এতবড় বস্ত্রখণ্ড এলো তা খেয়াল করতে গেলেন না। বস্ত্রখণ্ড পেয়েই তিনি ক্ষিপ্র হস্তে জড়িয়ে পেঁচিয়ে শরীফ রেজার মাথা-কপাল বেঁধে ফেললেন এবং একইভাবে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

'লতা' বলে ডাক দিতেই শরীফ রেজা একপাশে দণ্ডায়মানা কিশোরীর দিকে তাকালেন। কিন্তু তিনি তাঁর মুখ দেখতে পেলেন না। একে অন্ধকার রাত্রি, তদুপরি লতা তখন নত মস্তকে থাকায় অন্ধকার তাঁর মুখখানা আরো বেশী আড়াল করে ফেলেছিল। মাথা বাঁধা সারা হতেই শরীফ রেজা সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন — কিন্তু আপনারা — মানে —

সঙ্গে সঙ্গে হিরামতি বললেন—আমি ঐ মাননৃপতির স্ত্রী বাবা। আর এই যে পিছনে আমার এ পাশে দাঁড়িয়ে, এই লতা আমার মেয়ে। আমরা ঐ ভূদেব নৃপতির প্রাসাদ থেকে পালিয়ে এসেছি। এরাও সবাই আমাদের মতোই পালিয়ে এসেছে।

চারপাশে দণ্ডায়মান লোকজনদের প্রতি ইঙ্গিত করলেন হিরামতি দেবী। শুনেই শরীফ রেজা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন — কেন ? পালালেন কেন আপানারা ?

ঃ ওখানে মহাবিপদ সৃষ্টি হয়েছে বাবা। ওখানে থাকলে আর জাত ইজ্জত থাকবে না বা তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

ঃ কেন — কেন ?

ঃ ওখানে সবাইকে ধরে ধরে মুসলমান বানানো হচ্ছে। যে বিপদের ভয়ে স্বামীর ঘর ছেড়েছি আমি, ওখানেও আবার সেই বিপদ শুরু হয়েছে।

ঃ বলেন কি! জোর করেই মুসলমান করছে সবাইকে ?

ঃ জোর করেই তো। এই দেখো না, আমি মুসলমান হবো না, আমার এই মেয়ে মুসলমান হবে না বা হতে আমি দেবো না, তবু জোর করেই ওকে ধরে মুসলমান বানানোর চেষ্টা করেছে সবাই। শুধু চেষ্টাই নয়, এর উপর আবার আর একজন মুসলমানের সাথে বিয়েও তাকে দিতে গিয়েছে জোর করেই। আমার আত্মীয় ঐ ভূদেব নৃপতিও ঐ দলে। কি আর করি! ফাঁক পেয়েই পালিয়ে এসেছি বাবা। জান যায় যাক, জাত দিতে পারবো না।

শরীফ রেজার পায়ের তলে জমিন তখন দুলছে। কি করবেন তিনি, কি বলবেন তিনি — কিছুই স্থির করতে পারলেন না। একটু পরে ফের

প্রশ্ন করলেন — আপনারা তাহলে, মানে আপনার মেয়েকে তাহলে মুসলমান হতে দিতে চান না আপনি ?

প্রবলবেগে আপত্তি তুলে হিরামতি বললেন — না, বাবা না। কখ্খনো না। জান গেলেও না।

ঃ কিন্তু মেয়েতো আপনার মুসলমান হয়ে গেছে।

হিরামতি দেবী আঁতকে উঠে বললেন — আমি স্বীকার করি না — আমি স্বীকার করি না।

ঃ আপনার মেয়ের বিয়েটা ?

ঃ না-না, কিছুতেই না। মুসলমান হওয়াই স্বীকার করিনে আমি, তার উপর আবার বিয়ে ? ম্লেচ্ছের সাথে মেয়ে বিয়ে দেবো আমি ? জীবন থাকতে নয়।

ঃ কিন্তু —

ঃ কিন্তু নেই বাবা। এ যাবত শুনেছি, মুসলমানেরা কাউকে জোর করে মুসলমান করে না। এখন দেখছি, সে শুনা আমার ভুল।

এরপর শরীফ রেজার করার কিছুই ছিল না আর। কিন্তু তবু তিনি নিজেকে প্রবোধ দিতে পারলেন না। আবার প্রশ্ন করলেন — আপনার মেয়েরও কি তাই মত ? উনিও কি এই বিয়ে বা মুসলমান হওয়া — কোনটাই স্বীকার করেন না ?

আপত্তির জোর বাড়িয়ে দিয়ে হিরামতি দেবী বললেন না-না, একদম না। জোর করে মুসলমান করলেই আর বিয়ে দিলেই কেউ তা স্বীকার করে ?

— বলেই খানিকটা দূরে দণ্ডায়মান তাঁর কন্যাকে তিনি ডাক দিলেন। কন্যা তাঁর কাছে এলে তিনিই তাঁকে প্রশ্ন করলেন — এই লতা, তুই বলতো, তুই মুসলমান হতে চাস্ ?

নতমস্তকে থেকেই কন্যা তাঁর দ্রুতবেগে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন। মুখে বললেন না।

ঃ তুই তোর ঐ বিয়ে স্বীকার করিস্ ?

একইভাবে মাথা নেড়ে আবার তিনি আওয়াজ দিলেন — না।

অন্ধকার হলেও শরীফ রেজা তাঁর মাথা নাড়াটা আব্ছা আব্ছা বুঝতে পারলেন এবং নিজের কানে স্পষ্টভাবে তাঁর মুখের 'না' শব্দটি শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হিরামতি দেবী আরো প্রত্যয়ের সাথে বললেন — এবার তো বিশ্বাস হলো বাবা ? পালাবো না, আর থাকবো ওখানে কি কারণে ?

শরীফ রেজার চোখের সামনে তখন গোটা বিশ্বটাই বনবন করে ঘুরছে। তাঁর সদ্য বিবাহিত স্ত্রী তাঁর মুখের সামনে প্রবল বেগে অস্বীকার করছে বিয়ে তাঁদের। এ লজ্জা তিনি আর রাখেন কোথায়? একবার তাঁর ইচ্ছে হলো, নিজের পরিচয় দেয়ার। কিন্তু তিনি ভেবে দেখলেন, তাতে আর একটা অবাঞ্ছিত দৃশ্যেরই পয়দা হবে শুধু। এই যখন তাঁদের মানসিক অবস্থা, মুসলমান হওয়া বিয়ে হওয়া কোনটাই যখন কিছুতেই তাঁরা স্বীকার করতে চান না, তখন পরিচয় দেয়া স্রেফ একটা বিড়ম্বনা! কাজ নেই আর বিড়ম্বনা বাড়িয়ে! এমনিতেই ঢের শিক্ষা হয়েছে তাঁর!

অনেক সময় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর শরীফ রেজা নির্জীব কণ্ঠে বললেন — তাহলে বলুন, আর আমি আপনাদের জন্যে কি করতে পারি?

হিরামতি দেবী এবার ব্যাকুলকণ্ঠে অনুনয় করে বললেন — ঐ আর কয়েক ক্রোশ বাবা! এখান থেকে ধলভূমের মাঝামাঝি গেলেই আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী আছে। আপাততঃ ওখানে পৌঁছতে পারলেই সবাই আমরা নিরাপদ। আমার বাপের বাড়ী উৎকলে। ওখান থেকেই মেয়েকে নিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই আমি উৎকলে চলে যাবো। আমাদের কোনমতে আমার ঐ আত্মীয়ের বাড়ীতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করো বাবা। কিছু লোক দাও, যেন আর কোন বিপদ না হয়!

শরীফ রেজা আর কথা বাড়ালেন না। তাঁর পরিচয়টাও যখন জানতে চান না ভদ্র মহিলা, তখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি! তাঁর ফৌজের এক অংশকে এই কাফেলাটি পাহারা দিয়ে নিয়ে তাঁদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেয়ার আদেশ দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে এবং দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন — বিধানমতে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী তাঁকে ফেলে অবহেলে অজানার পথে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

এরপর কয়েক বছর কেটে গেছে। অনেক পানি ইতিমধ্যেই গড়িয়েছে বাঙ্গলা মুলুকের নদী দিয়ে। লাখ্‌নৌতির মসনদে অতপর গিয়াস উদ্দীন বাহাদুর এসেছেন, নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম এসেছেন, এখন কদর খান উপবিষ্ট। সাতগাঁয়ের প্রশাসনেও আর উলুগ জিয়া খান এখন নেই। তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বাহরাম খানও পাড়ি দিয়েছেন সোনার গাঁয়ে। আজম মালিক বা ঈজউদ্দীন ইয়াহিয়াই এখন সাতগাঁয়ের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। শায়খ শাহ শফীও এখন মোকামে তাঁর মজবুত হয়ে বসে গেছেন। এখন তাঁর বয়স হয়েছে। জেহাদ লড়াইয়ের সাথে সরাসরি আর সম্পর্ক তাঁর নেই বললেই চলে। প্রয়োজনীয় লড়াইটুকু এখন শরীফ রেজাকেই লড়তে হয় বা তাঁর অনুপস্থিতিতে শায়খ সাহেবের অন্যান্য খাদেম-মুরিদ্‌রাই লড়েন। শায়খ এখন পুরোপুরি ইবাদত নিয়ে থাকেন। শায়খ সাহেবের হুকুমে এবং লাখ্‌নৌতির প্রয়োজনে ইতিমধ্যেই শরীফ রেজা লাখনৌতিতে গিয়ে কিছু দিন নকরী করেও এসেছেন। মনটাকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে না পেরে এরই মাঝে কয়েকবার ধলভূমের কাছাকাছি হিরামতি বা লতাদের সেই আত্মীয়ের বাড়ীতেও গিয়েছেন শরীফ রেজা। কিন্তু সন্ধান পাননি কিছুই। রাঢ় অঞ্চলে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য দেখে, তাঁদের সেই আত্মীয়েরাও উৎকলে না কোন দিকে চলে গেছেন — সে সন্ধান তাঁকে কেউ দিতে পারেনি। ঐ ঘটনার কিছুদিন পর মাননৃপতিও পরলোক গমন করেছেন। তাঁর জিন্দেগীর দুঃস্বপ্ন ঐ লতার আর কোন হদিসই তাঁর কাছে নেই এখন।

সাতগাঁয়ের দিকে ছুটে চলেছে শরীফ রেজার অশ্ব। এসব কথা ভাবছেন আর শরীফ রেজা একবার করে হাত বুলাচ্ছেন তার কপালের ঐ কাটা দাগের উপর। এই দাগের হদিস্ জানতে চান আজ কনকলতা। তাঁর জিন্দেগীর এই চরমতম জিল্লতির, তার দীলের এই নিদারুণ দিল্লাগীর কথা কোন মুখে আজ কনকলতাকে বয়ান করে শোনাবেন তিনি!

এসব কথা ভাবতে ভাবতে শরীফ রেজার অশ্ব সাতগাঁয়ে তাঁর শায়খ হুজুরের মোকামে এসে দাঁড়ালো।

৬

অশ্ব থেকে নেমে শরীফ রেজা শায়খ শাহ শফীউদ্দীন সাহেবের সামনে এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালেন। সালাম নিয়ে শায়খ সাহেব কিছুক্ষণ শরীফ রেজার মুখের দিকে এক নজরে চেয়ে রইলেন। এরপর হাত ইশারায় তিনি শরীফ রেজাকে কাছে এসে বসতে বললেন। শরীফ রেজা নির্দেশ পালন করার পরও শায়খ সাহেব নিমেষ কয়েক কোন কথাই বললেন না। একইভাবে আরো কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর তিনি ধীরে ধীরে বললেন — চোখমুখ যে শুকিয়ে গেছে বিলকুল! খুবই না-উম্মিদ হয়েছো?

শরীফ রেজা সংকোচের সাথে বললেন — হুজুর —

একই রকম দরদী কণ্ঠে শায়খ আবার বরলেন — চোখ দু'টো একদম গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছো বলে মনে হচ্ছে?

ঃ জি — মানে, পথ তো খুব দূরের। এতটা পথ পেরিয়ে আসার পেরেশানীতেই হয়তো —

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ। সফরের তকলিফ তো একটা আছেই। তুমি তো আবার সোনার গাঁয়ের ওদিক থেকেই আসছো বোধ হয়?

ঃ জি-জি।

ঃ অনেক লম্বা সফর। কিন্তু তোমার চোখেমুখে যে আজাব ফুটে উঠেছে, তাতে শুধু ঐ পথের পেরেশানীটাই নেই। ওখানে দুশ্চিন্তার ছাপও রয়েছে সুস্পষ্ট। একমাত্র পথের পেরেশানীতেই কারো চোখমুখ এতটা পুড়ে না।

শরীফ রেজা তাজ্জব হলেন শায়খ সাহেবের অর্ন্তদৃষ্টির গভীরতা দেখে। নির্মম স্মৃতির নিরন্তর দহন যেহারে তামাম পথ দগ্ধ করেছে তাঁকে, শরীফ রেজা সে কথা এত শিগ্‌গির ভুলেননি। তিনি সসংকোচে বললেন — জনাব!

ঃ তোমার মতো এমন একজন মজবুত সেপাইকে এত শিগ্‌গির ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন?

ঃ হুজুর!

ঃ সোনার গাঁয়ের খবর আমি শুনেছি। বাহরাম খান সোনার গাঁকে যেভাবে তাঁর কব্জার মধ্যে এনেছেন, তাতে আর আপাততঃ কোন আশাই নেই — ব্যাপারটাতো এই রকম, না কি বলো?

ঃ জি-জি, ঠিক তাই।

ঃ কিন্তু তাতে এত হতাশ হওয়ার কি আছে? সব কিছুইতো এ দুনিয়ায় হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় না। তার জন্যে ধৈর্য ধরতে হয়, এন্তেজার করতে হয়। সাধনা করতে হয়।

ঃ অবশ্যই-অবশ্যই। কিন্তু আমি তো হুজুর এ ব্যাপারে না-উম্মিদ কিছু হইনি?

ঃ তোমার মুখতো তা বলে না।

শুষ্ক ওষ্ঠাধরে ক্লিষ্ট একটা হাসির রেখা টেনে শরীফ রেজা সলজ্জভাবে মাথা নীচু করলেন। এরপর মৃদুকণ্ঠে কৈফিয়াত দিয়ে বললেন — ওটা কিছু নয় হুজুর। ওটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাজনৈতিক ব্যাপার কিছু নয়।

শরীর আর মনের উপর আমার খানিকটা চাপ গেছে বলেই হয়তো এতটা কাহিল দেখাচ্ছে আমাকে।

শায়খ সাহেব জিজ্ঞাসু নেত্রে শরীফ রেজার মুখের দিকে তাকালেন। এবার মুখ তুলে শরীফ রেজা স্বচ্ছকণ্ঠে বললেন — সোনার গাঁয়ের ব্যাপারে আমার আফছোস্‌ আছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে একেবারেই না-উম্মিদ বা হতাশ আমি নই।

ঃ তাহলে যে এত শিগ্‌গির ফিরে এলে সাতগাঁয়ে? বর্তমানে করার কিছু না থাকলেও, ভবিষ্যতের ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার তো নিশ্চয়ই কিছু ছিল তোমার ওখানে? নাকি সোলায়মান খান সাহেব বা ঐ কিসিমের কোন কারো কাছেই কোন রকম সাড়া-উৎসাহ পাওনি?

ঃ জিনা হুজুর, পেয়েছি — পেয়েছি। বহুৎ পেয়েছি।

ঃ তাহলে এত জলদি ওখান থেকে চলে এলে যে তুমি?

শরীফ রেজা পুনরায় মাথা নীচু করলেন। ক্ষণিক নীরব থেকে ধীরকণ্ঠে বললেন — এ প্রেক্ষিতে আমার কর্তব্য সম্বন্ধে হুজুরের সঠিক নির্দেশ কিছু পাইনি। আর তা ছাড়া —

ঃ তাছাড়া?

ঃ হুজুরের খেদমত—মানে তয়তদরিবটা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা — এ খবরটা রাখতেই পারিনি অনেক দিন। এ ব্যাপারে অনিশ্চিত থেকে, কি করে আমি আরো সময় ওখানে বসে কাটাই?

দরবেশ সাহেব এ জবাবে তুষ্ট হতে পারলেন না। নাখোশ কণ্ঠে বললেন — স্রেফ এই জন্যই চলে এলে? আমাকে দেখার তো অনেক লোকই আছে এখানে। এর জন্যে তোমাকে আসতে হবে কেন?

ঃ তবু হুজুর, নিজে এসে দেখে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে না পারলে —

ঃ ওদিকের চেয়ে এই কাজই বড় হলো তোমার?

ঃ হলো বৈকি হুজুর! আপনি কোন তকলিফে থাকলে, আপনার খেদমত করা ছাড়া অন্য কোন কাজই আমার কাছে বড় নয়।

শরীফ রেজার বিনীত মস্তক আরো খানিক নত হলো। তা লক্ষ্য করেও শায়খ সাহেব শক্তকণ্ঠে বললেন — আমার সেবা করাটা এমন কোন কঠিন বা দুরূহ কাজ নয়। অনেক লোক মোকামে আমার আছে। ভক্তমুরিদ ছাড়াও মাইনে করা অনেক লোক। এদের যে কেউই এ কাজটা করতে পারবে। কিন্তু তোমার কাজটা? তোমার যে কাজ, সে কাজটা করতে পারে, এমন লোক কয়টা আছে গোটা দেশে?

ঃ হুজুর!

ঃ এতবড় শক্ত আর জরুরী কাজ ফেলে এই ফালতু কাজ নিয়ে তোমার এত উতলা হলে চলবে কেন ?

ঃ আপনার খেদমত করাটা আমার ফাল্‌তু কাজ হলো হুজুর ?

ঃ একদম ফাল্‌তু কাজ। গোটা এই বাঙ্গালা মুলুকের স্বার্থরক্ষার তুলনায়, বাঙ্গালা মুলুকে আমাদের কওমের তথা দ্বীন ইসলামের ফায়দা হাসিলের তুলনায় আমার খেদমতটা একদম একটা ফাল্‌তু কাজ। দ্বীনের কাজের চেয়ে ব্যক্তির কাজকে বড় করে দেখার অর্থই হলো — নিজেকে তো বটেই, সেই সাথে সেই ব্যক্তিটাকেও গুনাহ্‌গার বানিয়ে দেয়া।

ঃ জনাব!

ঃ তোমার তো এটা না বোঝার কথা নয় যে, ইসলামের সার্থেই এ মুলুকটা আজাদ হওয়া প্রয়োজন। আর সে আজাদীর পক্ষে মেহনত দেয়া মানেই দ্বীনের খেদমত করা।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ এ মুলুকের আজাদী না এলে, বর্তমান অবস্থায় দ্বীনের কাজে স্থবিরতা নেমে আসবে, স্বাচ্ছন্দ আসবে না। বরং বলা যায়, দ্বীনের কাজ ব্যাহতই হতে থাকবে অতপর।

ঃ হুজুর!

ঃ মাইনে করা গোলাম দিয়ে দ্বীনের কাজ হয় না। বাঙ্গালার সুলতান শাম্‌সউদ্দীন ফিরুয শাহের আমলে এ মুলুকে দ্বীনের কাজ যা হয়েছে, দিল্লীর এসব গোলামদের আমলে তার শত ভাগের একটা ভাগও হওয়ার ভরসা কম। দিল্লীর এসব গোলামেরা অর্থাৎ এই শাসকদের সকলেই অস্থায়ী শাসক। তাঁরা নিজেরাই জানেন না, কখন তাঁদের এ মুলুকের শাসনকর্তার পদ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হবে। কাজেই এ মুলুকে দ্বীন-ইসলাম ডুবলো, না ভাসলো, এ নিয়ে থোড়াই এদের মাথা ব্যথা আছে। একমাত্র স্বাধীন সুলতানদেরই এ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আছে জিয়াদা।

রাজনীতিবিদ শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবও সেদিন এই কথাই শরীফ রেজাকে বলেছিলেন। ধর্মপ্রাণ শায়খও আজ এই কথাই বলছেন। শরীফ রেজা চমৎকৃত হলেন এই দুইয়ের চিন্তাধারার মিল দেখে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন দিয়ে বললেন — জি জনাব, একথা একদম দিনের মতো পরিষ্কার।

ঃ বুঝতে কোন তকলিফ নেই তো আর তোমার ?

ঃ জি-না হুজুর। জাররা মাত্র নেই।

ঃ আমার তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোন সঠিক নির্দেশ তোমার প্রতি নেই — এই তো তোমার কথা ?

ঃ জি হুজুর। সেটা তো আমার চাই।

ঃ এখন তোমার প্রতি আমার সেই সঠিক নির্দেশ হলো — অতপর এই দিকটা নিয়ে তুমি চিন্তা-ভাবনা করবে আর এ কাজের প্রয়োজনে যখন যা করার দরকার, সেইটেই করে বেড়াবে। অন্য কথায়, এখন থেকে এইটেই তোমার একমাত্র কাজ।

ঃ বহুত্ আচ্ছা হুজুর।

ঃ আমাকে দেখবেন আল্লাহ্‌ তায়ালা। তোমাকে এ নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। এক দীলে এক নিয়াতে এর পেছনেই লেগে থাকবে তুমি।

ঃ হুজুরের এযাযত হলে, এর পেছনে হরওয়াক্ত মেহনত দিতে আমি আদৌ তকলিফ বোধ করাবো না।

ঃ সেই এযাযতই তোমাকে আমি দিলাম। সোনারগাঁ যাবার আগে যদি আমার সাথেই মোলাকাত হতো তোমার, তাহলে আগেই আমি এ নির্দেশ দিয়ে রাখতাম তোমাকে।

ঃ হুজুর!

ঃ বর্তমানে সম্ভাবনা ক্ষীণ মনে হলেও, হাল ছাড়লে চলবে না। এ মুলুকের আজাদীর পক্ষে যখন যে ডাক আসবে, তা যত নগণ্যই হোক, তাতে সাড়া দেয়া এ মুলুকের প্রতিটি মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব।

ঃ অবশ্যই হুজুর, অবশ্যই।

ঃ আজ হোক, কাল হোক আর দশ বছর পরে হোক, এ মুলুকটা আজাদ করা দ্বীনের খাতিরেই সবিশেষ প্রয়োজন। এখন থেকেই এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজেই তুমি থাকবে।

ঃ আমি তৈয়ার জনাব। যদিও আমার তাকত্ খুবই সীমিত আর প্রশাসনের কোন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের লোকও আমি নই, তবু আমার যতটাসাধ্য তা অবশ্যই আমি করবো।

ঃ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে যারা আছেন, তাঁদের তো এ ব্যাপারে উৎসাহ আর মদদ দিতে পারবে ?

ঃ জি, তাতো হুজুর পারবোই।

ঃ তাতেও অনেক কাজ হবে। একদিনেই তো বৃহৎ কিছু হয় না। প্রচেষ্টা চালু থাকলেই একদিন না একদিন মকসুদ হাসিল হয়ই।

ঃ জি — তা বিলকুল ঠিক।

ঃ এখন যাও। অনেক দূর থেকে এসেছো। পেরেশানীতে খুব কাহিল আছো তুমি। আগে বিরাম নাও, পরে এ নিয়ে আরো আলাপ করা যাবে।

ঃ জি আচ্ছা।

শায়খ সাহেব অন্যদিকে নজর দিলেন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন শরীফ রেজা।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরীফ রেজার সাতগাঁ থেকে লাখ্নৌতি যাবার কথা। তবে লাখ্নৌতি যাওয়াটা এমন জরুরী কিছু ছিল না। তাই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সহজেই পাল্টে গেল লক্ষ্য তাঁর। শায়খ সাহেবের আগ্রহের কারণে মাস খানেকের মধ্যেই শরীফ রেজা ফের সাতগাঁ থেকে বেরুলেন। লক্ষ্য তাঁর পুনরায় ঐ ভুলুয়া। কাজ তাঁর বাঙ্গালা মুলুকের আজাদী নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করা এবং সেই মোতাবেক সেই কাজে মেহনত দান করা।

মেহনত দানে শরীফ রেজা সততই তৈয়ার। কিন্তু মেহনত নেয়ার ওয়াক্তটা এখনও অনেক দূরে। চিন্তা–ভাবনার ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা গৌণ এখন। এরজন্যে তাঁর মাথার উপর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আছেন আরো কয়জন। কাজেই, শরীফ রেজার কাজটা এখন একেবারেই মামুলী আর সেই কারণেই, হাতে তাঁর সময় এখন অনেক। শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব এসে ভুলুয়াতে শক্ত হয়ে বসার আগে আপাততঃ করার তাঁর তেমন কিছুই নেই।

দেশের টানে শরীফ রেজা সাতগাঁ থেকে বেরুলেন। কিন্তু দীলের টানটা বিলকুলই এড়িয়ে যেতে পারলেন না। দীলে তাঁর দাগ কেটেছেন কনকলতা। অথচ সে-ও আর এক কুহেলিকা। স্বভাবে তো বটেই, পরিচয়ও তাঁর প্রশ্নবোধক। কনকলতার আদি নিবাস ত্রিবেণী। ত্রিবেণীরই মেয়ে তিনি। তাঁর আত্মীয়-স্বজন গোত্রীয়জন ত্রিবেণীরই বাসিন্দা। যথার্থ পরিচয়দানে অনিচ্ছুক এই অসমান্যা সুন্দরীর কি রয়েছে পেছনে ? কেন তার পিতৃপরিচয় এমন আজবভাবে অজ্ঞাত ? কেনই বা তা জানতে দিতে দবির খাঁ পালোয়ান এত উগ্রভাবে অনাগ্রহী ? তবে কি তা অবাঞ্ছিত কিছু ? কিংবা তা কি অনিশ্চিত এক প্রশ্ন ? কোন কলংক বা অপ্রিয় কোন প্রসঙ্গ কি বিদ্যমান সেখানে ? পঙ্কেজাত পদ্মের মতো কনকলতা কি পংকজ ? কোন স্বচ্ছ পানির পবিত্র পুষ্প নন ?

এমনটি ভাবতেও শরীফ রেজার দীলটা টনটন করে উঠে। ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব বলেছেন, কনকলতা, এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের

মেয়ে। জাতে গোত্রে তাঁর মা-বাপেরা উঁচু বংশের মানুষ। কিন্তু শরীফ রেজার দীলে এখন জিজ্ঞাসা — ফৌজদার সাহেবই কি সব খবর জানেন তাঁর ? শরীফ রেজার স্ত্রী লতা ওরফে লতিফারও পিতৃ পরিচয় দিতে উৎসাহী কেউ ছিলেন না। তাঁর মুসলমান পিতাকে নিয়ে ও পক্ষের কোন লোকই গর্ববোধ করেননি। তবে প্রসঙ্গ এলেই মাননৃপতির নাম এসেছে সংগে সংগে। তা নিয়ে কোন জড়তা তখন কারো মধ্যে থাকেনি। কিন্তু কনকলতার ব্যাপারে তো এই স্বাভাবিকতা নেই ? তার ব্যাপারে মাত্রাধিক এই সাবধানতা কেন ?

এ ধরনের হাজার প্রশ্ন শরীফ রেজার দীলে এখন। হাজার প্রশ্নে হাজার চিন্তায় মন মেজাজ তার এলোমেলো। স্ত্রী লতিফা বানু বেগম ফের লতা হয়েই রয়ে গেল। লতিফা আর হলো না। সে এখন উৎকলে। কার ঘর সে করছে এখন বা কোন হালতে আছে সে, সুদূর ও শত্রুমুলুক উৎকলে ছুটে গিয়ে সে হদিস করাটাও সহজ নয়, সে আগ্রহও আর শরীফ রেজার নেই। যা হবার নয়, তার পেছনে শ্রম দেয়া অর্থহীনই নয় শুধু, বাতুলতাও বটে। কিন্তু ঐ লতার মতো কনকলতা দূরের কোন ব্যাপার নয়। ত্রিবেণীও উৎকলের মতো দূর্গমমুলুক নয়। নিজ মুলুকের অভ্যন্তরে হাতে কাছের ব্যাপার। তাই যতটা সম্ভব, শরীফ রেজা কনকলতার হদিস করতে চান। খোজ খবরের মাধমে এই গোলক ধাঁধার আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চান তিনি। অনিশ্চয়তার অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলতে চান।

অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন শরীফ রেজা। সরাসরি ভুলুয়ার পথ না ধরে দক্ষিণ দিকে ঘুরলেন। ভুলুয়ার পথ বাঁয়ে রেখে ত্রিবেণীর পথ ধরলেন অতিরিক্ত সময় যা ব্যয় হবে এই প্রয়াসে, এক্ষণে তা তাঁর কাছে মোটেই কিছু উদ্বেগজনক নয়।

ছোটবড় কয়েকটি নদনদী পেরিয়ে তিন নদীর সংগমস্থল ত্রিবেণীতে হাজির হলেন শরীফ রেজা। নদীর দেশ ত্রিবেণী। প্রায় দিকেই নদী। ক্ষুদ্র-বৃহৎ,, তরাট-গভীর, হরেক রকম স্রোতস্বিনী। তামামগুলোই ব্যস্ত নদী। সর্বত্রই মৎসজীবীদের এন্তার তৎপরতা। শীর্ণভরাট মরাগাঙে মাছ শিকারের ভিড়টা আরো বেশী। ছোট ছোট জেলেডিঙ্গি আর ক্ষুদে ক্ষুদে মাছ শিকারী অগভীর নদী নালা মাতিয়ে রাখে সর্বক্ষণ। মৎসজীবি পক্ষীকুলেরও নজরটা এই দিকেই। ভরাগাঙে বরাত এদের অনউদার। বড় গাঙে ভেসে বেড়ায় বৃহ জেলের বহর। বিশাল বিশাল নৌকা আর মস্ত মস্ত জালের স্তূপ। জালের নাম 'জগৎ-বেড়'। চাপ্ড়া-ফেঁছি-ঘোর জাতীয় জাল। উজানভাটি দূর দূরান্তে ঘুরে বেড়ায় বহরগুলো।

জেলের বহর ছাড়াও নদীগুলোর বুক চিরে আরো অনেক নৌযান ও নৌকার বহর ছোটে। যাতায়াতের নিমিত্তে নৌপথই এ অঞ্চলের সহজ-সুলভ পথ। পান্‌সি ছিপ্ উবারা নাও যাত্রী নিয়ে দিনরাত্রি উজান ভাটি করে। পাশাপাশি মালটানে অসংখ্য পালের নাও। মাল টানে দাঁড় টানা কশা আর গুদাম ছইয়ের বিশালাকার নৌবহর। ছোট ছোট জাহাজও ত্রিবেণীর নদনদীতে হামেশাই ঘোরে।

নিকটেই সমুদ্র। ত্রিবেণী স্রেফ শহরই নয়, একটা সুবিখ্যাত বন্দর। মালামাল চলাচলের মস্তবড় মোকাম। বিভিন্ন দিক থেকে মাল আসে নৌপথে। ত্রিবেণীর বন্দর হয়ে মাল যায় নানা দেশে। ধান, যব, তিল, তিসি। গাঁইট গাঁইট সূতী কাপড়। তাঁতে বোনা শাড়ি-চাদর-থান। মাঠে মাঠে ফসল ফলায় কৃষকেরা। ঘরে ঘরে কাপড় বোনে তাঁতী। হরেক রকম পণ্য আর পসারের যোগান দেয় বাঙ্গালার কারিগর আর সৌখিন শিল্পীরা। সওদাগর আর ব্যবসায়ীরা পণ্য পাঠায় নানাস্থানে। স্বদেশের সর্বত্র আর বিদেশের বন্দরে। লাখনৌতি ও রাঢ় অঞ্চলের বৈদেশিক বাণিজ্যের ত্রিবেণীই মূলঘাঁটি। ত্রিবেণীর নদীবন্দর পেরিয়ে মাল যায় নিকটবর্তী সামুদ্রিক বন্দরে। সামুদ্রিক বন্দর থেকে আমদানীকৃত মালামাল ত্রিবেণীর পথ ধরেই রাঢ়ে আর লাখ্‌নৌতিতে ঢোকে। ফলে এ অঞ্চলের নৌপথ অত্যন্ত ব্যস্ত পথ। ত্রিবেণীর বাজার বন্দর অত্যন্ত ব্যস্ত স্থান।

বোঝার উপর শাকের আঁটি। ত্রিবেণী এ অঞ্চলের হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। গঙ্গার ধারাসহ ত্রিধারার মিলনক্ষেত্র ত্রিবেণী। নদীয়ার চেয়েও তৎকালীন হিন্দুদের এটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পুণ্যস্থান। বিশেষ বিশেষ লগ্নতিথি ছাড়াও বাঙ্গালার পুণ্যকামী হিন্দুরা সংবৎসর ভিড় জমায় ত্রিবেণীতে।

শরীফ রেজা এই ত্রিবেণীতে খুঁজতে এলেন কনকলতার ঠিকানা। জানতে এলেন কনকলতার ঠিকুজি। ত্রিবেণীতে এসে তিনি পথে পথে ঘুরতে লাগলেন কনকলতার আত্মীয় আর গোত্রীয়জনের সন্ধানে। পয়লা পয়লা সপুলকেই ঘুরলেন। এরপর তাঁর পুলক ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসতে লাগলো। ফৌজদার সোলায়মান খানের মকানে সবার আম্মিজান হলেও, কনকলতা ত্রিবেণীর কোন সার্বজনীন আম্মি নন। ত্রিবেণীর তিনি রাণী বা খাশ মহলের মালেকা নন। কোন বীরাঙ্গনা নারী বা প্রাতঃস্মরণীয়া ব্যক্তিত্ব নয়। অন্য কোন কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠাও নন তিনি। কনকলতা স্রেফ একটা নাম। জনবহুল ত্রিবেণীর হাজারটা কনকলতার তিনি এক কনকলতা। কনকলতা নামের পুণ্যকামী বহিরাগত শতাধিক মেয়ের

মতোই তিনি একটি মেয়ে। এই অগণিত কনকলতার কোনটিকে চান তিনি, তা নির্দিষ্ট করে বলার মতো কোন তথ্য শরীফ রেজার ছিল না। কনকলতা রূপসী। ত্রিবেণীর বাজারে এই রূপ কোন বৈচিত্রময় পরিচয় নয়। ত্রিবেণীর মহাতীর্থে রূপ-রঙ্গের সমারোহ নিত্যদিনের ঘটনা। চারুলতা তরুলতা বনলতার বাইরে, কনকলতা নামের তামাম রমণীকুলের মাঝে স্রেফ এক রমণীই রূপলাবণ্যের কুল্লে স্বত্বাধিকারিণী হবেন, এমন কোন কথা নেই। ঐ নামের আরো অনেক রূপসী ও সুন্দরী ত্রিবেণীতে ছিল এবং আছে। এদের কোন জনের হদিস জানতে চান তিনি, শরীফ রেজা এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি।

কাজেই কনকলতাকে খুঁজতে নেমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শরীফ রেজা বুঝলেন, এর চেয়ে পরশ পাথর খুঁজে বেড়ানোও সহজ। না দেখলেও পরশ পাথরের ধরন-গড়ন আর গুণাবলীর অনেক ধারণাই অনেকজনের আছে। কিন্তু শরীফ রেজার মনোরাজ্যে বিরাজমান কনকলতার কোন আঁক-আকৃতিই কোন লোকের জানা নেই, ঠাঁই ঠিকানা পড়ে মরুক।

যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন শরীফ রেজা। সম্ভাব্য সকল স্থান ও পরিবারের সাথে পাত্তা লাগানোর চেষ্টা করলেন। ঘুরে ঘুরে হয়রান হওয়ার পর শরীফ রেজা অবশেষে বাজার-বস্তি-লোকালয় ত্যাগ করে ফাঁকে এলেন এবং ঘোড়ার লাগাম টেনে নিয়ে তিন নদীর মূল ধারার তীরে এসে দাঁড়ালেন। সামনেই তাঁর গুদার বা খেয়াঘাট। তিনি স্থির করলেন, খেয়াঘাট পেরিয়ে ভুলুয়ার পথ ধরবেন তিনি। অনর্থক পেরেশান হয়ে ফায়দা নেই।

বিপুল বেগে বয়ে যাচ্ছে ত্রি-নদীর মূল ধারা। ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে স্রোত। উত্তাল তরঙ্গের বেসামাল ধাক্কায় চাপ চাপ ভেঙ্গে পড়ছে দুই পাড়ের মাটি। যেন দুনিয়ার তামাম পানি সাগরে যাওয়ার জন্যে একসাথে পাগল হয়ে উঠেছে। কার আগে কে যাবে, বাহাজটা তারই। এক ধারা ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছে আরেকটাকে। এই স্রোতের পেটকেটে এপার ওপার যাতায়াত। মাঝগাঙে দোলখাচ্ছে গুদারের ভরা নাও। মাঝ দরিয়ার তুফানে খেয়াতরী টালমাটাল। এপার থেকে যাত্রীদের ওপার নিয়ে ফেলছে। ওপার থেকে পুনরায় যাত্রী আনছে এপারে। সকাল-সন্ধ্যা প্রতিদিন।

এক নজরে চেয়ে আছেন শরীফ রেজা। ওপার থেকে খেয়াতরী এপার এসে ভিড়লে তবেই তার নদীপারের পালা। খেয়াঘাটে ভিড় জমেছে

লোকের। ভিড় এড়িয়ে ফাঁকেই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। দাঁড়িয়ে রইলেন স্রোতস্বিনীর খাড়া পাড়ের উপরে। খেয়াঘাট পাড়ের নীচে অল্প একটু সামনেই।

ঃ হুজুর —
সজাগ হয়ে শরীফ রেজা পাশ ফিরে তাকালেন। দেখলেন, ফৌজদার স্বোলায়মান খান সাহেবের খাশ নওকরদের একজন তাঁর একদম নিকটে জিজ্ঞাসুনেত্রে দণ্ডায়মান। শরীফ রেজা তাকাতেই সেই নওকরটি সালাম দিয়ে বললো হুজুর, আপনি এখানে এ সময়ে ?
সালাম নিয়ে শরীফ রেজা বললেন হ্যাঁ, এখানেই একটু এসেছিলাম। তা —তুমি —
নওকরটি হাসিমুখে বললো — আমার নাম মুইজুদ্দীন হুজুর, মুইজুদ্দীন মালিক। ফৌজদার হুজুরের মকানেইতো —
শরীফ রেজা বাধা দিয়ে বললেন — হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতো জানিই। তুমিতো ফৌজদার সাহেবের একান্ত কাছের লোক। প্রায় সময় ফৌজদার সাহেবের সাথে সাথেই থাকো।
ঃ জি হুজুর, জি। তাই আমাকে থাকতে হয়।
ঃ তা, তুমি এখানে ?
ঃ ফৌজদার হুজুরের হুকুমেই আমি এসেছি। ফি বছর এই দিনে আমাকেই আসতে হয়।
ঃ তোমাকেই আসতে হয়!
ঃ জি হুজুর! দবির খাঁ ভাইকে তো আর একা একা আসতে দেয়া যায় না ?
ঃ দবির খাঁ ভাই মানে ?
ঃ দরিব খাঁ — দবির খাঁ। ঐ কনকলতা আম্মির সেই আব্বা, মানে বাবা।
ঃ দবির খাঁ সাহেব এখানে এসেছেন ?
ঃ জি–জি। ঐ তো, ঐ যে বসে আছেন।
ডাইনের দিকে ইঙ্গিত করলো মুইজুদ্দীন। শরীফ রেজা অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর প্রায় নিকটেই নদীর ঐ খাড়াপাড়ের উপর একটা তালগাছে হেলান দিয়ে বসে আছে দবির খাঁ। তার ঐ বিশাল দেহ গাছের গোড়ার অর্ধেকটা আড়াল করে ফেলেছে। দরিব খাঁর হাতের বাঁয়ে খেয়াঘাট আর হাতের ডাইনে নদী থেকে অল্প একটু দূরে একটা ভিটে জাতীয় উঁচু

জায়গা। ভিটের বুকে হেথা হোথা উলু খাগড়ার ঝাড়। আশে পাশে কয়েকটা আম জাম আর তাল শিমুলের গাছ। নদীর দিকে মুখ করে খেয়া পারের দৌদুল্যমান ঐ ভরা নৌকোর দিকে এক ধেয়ানে চেয়ে আছে দবির খাঁ। পুরোপুরি ধ্যানমগ্ন। এ বিশ্বের আর কোন দিকেই কোন খেয়াল তার নেই।
শরীফ রেজা ব্যস্তভাবে তার দিকে ছুটতে গেলেন। কিন্তু শরীফ রেজাকে থামিয়ে দিলো মুইজুদ্দীন। বললো — না–না হুজুর, উনার কাছে যাবেন না। উনাকে এখন কিছুক্ষণ ঐভাবেই থাকতে দিন।
শরীফ রেজা হতভম্ভ হয়ে গেলেন। বললেন — সেকি! তার অর্থ ?
মইজুদ্দীন মালিক মলিন মুখে বললো — অনেকক্ষণ কেঁদেছেন উনি হুজুর। সকাল থেকে অনেক আঁসু ফেলে তিনি পেরেশান হয়ে আছেন। এখন একটু এইভাবে চুপ থাকা দরকার। মানে তাঁর বিরাম নেয়া প্রয়োজন।
আরো অধিক বিস্মিত হলেন শরীফ রেজা। বিপুল বিস্ময়ে বললেন — এসব তুমি কি বলছো মুইজুদ্দীন মিয়া ? অনেকক্ষণ কেঁদেছেন, অনেক আঁসু ফেলেছেন, এসব কথার অর্থ ? উনি কাঁদবেন কেন, আর কাঁদলেনই বা কেন ?
ঃ তার উপযুক্ত কারণ আছে হুজুর।
ঃ কারণ আছে!
ঃ জি হুজুর, যথেষ্ট কারণ আছে।
ঃ তাজ্জব! কোথায় কাঁদলেন উনি ? ওখানেই বসে বসে ?
ঃ জিনা। ঐ যে ঐ ভিটেটা, মানে ঐযে সব উলু-খাগড়ার ঝাড়-খোপ গজিয়েছে ওখানে।
ঃ ওখানে! ওখানে গিয়ে কাঁদলেন ?
ঃ জি হুজুর। ওখানেই যে কবর আছে দবির ভাইয়ের বেটির।
চমকে উঠলেন শরীফ রেজা। প্রশ্ন করলেন, বেটির কবর ? কার বেটির ?
ঃ ঐ দবির ভাইয়ের।
ঃ সে কি!
ঃ জি হাঁ। ওটা একটা এ এলাকার গোরস্তান। ঐ গোরস্তানেই তিনি তাঁর বেটির লাশ দাফন করে রেখেছেন।
শরীফ রেজা আর কোন তাল করতে পারলেন না। চিন্তাগুলো তামামই তাঁর মাথার মধ্যে জটপাকিয়ে গেল। হতবুদ্ধি হয়ে ফের তিনি প্রশ্ন করলেন — বলো কি, দবির খাঁ সাহেবের বেটির কবর এই ত্রিবেণীতে! উনি কি তাহলে এই ত্রিবেণীরই লোক ? মানে ? তাঁর বাড়ীঘর কি এখানে ?

ঃ জি-না হুজুর। এখানের লোকও উনি নন, এখানে তাঁর বাড়ী ঘরও নেই কিছু।

ঃ তবে ?

ঃ সে অনেক কথা হুজুর, অনেক বড় কাহিনী। তা আপনি এখন এখানে কোনদিকে যাবেন ?

ঃ যাবো তো আমি তোমাদের ওখানেই। ভুলুয়াতে যাবো বলেই বেরিয়েছি।

মুইজুদ্দীনের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো — তাইনাকি হুজুর ? বাঃ! তাহলে তো খুব ভাল কথা। আমরাও আগামীকাল সকালে ভুলুয়ায় ফিরে যাবো। তাহলে হুজুর চলুন, এক সাথেই যাই।

ঃ এক সাথে ?

ঃ জি হুজুর। আপনি এই রাতটুকু অপেক্ষা করলে এক সাথে যাওয়া যায়।

শরীফ রেজা চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তা করে বললেন — রাতটুকু অপেক্ষা করবো ? কিন্তু অপেক্ষা করার নির্দিষ্ট কোন জায়গাতো নেই আমার এখানে। তোমরা কোথায় উঠেছো ?

অত্যন্ত উৎসাহের সাথে মুইজুদ্দীন বললো — ঐতো হুজুর, বাজারের পাশেই নদীর ধারে মস্তবড় মুসাফিরখানা, ওখানে। খুব সুন্দর জায়গা হুজুর, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অনেক জায়গা আছে ওখানে।

চিন্তান্বিতভাবেই শরীফ রেজা বললেন — তাই ?

ঃ জি হুজুর। প্রতি বছর এখানেই এসে উঠি আমরা।

ঃ এলেই তোমরা জায়গা পাও এখানে ?

ঃ পাই বৈ কি। বেশ বড়সর মুসাফিরখানা যে। দু'দশটা কামরা সবসময়ই খালি থাকে। এ ছাড়া, আরো বেশ কয়েকটা বড় বড় সরাই আর মুসাফিরখানা এই ত্রিবেণীতে আছে। অনেক লোক এই ব্যবসা করে। থাকার কোন অসুবিধেই এখানে নেই হুজুর।

ঃ আচ্ছা!

ঃ এর উপর সরকারী মেহমানখানাও আছে একটা। আমরা গেলেই যথেষ্ট খাতিরখাতির করে তারা। আপনার পরিচয় পেলে তো আর কথাই নেই। খুব সমাদরে রাখবে তারা আপনাকে। আপনি থাকবেন হুজুর ?

একই রকম চিন্তা জড়িত কণ্ঠে শরীফ রেজা বললেন—থাকার কোন ইরাদা আমার ছিল না। কিন্তু যে কথা বললে তুমি, তাতে ব্যাপারটা ভাল করে না জেনে যেতেও মন চাইছে না। তা, তোমাদের ঐ মুসাফিরখানায় জায়গা পাওয়া যাবে না ?

সোচ্চার কণ্ঠে সাড়া দিলো মুইজুদ্দীন। বললো — যাবে না মানে ? জরুর পাওয়া যাবে হুজুর। মুসাফিরখানা অর্ধেকটাই এখন ফাঁকা। কয়েকটা দামী দামী কামরা কয়দিন ধরে অমনি পড়ে আছে। কোন দামী লোক এর মধ্যে কেউ আসেনি। ওর একটাতে ব্যবস্থা করে আসি হুজুর ?

ঃ এখনই ?

ঃ জি হুজুর। এই যাবো আর আসবো। ভাল একজন খদ্দের আছে শুনলে, মুসাফিরখানার মালিকপক্ষ বর্তে যাবে। তার উপর আমাদের লোক জানলে, খুব যত্ন করে ওরা সব সাজিয়ে গুজিয়ে রাখবে হুজুর।

শরীফ রেজা আমতা আমতা করতে লাগলেন। মুইজুদ্দীন মালিক ফের জোর দিয়ে বললো — এক লহমার ব্যাপার হুজুর। গিয়ে শুধু বলেই আমি চলে আসবো। যা করার এরপর ওরাই সব করবে।

ঃ তা — মানে, যাও তাহলে —

তৎক্ষণাৎ ছুটতে গিয়ে মুইজুদ্দীন মালিক ফের থামলো এবং ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো — ঐ দবির ভাইয়ের উপর একটু নজর রাখবেন হুজুর। তাঁর মাথার এখন মোটেই কোন ঠিক নেই। উঠে ফের কোনদিক যায় কে জানে। উনি ওখান থেকে উঠার চেষ্টা করলে, আপনি ওকে থামিয়ে দেবেন। আমি এই এলাম আর কি!

ব্যস্তপদে রওনা হলো মুইজুদ্দীন। অশ্বের লাগাম হাতে নিয়ে একইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন শরীফ রেজা। যে তাল গাছটায় হেলান দিয়ে দবির খাঁ বসেছিল, তার পেছনে ফাঁকা একটা পতিত জমি। গুল্মলতার ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু লকলকে ঘাস ছিল জমিটাতে। শরীফ রেজার অশ্ব খুবই পোষ মানা অশ্ব। লাগামটা গলার সাথে জড়িয়ে দিয়ে শরীফ রেজা তাঁর অশ্বটাকে ঘাসের দিকে এগিয়ে দিলেন। অশ্বটাও সাগ্রহে গিয়ে ঐ ঘাসপাতা খুঁটে খুঁটে খেতে লাগলো। শরীফ রেজা ফিরে এসে নদীর পাড়ে বসতেই দ্রুত পদে ফিরে এলো মুইজুদ্দীন। এসেই সে খোশদীলে বললো — আমাদের কামরার একদম পাশেই একটা ঝকঝকে সুন্দর কামরা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছে ওরা হুজুর। খোদ শায়খ হুজুরের লোক থাকবে শুনেই সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠে ঘর সাজাতে লেগেছে। ওদের যা ভক্তি-আগ্রহ দেখলাম হুজুর, তাতে কোন পয়সাকড়িই শেষ পর্যন্ত হয়তো ওদের কবুল করানো যাবে না।

শরীফ রেজাও সবিস্ময়ে বললেন—তাই নাকি ?

শরীফ রেজার পাশেই ঘাসের উপর বসতে বসতে মুইজুদ্দীন বললো — জি হুজুর। খোদ মালিকটাই বুঝি ঐ শায়খ হুজুরের কোন শিষ্য-মুরিদ হবেন।

দিনের তখন শেষ প্রহর। সূর্যের তেজ স্তিমিত হয়ে এসেছে। দবির খাঁ ঐযে ঐ ঠাঁয় বসেছিল, ঐভাবেই সে বসে রইলো তালগাছে হেলান দিয়ে। নড়ন চড়নের কিছুমাত্র আভাস-ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হলো না। মুইজুদ্দীনও তার বিরামে কোন বিঘ্ন ঘটাতে না গিয়ে শরীফ রেজার সাথে সেই পূর্বালাপে ফিরে এলো।

মুইজুদ্দীন তাঁর পাশে এসে স্থির হয়ে বসতেই শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন — আচ্ছা, ঐ যে ঐ খাঁ সাহেব ঐ একইভাবে রইলেন, কতক্ষণ উনি ঐভাবে থাকবেন?

এর জবাবে মুইজুদ্দীন বললো — তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই হুজুর। আর না হোক মাগরিব তক্তো বটেই।

ঃ মাগরিব তক্!

ঃ জি হুজুর। গত দুই বছর ধরেই দেখছি — এই নদীর ধারে এসে বসলে, মাগরিবের আজান কানে এসে না পৌঁছাতক্ ধ্যান উনার ভাঙ্গে না। মাগরিবের আজান শুরু হলেই উনি আমাকে খুঁজতে থাকেন মসজিদে যাওয়ার জন্যে।

ঃ এখন যদি উনাকে গিয়ে ডাকা যায়, তাহলে কি উনি গোস্বা হবেন?

ঃ মোটেই না হুজুর। ঐ লোকটার মধ্যে রাগ-গোস্বা-অভিমান বলে কোন কিছু আছে, এমনটি কখনও আমি মনে করতে পারিনি। এখন গিয়ে উনাকে ডাকলে বা উঠতে বললে উনি স্রেফ অনুনয়-বিনয় করবেন আর বলবেন — আর একটু থাকি ভাই। এইভাবে আমি খুব আরামবোধ করছি। আর একটু আমাকে এইভাবে থাকতে দাও।

ঃ তাজ্জব! তা ঘটনা কি মুইজুদ্দীন মিয়া? উনার বেটির কবর এই ত্রিবেণীতে আর উনি রইলেন —

ঃ ঐ তো বললাম হুজুর, সে কাহিনী মস্তবড়। রাতভর বললেও সব কথা ফুরোবেনা।

ঃ তবু অল্প কথায় যতটুকু পারো বলোতো শুনি। বাদবাঁকীটা না হয় রাতেই শুনবো বসে বসে।

ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের বিশ্বস্ত নওকর ও পুরাতন সঙ্গী মুইজুদ্দীন মালিক বলতে শুরু করলো। তার সুদীর্ঘ বক্তব্য থেকে দবির খাঁর যে বৃত্তান্ত প্রকাশ পেলো তা নিম্নরূপ ঃ—

দরিব খাঁর পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস আফগানিস্তানের হিরাটে। ভারতবর্ষের দিল্লীতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর পরই দিল্লীতে এবং বাঙ্গালা মুলুকে বলবনী শাসনকালে তাঁরা বিহারে এসে বসবাস

করতে থাকেন। দবির খাঁর পিতা দিরাজ খাঁর আমল থেকেই পরিবারটি আকারে ছোট হতে থাকে এবং দবির খাঁর জন্মকালে দবির খাঁর আম্মাজান ইন্তেকাল করলে পিতাপুত্র এই দুইজন মাত্র লোক এই পরিবারে অবশিষ্ট থাকে। জন্মকালে মাথায় একটা চোট্ লাগে দবির খাঁর। সন্তান প্রসবের সাথে সাথে প্রসূতির মৃত্যু ঘটায়, শিশুর প্রতি সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়া হয় না। এতে করে সেই মুহূর্তেই দবির খাঁর মৃত্যু না ঘটলেও মাথায় তার সেই থেকেই কিছুটা গড়বড় থেকে যায়। তবে বাল্যকালে বা যৌবনে এই গোলমালটা তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না। বাল্যকালে দেখা দিয়েই বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সে আভাসটা স্তিমিত হয়ে আসে এবং দিনে দিন দবির খাঁর চেহারা ও স্বাস্থ্য তাগড়া হয়ে উঠে। দবির খাঁর ওয়ালেদ দিরাজ খাঁ ছিলেন লাখ্নৌতির শাসনাধীন বিহার এলাকার সেনাবাহিনীর সেপাই। সেপাই বাপ মাতৃহারা সন্তানকে অন্যের হাতে না দিয়ে নিজেই তাকে লালন পালন করেন এবং নিষ্ঠার সাথে ফৌজী এলেম শিক্ষা দেন। দরিব খাঁর বয়স যখন বিশ, তখন পিতার ঐ একই ফৌজেই সেপাই হিসাবে যোগদান করে দবির খাঁ।

দবির খাঁর পিতা ছিলেন গা-গতরে বিশাল আকার মানুষ। দবির খাঁরও স্বাস্থ্য শরীর পরবর্তীকালে বিশালাকার হলেও, যৌবনে দবির খাঁর চেহারা ছিল আকর্ষণীয় ও পুরুষোচিত। যেমনই গায়ের রং তেমনই চোখ মুখের গঠন। এই আকর্ষণীয় চেহারাই একদিন মন হরণ করলো এক রূপসী রাজপুতানীর।

হিন্দুস্থানের অন্যতম মশহুর নাচনেওয়ালী রাজপুতানী চম্পাবাঈ তার যুবতী কন্যা চাঁদনী বাঈকে সঙ্গে নিয়ে এই সময় বাদাউন থেকে বিহারে আসে নাচ দেখাতে। রাষ্ট্রীয় এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে চম্পাবাঈকে আমন্ত্রণ করে আনা হয় সরকারী এক জালসায়। জালসা চলে হপ্তাকাল। নাচগানের যাদুকরী চম্পা বাঈয়ের আসরে কন্যা চাঁদনী বাঈও মাঝে মাঝে এসে নৃত্যগীত পরিবেশনে ছবক নিতে থাকে। সরকারী জালসা শেষে অন্যান্য বেসরকারী মহলের আমন্ত্রণে চম্পাবাঈ বিহারে এসে লাগাতার মাস দু'য়েক থাকে এবং দাওয়াতের পর দাওয়াত কবুল করে। চম্পাবাঈ আসলেই তখন এক বিগত যৌবনা নারী। তার রূপযৌবন তামামই প্রসাদনের দান। কিন্তু চাঁদনী বাঈয়ের যৌবন ছিল বাঁধভাঙ্গা যৌবন। রূপ ছিল মনোমোহিনী রূপ। বিহার মুলুকে চাঁদনীর এই দীর্ঘ সময় অবস্থানের কালে চাঁদনীর প্রেমে আওয়ারা হলেন আমীর-উমরাহ্-সালারেরা, আর চাঁদনী বাঈ আওয়ারা হলো বলিষ্ঠ ও সুপুরুষ সেপাই দবির খাঁর প্রেমপিয়াসে।

অল্পদিনেই বিষয়টি জানা জানি হয়ে গেল। প্রথম দিকে আমীর-উমরাহ সকলেই গোস্বা হলেন। পরে যখন দেখা গেল চাঁদনীবাঈ একান্তই দবিরগত প্রাণ, তখন আস্তে আস্তে পরিস্থিতি পাল্টে গেল এবং অনুকম্পা ও সহানুভূতি বিপুল বেগে দবির খাঁর দিকে চলে এলো। সমবয়সী সেপাইরা। এক সাথে আওয়াজ তুললো — চাঁদনী বাঈকি শাদি দবির ভাইকো সাথ্ জরুর হোনা চাহিয়ে।

গতিক খারাপ দেখে চম্পাবাঈ কন্যা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কোশেশ করলো। কিন্তু চাঁদনী বাঈ তার আগেই পালিয়ে এলো সামরিক ঘাঁটির অভ্যন্তরে দবির খাঁর কামরায়। ছড়িয়ে পড়লো খবর। মহানন্দে ছুটে এলেন সমবয়সী সেপাই ও বয়োজ্যেষ্ঠ সালারেরা। এটা তাঁদের সেনাবাহিনীর মস্ত একটা ইযযতবোধে সেই দিনই ধুমধামে চাঁদনী বাঈয়ের শাদি দবির খাঁর সাথেই সুসম্পন্ন হলো। শাদি ও ধুমধামের ব্যয় নির্বাহ হলো সামরিক তহবিল থেকে, চাঁদনী বাঈ-এর নাম হলো চাঁদবিবি।

এরপর বছর দুইয়েক কেটে গেল। চাঁদ বিবির কোলে ফুটফুটে এক মেয়ে এলো। দবির খার পিতা দিরাজ খাঁ তার নাম রাখলেন আম্বিয়া। আম্বিয়া বানু বেগম। চাঁদবিবি মাঝে মধ্যেই মেয়েকে সোহাগ করে "আম্বি" বলে ডাকতো। দবির খাঁর ডাক ছিল "আম্মি" — অর্থাৎ আম্মা। কালক্রমে এই "আম্মি" শব্দই মেয়েটির নাম রূপে প্রতিষ্ঠিত হলো।

ইতিমধ্যেই লাখ্‌নৌতিতে বিপুল বেগে বেজে উঠলো রণবাদ্য। রাজ্য জয়ের বাজনা। গোটা বাঙ্গালা মুলুক লাখ্‌নৌতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার বাজনা। এ বাজনা শুরু করলেন বলবন বংশের শাসক রুকনউদ্দীন কাইকাউস। এখন তা তুমুল বেগে বাজাতে লাগলেন স্বনামধন্য সুলতান শামসউদ্দীন ফিরুয শাহ। সৈন্য বাহিনী ধাবিত হলো—শ্রীহট্টে, চন্দ্র-দ্বীপে, ত্রিবেণীতে, সোনার গাঁয়ে, ময়মন সিংহে — নানা দিকে। ফলে, লাখ্‌নৌতির অধীনস্থ যেখানে যে সামরিক ঘাঁটি ছিল, তামাম ঘাঁটি থেকেই বাঙ্গালার সুলতান সেপাই টানতে লাগলেন। টানতে লাগলেন সালার আর রণবিদ্‌দের। বিহার থেকেও বাহিনী গেল বাঙ্গালায়। দবির খাঁর পিতা দিরাজ খাঁও এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বাঙ্গালা মুলুকে এলেন এবং সোনার গাঁয়ে লড়তে গিয়ে শাহাদত বরণ করলেন!

পিতার এই মৃত্যু সংবাদ পাওয়ামাত্র দবির খাঁ বউবেটিকে হেফাজত মতো রেখে বিহারের সৈন্যাধক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বাঙ্গালা মুলুকে চলে এলো এবং বাঙ্গালার ফৌজে শামিল হয়ে সোনার গাঁয়ে পৌছলো। সোনার

গাঁয়ে তখন লড়াই চলছে তুমুল। কামিয়াবীর শুভ সূচনা হলেও, পুরোপুরি কামিয়াবী বা বিজয় তখনও আসেনি। সোনার গাঁকে মুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার চরম মুহূর্ত তখন। এই পর্যায়ে এসে ওয়ালেদের কবর জিয়ারত করে এই লড়াইয়ে শরিক হলো দবির খাও। সোনার গাঁয়ে তার মরহুম ওয়ালেদের দাফন কাফনে যিনি অগ্রগামী ভূমিকা নেন, তিনি ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব। সোলায়মান খান সাহেব তখন সোনার গাঁয়ের এই লড়াইয়ের মধ্যমণি। পিতাকে তার দাফন করার সূত্র ধরেই ফৌজদার সাহেবের সাথে পরিচয় ঘটে দবির খাঁর। সোনার গাঁয়ে এসে সে ফৌজদার সাহেবের বাহিনীতেই যোগ দিয়ে এই লড়াইয়ে নামে এবং এক সাথে লড়াই করার কালেই সে ফৌজদার সাহেবের একজন পরমভক্ত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

লড়াইও একদিন শেষ হলো। সোনার গাঁ লাখনৌতির মুসলিম রাজ্যের অন্তভুক্ত হলো। লড়াই শেষে সোলায়মান খান তাঁর জায়গীর ভুলুয়ায় ফিরে এলেন। দবির খাঁও তার স্ত্রী কন্যার কাছে বিহারে চলে এলো।

দিন কেটে যেতে লাগলো। পরপর তিন চারটি বছর নিরুদ্বেগেই কাটলো। এরপর একদিন অকস্মাৎ এক দুরারোগ্য বীমারে শয্যা নিলো চাঁদবিবি এবং কয়েক দিনের মাথায় কন্যা ও খসমকে শোক সাগরে ভাসিয়ে সে অন্য দুনিয়ায় চলে গেল। শিশু কন্যার মুখ চেয়ে আছড়ে পড়লো দবির খাঁ। সে মাথা কুটতে লাগলো। কিন্তু সময় বড় অব্যর্থ দাওয়াই। সময়ের প্রলেপে দবির খাঁর দীলের ব্যথা ক্রমে ক্রমে লাঘব হয়ে এলো। এতিম কন্যার মুখ চেয়ে আবার তার সুখে দুঃখে দিন কাটতে লাগলো।

পুনরায় কেটে গেল কয়েকটা বছর। শিশু কন্যা আম্মি ওরফে আম্বিয়া বানু বেগম কালক্রমে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের দিকে উঁকি দিতে লাগলো। সেই সাথে পটে আঁকা ছবির মতো এক তুলনাহীন রূপরাশি তার সর্বাঙ্গে প্রস্ফুটিত হতে লাগলো। কৈশোর কালেই আম্মির এই রূপ লাবণ্য দেখে তাজ্জব হলেন প্রতিবেশীরা। সবাই তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন — আম্মির মতো এতটা খুব সুরাত লেড়কী গোটা বিহার তালাশ করলে দুসরাটি মিলবে না।

সময়ের পরিবর্তনে বাঙ্গালার রাজনৈতিক জগতেও অনেক পরিবর্তন এলো ত্রিবেণী, সাতগাঁ, চন্দ্রদ্বীপ — তামামই বাঙ্গালার মুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। এক পর্যায়ে, বাহরাম খান এক সাথে সোনার গাঁ ও

সাতগাঁয়ের শাসনকর্তা হয়ে এলেন। দবির খাঁ বিহারে যে বাহিনীর সেপাই ছিলো, সে বাহিনী গোটাই বাহরাম খান সোনার গাঁয়ের প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক ফৌজ হিসাবে সোনার গাঁয়ে পার করে নিলেন। ফলে, দবির খাঁ তার কন্যাসহ সোনার গাঁয়ে চলে এলো এবং সেই থেকে সোনার গাঁয়ে বসবাস করতে লাগলো।

ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবও এই সময় সোনার গাঁয়ের শাসক বাহরাম খানের নির্দেশে ভুলুয়া থেকে এসে সার্বক্ষণিকভাবে সোনার গাঁ সদরে অবস্থান করতে লাগলেন। এত করে দবির খাঁর সাথে তার পুরাতন সম্পর্ক পুনর্জীবিত হলো। তিনি দবির খাঁকে পুরোপুরিই তাঁর নিজের অধীনে টেনে নিলেন।

এর অল্প কিছুদিন পরেই ফৌজদার সোলায়মান খান ও দবির খাঁ সহকারে কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক লোকের একটি দলকে ত্রিবেণীতে এক সরকারী অনুষ্ঠানে যোগদান করার নির্দেশ দিলেন বাহরাম খান। কিন্তু যাত্রা করার পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ এক জরুরী কাজে সোলায়মান খান আটকে যাওয়ায়, দবির খাঁকেই দল নিয়ে ত্রিবেণীতে যাত্রা করতে হলো। বেশ কয়েকদিন দবির খাঁকে ত্রিবেণীতে থাকতে হবে দেখে, দবির খাঁ তার কন্যা 'আম্বি'কে সাথে নিয়েই ত্রিবেণীতে যাত্রা করলো। আম্বিকে সোনার গাঁয়ে একা রেখে গেলো না। কিন্তু সবই নসীব! এই যাত্রাই আম্বির জন্যে শেষ যাত্রা হলো।

ত্রিবেণীর এই নদী ভরা — নদী তখন। মূর্তি তখন তার আরো ভয়ংকর। এই খেয়াঘাটেই খেয়া নায়ে পার হতে এলো তারা। ঘন কালো মেঘ ছিল আকাশে। অনেকক্ষণ তক্ স্থির হয়ে ছিল মেঘ। দীর্ঘক্ষণ মেঘের কোন নড়ন চড়ন না থাকায়, ওরই মাঝেই খেয়া নৌকা এপার ওপার করতে লাগলো। কিন্তু দবির খাঁদের নিয়ে খেয়া নৌকা মাঝ দরিয়া না পেরুতেই অকস্মাৎ তুফান পয়দা হলো এবং প্রবল এক ঝাপটা এসে সমুদয় যাত্রীসহ খেয়াতরীটা মাঝনদীতে ডুবিয়ে দিয়ে গেল।

সাঁতার যারা জানতো তারা কোন মতে প্রাণ নিয়ে তীরে এসে উঠলো। মৃতপ্রায় অবস্থায় দবির খাঁও ভাসতে ভাসতে তীরের কাছে এলে নদীতীরের লোকেরা ঝাপিয়ে পড়ে তুলে আনলো তাকে। এই রকম আরো কিছু আধাতুরা আধামরা যাত্রিদের দুই কুলের লোকজন খুঁজে খুঁজে তুলে আনলো। বাদবাঁকীরা কোথায় গেল, ঝড় তুফানের মধ্যে কেউ আর তার হদিস করতে পারলো না। হদিস পাওয়া গেল না দবির খাঁর কন্যা আম্বি

বা আম্বিয়ারও। একটু পরেই রাত নেমে এলো। ভরা নায়ের অর্ধেক লোক নিখোঁজ হয়ে রইলো।

ভোর থেকেই পুনরায় শুরু হলো খোঁজাখুঁজি। আত্মীয় স্বজন সহকারে সরকারী বেসরকারী লোকজন দিনমান খুঁজে খুঁজে প্রায় এক দেড় ক্রোশ ভাটি থেকে কিছু লাশ উদ্ধার করে নিয়ে এলো। দবির খাঁর জ্ঞান ফিরতেই "আম্মি আম্মি" রবে সে আওয়ারা হয়ে উঠলো এবং উন্মাদের মতো প্রবহমান নদীটির এ তীর ও তীর দুইতীর অবিরাম তালাশ করে ফিরতে লাগলো। কয়েকদিন পর অনেকখানি ভাটি থেকে সে যখন আম্বিয়ার লাশ সনাক্ত করে তুলে আনলো, তখন আম্বিয়ার চোখ মুখের কোন অস্তিত্ব আর ছিল না। মাছ, কাঁকড়া ও অন্যান্য জীবজন্তুতে তামামই তা ভক্ষণ করে ফেলেছিল। পরণের লেবাসই ছিল তাকে পয়চান করার একমাত্র নিশানা। লেবাসটা নির্ভুলভাবে সনাক্ত করতে পেরে দবির খাঁ আম্বিয়ার লাশ তুলে আনলো এবং স্থানীয় লোকজনের সাহায্যে আম্বিয়াকে ঐ গোরস্তানে দাফন করলো।

সেই থেকেই দবির খাঁ তার কন্যার গোর জিয়ারত করতে প্রতিবছর এই দিনে এইখানে আসে আর গোর জিয়ারত অন্তে ঐ নদীর দিকে চেয়ে থাকে। তার অবচেতন মনে এমনই একটা ধারণা বিদ্যমান রইলো যে, আম্মি ওরফে আম্বিয়া এখনও মরেনি। ত্রিবেণীর পথ-প্রান্তর বা নদীতীরে সে এখনও তার হৃত পিতাকে তালাশ করে ফিরছে। এই ঘটনার পর থেকেই দবির খাঁর শিশুকালের মাথার সেই গোলমালটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং তার হুশবুদ্ধি অনেক খানি লোপ পেয়ে গেছে।

নদীর তীরে বসে বসে মুইজুদ্দীন মালিক শরীফ রেজাকে দবির খাঁর বৃত্তান্তের এই খানি বলতেই মাগরিবের আযান শুরু হলো। দেখা গেল আজান ধ্বনী কানে যেতেই দবির খাঁ লাফিয়ে উঠে এদিক ওদিক চাইতে শুরু করেছে। তা দেখে মুইজুদ্দীন ও শরীফ রেজা এক সঙ্গে দ্রুত পদে তার দিকে রওনা হলেন। শরীফ রেজা দবির খাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই দবির খাঁর মলিন মুখ রোশনাই হয়ে উঠলো। তৎক্ষণাৎ সে আরো খানিক সামনে এগিয়ে এসে উচ্ছ্বাস ভরে বললো — আরে বাপ্, কেয়া তাজ্জব! আপ্ ইধার আ-গিয়া ? বহুত খুব — বহুত খুব!

শরীফ রেজা বললেন — জি চাচা, এদিকে একটু কাজ ছিল। তা আপনি মানে আপনার তবিয়ত কেমন এখন ?

দবির খাঁ সহাস্যে ও উচ্চ কণ্ঠে বললো — উমদা, উমদা, বিলকুল উমদা। ঐতো উধার আমার বেটির কবর। কবর জেয়ারত হয়ে গেছে। ব্যস্! তবিয়ত আমার একদম ঠিকঠাক।

— বলেই সে এমনভাবে হাসতে লাগলো যা দেখেই শরীফ রেজা বুঝতে পারলো, এ হাসি কোন সুস্থ মানুষের হাসি নয়। এই প্রেক্ষিতে শরীফ রেজা আবার কিছু বলতে যেতেই মুইজুদ্দীন মালিক তাকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে সে নিজে দবির খাঁকে বললো — ভাই সাহেব, আজান তো হয়েছে। এবার মসজিদে যাই চলুন —

বিপুল বেগে নড়ে উঠলো দবির খাঁ। বললো — ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, জরুর। চলিয়ে — চলিয়ে —

বলেই সে হন হন করে মসজিদের দিকে হাঁটতে লাগলো।

মাগরিবের নামাজ আদায় করে তিনজন একসাথে মুসাফিরখানায় চলে এলেন। মুসাফিরখানায় পৌঁছতেই মুসাফিরখানার খাদেমেরা সরবে ছুটে এলো এবং তাদের একজন শরীফ রেজার ঘোড়ার লাগাম ধরলো। মুইজুদ্দীন মালিক নিজে গেলেন তার সাথে। আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়াটাকে হেফাজত করে এলো। শরীফ রেজা এসে যে কামরায় উঠলেন, সে কামরাটা সত্যিই বড় সুন্দর ছিল। পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে। শরীফ রেজা বুঝলেন — এক চুল বাড়িয়ে বলেনি মুইজুদ্দীন। লোকটা নির্ভরযোগ্য।

খানাপিনা অন্তে দবির খাঁ ঘুমিয়ে পড়লে মুইজুদ্দীনকে নিয়ে আবার বসলেন শরীফ রেজা। বললেন, আচ্ছা মুইজুদ্দীন মিয়া, এই যে এত খবর দিলে তুমি, দবির খাঁ সাহেবের ব্যক্তিগত এত কথা, দেশ দুনিয়ার এত কথা — এসব তুমি পেলে কোথায় ?

মুইজুদ্দীন মিয়া মুখ তুলে বললো — জি ?

শরীফ রেজা ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন — তুমি তো নকরী করো ফৌজদার সাহেবের মকানে। কারো ভেতর বাইরের এত কথা জানতে হলে সেই ব্যক্তির সাথে আর দেশের ব্যাপারে এত কথা জানতে হলে রাজনীতির সাথে যে ঘনিষ্ঠতা থাকতে হয়, তা কি তোমার ছিল ? মানে সে মওকা তুমি পেয়েছিলে ?

এর জবাবে মুইজুদ্দীন মালিক সরবে বললো — জিনা হুজুর, জিনা। এত মওকা পাবো কোথায় ? তবে এসবের কিছু কথা নিজেই আমি জানি, আর বাদবাকী তামামটুকুই আমার শোনা কথা।

ঃ শোনা কথা ?

ঃ জি হুজুর। ফৌজদার হুজুর একদিন দবির ভাইয়ের ভেতর-বাহিরের তামাম কথাই বসে বসে শুনিয়ে ছিলেন আমাদের। সাদাদীলের কথা উঠলেই উনি দবির ভাইয়ের জীবন কাহিনী বয়ান করে শুনান অনেককে।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ এ ছাড়া মন মেজাজে ফূর্তি থাকলে, দবির ভাইও তাঁর জিন্দেগীর অনেক কথাই জোশের সাথে ইয়ার-বন্ধুদের বলে বলে শুনান।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আর রাজনীতির কথা হুজুর ? ফৌজদার সাহেবের মকানে ওটাতো হরদমই আলোচনা হয় আমাদের মধ্যে। ফৌজদার হুজুরই আলোচনা করে শুনান আমাদের। দেশটার অবস্থা এর আগে কেমন ছিল, কেমন অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই অবস্থায় এলাম আমরা — এসব কথা তো আমাদের প্রায় আট পৌরে ব্যাপার।

ব্যাপারটা আসলে তা-ই। ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের একান্তই কাছের লোকের কাছে এসব কথা দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মতোই হরহামেশার কথা বৈকি ? শরীফ রেজা বুঝতে পারলেন। বুঝতে পেরেই বললেন — হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো। এবার আমি বুঝতে পারছি, এত কথা তুমি পেলে কোথায় ?

জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে মুইজুদ্দীন বললো — জি হুজুর ?

ঃ না, বলছি — দবির খাঁ সাহেবকে সত্যিই তুমি অনেক খানি জানো।

ঃ জানি বৈকি হুজুর ? দবির ভাই আসলেই একটা সাদাদীলের মানুষ। তার ভেতর বাহির তামামই এক বরাবর। কোন লুকাছাপা নেই।

ঃ হ্যাঁ, ওটা আমিও বুঝতে পারছি।

ঃ দবির ভাইয়ের সাথে কিছুদিন থাকুন হুজুর দেখবেন, দবির ভাইকে জানতে আদৌ কোন কসরত করতে হচ্ছে না। উনার দীলের সবকিছুই আপনার কাছে দিন বরাবর পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

ঃ তাই ?

ঃ এই যে আমাদের ঐ আম্মি মানে কনকলতা, ওকে নিয়ে পয়লা এখানে কি ঘটে, তা দবির ভাই ছাড়া দুস্‌রা কেউ দেখেওনি, জানেও না। কিন্তু তাহলে কি হয় ? দবির ভাই নিজেই এসব কথা এতবার আমাদের শুনিয়েছেন যে, এটা এখন অনেকের কাছেই একদম দেখা ঘটনার সামিল হয়ে গেছে।

শরীফ রেজা যারপর নেই উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন — ও হ্যাঁ, ঐ কনকলতা! কনকলতার ব্যাপারটা কি বলোতো ?

মুইজুদ্দীন বললেন — কনকলতা ? কনকলতাই তো এখন দবির ভাইয়ের আম্মি। মানে দবির ভাইয়ের বেটি ঐ "আম্মি" বা আম্বিয়ার স্থান দখল করে নিয়ে এখন কনকলতাই দবির ভাইয়ের আম্মি হয়ে গেছে। সেই সাথে সে আমাদেরও আম্মিজান।

ঃ সেই কথাই তো বলছি। কে ঐ কনকলতা ? আর দবির খাঁ সাহেবের আম্মিটাই বা হলো সে কি করে ?

মুইজুদ্দীন মালিক সঙ্গে সঙ্গে এর জবাব দিলো না। একটু থেমে সে অপেক্ষাকৃত ধীর কণ্ঠে টেনে টেনে বললো — সেও আর এক মস্তবড় দস্তান হুজুর। লম্বা কাহিনী। এই আম্বিয়ার ঘটনার সাথেই জড়িত।

ঃ কি রকম ?

ঃ যে বছর আম্বিয়া ডুবে মরে, তার পরের বছরের ঘটনা। আম্বিয়ার কবর জিয়ারত করার জন্যে পয়লা বছর দবির ভাই একাই এলেন। দবির ভাইয়ের সাথে কেউ আমরা এলাম না। বা ফৌজদার হুজুরও আমাদের কাউকে সাথে আসতে বললেন না।

এ কথায় শরীফ রেজা সংশয়ে পড়ে গেলেন। তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — দাঁড়াও — দাঁড়াও, একটু দাড়াও। দবির খাঁ সাহেব নকরী ফেলে ঐ ভুলুয়ায় তোমাদের কাছে ছিলেন তখন ?

ঃ আমাদের কাছেই তো হুজুর। তাঁর বেটি আম্বিয়ার ঐ দুর্ঘটনার পর আর নকরী তো উনি করেননি। এখান থেকে গিয়ে সরাসরি ফৌজদার সাহেবের মকানে এসে উঠেন, তার নিজের মকানেও আর যাননি।

ঃ তারপর — তারপর ?

ঃ দবির ভাইয়ের আর কোথাও কেউ না থাকায় ফৌজদার হুজুরও তাকে নিজের ভাইয়ের মতোই গ্রহণ করলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত বাহিনীতে বা দলে ভর্তি করে নিলেন। এখানে কোন বাঁধন-বালাই নেই, স্রেফ ফৌজদার সাহেবের আশে পাশে থাকা আর তাঁর টুকিটাকি ফায়ফরমায়েশ খাটা।

ঃ আচ্ছা।

ঃ এখানে যা দরকার তা ঈমান আর বিশ্বস্ততা। এ অবস্থায় পড়ে দবির ভাই বর্তে গেলেন। ওদিকে আবার আপনি তো নিজেই দেখেছেন, দবির ভাইয়ের ঈমান নিয়ে প্রশ্নের কোন ফাঁক নেই।

ঃ তা বটে, তা বটে। তারপর ?

ঃ অবসর নিয়ে ফৌজদার হুজুর যখন ভুলুয়ায় চলে এলেন, তখন দবির ভাইকেও সঙ্গে আনলেন এবং তার জন্যে ভিন্ন একটা ঘরও তুলে দিলেন। এ সবের কিছু কিছু আপনিও দেখেছেন বা জেনেছেন।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, এবার ঐ কনকলতার কথা বলো। দবির খাঁ সাহেব পয়লা বছর একাই আম্বিয়ার কবর জিয়ারত করতে এলেন, তোমরা কেউ এলে না — তারপর ?

ঃ তারপর উনি এসে কবর জিয়ারতটা কোনমতে করলেন বটে, কিন্তু এরপরেই কেমন একটা বেখেয়াল হয়ে গেলেন। তার মাথার মধ্যে কেবলই খেলতে লাগলো—এই ত্রিবেণীতে খোঁজ করলেই আম্বিয়াকে পাওয়া যাবে। আম্বিয়া মরেনি, ও লাশ বোধ হয় আম্বিয়ার নয়, সে এই ত্রিবেণীতেই ঘুরছে। ব্যস্! উনি ত্রিবেণীর গোটা এলাকা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

ঃ সেকি!

ঃ আর তাঁর খেয়ালের সাথে মিলমতো ঘটনাও ঘটে গেল তাজ্জব রকম একটা। এই ত্রিবেণীর ঐ প্রান্তে এক মস্তবড় মন্দির আছে। লোকে বলে মহামন্দির। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুণ্যকামী লোকজন ঐ মন্দিরে অর্ঘ দিতে আসে। ঐ মন্দিরের পাশেই ছোট একটা ফাঁকা জায়গা এবং তার পাশ দিয়ে সদর রাস্তা। রাস্তার পাশে ঐ ফাঁকা জায়গাতে কনকলতা দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে থেকে তন্ময় হয়ে কি যেন সে ভাবছিলো। রাস্তা দিয়ে যাবার কালে কনকলতার উপর চোখ পড়তেই দবির ভাই বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, বিলকুল তাঁর আম্বিয়া। সেই চোখ, সেই মুখ, রং-বর্ণ-বয়স এমন কি মাথার চুলটাও বিলকুল আম্বিয়ারই মতো। খুব সুরাতও বিলকুল একই রকম জ্বলন্ত। কনকলতাকে দেখে দবির ভাই কিছুতেই ধারণা করতে পারলেন না যে, এটা তার আম্বিয়া নয়। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে পলকখানেক দেখার পরই তিনি ছুটে এসে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন এবং একদম কাছে থেকেও দেখলেন। ফলাফল ঐ একই ফারাগ কিছু পেলেন না।

শরীফ রেজা রুদ্ধশ্বাসে বললে। — তারপর ?

মুইজুদ্দীনও প্রত্যয়ের সাথে বললেন — আসলে ফারাগও বেশী ছিল না হুজুর। মানুষের মতো অবিকল যে মানুষ হয়, আম্বিয়াক যারা দেখেছিলেন, পরবর্তীকালে কনকলতাকে দেখে তাঁরা একবাক্যে তা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরা একথাও বলেছেন, সূক্ষ্ম নজর ছাড়া সামান্য যে গরমিলটুকু এই দুইয়ের মধ্যে রয়েছে, তা পয়লা নজরে আর মোটা দৃষ্টিতে কারো কাছে ধরা পড়ার কথা নয়।

ঃ বলো কি!

ঃ দবির ভাইয়ের মাথায় তো ঐ ধারণাই ঘুরপাক খাচ্ছে তখন — আম্বিয়া বেঁচে আছে। ব্যস্! উনি একদম নিশ্চিত হলেন, এইটেই তার 'আম্মি'। আর যায় কোথায় ? "আম্মি — মেরে আম্মি" বলে ছুটে গিয়ে গড়মড় করে জড়িয়ে ধরলেন কনকলতাকে।

দুইচোখ ফুটে উঠলো শরীফ রেজার। আওয়াজ দিলেন—সোবহান আল্লাহ্!

মুইজুদ্দীন বলেই চললো — কনকলতা আনমনে দাঁড়িয়ে ছিল। অকস্মাৎ বাঘে ধরার মতো দবির ভাই গিয়ে তাকে ঐভাবে ধরাতে সে ভয়ানক আঁতকে উঠে চীৎকার দিয়ে উঠলো এবং মহাতংকে "বাঁচাও — বাঁচাও" বলে আর্তনাদ করতে লাগলো। কিন্তু দবির ভাইয়ের কোন দিকেই খেয়াল নেই। তিনি কনকলতাকে সবলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে "আম্মি আম্মি" করতে লাগলেন আর কনকলতা তাঁর কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে দাফাদাফি আর চীৎকার করতে লাগলো।

ঃ কি তাজ্জব! কি তাজ্জব!

ঃ একদম মন্দিরের পাশেই এই ঘটনা। মন্দিরের ভেতরে বাইরে অগণিত তীর্থ যাত্রী ভিড় জমিয়েছিল। মন্দিরের পূজারী, কর্মচারী আর সেবক সেবিকার সংখ্যাও অনেক। এর উপর ফের সদর রাস্তার পাশে হওয়ায় রাস্তাতেও লোকজন ছিল প্রচুর। চীৎকার শুনে সকলেই ছুটে এলো এবং এ দৃশ্য দেখে প্রথমতঃ সকলেই হতভম্ব হয়ে গেল। কনকলতার মাতাও ছিলেন এই মন্দিরেরই অন্যতম প্রধান এক সেবাদাসী। তিনিও ছুটে এলেন এবং মেয়ের ঐ অবস্থা দেখে তিনিও আঁতকে উঠে আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন — বাঁচান, আপনারা আমার মেয়েকে বাঁচান —

ঃ তারপর ?

ঃ এর পরের ঘটনা অবর্ণনীয়। অত্যন্ত রূপসী হওয়ার দরুন কনকলতার উপর এর আগেও ছোটখাটো আরো হামলা হয়েছে। অনেকেই তাকে অপহরণ করার অনেক কোশেশ করেছে। কিন্তু এমনভাবে কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি বা এতটা অগ্রসর হওয়ার সাহস কেউ পায়নি। এ ব্যাটাকে একেবারেই বেপরোয়া দেখে সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বারুদের মতো জ্বলে উঠলো এবং "ধর ব্যাটাকে ধর" — এই একটি মাত্র আওয়াজ উঠলো চারদিকে। এরপরেই যা হবার তা হয়ে গেল। চারদিকের বেশুমার এই লোকজন ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো দবির ভাইয়ের পিঠের উপর এবং হাটের মার মেরে তাঁকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলো।

ঃ সর্বনাশ!

ঃ অবশ্য দবির ভাই সঙ্গে সঙ্গে হুংকার দিয়ে দাঁড়ালে হয়তো অনেকেই এতটা সুযোগ পেতো না। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের খেয়ালে বুঁদ থাকায়, যে ব্যক্তিটি জীবনভর মার খাওয়া ছাড়া কখনও মারার খোয়াব দেখেনি, সেও দু'ঘা মেরে হাতের সুখ করে নিলো।

ঃ তারপর ?

ঃ তারপর সকলেই যখন বুঝতে পারলো, লোকটা আর বেঁচে নেই, মরে গেছে, তখনই তারা ক্ষান্ত হলো এবং একটা মানুষ খুন করলো তারা — এ জন্যে শাস্তি হতে পারে তাদের — এই খেয়াল মাথায় আসতেই তারা দবির ভাইয়ের দেহটা টেনে নিয়ে পাশের একটা ঘরের পেছনে আড়াল করে রেখেই উধাও হয়ে গেল। খুনের দায়ে পড়ার ভয়ে আশেপাশে আর একটা লোকও রইলোনা বা আর কেউ এদিকে এলো না।

শরীফ রেজা ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন — কনকলতা ? কনকলতারাও পালিয়ে গেল ?

ঃ হ্যাঁ, তারাও পালিয়ে গেল। দবির ভাইয়ের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে কনকলতা তার মায়ের কাছে ছুটে এলো এবং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এ অবস্থা দেখতে দেখতে কনকলতার যখন খেয়াল হলো — লোকটা তাকে আম্মি বলে ডেকেছে, মুরুব্বী লোক, কোন গুণ্ডাপাণ্ডার মতো নয় এবং যে কারণে মারছে তাকে সবাই, সে অপরাধে অপরাধী নিশ্চয়ই সে নয় — তখন তার আর করার কিছুই ছিল না। পরিস্থিতি তখন বিলকুল তার এক্তিয়ারের বাইরে চলে গেছে। এরপর লোকটা খুন হয়েছে বোধে যখন সকলেই পালিয়ে গেল, তখন খানিকটা নিরুপায় হয়ে আর অধিকটা তার মায়ের তাকিদে সেও পালিয়ে গেল।

ঃ কি আশ্চর্য! তারপর ?

ঃ তারপরের ঘটনাটুকু তামামই ঐ কনকলতার তৎপরতার কাহিনী হুজুর, তার অনুভূতির কাহিনী।

ঃ কি রকম ?

ঃ অল্পক্ষণের মধ্যেই বেলা একদম পড়ে এলো। সূর্য একদম নেমে এলো নীচে। মানুষ একটা খুন হয়েছে, যে কোন সময় পাইক আসবে, এই ভয়ে নখে গোণা কয়েকজন সেবক সেবিকা ছাড়া ঐ মহামন্দিরের আশেপাশে কোন গণমনিষ্যি রইলো না। মহাপুণ্য আহরণে আগত দূরান্তের ভক্তবৃন্দও নয়। সবাই দেখলো — লোকটা একটা খাঁ সাহেব। ত্রিবেণী এখন খাঁ সাহেবদের দখলেই। অবস্থায় খাঁ সাহেব খুন! ওরে বাপ্‌রে! আর কথা আছে ? স্থানীয় লোকের দেখাদেখি পুণ্যার্থীরাও দৌড় দিলো। পুণ্যার্থীরা পুণ্যের জন্যে মহামন্দিরে এসেছিল, খুনের ফ্যাসাদে পড়ার জন্যে নয়। তাই পুণ্যের চেয়ে প্রাণ বড় বিবেচনায় তারাও দেব ভবনকে পিঠ দেখিয়ে নিজ ভবনের উদ্দেশ্যে সময় থাকতেই দৌড়াতে শুরু করলো। ফলে, সূর্যাস্তের আগেই প্রেতপুরীর মতো জায়গাটা নির্জন হয়ে গেল।

ঃ আচ্ছা!

ঃ কনকলতার দীলে ঐ যে অনুশোচনা সৃষ্টি হলো, ক্রমেই তা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো। লোকটা নিশ্চয়ই ভুল করেছে, বদ মতলব তার ছিল না, অথচ তার নির্বুদ্ধিতার জন্যেই ঐ বেকসুর লোকটাকে জানটাই তার দিতে হলো — এ যন্ত্রণা দীল থেকে সে বিদায় করতে পারলো না। ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ একা একাই ছটফট করার পর সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তার মাথায় খেয়াল এলো, এমনও তো হতে পারে লোকটা এখনও মরেনি! এ খেয়াল তার মাথায় আসতেই সে ঘর থেকে বেরুলো এবং কোথাও কাউকে না দেখে সে এক পা দু'পা করে দবির ভাইয়ের ভূলুণ্ঠিত দেহের দিকে এগিয়ে এলো। অনুশোচনা দীলে তার এতই তীব্র ছিল যে, কোন মৃতদেহের নিকটে সে যাচ্ছে — এমন কোন অনুভূতিই তার তখন ছিল না। দবির ভাইয়ের দেহের কাছে এসে সে তাজ্জব হয়ে দেখলো, অনুমান তার ঠিক। লোকটা এখনও মরেনি। সে অল্প অল্প নড়ছে আর ক্ষীণ কণ্ঠে কাতরাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দিকে দৌড় দিলো কনকলতা। এই মন্দিরের যে ঘরে তারা থাকতো তা খুব নিকটেই। ঘরে গিয়েই এক হাঁড়ি পানি, একটা গামছা আর একটা পাখা নিয়ে সে তখনই ফের ছুটে এলো। এরপর অগ্রপশ্চাৎ কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা না করে কনকলতা ওখানেই বসে পড়লো এবং দবির ভাইয়ের মাথাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে তার চোখে মুখে পানির ছিটা দিতে লাগলো, পাখার বাতাস দিতে লাগলো আর গামছা ভিজিয়ে মাঝে মাঝে দবির ভাইয়ের হাত পা ও মুখমণ্ডল মুছে দিতে লাগলো।

শরীফ রেজা খোশদীলে আওয়াজ দিলেন — সাব্বাস!

মুইজুদ্দীন মালিক বললো—কিছুক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলার পর দবির ভাইয়ের অল্প অল্প জ্ঞান ফিরতে লাগলো। দবির ভাইকে ঠোঁট নাড়াতে দেখে তার মুখে পানি দিতেই দবির ভাই পানি পান করতে লাগলেন এবং পানি পান অন্তে যে আওয়াজটি তাঁর মুখ থেকে সর্বপ্রথম বেরুলো, তা ঐ একই আওয়াজ — "আম্মি — মেরে আম্মি"।

ঃ বলো কি!

ঃ জি হুজুর। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে "আম্মি-আম্মি" করতে লাগলেন। কনকলতার দীলে এই মুহূর্তে হঠাৎ কি যেন এক প্রতিক্রিয়া পয়দা হলো! সে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে বললো—"এই যে বাবা, এই যে আমি এখানে।" একথা কানে পড়তেই দবির ভাইয়ের ঠোঁট আরো দ্রুতবেগে নড়তে লাগলো এবং আবেগের আধিক্যে তার মুখের "আম্মি-আম্মি"

আওয়াজটি একটি গোঙ্গানীতে রূপান্তরিত হলো। প্রত্যুত্তরে কনকলতা বার বার বলতে লাগলো — "এই তো বাবা, এইতো আমি কাছেই আছি তোমার।"

ঃ তোফা!

ঃ সঙ্গে সঙ্গে দবির ভাই হাতড়াতে শুরু করলেন। হাত তুলতে না পেরে তিনি অবচেতন অবস্থায় মাটি হাতড়ালেন কিছুক্ষণ। পরে শক্তিহীন হয়ে ফের থেমে গেলেন। তাঁর দুইচোখের কোণ বেয়ে বড় বড় পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তা দেখে কনকলতা উতলা হয়ে উঠলো। সে আস্তে করে দবির ভাইয়ের মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে মন্দিরের দিকে দৌড় দিলো। মন্দিরের অপর পাশে তখনও যে কয়েকজন পূজারী ও সেবক চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসেছিল ও প্রতি মুহূর্তে হাঙ্গামার আশংকা করছিলো, তাদের কাছে গিয়ে কনকলতা ডাক হাঁক শুরু করলো। সে চীৎকার করে বলতে লাগলো — "কে কোথায় আছো, শিগ্গির বেরিয়ে এসো। লোকটা এখনও মরেনি। চেষ্টা করলে এখনও তাকে বাঁচানো যাবে"।

ঃ তারপর ?

ঃ লোকটাকে বাঁচানো যাবে, এখনও সে মরেনি, বাঁচানো গেলে হাঙ্গামা কিছুই হবে না — এ বোধটা মনে আসতেই যে যেখানে ছিল, সকলেই হুড় হুড় করে বেড়িয়ে এলো এবং কনকলতার কথা মতো সকলেই দবির ভাইকে ধরাধরি করে তুলে কনকলতাদের ঘরের পাশে মন্দিরের এক খড়ির ঘরে আনলো। ঘরটা তখন ফাঁকাই ছিল, খড়ি তেমন ছিল না। কনকলতা ক্ষিপ্রহস্তে সেখানেই একটা বিছানা করে দিলো এবং সকলেই দবির ভাইকে সেই বিছানায় শুইয়ে দিলো।

এই পর্যন্ত বলে মুইজুদ্দীন মালিক একটু থামলো। শরীফ রেজা শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে এ কাহিনী শুনছিলেন। তিনি কিছুতেই তর সইতে পারলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফের প্রশ্ন করলেন — তারপর ?

মুইজুদ্দীন মালিক ফের বলতে শুরু করলো—শুরু হলো কনকলতার খেদমত। দাওয়াই খাওয়ানো, মালিশ লাগানো, শেক দেয়া, বাতাস করা — দীপ জ্বেলে সারারাত বসে বসে সে দবির ভাইয়ের খেদমত করতে লাগলো। তেমন ইচ্ছে না থাকলেও, পরিস্থিতির চাপে পড়ে এবং মুস্কিল আহ্সানের প্রয়োজনে কনকলতার মাতা ও কনকলতাকে টুকিটাকি সাহায্য করতে লাগলেন। পরেরদিন অনেকখানি জ্ঞান ফিরলো দবির ভাইয়ের। কনকলতা তাঁর শিয়রে বসে সেবা করছে দেখে তিনি বিহ্বল হয়ে

গেলেন। কনকলতাও দরদভরে দবির ভাইয়ের চোখে মুখে হাত বুলাতে লাগলেন। এইভাবেই দুইয়ের মধ্যে পিতাপুত্রী সম্পর্ক মজবুত হতে লাগলো। এরপর কনকলতার মা চাইলেন দবির ভাইকে সরকারী কোন দাওয়াই খানায় বা সেবাখানায় পৌঁছে দিতে। কিন্তু কনকলতা রুখে দাঁড়ালো বিক্রমে। সে কিছুতেই দবির ভাইকে ছাড়লো না। অতপর হপ্তা দুই দবির ভাইয়ের যে সেবাটা কনকলতা করলো, একমাত্র নিজের পিতা ছাড়া পিতার মতো অন্য কাউকে এমন খেদমত করার কোন নজীর দুনিয়ায় আছে কিনা আমার জানা নেই ?

ঃ তাই ?

ঃ জি হুজুর। আল্লাহ তায়ালা কি দরদই পয়দা করলেন কনকলতার দীলে তা তিনিই জানেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দবির ভাইয়ের মলমূত্র সাফা করা থেকে শুরু করে সর্ববিধ পরিচর্যা করার মধ্যে সে এক অনাবিল তৃপ্তিবোধ করতে লাগলো।

ঃ সত্যিই বড় তাজ্জব তো!

ঃ দবির ভাই আস্তে আস্তে যখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেন তখন তিনি "আম্বি" বলতে অজ্ঞান আর কনকলতা "বাবা" বলতে অজ্ঞান। অনুশোচনার দাহ নিবারণ করতে গিয়ে পিতৃস্নেহের গভীর এক বাধনে বাঁধা পড়লো কনকলতা। জ্ঞান ফিরার পর যদিও দবির ভাই বুঝলেন, এই কনকলতা সত্যি সত্যিই আম্বিয়া তাঁর নয়, এবং কনকলতা যদিও জানে — এই দবির খাঁ সত্যি সত্যিই তার পিতা বা বাবা নয়, তবু এই বোধ আর ফারাগটা কোন কাজেই এলো না। অলৌকিক আর আসমানী এক রহমে এদের এই বাপ-বেটি সম্পর্ক রক্তর সম্পর্কের মতো অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেল।

এরপর মুইজুদ্দীন মালিক অনেকক্ষণ থেমে রইলো। অভিভূত হয়ে শরীফ রেজাও একইভাবে চুপচাপ বসে রইলেন। তখনই আর প্রশ্ন করার তাঁরও কোন খেয়াল-হুঁশ রইলো না।

অনেক্ষণ যাবত দুইজন ঐ একইভাবে নীরব থাকার পর শরীফ রেজা ধীরে ধীরে বললেন — তাজ্জব সত্যিই বড় তাজ্জব এক ব্যাপার। তা মুইজুদ্দীন মিয়া, এরপর কনকলতা ভুলুয়ায় এলেন কবে ?

মুইজুদ্দীন বললো — এর কিছুদিন পরেই। সুস্থ হয়ে উঠার পর দবির ভাই ভুলুয়ায় চলে এলেন। কিন্তু কনকলতাকে নিয়ে এদিকে এক মস্তবড় জটিলতার সৃষ্টি হলো। মায়ের সাথে কনকলতাও মহামন্দিরে পূজার যোগান দিতো। ফুল পাতা, ধূপ ধুনা এগিয়ে ঘুছিয়ে দিতো। কিন্তু একজন

মুসলমানের এতটা সংস্পর্শে আসার পর কনকলতার এসব কাজ অনেকেই আর সহজভাবে মেনে নিতে চাইলো না। অচিরেই এ নিয়ে একটা গুঞ্জরণ শুরু হলো। শেষ অবধি কনকলতার মন্দিরে প্রবেশ করা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে লাগলো। তাদের নজরে মুসলমানেরা ম্লেচ্ছ, অপবিত্র মুসলমানের সাথে যাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তারা কোন দেব মন্দিরে প্রবেশ করলে সে মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন থাকতে পারে না। এই প্রশ্নের জের ধরে কনকলতার মায়েরও সেবাদাসীর কাজ নিয়ে টানাটানি শুরু হলো।

আবার বিস্মিত হলেন শরীফ রেজা। প্রশ্ন করলেন — তারপর ?

ঃ ঐ সেবাদাসীর কাজটাই ছিল কনকলতাদের একমাত্র অবলম্বন। মা-বেটির একমাত্র জীবিকা। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই কেঁদে উঠলেন কনকলতার মাতা। তিনি ভ্রাক্ষন পণ্ডিত-পুরোহিতদের হাতে পায়ে ধরতে লাগলেন। এর ফলে শিগ্‌গিরই বৈঠক বসলো এ নিয়ে। বৈঠকে সাব্যস্ত হলো — কনকলতার মায়ের দোষটা বড় নয়। অপবিত্রতা তাকে তেমন গ্রাস করতে পারেনি। কিন্তু কনকলতাটা পুরোপুরিই অপবিত্র হয়ে গেছে। কনকলতার সংস্রব ত্যাগ করতে পারলে, কনকলতার মায়ের ঐ সেবাদাসীর পদটা আর বিপন্ন হবে না। যেমন তিনি আছেন, মন্দিরের ঐ কাজ নিয়ে তিনি তেমনই থাকতে পারবেন। পুনরায় কেঁদে উঠলেন কনকলতার মা। কাঁদতে কাঁদতে বললেন —"মেয়ে আমার সোমত্ত। সংস্রব ত্যাগ করতে গিয়ে এই সোমত্ত মেয়েকে আমি কোথায় পাঠাবো ঠাকুর ?" সংগে সংগে অনেক কণ্ঠের জবাব এলো—"বিয়ে দিয়ে দাও, বিয়ে দিয়ে দাও।" কনকলতার মা বললেন —"আমার এই অপবিত্র মেয়েকে কে বিয়ে করবে ঠাকুর ?" কণ্ঠ সবার আরো অধিক সোচ্চার হলো। সমস্বরে জবাব এলো "সেটা আমরা দেখবো—আমরা দেখবো, আপনি শুধু বিয়ে দিতে সম্মত হোন, ব্যস! " কেউ বললে — "আমি করবো, আমি করবো।" কেউ কেউ আবার ব্যাখ্যা দিয়ে বললে — "সবাইতো আমরা পুরোহিতগিরি করিনে, আর কনকলতাও এখনো ইসলাম কবুল করেনি। কাজেই আর বাধা কোথায় ? আমরা করবো — আমরা করবো।"

ঃ আচ্ছা ? এয়সা কারবার ?

ঃ জি হুজুর। এরপর বৈঠক থেকে ফিরে এলেন কনকলতার মাতা। চিন্তিত চিত্তে ঘরে ফিরে এসব কথা কনকলতাকে বলতেই তেলে বেগুনে জলে উঠলো কনকলতা। আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে সে সশব্দে জানিয়ে

দিলো যে, দরকার হলে ভরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সে মরবে, তবু ঐ শেয়াল কুকুরের ভোক্ষ্য সে জিন্দেগীতে হবে না।

শরীফ রেজা এবার সপুলকে বললেন — শাব্বাশ্! তারপর ?

মুইজুদ্দীন মালিক বললো — স্বাভাবিকভাবেই সমস্যা আরো জটিল হলো। কনকলতাকে বিদায় করতে না পারায় কনকলতার মায়ের ঐ রুজিটাও বন্ধ হয়ে গেল। পূজার কাজে তাকেও আর কেউ হাত লাগাতে দিলো না। আয় উপায় বন্ধ হওয়ায় চরম যখন দুর্দিন তাদের, তখন আবার হুকুম এলো — মন্দিরের ঐ ঘরটিও ছাড়তে হবে তাদের। মন্দিরের আওতাভুক্ত যে কোন ঘরে অপবিত্রতার স্পর্শ লাগলে রুষ্ট হবেন দেবতা। উপায়ান্তর না দেখে কনকলতার মাতা গিয়ে আছড়ে পড়লেন প্রধান পূজারীর পায়ের উপর। আর্তকণ্ঠে বললেন —" থাকবো কোথায় ঠাকুর ?" কিঞ্চিৎ দয়া হলো পুরোহিতের। তিনি বললেন, "বিয়ে না দাও, মেয়েকে তোমার অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও, অন্যখানে রাখো। তাহলেও তোমার একটা ব্যবস্থা যেভাবে হোক, করবো আমি। মেয়েকে তোমার সরাতেই হবে মন্দিরের চত্বর থেকে।"

ঃ তারপর কি হলো ?

ঃ ঠিক এই সময়ই ত্রিবেণীতে আবার এলেন দবির ভাই। শুনেই তিনি বললেন — "কুয়ী মুসিবত নেহি! মেরে আম্মি মেরে পাস্ রহেগী। বহুত উমদা বাত।" কনকলতার মা বললেন —"কথাটাতো ঐ একই হলো দাদা। মেয়ে আমার মুসলমানের ঘরে থাকলে, এরা আমাকে মন্দিরে থাকতে দেবে কেন ?" দবির ভাই জোরদার কণ্ঠে বললেন —"নেহি-নেহি, ঘাব্ড়ানে কো বাত নেহি। আম্মি কে আমি জুদা করে তার কওমের মধ্যেই মানে তার স্বজাতির মধ্যেই রাখবো। মুসলমানের ঘরে তাকে বিলকুল থাকতে হবেনা।" শুনে কনকলতা ব্যাকুল কণ্ঠে বললো — "বাবা!" দবির ভাই বললেন —"হারে বেটি, হাঁ। আমার ফৌজদার হুজুরের মকানের সাথেই বহুত হিন্দুর বসত। ওখানেই তোমার ঠাঁই বানিয়ে দেবো আমি। তুমি ওদের সাথেই থাকবে।"

ঃ আচ্ছা।

ঃ এ সমস্যা ছাড়াও কনকলতাকে নিয়ে আরো একটা সমস্যা ছিল কনকলতার মায়ের। সেটা হলো, মেয়েকে তাঁর হেফাজত করা। মেয়েটার ঐ তুলনাহীন রূপটাই ছিল মস্ত একটা সমস্যা। চারদিকের সকলেই হায়েনার মতো চেয়েছিল তার দিকে। কোন শক্ত একটা আশ্রয়ে তাকে পার করতে না পারলে, ইযযত তো নয়ই, মেয়ের জানটাও আর বেশীদিন

হেফাজত করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা। এদিকে, দবির ভাইয়ের মকানে যাওয়ার জন্যে কনকলতা উঠে এক পায়ে খাড়া হলো। চারদিকের উৎপাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ফলে, কনকলতার মা আবার প্রধান পূজারীর শরণাপন্ন হলেন। এর জবাবে প্রধান পূজারী সখেদে বললেন — "তোমার মেয়ের ব্যাপারে নিদ্ ঘুম বাদ দিয়েছে এখানকার সকলেই। কাজেই, যেখানে হোক, মেয়েকে তোমার সরাও, তোমাকে নিয়ে আর কোন সমস্যা হতে দেবো না।"

ত্রিবেণীর মুসাফিরখানায় রাত জেগে বসে বসে কনকলতার কাহিনী একের পর এক বলে যাচ্ছে মুইজুদ্দীন মালিক আর বিপুল বিস্ময় ও পরম আগ্রহে শুনে যাচ্ছেন শরীফ রেজা। এই পর্যায়ে এসে শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন — আচ্ছা, একমাত্র দবির খাঁ সাহেবের সাথেই কনকলতার আসার প্রশ্ন উঠলো কেন ? কনকলতার মায়ের বা বাপের পক্ষের কেউ কোথাও নেই বা ছিল না ?

মুইজুদ্দীন বললো — দবির ভাইয়ের কাছেই আমরা যা শুনেছি, তাতে তিনকুলে কেউ নেই তাদের।

ঃ একদম এতিম ওরা ?

ঃ না, এক কালে নাকি সবই তাদের ছিল। বংশও তাদের উঁচু। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় সব তাদের গেছে।

ঃ দুর্ঘটনা!

ঃ হ্যাঁ' দুর্ঘটনা হুজুর। ঐ দুর্ঘটনার ফলেই নাকি সর্বহারা তারা।

ঃ কি সে দুর্ঘটনা ?

মুইজুদ্দীন মালিক ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। শরীফ রেজা আবার বললেন — কি, দুর্ঘটনাটা কি ?

ঃ সেটা বলতে নিষেধ আছে হুজুর। এ কথাটা আর কাউকে বলতে দবির ভাই বিশেষভাবে বারণ করেছেন আমাদের।

ঃ মানে ?

ঃ আমি আর ফৌজদার হুজুর ছাড়া, এ খবর আর অন্য কেউই জানে না।

ঃ কনকলতা ?

ঃ সে অবশ্যই জানে। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি — এ প্রসঙ্গে কথা উঠলেই সে বড় নাখোশ হয় এবং এসবের মধ্যে থাকে না।

শরীফ রেজা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এই নিষেধটাই পরম জিজ্ঞাস্য শরীফ রেজার। এই সন্ধানটা নেয়ার জন্যেই তিনি ত্রিবেণীতে এসেছেন। কাজেই শরীফ রেজা এইটুকুতেই তৃপ্ত থাকতে পারলেন না। তিনি পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। অত্যন্ত ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন — কি সে ব্যাপারটা ? তার কিছুটা ইঙ্গিতও কি দেয়া যায়না মুইজুদ্দীন মিয়া ?

শরীফ রেজার পীড়াপীড়িতে মুইজুদ্দীন বললো — দেয়া যায় না, ঠিক এমনটি নয় হুজুর! কসম কিছু দেয়া নেই এ ব্যাপারে। তবে দবির ভাইয়ের ইচ্ছে নয়, বেশী লোক এ কথাটা জানুক।

শরীফ রেজা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন — তাহলে একটু বলোই না ব্যাপারটা

ঃ ব্যাপার বড় অপ্রিয় ব্যাপার হুজুর। আপনি বলেই বলছি। নইলে আমিও চাইনে, একথা অন্য আর কেউ জানুক।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ কনকলতার মা কুলত্যাগিনী আউরাত।

চমকে উঠলেন শরীফ রেজা। জ্বলন্ত লৌহ শলাকার মতো কথাটা তাঁর কানের মধ্যে প্রবেশ করলো। তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বললেন — কুলত্যাগিনী ?

ঃ কুলত্যাহিনী মানে স্বামীর ঘর ত্যাগ করা আউরাত হুজুর। অত্যন্ত মর্মদাহে ঝোঁকের মাথায় নাকি এই কথাটা একদিন কনকলতার মা-ই ফস্ করে দবির ভাইকে বলে ফেলেন।

ঃ এ্যাঁ!

ঃ বলে ফেলেই নাকি ফের তিনি কথাটা চেপে যান।

ঃ তাজ্জব! তাহলে কে তাঁর স্বামী ?

ঃ ওটা আমি জানিনে হুজুর। ওটা আমার জানা নেই।

ঃ দবির খাঁ সাহেব ? উনি জানেন না ?

ঃ উনিও তা জানেন না। কনকলতার মা এ খবরটা কিছুতেই তাঁকে দেননি। বরং কনকলতার মা দবির ভাইকে এই মর্মে কসম দিয়ে রেখেছেন যে, একথা আর কখনও জানতে তিনি চাইবেন না।

শরীফ রেজা গুম্ মেরে গেলেন। পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে স্বগতোক্তি করলেন — কনকলতা তাহলে একজন অবৈধ সন্তান!

একথায় মুইজুদ্দীন মালিক চঞ্চল হয়ে উঠে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — জিনা হুজুর, জিনা। জন্মে তার দোষ নেই। জন্মগতভাবে কনকলতা

নিষ্পাপ ওপবিত্র। একথা কনকলতার মা জোর দিয়ে দবির ভাইকে বলেছেন, এমন কি মন্দির ছুঁয়ে বলেছেন।

ঃ এ ব্যাপারে দবির ভাইয়ের দীলে তিল পরিমাণ সন্দেহও যাতে করে না থাকে, সেই জন্যে মন্দির ছুঁয়ে বলেছেন।

ঃ আশ্চর্য!

ঃ কনকলতার পিতৃপরিচয় দবির ভাই শুধু জানেন না, তা-ই নয়। বরং কেউ তা জানতে চাইলে দবির ভাই তা প্রাণপণে রোধ করবেন আর কনকলতার উপর এ নিয়ে কোন চাপ আসতে দেবেন না — এই ওয়াদাই কনকলতার মায়ের কাছে করে এসেছেন দবির ভাই। হিন্দু সমাজে রাখবেন আর পিতৃপরিচয় চেপে রাখবেন — এই ওয়াদা করিয়ে নিয়েই দবির ভাইয়ের হাতে কনকলতাকে তুলে দিয়েছেন কনকলতার মা। কনকলতার মঙ্গলের জন্যেই নাকি এসব কিছু প্রয়োজন আর সে মঙ্গলটা কি তা নাকি কনকলতাও জানে।

শরীফ রেজা পুনরায় নীরব হয়ে গেলেন। দীলে তার বিস্ময়ের পর বিস্ময় পয়দা হতে লাগলো। একটু পরে বিস্মিত কণ্ঠে ফের তিনি বললেন — তাজ্জব! এদের কোন জাত-পরিচয় না জেনেই মন্দিরের কর্তৃপক্ষ কাজ দিয়েছেন এদের ?

ঃ জিনা হুজুর। কনকলতার বাপকে ঠিক না চিনলেও, কনকলতাদের খুব বড় একঘর আত্মীয় ছিল ত্রিবেণীতে। এদের পরিচয় দিয়েই ঐ মন্দিরের কাজ পেয়েছেন কনকলতারা।

ঃ আচ্ছা!

ঃ কনকলতার পিতৃপরিচয় দিতে দূর অঞ্চলের কোন এক পরলোকগত ব্রাহ্মনের নাম করেছেন কনকলতার মা। ওটাই সবাই মেনে নিয়েছেন। কে আর এত খোঁজ খবর নিতে যায় ?

ঃ বলো কি! তা কনকলতাদের সেই আত্মীয়েরা কেউ আর নেই এখানে ?

ঃ জিনা।

ঃ একজনও নেই ?

ঃ জিনা হুজুর। তুর্কী হামলায় সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হয়েছে বলে কনকলতারা কয়েকবছর আগে এসে তাদের ঐ দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের আশ্রয়ে উঠে। কিন্তু ত্রিবেণী তার আগেই মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। তাদের ঐ আত্মীয়দের পরিবারটা ছিল এক অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু পরিবার। মুসলমানদের ত্রিবেণী দখলের পর থেকেই তারা ত্রিবেণী থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার ধান্দায় ছিল। এর মাঝে হঠাৎ একদিন কনকলতা সহকারে

ঐ পরিবারের মেয়েদের উপর হামলা করে কতকগুলো দুর্বৃত্ত। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর তখন লাখ্‌নৌতির তখ্‌তে। কি এক কাজে তিনি সেদিন ত্রিবেণীতে হাজির ছিলেন এবং নসীবগুণে আক্রান্ত ঐ পরিবারের পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন। হৈ চৈ আর আর্তনাদ শুনে নিজেই তিনি তলোয়ার হাতে ছুটলেন। তা দেখে তার লোক লস্করও তলোয়ার হাতে ছুটলো। আক্রান্ত বাড়ী ঘিরে তিনি তামাম দুর্বৃত্তদের পাকড়াও করলেন এবং এই জুলুমের শাস্তি স্বরূপ দুর্বৃত্তদের কোতল করে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। আক্রান্ত গৃহের একপাশে দাঁড়িয়ে এই সময় কনকলতা কাঁদছিলো। তা দেখতে পেয়ে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেব তার কাছে ছুটে গিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলালেন এবং তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন — কেঁদোনা মা। যা ঘটে গেছে তা আমার অযোগ্যতার দরুনই ঘটে গেছে। আমি এই মুলুকের সুলতান, স্বাধীন স্বার্বভৌম সুলতান। কারো গোলামী আমি করিনা। এই বাঙ্গালা মুলুক আমারই মাটি, তোমরা সবাই আমার প্রজা এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তোমরা সবাই আমারই সন্তান। পরাধীন শাসকের কথা আলাদা। সন্তানতুল্য প্রজাদের হেফাজত করা যে কোন স্বাধীন সুলতানের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তোমাদের হেফাজত করা আমারই পবিত্র দায়িত্ব। তোমাকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি মা, যতদিন তোমার এই ছেলে বাঙ্গালার মসনদে থাকবে, ততদিন আর এমন ঘটনা কোন দিনই ঘটবে না। তোমাদের পাহারা দেয়ার দায়িত্ব আজ থেকে আমি আমার নিজের কাঁধে নিলাম।

শরীফ রেজা পরম বিস্ময়ে বললেন — বলো কি! এই ঘটনা ?

মুইজুদ্দীন বললো — জি হুজুর, এই ঘটনা। সুলতানের সে দিনের সেই আচরণে কনকলতা এতটা অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যে, সে সঙ্গে সঙ্গে সুলতানের পায়ের কাছে বসে তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় তুলে মেখেছিল। সেই সাথে ত্রিবেণী থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার ধান্দাও তার সেই আত্মীয়েরা ত্যাগ করে এবং খোশ হালেই এখানে বসবাস করতে থাকে।

ঃ তারপর ?

ঃ অল্পদিনেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পালটে গেল। বাঙ্গালা মুলুক দিল্লীর অধীনে চলে গেল। তাতার খান অর্থাৎ সোনার গাঁয়ের আজকের এই বাহরাম খান তখন সাতগাঁ ও ত্রিবেণীর শাসনকর্তা হয়ে এসে সাতগাঁয়ে বসলেন। তিনি তো বরাবরই দিল্লীর একজন কর্মচারী বা গোলাম, কোন স্বাধীন সুলতান নন। ফলে, এসেই তিনি ফূর্তিফার্তায় গা ভাসিয়ে দিলেন। প্রজাদের সুখ দুঃখ নিয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন তার ছিল না।

এই সময় কনকলতার ঐ আত্মীয়দের বাড়ীতে আবার একদিন হামলা হলো দুর্বৃত্তের। জেনানাদের কব্জা করতে না পেরে দুর্বৃত্তেরা মালমাত্তা লুটপাট করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নালিশ গেল তাতার ওরফে বাহরাম খানের কাছে। বাহরাম খান হেসেই আকুল হলেন এবং জানালেন, নিজেদের হেফাজত করার দায়িত্ব প্রজাদেরই। শাসনকর্তার এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ নেই।

ঃ বলো কি!

ঃ গতিক খারাপ দেখে কনকলতাদের ফেলে সেই রাতেই ঐ পরিবারের এক এক অংশ এক এক মুলুকে চলে গেল। আর তাদের একটা লোকও ত্রিবেণীতে থাকলো না।

ঃ কনকলতাদের ফেলে গেল ?

ঃ যাবে না হুজুর! একে তারা দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তার উপর তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। তখন ঐ পরিবারের লোকদের নিজেদেরই কোন সঠিক আর নির্দিষ্ট ঠাঁই-আশ্রয় নেই। এর উপর আবার কনকলতাদের সঙ্গে নেবে কে ?

ঃ আচ্ছা!

ঃ এর কয়দিন পরই কিছু সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ কনকলতাদের এনে ঐ মহামন্দিরে তুললো এবং কনকলতার মাকে সেবাদাসীর কাজ জুটিয়ে দিলো। সেই থেকে ঐ মন্দিরই ঠিকানা হলো কনকলতাদের।

মুইজুদ্দীন থামলো। শরীফ রেজা এবার তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলেন। তাঁর চোখের সামনে এতদিনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিলো — গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের প্রতি কেন কনকলতার ঐ অতটা দরদ, আর এই দেশটা স্বাধীন হোক — এ নিয়ে কেন তার এতটা আগ্রহ। আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শরীফ রেজা বললেন — এরপর দবির খাঁ সাহেবের সাথে তাহলে কনকলতাই ভুলুয়ায় এলো, কনকলতার মা সাথে এলেন না ?

ঃ না হুজুর। ও বেটি কট্টোর এক হিন্দু। তিনি জানালেন — যে কয়দিন বাঁচবেন তিনি, দেবদেবীর আরাধনাতেই সে ক'টা দিন কাটিয়ে দেবেন, অনর্থক ছুটোছুটি করে আর জাত গোত্র খোয়াবেন না। বরং দবির ভাই বা অন্য কারো মারফত কনকলতার খোঁজ খবরটা মাঝে মাঝে জানতে পারলে বা কনকলতা সুযোগ সুবিধে করে দু'একবার এসে দেখা করে গেলেই তিনি খুশী থাকবেন। কনকলতার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, কনকলতা পুরোপুরি সাবালিকা

এখন। ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ও-ই এখন যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেইটেই চূড়ান্ত। কনকলতা নিরাপদে আছে, জোর করে কোন সিদ্ধান্ত ওর উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে না, — এটুকু জানলেই তিনি দেবদেবীর পূজা-অর্চনার মাধ্যমে খোশ দীলে পরমার্থ হাসিল করতে পারবেন।

শরীফ রেজা ক্লীষ্ট হাসি হেসে বললেন ধন্য মেয়ে যাহোক!

মুইজুদ্দীন বললো — কিন্তু সেই পরমার্থ হাসিল করার ফুরসুতও তিনি জিয়াদ্দী কিছু পেলেন না। বছর খানেকের মধ্যেই তিনি কঠিন বিমারে আক্রান্ত হলেন। খবর পেয়ে দবির ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে এলো কনকলতা। দবির ভাই আর কনকলতা মিলে মউতের সাথে লাঠালাঠি করেও কনকলতার মাতাকে আর বাঁচিয়ে তুলতে পারলেন না। ত্রিবেণীরই ঐ মহাশশ্মানে মায়ের মুখাগ্নি করে দবির ভাইয়ের সাথে ফের ভুলুয়াতে ওয়াপস্ এলো কনকলতা।

গল্পের মধ্যে মগ্ন ছিলেন শরীফ রেজা আর মুইজুদ্দীন মালিক। শরীফ রেজার পাশের কামরায় ইতিমধ্যে ঘুম থেকে জেগে উঠলো দবির খাঁ। মুইজুদ্দীন মালিক কে কাছে-কোলে না দেখে সে ডাকে হাঁকে কাঁপিয়ে তুললো মুসাফিরখানা। রাত তখন শেষ প্রায়। দবির খাঁর আওয়াজ পেয়েই শরীফ রেজার কামরা থেকে মুইজুদ্দীন মালিক দবির খাঁর কামরার দিকে দ্রুতপদে ছুটলো।

আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে শরীফ রেজা তাঁর বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন।

৭

ভুলুয়ার সদরটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ঠাণ্ডা মারা প্রশাসনিক দপ্তরগুলো এখন খুব সরগরম। রাস্তাঘাট বস্তি-বাজার রাতারাতি সাফা হয়ে গেছে। তামাম কিছু পরিচ্ছন্ন। দোকান পাট পণ্য-পসার সর্বত্রই সুসজ্জিত। থরে থরে সাজানো। মানুষ ও যানবাহনের যদেচ্ছা চলাচলে নিয়ন্ত্রণ এসেছে। দৈনন্দিন জীবন প্রবাহের মাঝেও শৃঙ্খলা ও নিয়মনীতি বিদ্যমান। বৃদ্ধি পেয়েছে কর্মের প্রতি আকর্ষণ আর কর্তব্যের প্রতি আগ্রহ। প্রাণ ও প্রফুল্লতার পবিত্র পরশে ভুলুয়ার সর্বাঙ্গে ঢল নেমেছে তারুণ্যের।

ভুলুয়ার নয়া ওয়ালী বা নয়া শাসক শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব এখন ভুলুয়ায়। লোক লস্কর, লটবহর ও পরিজনবর্গ নিয়ে ভুলুয়ার শাসনকর্তা হিসাবে তিনি কয়দিন আগে ভুলুয়ায় পার হয়েছেন এবং কায়েমীভাবে ভুলুয়ায় বসবাস শুরু করেছেন। শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব একজন কর্মতৎপর মানুষ। নিরলস পরিশ্রম ও একাগ্রতার বলেই তিনি মামুলী অবস্থান থেকে এই অবস্থায় এসেছেন। নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার উজ্জ্বল প্রতিক শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব ভুলুয়ায় এসেই নেতিয়ে পড়া ভুলুয়াকে তাগ্‌ড়া করে তুলেছেন। প্রশাসনিক দপ্তরগুলো কর্মমুখর করার পরই তিনি রাস্তায় এসে নেমেছেন গঞ্জ-বাজার-বস্তিতে প্রাণ সঞ্চার করার কাজে। তেজারতদার, সওদাগর, কৃষক-মযদুর-কারিগর ও কলকারখানার মানুষগুলোকে উদাত্ত কণ্ঠে কর্মের আহ্বান জানিয়ে তিনি কঠোর কণ্ঠে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। আচরণের অসততা ওজন-মাপের কারচুপি আর জীবন চক্রের যে কোন পাকে প্রতারণা ও ভাঁওতাবাজীর একমাত্র পরিণাম মউত এবং নির্জলা মউত। তার জন্যে সুপারিশ ও প্রভাব বিস্তারের শাস্তিও ঐ মউত।

স্রেফ হুশিয়ারী জারি করেই ভুলুয়ার নয়া শাসক কর্তব্য শেষ করেননি। হুশিয়ারীটা শক্তহাতে কার্যকরীও করেছেন। সুপারিশকারী কয়েকজন আমলা উমরাহ্‌র খণ্ডিত লাশ নদীর স্রোতে ভাসিয়ে নজীর স্থাপনও করেছেন। ফলে, রাতারাতি পাল্টে গেছে ভুলুয়ার পরিস্থিতি। কাজ ফেলে কৌটিল্য আর বদমতলবী মোহড়া গ্রীষ্মের শবনমবৎ উষাকালেই উবে গেছে তপ্তরশ্মির তাড়নায়। ফলাফল পুণ্যময়। গুটিকয় মতলববাজ আর স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বাদে ভুলুয়াটা গোটাই আজ ফখরউদ্দীনের নাম-তারিফে মুখর এবং নিভৃত-নিরালায় তাঁর ভালাই কামনায় মসগুল। স্বাধীন সুলতানী প্রশাসনের অভিনব পরশে প্রজাকুল সর্বত্রই বিহ্বল ও চমৎকৃত।

ভুলুয়ায় এসে কয়েকদিনের মধ্যেই ভুলুয়ার পরিস্থিতি পাল্টে দিলেন শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব। এ কাজে তাকে সহযোগিতা দান করলেন তাঁর একনিষ্ঠ সহকর্মীরা — বিশেষ করে ভুলুয়ার ইনসান আলী আর সোনার গাঁয়ের জাফর আলী। তরুণ সৈনিক জাফর আলী খান শাহ ফখরউদ্দীনেরই অধীনস্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন ফখরউদ্দীনের অধীনে সোনার গাঁয়ের বাহিনীর সহকারী সালার। সোনার গাঁয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের সম্মতি সাপেক্ষে প্রাথমিক কাজগুলো গুছিয়ে দেয়ার ইরাদায় এই সহকারী সেনাপতি জাফর আলী খান শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের সাথে ভুলুয়ায় এসেছেন। প্রশাসক নিযুক্ত হওয়ায় শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবকে সোনার গাঁয়ের বাহিনী থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন

হতে হয়েছে আর জাফর আলীও সেই কারণে শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব থেকে জুদা হয়ে গেছেন। তবে বাহ্‌রাম খানের ঢালাও হুকুম আছে — ইচ্ছে করলে জাফর আলীকে ভুলুয়াতেই সবসময় রাখতে পারবেন তিনি।

জাফর আলীকে পেয়ার করেন শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব। অনেকটা ছেলের মতো দেখেন। সেই সুবাদে শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের অন্দরমহল পর্যন্ত জাফর আলীর নিঃসংকোচ যাতায়াত। ফখরউদ্দীন সাহেবের তিনি প্রিয়ভাজন বলেই এই মহলের চাকর নফরগুলোও সবিশেষ খাতির করে জাফর আলীকে। খাতিরের সাথে অনেকে আবার ভয়ও করে জিয়াদা। তাঁর মর্জি বুঝে চলে। দ্বারী প্রহরী দিদার আলীরা এই তরুণ সালারের মন যোগাতেই অধিক ব্যস্ত থাকে। অবশ্য, আদিল খাঁ আফগানদের আদব আখ্‌লাক আলাদা। এরা ভালর কাছে ভাল, মন্দের কাছে মন্দ। কোন ধান্দাবাজী নেই।

এখন ইনসান আলীও এই মহলের আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন। তাঁর সরলতা ও সৎ-সুন্দর মানসিকতা অচিরেই ফখরউদ্দীন সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ফখরউদ্দীন সাহেব চমৎকৃত হলেন। প্রীত হলেন তিনি। বিশ্বাস স্থাপনের আর একটা উপযুক্ত পাত্র পেলেন শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব। বিনিময়ে ইনসান আলী লাভ করলেন শাহ সাহেবের সুনজর। ইনসান আলীর সামনেও এ মহলের ফটক অবারিত হয়ে গেল।

প্রাথমিক ঝুটঝামেলা শেষ হয়েছে। জাফর আলীর ছুটোছুটি মন্থর হয়ে এসেছে। সীমিত হয়ে এসেছে তাঁর করণীয়। ইনসান আলীর আবির্ভাবও জাফর আলীর প্রয়োজনটা হাল্‌কা করে দিয়েছে। সোনার গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছেন জাফর আলী। কাজের চাপ লাঘব হওয়ার জন্যেই নয়, নিজের খেয়ালেই যাচ্ছেন। হঠাৎ তার খেয়াল হয়েছে, তাঁর এখন ওয়াপস্‌ যাওয়া উচিত, তাই তিনি যাচ্ছেন। তার যাওয়ার খবর শুনতে পেয়ে তাঁর সামনে এলেন আদিল খাঁ।

অন্দর মহলের বাইরে দহলীজের পাশেই এক খোলামেলা কামরায় জাফর আলী পয়লা এসে উঠেন। প্রশাসকের দপ্তরটা একেবারেই পাশে হওয়ায় এই কামরাটাই পছন্দ হয় জাফর আলীর। তিনি সেই থেকে এই কামরাতেই আছেন। দু'একদিনের মধ্যেই রওনা হবেন তিনি। সামান-আদিও অনেকটা গুছিয়ে গুটিয়ে নিয়েছেন। তিনি চলে যাচ্ছেন, তবুও কারো মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া না থাকায় তিনি মন মরা হয়ে আছেন। খানিকটা হাতে কোন কাজ না থাকায় আর অধিকটা দীলের হাল নাজুক হওয়ায়, ঘরের মধ্যেই কুরসীতে গা এলিয়ে ছিলেন তিনি।

বাইরে কোথাও যাননি। ঘরে এলেন আদিল খাঁ। তিনি এসে সালাম দিয়ে বললেন — ইয়ে বাত্‌ কি কায়েমী বাত্‌ হুজুর ?

সালাম নিয়ে জাফর আলী সোজা হয়ে বসলেন। কথাটা বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলেন — কোন বাত্‌ খাঁ সাহেব ?

ঃ আপনি নাকি ওয়াপস্‌ যাচ্ছেন সোনার গাঁয়ে ?

জাফর আলী নির্লিপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন — হ্যাঁ, যাচ্ছিই তো।

ঃ কেন হুজুর ? জায়গাটা কি বিলকুল নাপছন্দ আপনার ?

ঃ জায়গাটা! কোন জায়গা ?

ঃ এই ভুলুয়া ? ইয়ে মকান ?

ঃ কেন, নাপছন্দ হবে কেন ?

ঃ তব্‌ ? ওয়াপস যাচ্ছেন কিস্‌ লিয়ে ?

জাফর আলী বিস্মিত হলেন। বললেন — সেকি! যেতে হবে না আমাকে ? এখানেই কি বরাবর থাকবো আমি ?

ঃ হুজুর তো থাকবেন ?

ঃ জরুর থাকবেন। উনি এখানে ওয়ালী হয়ে এসেছেন। উনাকে তো থাকতে হবে অবশ্যই।

ঃ আপ ?

ঃ আমি তো আর এখানে ওয়ালী মানে শাসনকর্তা হয়ে আসিনি। এসেছিলাম জনাবকে পৌঁছে দিতে আর কয়েক দিন পাশে থেকে তাঁর প্রথমদিকের মেহনতটা যথাসম্ভব কমিয়ে দিতে। প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গেছে, তাই যাচ্ছি।

ঃ লেকেন —

ঃ আমার কাজ ফৌজে। আমাকে আমার কাজে যেতে হবে না ?

আমতা আমতা করে আদিল খাঁ বললেন — এখানেও তো ফৌজ আছে হুজুর। এখানে থাকলেও তো ঐ ফৌজের কাজে লাগতে পারতেন আপনি ?

ঃ হ্যাঁ, তা পারতাম। তবে গরজটা আমার বেশী যেখানে, সেখানেই তো থাকা উচিত আমার ?

ঃ হুজুর —

ঃ সোনার গাঁয়ের এক বাহিনীর আমি সহকারী সালার। সে দায়িত্ব ফেলে খামাখা এখানে বসে থেকে লাভটা কি আমার ?

তবুও আদিল খাঁ তাঁর খেয়াল থেকে হটলেন না। ইতস্ততঃ করে বললেন — এখানে যে বাহিনী আছে, চাইলেই তো তার দায়িত্ব পেতে পারেন আপনি।

খট্‌কা লাগলো জাফর আলীর। তিনি নীরব হয়ে ক্ষণকাল আদিল খাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আদিল খাঁর সাথে তার পরিচয় অনেক দিনের। সম্পর্কও মোটামুটি উষ্ণই। কিন্তু তাই বলে তা এমন নয় যে, তাঁর বিরহে মুষড়ে পড়বেন আদিল খাঁ। হঠাৎ তাঁর আজ এই ধরনের আগ্রহ! ব্যাপার কি ? কি বলতে চান এই শান্ত ধীর মানুষটা ? জাফর আলী বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন — আমি তা চাইতে যাবো কেন ?

আদিল খাঁও ভাবতে লাগলেন। কি জবাব দেবেন এর ? যে প্রশ্নটা ইতস্ততঃ ঘোরপাক খাচ্ছে দীলে তাঁর, সে সম্বন্ধে কিছুটা আকার ইংগিত দেয়া ছাড়া, সরাসরি মুখে বলা সম্ভব নয়। স্পষ্ট করে বলার মতো কথাও তা নয়। সবকিছুই একটা অনুভূতি আর আন্দাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এখনও। স্পষ্ট কোন রূপ গ্রহণ করেনি। এ ব্যাপারে সরাসরি কি বলবেন তিনি ? তাই থতমত করে বললেন — জি ?

জাফর আলী বললেন — এখানকার দায়িত্বে তো মজবুত লোকই আছেন। ইনসান আলী সাহেব একজন সুদক্ষ যোদ্ধা, এলেমদার লড়াইয়া। তাঁর হক আমি মারতে যাবো কেন ?

ঃ তা কথা হলো —

ঃ আমি এখানে থাকতে চাইলে জনাব শাহ ফখরউদ্দীন হুজুর হয়তো বিনা বাক্যেই মঞ্জুর করবেন আরজ আমার। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আবার ইনসান আলী সাহেবকে ঐ সোনার গাঁয়ে যেতে হবে আমার জায়গায়। খামাখা এই ফ্যাসাদ পয়দা করতে আমি যাবো কেন ?

খুবই ন্যায্য কথা। আদিল খাঁ নিতান্তই সাদা দীলের মানুষ। কোন ঘোরপ্যাঁচ তাঁর নেই। দীলে তাঁর যা উদয় হয়েছে, তিনি সেই তাড়নায় এসেছেন। কোন কিছু বাড়িয়ে বা আন্দাজে বলার অভ্যাস তাঁর নেই। তাছাড়া, ইনসান আলীর উপরও যে এটা একটা অবিচার হবে — এটাও তিনি বুঝতে পারলেন। এত সমস্যার গিঁঠ খোলার সাধ্য তাঁর ছিল না। তাই লা-জবাব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আদিল খাঁ। তা লক্ষ্য করে জাফর আলী ফের প্রশ্ন করলেন — কি, কথাটা কি খাঁ সাহেব ? আমার এখানে থাকাটা খুব পছন্দ করছেন আপনি ?

এর জবাবে আদিল খাঁ দুর্বলকণ্ঠে বললেন — পছন্দ তো ছিলই থোড়া হুজুর, লেকেন —

ঃ জনাবের হেফাজতিটা নিয়েই কি একথাটা বলছেন ?

জোরদার হলো আদিল খাঁর কণ্ঠ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন — জিনা হুজুর, জিনা। হেফাজতির আনযাম তাঁর আল্লাহর রহমে মজবুতই আছে।

ইধার ফের ইনসান আলী হুজুরকেও ঈমানদার বলেই মালুম হচ্ছে। এ নিয়ে সোচ্ করার জরুরত কিছু নেই। লেকেন —

ঃ লেকেন ?

ঃ ফরিদা আম্মা, হুজুর। ও বেটি এ নিয়ে পেরেশান বোধ করছে।

আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন জাফর আলী খান। এই তরুণ সালারের দীল যে রশ্মির তালাশে উদগ্রীব হয়ে ছিল, সেই প্রত্যাশিত আলো এতক্ষণে এসে তাঁর দীলের দ্বারে উঁকি দিলো। তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। জাফর আলীর প্রভুপ্রীতির প্রথম ও প্রধান কারণ শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের সদাশয় আচরণ। উপরওয়ালার সুনজর অধীনস্ত প্রত্যেকটি লোকের কাছেই দুষ্প্রাপ্য এক বস্তু। যে পায়, সে তা অধিক ক্ষেত্রে তকদির গুণেই পায়। স্রেফ তদবির দিয়ে হয় না। কৃতজ্ঞ প্রতি ব্যক্তিই এ কারণে প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। জাফর আলী খান শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের শুধু সুনজরই পাননি, স্নেহও পেয়েছেন প্রচুর। সুতরাং প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার উপযুক্ত ও সংশয়হীন উৎস আছে জাফর আলীর। এই উৎস আরো নিশ্ছিদ্র হয়েছে ফরিদা বানুর সুবাসে। পরিচ্ছন্ন চরিত্রের সুন্দরী ফরিদা বানু প্রথম দিনের দর্শনেই শক্ত একটা নাড়া দিয়েছেন জাফর আলীর দীলে। অতপর ফরিদা বানুর সহৃদয় আচরণে তাঁর দিকে ক্রমে ক্রমে ঝুঁকে গেছেন জাফর আলী। মুনিবের আস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার তাকিদে তিনি সংযমী হয়ে চলেছেন ঠিকই, কোন আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে যাননি, তবে এ বাড়ীর আকর্ষণ ফরিদা বানুও কম নন জাফর আলীর কাছে।

এই আকর্ষণ আরো জোরদার হচ্ছে দিন দিন। এর পেছনে মদদ দিচ্ছেন শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব নিজে এবং আংশিকভাবে ফরিদা বানু বেগমও। জাফর আলীকে নিয়ে শাহ ফখরউদ্দিন সাহেবের ইচ্ছা-ইরাদার পাঁপড়িগুলো ফুটে উঠছে ক্রমেই। ফরিদা বানুর আচরণের মধ্যেও জাফর আলীর প্রতি একটা দুর্বলতার ইংগিত দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পিতাপুত্রী উভয়েরই মনোভাবটা আঁচ করছেন অনেকেই। কিন্তু তা কেউ পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছেন না। কোন সরাসরি ভূমিকায় এই পিতাপুত্রীও আসছেন না। এর একটা বড় কারণ জাফর আলীর চরিত্র। জাফর আলীর মনটা মোটামুটি সবলই। আর সে কারণে যথেষ্ট স্নেহখাতির করেন তাঁকে পিতাপুত্রী উভয়েই। কিন্তু জাফর আলীর চরিত্রে এমন একটা দিক আছে যার জন্য তাঁকে অন্ধভাবে কাছে টানতে গিয়ে তাঁরা আপ্‌সে আপ্ কমজোর হয়ে পড়েন। প্রকট কিছু না হলেও জাফর আলীর মনমতি চঞ্চল, মেজাজমর্জি অসমান। এই ঠাণ্ডা, এই গরম।

বাঞ্ছিত সমন্বয় এই তরুণ সৈনিকের মেজাজমর্জিতে এখনও অনুপস্থিত। তদুপরি জেদীও তিনি খানিকটা, খেয়ালীও অনেকখানি। স্নেহের বদলে ভক্তি তাঁর অসামান্য হলেও, ভবিষ্যতে এই মেজাজমর্জি আর খেয়াল কোন দিকে মোড় নেয়—এই দ্বিধা পিতাপুত্রী উভয়েরই। ইচ্ছে তাদের সুস্পষ্ট ও অকৃত্রিম। কিন্তু অদৃশ্য কাঁটার মতো সূক্ষ্ম এই বিঘ্নটা মাঝখানে দণ্ডায়মান। তাই মন খুলতে চাইলেও তাঁরা সরাসরি মুখ খুলতে পারছেন না। আর এ কারণেই আদিল খাঁ আফগানের মতো সহজ সরল মানুষেরা ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলেও, জাফর আলীর কাছে তা সিধা করে ব্যক্ত করতে পারছেন না।

এদিকে আবার জাফর আলীও দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছেন। তিনি বুঝে উঠতে পাছেন না, বাপ বেটির এই সহৃদয় আচরণটা অনুকম্পাই শুধু, না সত্যি সত্যি এর পেছনে স্পর্শ আছে দীলের আর ভিত আছে ইরাদার। আর এই বুঝে উঠতে না পারার কারণেই যে উৎসাহ নিয়ে তিনি এদের পেছনে ঘুরছেন আর এই ভুলুয়া তক্ এসেছেন, তাতে খানিকটা ভাটা পড়ে গেছে। এখন তাঁর জিদ চেপেছে, তিনি সোনার গাঁয়েই চলে যাবেন, খামাখা আর এখানে বসে থাকবেন না।

কিন্তু এই খেয়ালী লোকের জিদটা এক কথাতেই পান্‌সে হয়ে গেল। আদিল খাঁ আফগান যখন কথায় কথায় ফরিদা বানুর কথায় এলেন; তখন সঙ্গে সঙ্গে জাফর আলী উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। নড়ে চড়ে বসে তিনি সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন — কেন, কেন? তিনি পেরেশান বোধ করছেন কেন?

আদিল খাঁ সখেদে বললেন — একদম নয়া মুলুক হুজুর। আদমী আউরাত অচেনা। সোনার গাঁয়ে যে হালতে ছিল সে, এখানে তা বিলকুলই উল্টা।

ঃ হ্যাঁ, তাতো কিছুটা বটেই।

ঃ এদিকে ফের চেনাজানা আদমীরাও তামাম সরে যাচ্ছেন। বেচারী এই ভিন মুলুকে একেলী হয়ে যাচ্ছে।

ঃ তিনি কি তাই বলছেন?

ঃ জি হুজুর, বলছেন তো জরুর।

ঃ কিন্তু তেমনটি তো আমি বুঝতে পারছিনে।

ঃ হুজুর —

ঃ কি বলছেন তিনি?

ঃ কে? ঐ ফরিদা বেটি?

ঃ হ্যাঁ। উনি কি বলছেন?

জবাব এলো পর্দা ঝুলানো খোলা দরজার ওপার থেকে। বোরকাবৃত ফরিদা বানু ইতিমধ্যেই এসে এই দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ওখান থেকেই বললেন — আমি কি বলছি তা আমার মুখেই শুনুন। চাচা কি বলবেন?

চমকে গেলেন জাফর আলী। কুরসী থেকে উঠে তিনি থতমত করে বললেন — জি?

ফরিদা বানু বললেন — চাচাকে আমি পাঠিয়েছি আপনার খবরটা নেয়ার জন্যে। ঘরে আপনি আছেন কিনা, তাই দেখার জন্যে। আমি কি বলতে চাই, তা বলার জন্যে নয়।

আদিল খাঁ সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — নেহি বেটি, কুয়ী দুস্‌রা বাত্ বলিনি। এই হুজুরের ওয়াপস্ যাওয়া না-পছন্দ তোমার, এতে তুমি পেরেশান হয়ে যাচ্ছো — স্রেফ সেই বাত্‌টা বলেছি।

দরজার ওপারে থেকেও একথায় ফরিদা বানু সংকুচিত হয়ে গেলেন। তিনি গরম কণ্ঠে বললেন — বেশ করেছেন। এবার দহলীজের ওপাশের ঐ কামরায় আসতে বলুন উনাকে। উনার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

ফরিদা বানু ওখান থেকে সরে গেলেন। একটু পরে জাফর আলী নির্দিষ্ট সেই কামরায় এসে দেখলেন — বোরকা ঢাকা ফরিদা বানু একটা কুরসীর উপর একা একাই চুপচাপ বসে আছেন। জাফর আলী কামরায় এসে দাঁড়ালে ফরিদা বানু সামনের একটা কুরসীর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন — বসুন।

দোদুল্যমান চিত্তে জাফর আলী আসন গ্রহণ করলে ফরিদা বানু বললেন — হঠাৎই আজ শুনলাম, দু'একদিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছেন আপনি। সামান-আদিও নাকি সেই মোতাবেক গুটিয়ে গুছিয়ে নিয়েছেন। কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। ব্যাপারটা কি বলুন তো?

জাফর আলী সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। কিয়ৎকাল থেমে থেকে ধীর কণ্ঠে বললেন — যা আপনি শুনেছেন, ঠিকই শুনেছেন।

ফরিদা বানু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন — ঠিকই শুনেছি?

ঐ একই রকম নির্লিপ্ত কণ্ঠে জাফর আলী বলছেন — জি।

ঃ আপনি সোনার গাঁয়েই ফিরে যাচ্ছেন?

ঃ জি-হাঁ।

ফরিদা বানুর কণ্ঠ আরো তীক্ষ্ণ হলো। তিনি বললেন — যাবেন ভাল কথা। তা এভাবে পালিয়ে যাবার কারণ?

[illegible] হলেন জাফর আলী। বললেন —— পালিয়ে যাচ্ছি!

[illegible] গাঁয়ে আপনি চলে যাবেন, আর একথাটা জানতেও আমি [illegible] না ?

ঃ তা —— মানে ——

ঃ আমাকে তো একবার তা বলতেও পারতেন আপনি ?

ঃ হ্যাঁ, কিন্তু ——

ঃ এতবার আমার দেখা হচ্ছে আপনার সাথে আর আমি আপনার এই খবরটা অন্যের মারফত পাচ্ছি, আর এইমাত্র পাচ্ছি ?

জাফর আলী আরো অধিক বিস্মিত হলেন। বললেন —— সেকি! হুজুর, মানে আপনার আব্বা, তাঁর মুখেও কি শুনেননি আপনি একথা ?

ঃ না, কেউ আমাকে বলেনি।

ঃ তাজ্জব! এটা একটা বাসী খবর এখন। কয়দিন ধরেই আমার যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে। এ মকানের দারোয়ান-নফরগুলোও প্রায় সকলেই তা জানে। আর আপনি ——

জ্বলে উঠলেন ফরিদা বানু। বললেন —— আমি তো আর দারোয়ান নফর নই যে দ্বারে দ্বারে দাঁড়িয়ে থেকে তামাম কথা শুনবো আমি আপনাদের ? আমরা জেনানা। অন্দর মহলে থাকি। আমাদের না বললে জানবো আমরা কি করে ?

নিজের জ্বালেই জড়িয়ে গেলেন জাফর আলী। তিনি বুঝতে পারলেন —— অভিমানটা তার একদম হাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। যার উপর অভিমান করে চলে যাচ্ছেন তিনি, সেই ফরিদাই এখনও জানেন না তাঁর চলে যাওয়ার কথা। এ ব্যাপারে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া নেই দেখে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন মনে মনে, অথচ ক্রিয়াই যেখানে নেই, সেখানে প্রতিক্রিয়ার উদয় হবে কোত্থেকে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে সরম পেলেন জাফর আলী। তাঁর সম্বন্ধে এঁরা একদম উদাসিন কিছু নয় দেখে অনুতপ্ত হলেন খানিক। তাই শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন —— সেতো ঠিকই —— সেতো ঠিকই।

ঃ তাহলে ?

ঃ মেহেরবানী করে কসুর নেবেন না আপনি। আমার একটা ভুল ধারণা ছিল যে, আপনি সব শুনেছেন। সবকিছুই জানেন আপনি। জেনে শুনেও আপনি যখন এ ব্যাপারে কোন কথাই বলছেন না তখন ভাবলাম, গায়ে পড়ে এই বাসী খবরটা দেয়া আপনাকে ঠিক হবে না।

ঃ টাট্‌কা থাকতেই সেই খবরটা দিতে পারতেন আপনি ?

বেকায়দায় পড়ে জাফর আলী কৈফিয়াত দিতে গেলেন। বললেন —— হ্যাঁ, তা পারতাম। তবে ব্যাপারটা হলো, বলার কোন মওকা আমি পাইনি।

ঃ মওকা!

ঃ কোন একটা প্রসঙ্গ না থাকলে, স্রেফ "আমি চলে যাচ্ছি" এই কথাটা জানাই আপনাকে কি করে ?

ঃ কি করে মানে ? এখানে বাধাটা আপনার কোথায় ?

ঃ আপনি আবার কি মনে করেন, এই ভেবেই ——

ঃ বটে! এতদিন পরও এটুকু সৎসাহস আপনার থাকবে না ? অথচ আপনাকে নিয়ে কতই না টানাটানি আমাদের!

জাফর আলীর দীল উষ্ণ হয়ে উঠলো। তিনি গদগদ কণ্ঠে বললেন —— না। মানে সত্যিই আমার ভুল হয়ে গেছে মস্তবড়।

ফরিদা বানু এড়িয়ে গেলেন এদিক। বললেন —— ওসব কথা থাক। আপনারা সবাই যদি চলেই যাবেন একে একে, তাহলে আর এলেন কেন আপনারা ?

জাফর আলী ইতস্তত করে বললেন —— এলাম মানে ——

ঃ আমাদের উপর এতটুকু কি দয়া মায়া নেই আপনাদের ? আসার সময় সবাই আমরা মহানন্দে হৈ হৈ করে একসাথে এলাম, আর এখন আমাদের এই অচিন মুলুকে ফেলে আপনারা নির্দ্বিধায় সরে পড়ছেন একে একে ?

ঃ তা কথা হলো, অন্যেরা কেন যাচ্ছেন সেটা ——

ঃ অন্যের কথা থাক। আমাদের নিয়ে অন্যের কারো মাথাব্যথা বা চিন্তা-ভাবনা নাও থাকতে পারে। কিন্তু আপনার ? আপনার ব্যাপারটাতো অন্যের মতো হওয়ার কথা নয় ? আপনাকে তো কেউ তা ভাবিও না আমরা ? আমাদের একা ফেলে আপনি যাচ্ছেন কেমন করে ?

ফরিদা বানুর বেগের সাথে তাল রাখতে না পারলেও, এসব কথায় জাফর আলী বিহ্বল হয়ে যেতে লাগলেন। তিনি শশব্যস্তে বললেন —— না-না, মানে —— কথাটা ঠিক হলো না। আমার যাওয়া না যাওয়াটাতো আমার একার ব্যাপর নয়। হুজুরের উপরও এটা অনেকটা নির্ভরশীল। হুজুর যদি চান ——

ফরিদা বানু কথা তাঁকে শেষ করতে দিলেন না। কথার মাঝেই বললেন —— আপনার সেই হুজুরই কি আপনাকে চলে যেতে বলেছেন ?

আলী বললেন — না, তা তিনি বলেননি। তবে আমি যাবার [illegible] করলে, 'না'ও তিনি করেননি।

[illegible] সঙ্গে সমর্থন করেছেন প্রস্তাব আপনার ?

ঃ জি না, তাও তিনি করেননি। কিছুটা ইতস্ততঃ করে পরে তিনি সম্মতি দান করেছেন।

ঃ উনি ইতস্ততঃ করেছেন ?

ঃ জি, তা করেছেন।

ঃ কেন ঐ ইতস্ততঃ করলেন উনি, তা বোঝেন না ?

ফাঁপড়ে পড়লেন জাফর আলী। কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেও ঐ ইতস্ততঃ করার অর্থটা যে নিগূঢ় কোন উদ্দেশ্যে কাছেই তাঁকে রাখতে চান তাঁর মুনিব, অর্থাৎ ফরিদা বানুর আব্বা, এটা জোরদারভাবে বোঝার মওকা কোথায় তাঁর ? এবার তা অনেকখানি অনুমান করতে পেরে তিনি বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং বিমূঢ় কণ্ঠে বললেন — তা, মানে —

ঃ আপনাকে আমার আব্বা কোন চোখে দেখেন, আপনার উপর তাঁর কতটা ভরসা আর বিশ্বাস — এটুকু বোঝার মতো জ্ঞানটাও আপনার নেই ?

উদ্বেলিত কণ্ঠে জাফর আলী বললেন — জিনা, জিনা। তা বুঝি। হুজুর আমাকে বহুত স্নেহ মুহাব্বত করেন।

ঃ অথচ সেই হুজুরকে একা ফেলে স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছেন আপনি!

ঃ না, মানে — হুজুর বললেই তো —

ঃ হুজুরের কথাও থাক। আমার কথাটা ভেবে দেখলেন না একবারও ? এই অচিনপুরীতে কেমন করে একা আমি থাকবো ?

ঃ হ্যাঁ, মানে আপনি বললেও আমি আমার ইরাদা —

তাঁর কথায় কান না দিয়ে ফরিদা বানু বলেই চললেন — ভাইটা আমার নাবালক। কোন বহিন আমার নেই। সঙ্গীহীন অবস্থায় এই নয়া জায়গায় একা একা কেমন করে থাকবো আমি ? ভাবতেই আমি পারছিনে, আমার সাথে কথা না বলে এমন একটা সিদ্ধান্ত কেমন করে নিলেন আপনি ?

গোস্বায় ফরিদা বানু গাল ফুলাতে লাগলেন। তাঁকে শান্ত করতে জাফর আলী বললেন — আহা, কথাটা আমার শুনুন। আপনি এত নাখোশ হবেন — এটা আমি বুঝতে পারিনি। আমি স্রেফ ভেবেছি —

ফরিদা বানু আবেগের উপরই ছিলেন। বললেন — দীল বলে কি কোন কিছুই নেই আপনার ? সোনার গাঁয়ে আমাকে সঙ্গ দেয়ার লোকের যখন

মোটেই অভাব ছিল না, তখন তো আপনি আমার পাশে পাশেই অহরহ থেকেছেন। আর এখানে আমি একেবারেই সঙ্গীহীন দেখেও আপনি চলে যেতে পারছেন ? তাইতো লোকে বলে, সত্যিকারের কে আপন লোক, একমাত্র মুসিবতের দিনেই তা বোঝা যায়!

অন্যদিকে মুখ ফেরালেন ফরিদা বানু। আনন্দে আবেগে এবং ফরিদা বানুর অভিমানে দিশেহারা জাফর আলী বললেন — আচ্ছা, ঠিক আছে — ঠিক আছে। হুজুরের সাথে কথা বলে —

তাঁর কথা শেষ হলো না। ইতিমধ্যেই দীদার আলী এসে ফরিদা বানুকে লক্ষ্য করে বললো — আপা, হুজুর আপনাকে উপর তলায় ডাকছেন —

মুখ ফিরিয়ে ফরিদা বানু বললেন — উপর তলায় ?

দিদার আলী বললো — জি, হাঁ।

ঃ আর কেউ আছে ওখানে ?

ঃ জি আছেন। ওখানে ইনসান আলী হুজুর কথা বলছেন বড় হুজুরের সাথে।

ঃ এখনই যেতে বললেন ?

ঃ জি-হাঁ। কি একটা আলোচনা করছেন উনারা আপনাকে নিয়ে, আর তাই আপনাকে এখনই যেতে বললেন।

ঃ ও, আচ্ছা যাচ্ছি —

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন ফরিদা বানু বেগম। অন্য আর কোন কথাই না বলে তিনি ব্যাস্ত পদে বেরিয়ে গেলেন। কুরসীর উপর অসহায়ভাবে বসে রইলেন জাফর আলী খান। পলক খানেক তা লক্ষ্য করে দীদার আলীও প্রস্থানোদ্যোগ করলো। খেয়াল হতেই জাফর আলী তাকে ডাক দিয়ে বললেন — এই, শোনো-শোনো —

ঘুরে দাঁড়ালো দীদার আলী। কাছে এসে বললো — হুজুর ?

জাফর আলী বললেন — কি, ব্যাপার কি দীদার আলী ?

জাফর আলীর প্রতি দীদার আলীর আগে থেকেই একটা আনুগত্য ছিল। জাফর আলী কি বলতে চান, তা বুঝতেও সে পারলো। তবু সে কথায় না গিয়ে সে প্রশ্ন করলো — কোন ব্যাপার হুজুর ?

ঃ ঐ যে ফরিদা বেগমকে ডেকে পাঠালেন উপর তলায় ?

ঃ উনাকে গরজ পড়েছে, তাই।

ঃ গরজ ? কি সে গরজ, তা কি কিছু জানো ?

ঃ জনাব!

ঃ ফরিদা বানুকে নিয়ে ইনসান আলী সাহেবের সাথে হুজুরের কি আলাপ ?

ঃ আপাকে নিয়ে কোথায় যেন যেতে বললেন তাঁকে। আপা এই এলাকার কোন এক জায়গায় বেড়াতে যাবেন কিনা ?

জাফর আলী তাজ্জব হলেন। বললেন — ইনসান আলী সাহেব তাঁর সাথে যাচ্ছেন মানে ?

ঃ নইলে আর কে যাবে হুজুর ? জেনানা আদমী। দূরে কোথাও যেতে হলে সঙ্গীতো একটা চাই তাঁর ? একা একা তো যেতে পারেন না তিনি ?

ঃ মানে ?

ঃ এর তো কিছু মানে নেই হুজুর। আপনারা একে একে সকলেই চলে যাচ্ছেন। এক আদিল খাঁ সাহেব ছাড়া আপাকে সঙ্গ দেয়ার মতো উপযুক্ত পুরানো আর কোন লোক নেই। ইনসান আলী সাহেবকেই তাই যেতে হচ্ছে।

ঃ সেকি!

ঃ চাকর-নফর দাসী-বাঁদী যতই সাথে থাক, গুরুত্বপূর্ণ আর নির্ভরশীল লোক ছাড়াতো আর যার তার উপর ভরসা করে হুজুর আমাদের পাঠাতে পারেন না বেটিকে ?

ঃ তা-মানে — ইনসান আলী সাহেব — !

ঃ অবাক হচ্ছেন কেন হুজুর ? আপনিও থাকছেন না। কাজেই শুধু এই একবার কেন, এরপর তো বরাবরই ঐ ইনসান আলী হুজুরই সাথে থাকবেন আপার! মকানেও তিনিই এখন সঙ্গ দেবেন তাঁকে।

জাফর আলী আহত কণ্ঠে বললেন — দীদার আলী —

জাফর আলীর মর্মদাহ বুঝতে পারলো দীদার আলী। সেই সাথে জাফর আলীর আহম্মকীটাও সে বুঝতে পারলো কিন্তু সে একজন দ্বারোয়ান। এর জবাবে এই রকম এক হোমড়া চোমড়া লোককে কি বলবে সে ? দীদার আলী বিষণ্ন বদনে বললো — হুজুর!

ঃ এটা কেমন হলো দীদার আলী ?

ঃ জি ?

ঃ একটা কিছু বলো তুমি ?

ঃ কি আর বলবো হুজুর ? ছোট মুখে বড় কথা কেমন করে বলি ?

ঃ আহা, বলোই না যা হোক!

ঃ আপনার কি সোনার গাঁয়ে না গেলে চলেই না হুজুর ?

ঃ কেন, চলবে না কেন ? জরুরী তেমন গরজ তো কিছু নেই।

ঃ তাহলে যাচ্ছেন কেন সেখানে ?

ঃ যাচ্ছি মানে, যাওয়া বোধহয় উচিত, এই বিবেচনায়।

ঃ আপনি আপাকে সঙ্গ দিলে তো বর্তেই যান সবাই তাঁরা। ঐ ইনসান আলী হুজুরকে আর ডাকার প্রশ্নই আসে না। তবু আপনি যাচ্ছেন কেন ?

ঃ দীদার আলী!

ঃ হুজুর, নিজের হাতের পাখী যদি নিজেই কেউ উড়িয়ে দেয় আসমানে তাহলে সে পাখী গিয়ে কোন গাছের কোন ডালে বসবে কখন — তার কি কোন ঠিক ঠিকানা আছে হুজুর!

জাফর আলী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি কিছু বলার আগেই দীদার আলীর জরুরী তলব এলো উপর থেকে এবং দীদার আলী পড়িমরি উপর তলায় ছুটলো।

ত্রিবেণী থেকে ফিরে এলেন তিনজন। শরীফ রেজা, দবির খাঁ আর মুইজুদ্দীন মালিক। ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব দহলীজেই ছিলেন। অশ্বপদ শব্দে তিনি বাহির আঙ্গিনায় বেরিয়ে এলেন এবং দবির খাঁদের যথাসময়ে ফিরতে দেখে যথেষ্ট খুশী হলেন। সেই সাথে শরীফ রেজাকে এদের সাথে দেখে তিনি তাজ্জবও হলেন চরম, চিন্তিতও হলেন কিছুটা। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক কদম সামনে এসে বললেন — আরে শরীফ রেজা যে! এসো — এসো—

এদিক ওদিক থেকে ইতিমধ্যেই আরো কয়েকজন লস্কর-নফর এসে জটলা করে দাঁড়ালো। ফৌজদার সাহেবকে এগিয়ে আসতে দেখেই শরীফ রেজা সালাম দিয়ে অশ্ব থেকে নামলেন। সালাম নিয়ে ফৌজদার সাহেব বললেন — যাও, ঐ দহলীজে বসো গিয়ে। ঘোড়া তোমার এরাই সামাল করবে।

তিনি তার নফরদের দিকে ইংগিত করলেন। অতপর তিনি দবির খাঁ আর মুইজুদ্দীনের সাথে তাদের হাল হাকিকত নিয়ে মামুলী কিছু কথাবার্তার পরই ফের শরীফ রেজার দিকে ঘুরলেন। শরীফ রেজা তখনও পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দিকে ঘুরেই ফৌজদার সাহেব ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — চলো — চলো ঐ দহলীজে গিয়ে একটু বসি আগে, চলো। কি তাজ্জব! তুমি যে এত জলদি ফিরে আসবে আবার, এটাতো আমি কল্পনা করতেও পারিনি।

শরীফ রেজাকে দহলীজে এনে বসিয়েই ফৌজদার সাহেব শংকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন — কি ব্যাপার, খবর টবর সব ভালতো ?

জবাবে শরীফ রেজা স্মিতহাস্যে বললেন — জি, আল্লাহর রহমে সব ভাল।

ঃ হুজুর ? হুজুরের খবর কি ?

ঃ তিনিও সহিসালামতেই আছেন।

ঃ তাঁর তবিয়ত ? মন মর্জি ?

ঃ জি, তামামই ঠিকঠাক। মুসিবত কিছু নেই।

ঃ তা তুমি আবার এত শিগ্‌গির এদিকে ? জরুরী কোন কাজে বেরিয়েছো নাকি ?

ঃ জি ?

ঃ কোথাও কি কোন গড়বড় দেখা দিয়েছে ?

ঃ জিনা-জিনা। আমি এখানে আসবো বলেই এসেছি। কোন মুসিবতের খবরে বা জরুরী কোন কাজ নিয়ে আসিনি।

ফৌজদার সাহেব আশ্বস্ত হলেন। শংকামুক্তির প্রশান্তি নিয়ে বললেন — যাক, তবু ভাল! হঠাৎ তোমাকে দেখে আমি তো কিছুটা ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। ভাবলাম, না জানি কোন নয়া খবর আছে বা নয়া ঘটনা ঘটেছে।

শরীফ রেজা সবিস্ময়ে বললেন — তাই নাকি ?

ঃ হ্যাঁ। এত শিগ্‌গিরতো তোমার আসার কথা নয় এখানে! মানে এমন কোন ইংগিত তুমি যাওয়ার সময় দাওনি ?

ঃ তা-ঠিক, তা-ঠিক এত শিগ্‌গির আসবো ফের, এমন কোন ইরাদাও আমার ছিল না।

ঃ তবে ?

শরীফ রেজা হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন — আমার হুজুর আমাকে কোরবাণী করে দিলেন।

বুঝতে না পেরে ফৌজদার সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন — কি রকম ?

ঃ রকমটা হলো, এ মুলুকের আজাদী হাসিলের খাতে হুজুর আমাকে নিঃস্বার্থভাবে খয়রাত করে দিলেন।

বুঝতে পেরে সশব্দে হেসে উঠলেন ফৌজদার সাহেব। বললেন — বাহ্‌-বাহ্‌! বড় সুন্দর ব্যাপারতো!

ঃ জি জনাব। আমার হুজুরের হুকুম — আজাদী হাসিলেন কাজ আর সেই সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়া দুস্‌রা কোন করণীয়ই আর নেই এখন আমার।

ঃ আচ্ছা।

ঃ এই কাজ আর চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আপনাদের সাথে অহরহ থাকতে হবে আমাকে আর ছুটতে হবে সর্বত্র।

এ খবরে ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব অত্যন্ত খুশী হলেন এবং খোশদীলে আওয়াজ দিলেন — শাব্বাশ্‌।

ঃ একমাত্র এই কাজের প্রয়োজনে ছাড়া, অন্য কোন অজুহাতেই সাতগাঁ আর লাখ্‌নৌতিতে আর কোন স্থান নেই আমার।

ঃ মারহাবা! মারহাবা!

ঃ এমনকি হুজুরের খেদমতের জন্যেও নয়।

একথায় ফের দমে গেলেন ফৌজদার সাহেব। বললেন — সে কি!

ঃ এই তার হুকুম এবং কড়া হুকুম।

ঃ তাজ্জব!

শরীফ রেজা তাঁর হুজুর শায়খ শাহ শফীউদ্দীনের ধ্যান ধারণা আর ইচ্ছা-ইরাদার তামাম কথা বয়ান করে শুনালেন। অতপর বললেন — আমার হুজুরের সারকথা — দ্বীন ইসলামের স্বার্থেই এই মুলুকটা অতি শিগ্‌গির আজাদ হওয়ার দরকার, আর এই আজাদী হাসিলের কাজে তিনি আমাকে এখন থেকেই আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন।

ঃ বেশ-বেশ।

ঃ তাঁর সেই নির্দেশ মোতাবেকই এখনই আবার আসতে হলো আমাকে।

ঃ বহুৎ খুব! বহুৎ খুব!

একটু থেমে ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব ফের উৎফুল্ল চিত্তে বললেন — সত্যিই দীল যাদের পাক হয়, তাদের চিন্তাধারা কতই না মহৎ আর উচ্চ পর্যায়ের হয়।

ঃ জি ?

ঃ আমি আমাদের শায়খ হুজুরের কথা বলছি। হুজুরের এই কিসিমের চিন্তাধারার কথা শুনে আমি সত্যিই মোহিত হয়ে গেছি। দ্বীনের রাহায় এতই নিবেদিত তাঁর অন্তর আর এত সার্থক তাঁর চিন্তা-ভাবনা। দ্বীন ইসলামের এই কিসিমের জবরদস্ত সৈনিকেরাই এ মুলুকে দ্বীনের চেরাগ শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন। এঁদের জন্যেই এই গুমরাহী ঘেরা মুলুকে এই চেরাগ আজও জ্বলছে।

ঃ জনাব!

ঃ তার ধ্যান ধারণা নির্ভুল। বিশেষ করে বাঙ্গালা মুলুকে দ্বীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে এ মুলুকটা স্বাধীন হওয়ার দরকার আর স্বাধীন সুলতান দ্বারা এ মুলুক শাসিত হওয়া দরকার।

ঃ জি-জি। একথাই আমাদের হুজুরের কথা। শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবেরও দেখলাম — চিন্তাধারা এই রকম।

ঃ হতেই হবে। এ মুলুকে দ্বীন আর কওমের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করবেন, তাঁদের উপলব্ধি ঘুরেফিরে এসে এই এক জায়গাতে মিলতেই হবে। তা যাক সে কথা। এবার বলো, তুমি দবির খাঁ আর মুইজুদ্দীনের সাক্ষাৎ পেলে কোথায় ? রাস্তার মাঝে ?

ঃ জিনা, ঐ ত্রিবেণীতে।

ঃ ত্রিবেণীতে! তুমি ত্রিবেণীতে গিয়েছিলে ?

ঃ জি। শুধু যাইনি, ওদের সাথে এক মুসাফিরখানায় থেকেছিও ওখানে।

ঃ বলো কি! ত্রিবেণীতে কি কাজে গিয়েছিলে ?

ঃ ঠিক নির্দিষ্ট কোন কাজে নয়। এই ভুলুয়াতে আসার পথেই ঐ পথ হয়ে এলাম। অনেকদিন যাইনি আমি ওদিকে, হাতে সময়ও ছিল। তাই ভাবলাম, কনকলতাদের ত্রিবেণীটা দেখেই যাই একবার।

শরীফ রেজার ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। ফৌজদার সাহেব বললেন — ও — আচ্ছা তা দবির খাঁদের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হলো কি করে ?

জবাবে শরীফ রেজা বললেন — আচানকভাবেই বলা যায়। এই ভুলুয়ায় আসবো বলে ত্রিবেণীর খেয়াঘাটে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। মুইজুদ্দীন মালিক হঠাৎ দেখে ফেলে আমাকে। সেও ওখানেই ছিল তখন।

ঃ দবির খাঁ ? দবির খাঁ কি ছিল তখন তার সাথে ?

ঃ ছিলেন। ঠিক সাথে নয়, ঐ নদীর পাড়েই একটু দূরে বসেছিলেন।

ঃ একা একা ?

ঃ জি, একদম একাই।

এরপর দবির খাঁকে শরীফ রেজা ওখানে যে অবস্থায় দেখেছিলেন, তা ফৌজদার সাহেবকে বর্ণনা করে শুনালেন এবং সবশেষে বললেন — এত বড় যে আঘাত আছে বেচারার দীলে, সেবার তাঁকে দেখে তা বুঝেতেই আমি পারিনি।

ঃ সব কথা শুনেছো ?

ঃ জি। মুইজুদ্দীন মালিকই সব বলেছে।

ঃ হ্যাঁ, এই মুইজুদ্দীন মালিক দবির খাঁর অনেক কথাই জানে। একসাথে ঘুরে ঘুরে সে অনেক কিছু শুনেছে। এই কনকলতার কথাও তুমি শুনেছো তাহলে নিশ্চয়ই ?

ঃ শুনেছি। যে মন্দিরে তাঁর আম্মা কাজ করতেন, ঘুরতে ঘুরতে সে মন্দিরও দেখে এসেছি।

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ফৌজদার সোলায়মান খান। পরে তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন — এই হলো এই দুইটি রহস্যের ইতিহাস। এই দুইজনের জিন্দেগীর প্রেক্ষাপট। হেসে খেলে জীবন কাটায় এরা। দেখলে কেউ বুঝতেই কিছু পারবে না। কিন্তু দীলে এদের ব্যথা আছে অনেক।

ঃ জনাব!

ঃ এরা দুইজনই নসীবের দুই অসহায় শিকার। নসীবের শিকার হয়ে এরা উভয়েই এতিম হয়ে গেছে!

ক্ষণিকের জন্যে ফৌজদার সাহেব নীরব হয়ে গেলেন। তিনি বসে রইলেন চুপচাপ। শরীফ রেজাও কিছুক্ষণ ঐভাবে বসে রইলেন। এরপর সসংকোচে প্রশ্ন করলেন — আচ্ছা জনাব, এই কনকলতার পিতৃ পরিচয়টা কি আসলে ?

মুখ তুললেন খান সাহেব। তিনি স্থির নয়নে কিছুক্ষণ শরীফ রেজার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সে দৃষ্টিতে তেজ নেই, জিজ্ঞাসা নেই, কৌতুহল নেই। সে দৃষ্টি উদাস। উদাস নয়নে চেয়ে থেকে তিনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন — জানিনে।

শরীফ রেজার কৌতুহল বৃদ্ধি পেলো। কিছুটা তাজ্জব হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন — বলেন কি! আপনিও কিছু জানেন না ?

জবাবে ঐ একইভাবে সোলায়মান খান বললেন — না।

ঃ তাজ্জব! সত্যিই তো তাহলে এক মস্তবড় রহস্য এই কনকলতা!

খেয়ালে এলেন সোলায়মান খান। প্রশ্ন করলেন — কি বললে ?

ঃ কনকলতাও কি তার পিতৃপরিচয় জানেন না ?

ঃ তা জানবে না কেন ? সে তা যথার্থই জানে।

ঃ জানে ?

ঃ হ্যাঁ, সে নিজেই বলেছে — সে সব জানে।

ঃ তবু আপনাকে বলেননি ?

ঃ না।

ঃ বলেন কি!

ঃ সেতো তা নিজ গরজে বলেইনি, বরং আমি একদিন প্রশ্ন করলে সে বিব্রতবোধ করেছে আর ব্যথা পেয়েছে খুব। দেখে শুনে আমিও আর পীড়াপীড়ি করিনি।

ঃ জনাব!

ঃ হয়তো বেচারীর জন্মগত দিকটা বলার মতো নয়, হয়তো সেটা নাজুক। তাই আর সে প্রশ্ন তুলে তাকে কষ্ট দিতে চাইনি।

ঃ তা — মানে—

ফৌজদার সাহেবের কণ্ঠ এবার আচানকভাবে শক্ত হলো। তিনি শক্তকণ্ঠে বললেন — আমি চাইনে, এ প্রশ্ন কেউ তুলে তাকে ব্যথা দিক।

ঃ জনাব!

ঃ জেনেও যখন সে তা বলতে চায় না, তখন নিশ্চয়ই তা জটিল এবং কষ্টদায়ক। খামাখা সে প্রসঙ্গ তুলে তাকে কষ্ট দেয়ার গরজটা কি ?

ঃ হ্যাঁ, তা —

ঃ সে আমাদের স্বজাতি নয়। যাদের সে স্বজাতি, মাথা ঘামালে তারা এ নিয়ে মাথা ঘামাবে। আমাদের এখানে মাথাব্যথাটা কোথায় ?

ঃ তা ঠিক — তা ঠিক।

ঃ তদুপরি জন্মের জন্যে কেউ কখনও দায়ী নয়। মানুষ দায়ী কর্মের জন্যে। কোন লোকের জন্মটা অপবিত্র হলেও, লোকটা অপবিত্র নয়। আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি সে। আশরাফুল -মাখলুকাতের সে-ও একজন দাবীদার। ইসলামে কারো জন্মগত ব্যাপার নিয়ে কোন সংকীর্ণতা নেই।

ঃ জি, তাতো বটেই।

ঃ আসলেও কনকলতাটা ফুলের মতো পবিত্র। এমন সৎস্বভাবের লেড়কী কদাচিত চোখে পড়ে। যেমন তার দীল, তেমনই তার চরিত্র আর তেমনই তার আদব আখলাক। কাজেই তুচ্ছ আর অনর্থক ঐ প্রশ্ন নিয়ে আমরা কেন মাথা ঘামাতে যাবো ?

ঃ অবশ্যই — অবশ্যই।

ঃ আমাদের সবারই লক্ষ্য হবে — সে সুখে থাক, আনন্দে থাক, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক, সে সুখী হোক — ব্যস্! একটা মানুষের জীবন সুখের করতে পারলে, তার চেয়ে বড় সুখ আর আছে ?

সরবে হাজির হলেন কনকলতা। তিনি বাইরে থেকেই আওয়াজ দিলেন — কৈ, উনারা সব গেলেন কোথায় ?

দহলীজে পা দিয়েই ফের বলে উঠলেন — এই যে, যা ভেবেছি — তাই। শুরু হয়েছে নসিহত।

ফৌজদার সাহেব হেসে বললেন — কি হলো আম্মিজান ?

আম্মিজান আক্রমণ করে বললেন — আচ্ছা বড়বাপ, তুমি একটা কি ?

ঃ কি মানে ?

ঃ তোমার কি হুঁশবুদ্ধি কমে যাচ্ছে দিন দিন ? কেমন যেন হয়ে যাচ্ছো তুমি!

অভিযোগ ফুটে উঠলো কনকলতার চোখে মুখে। তা লক্ষ্য করে পুনরায় হেসে ফেললেন ফৌজদার সাহেব। হাসতে হাসতে বললেন — কেমন হয়ে যাচ্ছি মানে ? হলোটা কি তা আগে বলবে তো ?

ঃ হলোটা কি! ওদিকে মুইজুদ্দীন চাচা, বাবা — উনাদের সবারই ডুব-গোছল হয়ে গেল, আর মেহমানকে এখনও তুমি আটকে রেখেছো দহলীজে ? কতদূর থেকে এলেন উনারা, খেয়াল রেখেছো কিছু ? আহার বিরামের জরুরত নেই ?

কপট বিস্ময়ে ফৌজদার সাহেব বললেন — ও হ্যাঁ, জরুর-জরুর! যাওহে সেপাই, যাও-যাও। ঘরতো তোমার চেনাই আছে। যাও শিগ্‌গির সেখানে।

বলেই ফের হাসতে লাগলেন খান সাহেব। শরীফ রেজা থতমত করে বললেন — তা মানে—

খান সাহেব ঐ একই সুরে বললেন — ওসব মানে টানে নেই কিছু। নসীব উম্‌দা হলে কোন বালাই মুসিবত কাউকে কখনও স্পর্শ করতে পারে না, বুঝেছো ?

ঃ জি — মানে ?

ঃ তোমার শায়খ হুজুর তোমাকে তাড়িয়ে দিলে কি হবে, তোমার সুখদুঃখ নিয়ে উনি না ভাবলে কি হবে, গায়ে কি তোমার কাঁটার আঁচড় লাগতে পারে কখনও ?

ফৌজদার সাহেবের ভাব দেখে শরীফ রেজারও হাসি পেলো। তিনি ঈষৎ হেসে বললেন কি যে বলেন জনাব ?

ঃ ঐ যে ঐ কনকলতাকেই জিজ্ঞেস্ করে দেখো না ? কি যেন বলে ওদের শাস্ত্রে ? "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়" — না কিসব কথা ? তোমার ব্যাপারটা ঐ রকমই। তোমার সুখদুঃখের খবর করার লোকের কি কোন অভাব আছে দুনিয়ায় ?

ঃ জনাব!

ঃ তোমার নসীব কি মা বাপহারা এই সোলায়মান খানের মতো ?

কপট রোষে ফুলে উঠলেন কনকলতা। বললেন, বড়বাপ, কি হচ্ছে এসব ?

ঃ কিছু নয় — কিছু নয়। বলছি — এতিম নাহলে, এই বদনসীব সোলায়মান খানেরও আম্মা এসে বলতো, বেলা হয়েছে কত সেদিকে খেয়াল আছে ? আহার বিশ্রাম নেই তোমার ?

কনকলতা তেড়ে এলেন। বললেন — তবেরে! উঠো, উঠো বলছি —

হো হো করে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন ফৌজদার সাহেব। সেই সাথে উঠে দাঁড়ালেন শরীফ রেজাও।

জিন্দেগীর এক নয়া চত্বরে পা দিলেন শরীফ রেজা। পাল্টে গেল শরীফ রেজার জীবন চক্রের আবহ। বদলে গেল পরিবেশ আর পরিমণ্ডল। ফৌজদার সোলায়মান খান জানিয়েছেন — অতপর খান সাহেবের মকানই মকান তাঁর। বাঙ্গালা মুলুকটা গোটাই তার কর্মক্ষেত্র হলেও, এই খান সাহেবের মকানই তাঁর বর্তমান ঠিকানা। গৌড় থেকে সাতগাঁ, সাতগাঁ থেকে ভুলুয়া, ভুলুয়ার পর সম্মুখে ঐ সোনার গাঁ। লাখ্‌নৌতি বা গৌড়ে একটা জন্মগত ঠিকানা তার থাকলেও, অদ্যতক কায়েমী কোন ঠিকানা নেই শরীফ রেজার। দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা, মানুষ এখানে মুসাফির, কায়েমী মোকাম প্রত্যেকের ঐ পরলোকে — এ দর্শনের পরোয়া মানুষ করুক আর না করুক, শরীফ রেজার জিন্দেগীটা আজও ঠিক এই রকমই। এমনই এক কক্ষপথে পাক খাচ্ছে নিরন্তর।

তাঁর বছপন কালের স্মৃতি আছে লাখনৌতির পথেঘাটে। কৈশোর আর যৌবনের দিনগুলি তাঁর পীর দরবেশের আখড়ার সাথে সম্পৃক্ত। এখন এলেন ভুলুয়ার এই গৃহবাসে। সাতগাঁয়ের পথ প্রান্তর আর আস্তানার ঐ খোলা চত্বর, ঐ মুক্ত হাওয়া — দীপ্ত আকাশ — কুঞ্জবন, এক পলকে পড়ে গেল হাজার বনের পশ্চাতে, তিনি এলেন সারি সারি নারিকেল বনের মুলুকে আর সুপারীবনের ছায়ায়। এ কুঞ্জেরও যদিও তিনি ক্ষণিকের এক অতিথি, কর্তব্যের দাওয়াত এলেই ছুটতে হবে দূরান্তরে — থাকতে হবে পথে ঘাটে, ময়দানে বা সরাইখানায়, তবুও এই মকানই আজকের তাঁর ঠিকানা। এই মুহূর্তে মউত এলে গোর হবে তাঁর এই গাঁয়েই।

নিজস্ব কোন গণ্ডী নেই, আত্মীয় স্বজন পড়শী নেই, সায়াহ্নের বিহঙ্গবৎ কুলায় ফেরার তাকিদ নেই। পশ্চাতে কোন আহ্বানও নেই আপনজনের। অতীত তার লগ্নি দেয়া, বর্তমানটা ভাড়াটে, ভবিষ্যৎ তার পুরোপুরি সন-করারী ইজারার। ধরতে পারলে আছে, না পারলে তা নিলাম ডাকে বিকিয়ে যাবে বেমালুম। নিজের বলে কোন কিছু ছিলও না একান্তই, সামনেও তা থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। অতীত তাঁর অস্পষ্ট, বর্তমান তাঁর রিক্ত, সম্মুখটা শূন্যের পরে নিঃসীম আর এক শূন্যেরই দেয়াল দিয়ে

ঘেরা। সামনে কেউ তাঁর নেই, আকর্ষণও নেই কিছু। লতার পাট চুকে গেছে, কনকলতাও ক্ষণিকের এক দুঃস্বপ্ন। এক রহস্যময় আলেয়া। এই আছে, এই নেই। যখন তখন নিভে যাবে লতার চেয়েও মিথ্যা হয়ে। দীলের জন পশ্চাতে কেউ রইলো না, সামনেও কেউ নেই তাঁর। সামনে এখন থাকার মধ্যে আছে শুধু অরাতি আর শহীদের সরাব পিয়াসী সঙ্গীরা। আছেন বাহরাম খান, কদরখান, ঈয়জুদ্দীন ইয়াহিয়া। আছেন সোলায়মান খান, ফখরউদ্দীন, ইনসান আলী, লাড্ডু মিয়া। আর আছে নাম নাজানা লড়াইয়ের ময়দানগুলো। এগুলোই সামনে নিয়ে হাল জিন্দেগী শরীফ রেজার।

হতাশার এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে দেদীপ্যমান আশার আলো যেটি, সেটি হলো — শত বঞ্চনার মাঝেও শরীফ রেজার হাল জিন্দেগী দুর্বার। শত শূন্যের মাঝেও তার শক্তির উৎস শাশ্বত। সে উৎসের মূলধারা তাঁর দ্বীনের খুঁটি মজবুত করার অনন্ত স্পৃহা আর বিপন্ন এই বাঙ্গালায় তাঁর কওমকে হেফাজত করার দুরন্ত বাসনা। এ বাসনা চরিতার্থে সক্ষম যদি হোন তিনি, সামনের এই সংগ্রামে কামিয়াবী আসে যদি — আসে যদি বাঙ্গালার সেই বাঞ্ছিত আজাদী, তাঁর এই বঞ্চনাময় ব্যক্তিজীবন কানায় কানায় ভরে যাবে সমষ্টির অফুরন্ত আনন্দের ধারায়।

আর যদি তা না আসে ? না আসে সেই স্বর্ণালী কামিয়াবী ? না পুরে এই একান্ত আকাঙ্খাটাও ? আর ভাবতে পারে না শরীফ রেজা!

কনকলতার তাড়া খেয়ে ফৌজদার সাহেবের সাথেই দহলীজ থেকে বেরিয়ে এলেন শরীফ রেজা। অতপর যে ঘরটিতে ইতিপূর্বে থেকে গেছেন তিনি, তার জন্যে নির্দিষ্ট সেই দক্ষিণ প্রান্তের বাইরের ঘরে চলে এলেন এবং গোছল--আহার অন্তে শয্যায় এসে শুয়ে পড়লেন। দবির খাঁ আর মুইজুদ্দীনের মতো দীর্ঘ পথের পেরেশানীতে শ্রান্ত ছিলেন তিনিও। বিশ্রাম তার প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট। তাই লোকজন নিয়ে কনকলতা তাঁর আশেপাশে থাকলেও, বিশ্রামে তাঁর ব্যাঘাত ঘটবে বিবেচনায় কনকলতা কোন রকম গল্প আলাপে যাননি। শরীফ রেজাকে শুইয়ে দিয়েই নিজ মকানে চলে গেছেন কনকলতা।

আহার অন্তে শুয়ে পড়েই গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে গেলেন শরীফ রেজা। ঘুম যখন তাঁর ভাঙ্গলো, বেলা তখন শেষ। শেষ প্রহরের সূর্য তখন ঘরের টানে আওয়ারা। শয্যার উপর উঠে বসলেন শরীফ রেজা। কাছে কোলে কেউ নেই। ঘর—বারান্দা নির্জন। অজু করে এসে তিনি নামাজ পড়লেন নির্জনে। এর পরে এক কুরসী টেনে দরজার কাছে আনলেন এবং খোলা

দরজায় বসলেন। বাইরেও কেউ নেই। খোলা বারান্দা পেরিয়ে তাঁর প্রসারিত দৃষ্টি ছুটে গেল অনেক দূরে। গাছপালা, ঘর দুয়ার আর গৃহপালিত পশুর সাথে লোক বসতির পরশকামী পক্ষীদের দেখতে পেলেন বেশ কিছু। কিন্তু কাছে কোলে লোকজন কিছু দেখলেন না। যে দু'একজন ছিলেন তখন, সবাই ছিলেন অনেক দূরে। রাস্তা বেয়ে হাঁটছেন কেউ, কেউবা আবার এক বাড়ী থেকে বেরিয়ে অন্য বাড়ীতে ঢুকছেন।

ত্রিবেণী থেকে বেরিয়ে একসাথে হৈ হৈ করে এলেন তাঁরা। গল্প গুজব আর রসালাপে তামাম পথ পেরিয়ে এলেন। খান সাহেবের মকানেও নানাজনের সংস্পর্শে তাঁর প্রথম দিকের মুহূর্তগুলো খোশহালেই কেটে গেল। ঘুম থেকে উঠে এই নিভৃত একাকিত্বে শরীফ রেজা ফিরে এলেন নিজস্ব অস্তিত্বে। ফিরে এলেন প্রস্তর কঠিন বাস্তবে। একা একা বসে তিনি তাঁর ভাসমান জিন্দেগীর নিকেশ কষতে লাগলেন। নজর দিলেন পেছন দিকের অতীতে, চোখ লাগালেন অনাগত ভবিষ্যতের আয়নায়। ফলাফল যা নিকেশ অন্তে আসতে লাগলো — তা নির্ভেজাল আনন্দ ধারায় বিধৌতই নয়, তার মধ্যেই বেদনার আঁসুও আছে ফোঁটা ফোঁটা।

হাতের উপর গাল রেখে শূন্যের পানে চেয়ে আছেন শরীফ রেজা। দৃষ্টি তাঁর খোলা। কিন্তু সে দৃষ্টিতে ধারণ শক্তি নেই। চেয়ে আছেন চেয়ে থাকার প্রয়োজনে, দেখার জন্যে নয়। বসে আছেন বিবশ দেহে, নড়ন চনড় নেই।

"ওমা, সেকি! কখন উঠলেন ঘুম থেকে ?"

সম্বিতে ফিরে এলেন শরীফ রেজা। সক্রিয় হলো দুই নয়নের দৃষ্টি। দেখলেন — সম্মুখে তাঁর কনকলতা দাঁড়িয়ে। দেখামাত্রই শরীফ রেজা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন এবং দরজা থেকে কুরসীখানা এক পাশে টানতে টানতে বললেন — এ্যাঁ! এইতো, এই এখনই।

এগিয়ে এলেন কনকলতা। এগিয়ে এসে বললেন — এখনই মানে কখন ?

ঃ এই একটু আগে।

ঃ একটু আগেই তো আমি এসেছিলাম আর একবার। দেখলাম, আপনি অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। তা দেখে ফের ফিরে গেলাম।

ঃ তাই না কি ? তাহলে তার পরে পরেই ঘুম ভেঙ্গেছে আমার। নামাজ পড়ে উঠেই তো এই একটু বসেছি। আসুন-আসুন, বসুন —

কুরসীখানা টেনে দিতেই কনকলতা হৈ হৈ করে বাধা দিলেন। বললেন আরে, করেন কি-করেন কি! আপনি দিচ্ছেন আমাকে আসন টেনে ?

ঃ জি ?

ঃ গুনাহ্‌গার কেন করছেন আপনি আমাকে ? আপনিই ওটাতে বসুন। আমি ঐ ঐখানাতে বসছি —

বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন কনকলতা। তিনি অন্য একটা কুরসী টেনে বসলেন এবং হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন — এত কি ভাবছেন বসে বসে ?

কুরসীতে ফের বসতে বসতে শরীফ রেজা বললেন — কই, নাতো ? তেমন কিছু নয়।

মাথা নাড়লেন কনকলতা। বললেন—উঁহুঁ, সত্যি কথা বললেন না।

ঃ বললাম না ?

ঃ নাঃ। আমি জ্যান্ত মানুষ সামনে এসে দাঁড়িয়েও নজরে আপনার পড়লাম না, আর আপনি বলছেন কিছু নয় ? এ কখনো হতে পারে না।

শরীফ রেজা ঈষৎ হেসে বললেন — তাহলে ?

ঃ জরুর কাউকে মনে পড়েছে আপনার। কিংবা কোন দুর্ঘটনা।

ঃ দুর্ঘটনা!

ঃ না, কোন দুর্ঘটনাও নয়। বড় কোন দুর্ঘটনা এর মধ্যে ঘটে থাকলে অবশ্যই আমরা জানতাম, মানে বড়বাপ তা জানতেন। কোন সাদামাটা দুর্ঘটনায় এতটা বিহ্বল হওয়ার আদমী আপনি নন। নিশ্চয়ই এতে যোগ আছে কোন আপনজনের।

ঃ আপনজনের!

ঃ মানে আপনজনের স্মৃতির বা বেদনার ব্যাপার নাহলে এতটা বিভোর হয়ে —

শরীফ রেজা ক্লিষ্ট হাসি হাসলেন। বললেন — আপনাকে তো বলেছিই আমি সেবার — আমার কোন আত্মীয় বা আপনজন কেউ নেই ?

ঃ না থাকলেও থাকতেই বা কতক্ষণ। আপনার মতো মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষীর অভাব থাকতে পারে এই দুনিয়ায় ?

ঃ মানে ?

ঃ আমাদের এক বিরহকাতর দিদিমণিকে যে অবস্থায় দেখেছিলাম, আপনাকে দেখে আজ সেই কথাটাই মনে হচ্ছে আমার।

মুখটিপে হাসতে লাগলেন কনকলতা। শরীফ রেজা মুখ তুলে তাঁর হাঁসির দিকে তাকালেন। এমনিতেই কনকলতার ঘাটতি নেই রূপে। শরীফ রেজার মনে হলো, এর উপরও সেই রূপলাবণ্যে আজ আবার কিঞ্চিৎ হাত লাগিয়েছেন কনকলতা। পরিচর্যার ন্যূনতম পরশেই সেই দীপ্তিময় রূপচ্ছটায় আগুন ধরে গেছে। সে আগুনের শিখা এসে দুই নয়নে

লাগলেও ধ্যানভঙ্গের আকস্মিকতায় শরীফ রেজা তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি। এবার তা লক্ষ্য করেই মুগ্ধ হলেন শরীফ রেজা। ঐ অপরূপ মুখাকৃতি আর চোখ-ভ্রু-ঠোঁটে সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই তিনি হারিয়ে ফেললেন নিজেকে। কনকলতার মুখের দিকে এক ধেয়ানে চেয়ে রইলেন বেখেয়ালেই। অল্পক্ষণেই কনকলতা তা বুঝতে পারলেন। বুঝতে পেরেই আর একদফা হাসলেন তিনি। নির্মল সে হাসি। হাসতে হাসতে বললেন — কি দেখছেন মুখে আমার ?

চমকে উঠলেন শরীফ রেজা। শরম পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিলেন চোখ। একইভাবে হাসতে হাসতে কনকলতা ফের বললেন — এ মুখে কি অন্য কারো মুখচ্ছবি তালাশ করছেন ? মানে, এক মুখ দেখে অন্য আর এক মুখের কথা ভাবছেন ?

আরো অধিক লজ্জা পেলেন শরীফ রেজা। ইতস্ততঃ করে বললেন — জি ? মানে কি বললেন ?

ঃ কৈ, আমার কথার জবাব তো সঠিক দিলেন না ?

মেঝের দিকে নজর রেখে শরীফ রেজা বললেন — কোন কথার ?

ঃ ঐ যে বললাম, মগ্ন হয়ে কোন ভাবনা ভাবছেন এত ?

নিজেকে সহজ করার ইরাদায় শরীফ রেজা নড়ে চড়ে বসলেন এবং গলা ঝেড়ে বললেন — না–না, কোন ভাবনা টাব্‌না নয় তেমন। এই অম্‌নি অম্‌নি, এই আর কি!

শরীফ রেজার নজর ঐ মেঝের দিকেই রইলো। তা খেয়াল না করে কনকলতা প্রশ্ন করলেন — অম্‌নি–অম্‌নি ?

ঃ জি–হাঁ — জি–হাঁ।

ঃ ভাবনা টাব্‌না নয় কিছু ?

ঃ জিনা–জিনা।

ঃ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলুন তো ?

ঃ শরীফ রেজার নজর আরো নত হলো। তিনি নত নজরেই বললেন — তা মানে —

ঃ কোন ভাবনা আপনি ভাবেননি, এই মিথ্যাটা কেমন করে বলতে পারেন আপনি, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলুন তো দেখি —

শরীফ রেজা ইতস্ততঃ করে বললেন — না, এই নিজেরই ব্যাপার-স্যাপার।

কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, এই আর কি!

এতক্ষণে কনকলতা লক্ষ্য করলেন, শরীফ রেজার মাথাটা নুয়ে আছে সেই থেকেই। তা লক্ষ্য করেই কনকলতা হৈ হৈ করে উঠলেন। বললেন আরে-আরে! সে কি!

শরীফ রেজা ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — জি ?

ঃ উহরে বাবা! এমনটি হলেতো আপনাকে নিয়ে পারবো না।

ঃ মানে ?

ঃ পুরুষ মানুষের এত লজ্জা থাকবে কেন ? বিশেষ করে সেপাই মানুষের ?

ঃ লজ্জা ?

ঃ হ্যাঁ। এক কথাতেই নুয়ে গেছেন শাকের মতো! ঠিক আছে বাবা, ভুল হয়েছে — ত্রুটি হয়েছে, আমি ত্রুটি স্বীকার করছি।

ঃ এ্যাঁ। এসব কি বলছেন ?

ঃ কথাটা আমি ঠাট্টাচ্ছলে বলেছি আর একজন পুরুষ মানুষকে বলেছি। আসলে আমি যে একজন জেনানার সামনে বসে আছি, তা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারলে কি আর এত ঢিলাঢালাভাবে কথা বলি আপনার সাথে ? নিক্তি দিয়ে মেপে মেপে বলতাম। তা যাহোক, আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাফ করে দিন —

বলতে বলতে দুই হাত জোড় করে ঠোঁট চেপে হাসতে লাগলেন কনকলতা। কপটরোষে শরীফ রেজা লাফ দিয়ে কুরসী থেকে উঠলেন এবং বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন — নাঃ! আপনার সাথে আর পারলাম না।

এবার সশব্দে হেসে ফেললেন কনকলতা। হাসতে হাসতে বললেন — পারবেনও না কোনদিন, যতক্ষণ না ঐ জেনানা ভীতি দীল থেকে আপনার না যাচ্ছে।

বাইরে থেকেই শরীফ রেজা বললেন — জেনানা ভীতি!

বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে কনকলতা বললেন — পয়লা থেকেই লক্ষ্য করছি, মাথা আপনার সবসময়ই নুয়ে থাকে। আমার সামনে কিছুতেই আপনি সহজ হতে পারেন না। কিছুটা সৌজন্য অবশ্যি ভাল। কিন্তু এতটা নয়।

ঃ আচ্ছা!

ঃ তাই আমি স্থির করেছি, আপনাকে একটু বানাতে হবে শক্ত করে।

হাসির রেখা লেগেই রইলো কনকলতার মুখে। শরীফ রেজা বললেন — ফের শুরু করলেন ?

ঃ হ্যাঁ, শুরু করেছি, সারা করিনি। এক বাড়ীতে থাকতে হবে যখন, তখন এ ভূত আপনার ছাড়াতেই হবে আমাকে ?

ঃ ছাড়াতেই হবে ?

ঃ জরুর। এক বাড়ীতে থাকবেন অথচ সহজ হতে পারবেন না, ওটি হবে না।

ঃ হবে না ?

ঃ জ্বিনা। দরকার হলে তলোয়ার ধরতে হবে। যদি তা পারেন, ভাল। না পারলে এ বাড়ীর ভাত আপনার চাউল।

ঃ মানে ?

ঃ মানে এ মকানে আমি ছাড়া আর দুস্‌রা কোন জেনানার ঠাঁই নেই — বুঝতে পেরেছেন ?

ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব এদিকেই আসছিলেন। কনকলতার কথা শুনে তিনি হাসি মুখে বললেন — আরে, এত কি বোঝাচ্ছো মেহমানকে ?

সংকুচিতভাবে শরীফ রেজা তাঁর সাথে সালাম বিনিময় করলেন। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে কনকলতা সহাস্যে ও স্বচ্ছকণ্ঠে বললেন — বুঝাচ্ছিনে বড়বাপ, বানাচ্ছি। আপনার এই মেহমানকে মানুষ বানানোর কোশেশ করছি। পুরুষ মানুষের এত শরম ? তাও আবার শুনি, লড়াই করেন। কেমন করে লড়াই করেন, তাতো কিছু বুঝিনে। সামনে হঠাৎ আউরাত কেউ এলেইতো তলোয়ার ফেলে বসে পড়বেন শরমে।

হো হো করে হেসে উঠলেন সোলায়মান খান সাহেব। শরীফ রেজাকে বললেন — এখন বুঝতে পারছো শরীফ রেজা, কেমন কড়া শাসনের মধ্যে আমি আছি ?

শরীফ রেজা বললেন—জি ?

ফৌজদার সাহেব বললেন — সবসময় একদম সিধাভাবে চলতে হয়। কোন রকম লুকাই-লুকাই, পালাই-পালাই, চলবে না। উনিশ বিশ হয়েছে, না মরেছো! একদম বিষ নামিয়ে ছাড়বে।

শরীফ রেজা বললেন — তা বুঝতে পারছি।

ঃ তাই বলে আবার তুমি যেন ভেবো না, মেয়েটা খুব মুখরা। যতখানি বলা দরকার তরতর করে ঠিক ততখানিই বলবে। এরপর ব্যস্‌। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর একটা কথাও মুখচিপে বের করতে পারবে না। আসলে একেবারে খাঁটি সোনা বুঝলে, খাঁদের কোন নাম গন্ধও নেই।

কনকলতার দিকে আঁড়চোখে চেয়ে শরীফ রেজা বললেন — জি-জি, ওটা আমি পয়লা দিনেই বুঝেছি।

ঃ তুমি তো আবার বেশ খানিকটা লাজুক ছেলে। ওর সামনে জড়সড় হয়ে যাচ্ছো বুঝি খুব ?

কথা ধরলেন কনকলতা। বললেন — হয়ে যাচ্ছেন মানে কি ? একদম লতার মতো নুয়ে পড়ছেন। আচ্ছা এক মেহমান আপনি রাখলেন শেষে বড়বাপ!

শরীফ রেজার দিকে অমনিভাবে আঁড়চোখে তাকিয়ে কনকলতাও চাপা হাসি হাসতে লাগলেন। সে দিকে না চেয়ে শরীফ রেজাকে উদ্দেশ করে ফৌজদার সাহেব বললেন — আরে সেকি! ওতো ঐ পুঁচকে একটা মেয়ে। তোমার অনেক ছোট। ওকে দেখে তোমার এত শরম কিসের ? বরং ওর সামনে কেউ সহজ হতে না পারলেই ও বিগ্‌ড়ে যায়। দেখো না, এ বাড়ীতে সবার সাথে কেমন তার স্বচ্ছন্দ মেলামেশা, সবাইকে কেমন শাসন করে বেড়ায় ?

শরীফ রেজা বললেন — জি, জি, তা ঠিক।

ঃ ওকে তোমার শরম কি ? ওতো তোমার একদম বহিনের মতো। ছোট বহিন। সেই মাফিকই ওর সাথে চলাফেরা করবে তুমি। আমি তো আর তোমার হরওয়াক্ত খবর রাখতে পারবো না ? ওর হাতেই থাকতে হবে তোমাকে।

ঃ জি, তা বুঝতে পারছি।

ফৌজদার আরো হেসে বললেন — শরম করলে তুমিই মারা পড়বে হে। শরম করলে এ দুনিয়ায় গরম ভাত মেলে না।

ফৌজদার সাহেব তখনই বারান্দার নীচেই দাঁড়িয়েছিলেন। খেয়াল হতেই কনকলতা ব্যস্তকণ্ঠে বললেন — আরে! সে কি বড়বাপ ? তুমি নীচে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? এসো-এসো, উপরে এসো। আমি কুরসী দিচ্ছি বারান্দায়।

হাত তুলে বাধা দিয়ে ফৌজদার সাহেব বললেন — না-না বসবো না। শরীফ রেজাকে আমি একটা কথা বলতে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে শরীফ রেজা বারান্দার নীচে নেমে এলেন। ব্যস্তভাবে বললেন — জি-জি, বলুন।

ঃ কথাটা এমন কিছুই নয়। আগামীকাল খুব ভোরে আমার এক লোক যাচ্ছে ভুলুয়ার সদরে। তাঁরা বলেছিলেন, তুমি এলে তোমাকে নিয়ে কোন তারিখে যাবো আমি সেখানে, সে সংবাদটা আগাম তাঁদের জানাতে।

ফখরউদ্দীন সাহেব তো খুব ব্যস্ত মানুষ এখন। মাঝে মাঝেই তাঁকে আবার সোনার গাঁয়েও যেতে হয়। সংবাদ পেলে সেই মোতাবেক সদরেই তিনি থাকবেন। কবে নাগাদ যাওয়া যায় বলোতো?

শরীফ রেজা উৎসাহ ভরে বললেন — চলুন না, পরশু দিনই যাই আমরা?

আপত্তি করলেন ফৌজদার সাহেব। বললেন — না–না, পরশু তরশু পারবো না। এ হপ্তা গোটাই আমি খুবই ব্যস্ত আছি। চলো আগামী হপ্তার পয়লা দিনই যাই!

ঃ জি–জি, আপনি যা বলবেন, তাইই হবে। আমার তো কোন অসুবিধাই নেই।

ঃ অসুবিধে নেই তো? মানে ইতিমধ্যে অন্য কোথাও যাওয়ার কোন ইচ্ছে ইরাদা কিছু —

ঃ জিনা–জিনা। তেমন কোন পরিকল্পনা কিছুই আমার নেই এখন।

ঃ বেশ বেশ। তাহলে বরং এ কয়দিন তুমি আমার এই এলাকাটার এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে একটু পরিচিত হয়ে নাও।

ঃ জি আচ্ছা।

ঃ তাহলে যাই। যে লোকটা যাবে, সে খবরটার জন্যে অপেক্ষা করছে বাহির আঙ্গিনায়। এখনই ফের আর এক জায়গায় যাবে সে। খবরটা তাই এখনই দিতে হবে।

ঃ আচ্ছা।

ঃ তাহলে তাকে সেই কথাই বলে দি–গে, না কি বলো?

ঃ জি–জি।

ফৌজদার সাহেব ব্যস্ত পদে চলে গেলেন। বারান্দা থেকে নেমে এলেন কনকলতা। শরীফ রেজাকে হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন—কি, শরমটা গেল কিছু?

শরীফ রেজা চোখ তুলে কনকলতার মুখের দিকে সরাসরি তাকালেন। স্থির নয়নে চেয়ে থেকে বললেন — জি, বিলকুল। এত ধোলাইয়ের পরেও কি আর ওটা থাকে?

চেয়েই রইলেন শরীফ রেজা। এবার চোখ নামালেন কনকলতাই। হাসি মুখে বললেন — শাব্বাশ্।

মাগরিবের আজান শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই সচকিত হয়ে উঠলেন। কনকলতা বললেন — এই যাঃ! যে কথা শুনতে এলাম, তা কিছুই শোনা হলো না। তা যাক, পরেই সেসব শুনবো। মসিজদ তো চেনাই আছে। যান, নামাজটা আগে সেরে আসুন।

মাগরিবের নামাজ আদায় করে শরীফ রেজার আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফেরা হলো না। মসজিদ থেকে বেরিয়ে তিনি ফৌজদার সাহেবের সাথে সাথে তাঁর দহলীজে এসে ঢুকলেন এবং নানা রকম কথাবার্তা নিয়ে এশাতক্ ওখানে বসেই কাটালেন। এশার নামাজ পড়ে এসেও আরো কিছুক্ষণ বসলেন তাঁরা। এরপর ঘরে ফিরে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেন শরীফ রেজা। কনকলতার সাথে সেদিন আর কোন রকম কথাবার্তাই হলো না। কনকলতা যা শুনতে চান, তা অমনি রয়ে গেল।

পরের দিন নাস্তা করে শরীফ রেজা তাঁর শয্যায় এসে বসতেই ঘরে ঢুকলেন কনকলতা। একটা কুরসী টেনে বসতে বসতে বললেন — কাল থেকে যা জানার জন্যে ঘুরছি, সে মওকাই আমি পাচ্ছিনে। শুনলাম, ত্রিবেণীতেই নাকি মুইজুদ্দীন চাচা আর বাবার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে আপনার — মানে ঐ ত্রিবেণীর খেয়াঘাটে? তাই কি?

শরীফ রেজা স্মিতহাস্যে বললেন—হ্যাঁ।

কনকলতা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—সে কি! ত্রিবেণীতে গিয়েছিলেন আপনি?

ঃ হ্যাঁ, গিয়েছিলাম তো।

ঃ তাজ্জব। আমি ভাবলাম, রাস্তার মাঝেই সাক্ষাৎ হওয়ায় বাবাদের সাথে সামিল হয়েছেন আপনি! কিন্তু পরে শুনছি, আপনিও ঐ ত্রিবেণীতেই গিয়েছিলেন।

ঃ ঠিকই শুনেছেন।

কনকলতা চিন্তিতকণ্ঠে বললেন — ত্রিবেণীতে আপনি গেলেন — কি, কাজটা কি ছিল সেখানে?

ঃ না, কাজটা তেমন কিছুই নয়। এই ভুলুয়ায় আসার পথে এমনি একটু খেয়াল হলো, ত্রিবেণী হয়েই যাই। তাই সেখানে গেলাম।

কনকলতার ভ্রূযুগলে ছোট্ট একটা কুঞ্চন দেখা দিলো। তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন— তাই সেখানে গেলেন? কতদিন পর গেলেন আপনি সেখানে?

ঃ তা অনেকদিন পরই বলা যায়।

ঃ অনেকদিন মানে কতদিন?

ঃ বছর কয়েক হবে।

ঃ বছর ক-য়ে-ক! কয়েক বছর পর হঠাৎ আপনার খেয়াল হলো — একটু ত্রিবেণী হয়েই যাই?

কনকলতার কণ্ঠে কৌতুক আর বিস্ময় ফুটে উঠলো। তা লক্ষ্য করে শরীফ রেজা আবার একটু হাসলেন। হাসিমুখে বললেন — কেন বলুনতো ? একথা বলছেন কেন ?

ঃ একটা প্রশ্ন আমার মনের কোণে বার বার উঁকি দিচ্ছে।

ঃ প্রশ্ন ?

ঃ মানে একটা ধারণা। রাতে শুয়ে শুয়ে সেই ধারণার উপরই আমার অনেক সময় কেটেছে।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ আপনি যদি একান্তই নির্দিষ্ট কোন কাজে গিয়ে না থাকেন, তাহলে বোধহয় আমার ধারণা সত্যিও হতে পারে।

কনকলতা সাগ্রহে চেয়ে রইলেন। শরীফ রেজা বললেন — না, সত্যিই আমি কোন নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে যাইনি।

ঃ তাহলে কেন আপনি গেলেন, ঠিক ঠিক তা বলার মতো সৎসাহসটা দেখান তো একটু দেখি।

কনকলতা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। শরীফ রেজা উল্টা পথ ধরলেন। বললেন — আপনার কি ধারণা তাই আগে বলুন। যদি তা মিলে যায় আমি সত্যিই তা স্বীকার করবো, কথা দিচ্ছি।

স্থির নয়নে চেয়ে থেকে কনকলতা বললেন — ওয়াদা? শরীফ রেজা নিঃসংকোচে বললেন—ওয়াদা।

কনকলতা অবিচল কণ্ঠে বললেন—আপনি আমার খবর নিতেই সেখানে গিয়েছিলেন।

চমকে উঠলেন শরীফ রেজা। বিপুল বিস্ময়ে কনকলতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন — সে কি!

কনকলতা সপুলকে বললেন — কথাটা ঠিক কিনা, তাই আগে বলে আপনি আপনার ওয়াদা রক্ষে করুন।

ঃ জি, ঠিক।

ঃ ঠিক! আপনি সত্যি তা স্বীকার করছেন ?

শরীফ রেজা ধীর কণ্ঠে বললেন — ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার পর আর আমি সত্যটা অস্বীকার করি কি করে ?

খুশীর প্রভায় কনকলতার চোখ মুখ দীপ্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই কি যেন কি ভেবে তিনি আবার দমে গেলেন। এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ শরীফ রেজার মুখের দিকে চেয়ে থাকার পর তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন — লোকটাতো আপনি সুবিধের নন বড় একটা!

সচকিত হয়ে শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন — কেন-কেন ?

ঃ একটা মেয়ের খবর করতে আপনি ত্রিবেণীতে গেলেন ? তাও আবার একটা ভিনজাতের মেয়ে ?

ঃ মেয়ের খবর!

ঃ যুদ্ধ নয়, লড়াই নয়, দেশের কোন কাজ নয়, স্রেফ একটা মেয়েছেলের ব্যাপার নিয়ে এত আগ্রহ আপনার ?

ঃ এ্যাঁ!

ঃ তাহলে তো আপনাকে দিয়ে কিছুই হবে না এ দেশের। খামাখাই আপনাকে নিয়ে ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব খোয়াব দেখছেন বড় বড়।

কনকলতা মুখ ঘুরিয়ে পুনরায় হাসতে লাগলেন। তা লক্ষ্য করে শরীফ রেজা বললেন—আচ্ছা হলেম না হয় আমি একটা খারাপ লোক। মেয়েদের নিয়ে বেশী আগ্রহ আমার। কিন্তু আপনি ? আপনার তো কাউকে নিয়ে কোন আগ্রহই নেই। আপনি কি করে বুঝলেন — আমি আপনার খোঁজ করার জন্যেই ত্রিবেণীতে গিয়েছিলাম ?

পাল্টা চাপে পড়েও কনকলতা দমলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন — ওটা আমি পয়লা দিনেই বুঝেছিলাম।

ঃ পয়লা দিনে!

ঃ ঐ যে সেবার এসে বড়বাপের সাথে আপনার আলাপ হলো আমাকে নিয়ে ?

আমি তো দহলীজের দরজার পাশেই ছিলাম। আপনাদের আলাপ যে আমি সব শুনেছি, তাওতো আপনাকে আমি বলেছিলাম একটু পরেই।

ঃ হ্যাঁ, বলেছিলেন।

ঃ ঐ আলাপের মধ্যে আমাকে নিয়ে যে আগ্রহ দেখেছি আমি আপনার — আমি কে, কার মেয়ে, কোথায় বাড়ী, ত্রিবেণীর কোথায়, ওখানে কেন — ইত্যাদি নিয়ে আপনার যে মাথাব্যথা লক্ষ্য করেছি তখন, তাতেই আমি বুঝেছি — আমি মরেছি।

ঃ কি রকম ?

ঃ আপনি আমার ইহকাল আর পরকাল — এ দুটোই একসাথে ঝরঝরে করে তবেই ছাড়বেন।

আবার মিটিমিটি হাসতে লাগলেন কনকলতা। শরীফ রেজা বললেন — তা কি করবো আর না করবো, জানিনে। তবে নিজেকে ঘিরে কেউ এতটা রহস্য রচনা করে রাখলে, স্রেফ এই নাদান শরীফ রেজা কেন,

যেকোন শরীফ ঘরের আদমীও সে রহস্যভেদ করার দুর্বার আগ্রহে অস্থির হয়ে উঠবেন। জানেন তো, মানুষ বড় রহস্য কাতর ? কোথাও কোন রহস্যের গন্ধ পেলে তারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যায় ?

ঃ রহস্য! রহস্য কোথায় পেলেন আপনি ?

ঃ কেন ? আপনি নিজেই একটা জীবন্ত রহস্য!

ঃ কি রকম ?

ঃ কি রকম মানে ? লোক আপনি ত্রিবেণীর — আছেন এই ভুলুয়ায়, জাতে আপনি হিন্দু — থাকেন মুসলমানদের নিয়ে, গোত্রে আপনি কুলিন — অথচ দবির খান সোলায়মান খান সাহেবেরা আপনার আব্বা আর বড় আব্বা! এটা কি একটা যেমন তেমন গোলক ধাঁধা ? তদুপরি —

শরীফ রেজা থামলেন। তা দেখে কনকলতা বললেন — তদুপরি ? থামলেন কেন, বলুন ? বলতে যখন শুরু করেছেন তখন আর খামাখা ঢাক-ঢাক ভাব কেন ? বলুন-তদুপরি ?

ঃ তদুপরি আপনার এই তুলনাহীন খুব সুরাত, অসাধারণ জ্ঞান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দীল খোলা আচরণ আর সেই সাথে সবার উপর আপনার এই অবাধ প্রভুত্ব, সবার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা, অফুরন্ত দরদ, অসামান্য স্নেহ মমতা, মানে — ওরে বাপরে। আর আমি বলতে পারছিনে। মাথা আমার ঘুরছে।

শরীফ রেজার ভাব দেখে কনকলতা খানিকটা শব্দ করেই হাসলেন। বললেন — ঘুরছে ?

ঃ জি, বন বন করে ঘুরছে।

ঃ ঘুরবেই। রহস্য ভেদের খাহেশ যাদের অধিক হয়, তাদের মাথা ঘুরেই না শুধু, অনেক সময় বিগ্‌ড়েও যায়।

ঃ তাই ?

ঃ বিলকুল। এত খাহেশ দীলে থাকলে, তার অশান্তির শেষ থাকে না।

ঃ তাহলে ?

ঃ আমার একটা নসিহত শুনুন, দীলে শান্তি পাবেন।

ঃ নসিহত ? আচ্ছা বলুন-বলুন —

কনকলতার কণ্ঠস্বর কিছুটা গম্ভীর হলো। তিনি বললেন — ঠাট্টা নয়, যা বলছি — সত্যিই তা একটু গুরুত্ব দিয়ে শুনুন।

ঃ আচ্ছা, বলুন। আমি শুনছি —

ঃ যতটুকু জেনেছেন — জেনেছেন। ব্যস্‌। আর বেশী দরকার নেই। এটুকু নিয়েই আপনি তৃপ্ত থাকুন, সত্যিই আপনি আরামে থাকবেন। দীলও আপনার তাজা থাকবে। কোন অস্বস্তিবোধ করবেন না।

ঃ তাই ? আচ্ছা তাহলে তাই হবে। ও নিয়ে আর ভাববো না।

ঃ ভাববেন নাতো ?

ঃ জিনা। সখ আমার থেমে গেছে। আপনার রহস্য নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাতে যাবো না।

ঃ ঠিক ?

ঃ ঠিক।

ঃ ওয়াদা ?

ঃ এ্যাঁ! না-না, এতটা নির্দয় হবেন না। এতিম অসহায় পেয়ে এত শক্ত করে বাঁধবেন না। হয়তো সহ্য করতে পারবো না।

ঃ তার অর্থ, দীলে আপনার কৌতুহল কিছু থেকেই যাচ্ছে এরপরও ?

ঃ মানে ?

কনকলতা ক্ষীণকণ্ঠে বললেন — দীল আপনার দ্বন্দ্বমুক্ত হচ্ছে না। ধীরে ধীরে দুই চোখ নামিয়ে নিলেন কনকলতা। তার মুখমণ্ডলে পাতলা একটা পর্দা পড়লো বিষাদের। তা দেখে শরীফ রেজা ব্যস্তকণ্ঠে বললেন — না-না, কোন কৌতুহল নয় বুঝলেন ? আসলে মানুষ তো আমি। আপনাকে নিয়ে কোন ভাবনা যদি আসেই কখনও দীলে, তাহলে তো আমি ওয়াদা খেলাপের দায়ে পড়ে যাবো।

কনকলতার মাথাটা ইতিমধ্যেই আরো একটু নুয়ে এলো। শরীফ রেজার একথা যে কনকলতা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন — এমন মনে হলো না। নত মস্তকে বেশ কিছুক্ষণ একভাবে মেঝের দিকে চেয়ে রইলেন কনকলতা। এরপর আস্তে আস্তে মুখ যখন তুললেন তিনি, তখন শরীফ রেজা অবাক বিস্ময়ে দেখলেন — সে মুখে রক্ত নেই, সে মুখ পাণ্ডুর। এতদৃশ্যে শরীফ রেজা কি বলবেন — তা স্থির করতে পারলেন না। সম্বিতহীনের মতো তিনি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। মুখ তুলে কনকলতা সখেদে বললেন — আমি তাজ্জব হই, এ দুনিয়ার প্রায় মানুষই কম বেশী একই রকম। দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় রকমের ফারাগ কারো মধ্যেই তেমন একটা দেখলাম না।

শরীফ রেজা হতভম্ব হয়ে গেলেন। কনকলতা যে একথার মধ্যে তাকেও জড়ালেন, এটা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হলো না। কিন্তু জবাবে কি বলবেন। স্থির করতে না পেরে তিনি থতমত করতে লাগলেন।

আরো অধিক অধিক করুণ কণ্ঠে কনকলতা আবার বললেন — আমার অত্যন্ত কষ্ট হয় এই কারণে যে, এই জলজ্যান্ত আমাকে দিয়ে কেউই আমার মূল্য বিচার করতে চায় না। সবাই আমার ঠিকুজী, মানে,

গোত্রবংশ দিয়ে আমার মূল্য নির্ধারণ করতে চায়। আমাকে নিয়ে নয়, কেন যেন সবাই আমার ঠিকুজী নিয়ে ব্যস্ত।

সকল দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে শরীফ রেজা এবার সবলকণ্ঠে বললেন — এ্যাঁ! সে কি! না-না, আপনি ভুল করছেন। আমি কিন্তু —

ফল কিছুই হলো না। আপন খেয়ালে বলেই চললেন কনকলতা — আমার ঠিকুজী — যদি উজ্জ্বল হয়, তাহলে আমি কুরূপা বা কুচরিত্রের যা-ই হই না কেন, আমি পরমবস্তু। আর যদি তা না হয়, অজ্ঞাত-অস্পষ্ট হয় বা কোন রকমের সংশয় কিছু থাকে সেখানে, আমার সবকিছুই মিথ্যা। আমি কুৎসিতল — আমি অস্পৃশ্য!

কনকলতার কণ্ঠে অপরিসীম বেদনার সুর মূর্ত হয়ে উঠলো। তা দেখে শরীফ রেজার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ হলো ফৌজদার সাহেবের কথা। ফৌজদার সাহেব বলেছিলেন পরিচয় ঘটিত কোন প্রশ্ন উঠলেই কনকলতা খুব কষ্ট পায়। অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়ে। কথাটার সত্যতা পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করলেন শরীফ রেজা। আর সে কারণেই তিনি অতিশয় ব্যস্তভাবে বললেন—দোহাই আপনার, আপনি ভুল বুঝবেন না। আমি ওসব কিছু ভাবিনে।

মুখ তুললেন কনকলতা। শরীফ রেজা ফের বললেন—এভাবে আপনি বলবেন না। মানে, এতটা অবিচার আপনি আমার উপর করবেন না।

কনকলতার সম্বিত ফিরে এলো। সপ্রোত্থিতের মতো তিনি বললেন — এ্যাঁ!

শরীফ রেজা গম্ভীর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন — আপনি যদি এতটা আস্থাই হারিয়ে থাকেন আমার উপর, তাহলে আর আমার থাকা চলে না এখানে।

শরীফ রেজার মুখমণ্ডলও মলিন হলো। তা দেখে চমকে উঠলেন কনকলতা। আবেগের আধিক্যে বর্তমানের সাথে তাঁর পলক কয়েকের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। শরীফ রেজার এই কথায় হকচকিয়ে গেলেন তিনি এবং শশব্যস্তে বললেন—মানে! সেকি! একথা কেন বলছেন আপনি ?

অভিমান ভরা কণ্ঠে শরীফ রেজা বললেন — আপনার যদি এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে, আর পাঁচজনের মতো আমারও একমাত্র নজর আপনার ঐ ঠিকুজির উপর আর সে কারণেই গিয়েছিলাম ত্রিবেণীতে,আপনার মূল্যায়ণ স্রেফ আপনাকে দিয়ে করতে আমিও অক্ষম, তাহলে বুঝবো, সেটা আমার নিতান্তই দুর্ভাগ্য, আর সে ক্ষেত্রে সত্বর আমার এখান থেকে সরে পড়াই উচিত।

এ কথায় কনকলতা থ মেরে গেলেন। প্রবল একটা নিঃশ্বাসের বেগ চাপতে চাপতে ফের তিনি মাথা নীচু করলেন এবং লহমা খানেক ঐভাবেই রইলেন। এরপর মাথা তুলে অপরাধীর মতো ধীরে ধীরে বললেন — কথাটা আপনার যদিও খুব শক্ত, তবু এ জন্যে দোষ আপনাকে দেবো না। আসলে দীলে আপনার আমিই আঘাত করেছি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, এটা ইচ্ছাকৃতও নয়, সত্যও নয়। ঘটনাচক্রেই এমনটি মনে হয়েছে আপনার।

ঃ শরীফ রেজা বললেন — মানে ?

কনকলতা বললেন — আপনি স্বীকার করুন আর না করুন, পরিচয় আমাদের অল্পদিনের হলেও, আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা যে কত উচ্চ, তা আপনি ঠিকই জানেন। আর পাঁচজনের মতো আপনাকে ফালতু মনে করার বা খাটো করে দেখার কোন অবকাশই আমার নেই।

ঃ তা — মানে —

ঃ আপনি যে আমাকে কখনও ভুল বুঝতে পারেন না, আমাকে মূল্যায়ণ করতে ঠিকুজির যে কোন প্রয়োজন নেই আপনার আমি তা বুঝি। আর আমি যে এটা বুঝি, তা আপনিও বোঝেন।

ঃ কিন্তু —

ঃ আমার কথার মধ্যে আপনার প্রতি আমার যা অভিযোগ প্রকাশ পেয়েছে — অ-তামামই বাইরের, অন্তরের কিছু নয়। আমি বিশ্বাস করি — এটাও আপনি বোঝেন, আমার সমঝে দেয়ার অপেক্ষাই রাখে না।

ঃ তাহলে ?

ঃ গোলমালটা বেঁধেছে আমার অত্যধিক আবেগের জন্যে আর কথাগুলো আপনাকে লক্ষ্য করে বলার জন্যে। আপনাকে সামনে রেখে বলার উদ্দেশ্য আপনাকে বলা নয়। ঐ অছিলায় আমার প্রকৃত অবস্থাটা আপনার কাছে তুলে ধরা।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আর আমার বলার কিছু নেই। এখন আমার অপরাধের শাস্তির ভার আপনার উপর —

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন কনকলতা। উঠতে উঠতে বললেন — তবে আর যে শাস্তিই দেন, "থাকা চলে না"। একথাটা দয়া করে আর দুস্‌রাবার বলবেন না। ও কথায় দীলে বড় চোট্ লেগেছে আমার।

ঃ কিন্তু আপনি উঠছেন কেন ?

কনকলতা ধীরকণ্ঠে বললেন — এখন যাই। দুইদিন দুই দফা এলাম। দুইবারই আপনাকে আমি আঘাত করলাম অনর্থক। কি যে হয়েছে আমার, আমি নিজেই বুঝতে পারছিনে।

ঃ কিন্তু এভাবে চলে গেলে যে আমি আবার আঘাত পাবো।

ঃ না-না, দোহাই আপনার। কিছু মনে নেবেন না। আমি আবার আসবো। এখন যাই।

কনকলতার কণ্ঠে অনুনয় ফুটে উঠলো। শরীফ রেজা বললেন — যাবেন?

ঃ জি, যদি দয়া করে অপরাধ না নেন! আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছি।

ঃ আচ্ছা আসুন—

যাবার উদ্যোগ করেও কনকলতা আর একবার কাতর কণ্ঠে বললেন — কিছু মনে করছেন নাতো?

ঃ না-না। আপনি আসুন —

টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন কনকলতা। এই রহস্যময় মেয়েটির রহস্যময় আচরণে আর এক দফা তাজ্জব হলেন শরীফ রেজা। সেই সাথে তাঁর মনে হলো — কনকলতার পেছনে নাজুক ধরনের কোন কিছু রয়ে গেছে নিশ্চয়ই, আর সে কারণেই এ প্রসঙ্গে এসে তিনি এতখানি বেসামাল হয়ে গেলেন।

৮

সদরে যেতে দেরী আছে এখনও। সামনের হপ্তা আসতে এখনও আরো কয়েকদিন মাঝখানে। ফৌজদার সাহেবের কথামতো এলাকাটার নানা দিকে শরীফ রেজা প্রতিদিন ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁকে পালাক্রমে সঙ্গ দিলেন মুইজুদ্দীন মালিক ও দবির খাঁ। হিন্দু পাড়াটা বাদে নিকটবর্তী তামাম এলাকা তিনি ঘুরে বেড়িয়ে শেষ করলেন। হিন্দুপাড়াটা সময় মতো কনকলতাই দেখিয়ে আনবেন, বলেছেন। তাই, শরীফ রেজা নজর দিলেন দূরবর্তী এলাকায়। আলসের মতো ঘরে বসে না থেকে এ ধরনের বেগার খাটাকে অগ্রাধিকার দিলেন তিনি।

সেদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লেন শরীফ রেজা। দূরবর্তী গাঁয়ে যাবেন, এই ইরাদা নিলেন। সঙ্গে রইলো বল্লম কাঁধে দবির খাঁ। একটানা হেঁটে তাঁরা ফৌজদার সাহেবের গাঁ'টা পেছনে ফেলে এলেন এবং ভিনগাঁয়ের হাল হকিকত, ভিনগাঁয়ের মাঠক্ষেত, রাস্তাঘাট, বন বাগান দেখবেন বলে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

গাঁ-গুলো সব ফাঁকে ফাঁকে। মাঝখানে ঝোপঝাড়, খাল বিল আর মস্ত মস্ত মাঠ। মুক্ত মাঠের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। আঁকাবাঁকা মেঠো পথ। এই মেঠো পথই ধরলেন তাঁরা। মাঠে ঢুকেই শরীফ রেজার দুইচোখ জুড়িয়ে গেল সবুজ ক্ষেতের বাহারে। এমনই সব মাঠক্ষেত পেরিয়েই তাঁকে হরহামেশা ছুটতে হয় গোটা মুলুকের নানা দিকে। তখন তাঁর নজর থাকে সামনে আর মন থাকে নানা চিন্তার আবর্তে। এমন করে দেখার মওকা জুটেই না বড় একটা। আজ তাঁর মন মেজাজ মুক্ত। আজ তিনি দেখার জন্যেই বেরিয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, রাঢ় অঞ্চলের চেয়ে এই পূব অঞ্চলটা অনেক বেশী আবাদী। অঢেল ফসল মাঠে। ধান-কলাই, তিল-তিসি, যব-কাউন — ইত্যাদি হরেক রকম ফসল ফলায় এ অঞ্চলের কৃষকেরা। তিনি দেখলেন, মাঠ ভর্তি লোক। কৃষিকাজেই অধিকাংশ ব্যস্ত। কেউ ব্যস্ত গোবাদি পশুর পেছনে। মস্ত মস্ত গোচরে ভিড় করছে পশুর পাল। গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়ার বিরাট বিরাট দল। গোয়ালাদের গাভী আর কিছু কিছু দেশী জাতের অশ্ব। গরু চরানোর ফাঁকে ফাঁকে খেলায় ব্যস্ত রাখালেরা। মাঠের মাঝে হেথা হোথা বট-পাকুড়ের গাছ। বাবলা বনের ছায়া। রাখাল-রসিক মানুষেরা ছায়ায় বসে একমনে সুর তুলছে বাঁশীতে। মন উদাসী মেঠো সুর। দল বেঁধে ক্ষেতের কাজে গান হাঁকছে কৃষকেরা। লম্বা লম্বা ভাটিয়ালী। বাতাসের নাগরদোলায় দোল খাচ্ছে ফসল। শিশ, পাতা, কচিডগা। ক্ষেতের পর ক্ষেত। সমুদ্রের তরঙ্গবত্ ঢেউ এর পর ঢেউ উঠছে ভরা ক্ষেতের বুকে। সে ঢেউ ফের হারিয়ে যাচ্ছে দূরান্তের দিগন্তে।

মনোমোহিনী দৃশ্য। গ্রাম বাঙ্গালার একান্তই নিজস্ব একরূপ। পথ বেয়ে হাঁটছেন আর শরীফ রেজা দেখছেন। দেখছেন আর ভাবছেন। ভাবছেন তাঁর জীবন কথা। তাঁর জঙ্গীজীবনের ইতিবৃত্ত। এদের জীবন উৎপাদনের। এরা প্রাণ-ধারণের যোগানদার। হর্ষ-বিষাদ সুখ-দুঃখের এক নিশানাহীন প্রবাহে ভেসে চলে জীবন এদের। কারোই এদের জিন্দেগীটা নকসা কাটা নয়। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ও হিসেব নিকেশ সম্বলিত ছকবন্দি জীবন এদের অজ্ঞাত। ভবিষ্যতের ভাবনা এদের ক্ষীণ। তাই এরা শংকাহীন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-উদ্বেগহীন। দুঃখে এরা আকুল হয়ে কাঁদে, সুখে এরা দীল ফাটিয়ে হাসে। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা-প্লাবন আর জরা-ব্যাধির সাথে এরা একান্ত হয়ে চলে। এদের পাশে তাঁর জিন্দেগী কতই না বৈচিত্রহীন! কতইনা শৃঙ্খলিত, কতই না নৃশংস।

শরীফ রেজা আর দবির খাঁ মাঠ পেরিয়ে গাঁয়ে এলেন। এক-গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ে গেলেন তাঁরা। কামারের হাপর, কুমোরের চাক, ছুতোরের মোকাম, তাঁতীর তাঁত, কলুর ঘানি, শিল্পীর শিল্প আর দোকানীর দোকান দেখে, ফেরিওয়ালা-চুড়িওয়ালা, সাপুড়ে-বাউল-পানওয়ালা — হরেক রকম লোকের সাথে পরিচয় ও ভাব বিনিময় করে, তাঁরা অফর বেলায় বাড়ীর পথ ধরলেন।

আগে হাঁটছেন শরীফ রেজা, তার পেছনে দবির খাঁ। কিঞ্চিৎ হুঁ, হাঁ, আর এলোমেলো খুরচো কিছু প্রশ্নোত্তর দিতে দিতে অবিচ্ছেদ্য ছায়ার মতো শরীফ রেজার পিছে পিছে তামাম পথ ঘুরে বেড়াচ্ছে দবির খাঁ। নিরুৎসাহ, বিরক্তি বা নারাজ-নাখোশের আভাসটিও তার মুখমণ্ডলে নেই। দবির খাঁ জেনেছে—শরীফ রেজার বিচরণে সঙ্গ দিতে হবে তাকে। ব্যস্! পথ তাদের এ পৃথিবীর শেষপ্রান্ত তক্ হলেও, পরোয়া নেই দবির খাঁর। জাহান্নাম তক হলেও, ও ভি আচ্ছা।

বিস্তীর্ণ এলাকায় উদ্দেশ্যহীন টহল দিয়ে মুক্তপ্রাণ ভ্রমণের স্বাদ-আস্বাদ গ্রহণ করলেন শরীফ রেজা। ফেরার পথে দবির খাঁকে প্রশ্ন করলেন — আচ্ছা চাচা, এ এলাকায় আগে কখনও এসেছেন?

দবির খাঁ উৎফুল্ল কণ্ঠে জবাব দিলো — বহুৎ-বহুৎ। এ এলাকা তামামই আমার পয়চান করা আছে। উধার ঐ তালবাগানের সরোবরে হুজুরের সাথে জিয়াদাবার এসেছি।

শরীফ রেজা উৎসাহভরে বললেন — তালবাগানের সরোবর! ওটা আবার কোথায়?

ঃ ঐ তো ঐ সামনে। একদম নযদিক। আম্মিও ভি এসেছিল একরোজ।

ঃ তাই নাকি? কনকলতাও এসেছিল?

ঃ জি বাপজান, মছলী ধরা দেখতে। জব্বোর জব্বোর মছলী।

ঃ মছলী ধরা — মানে মাছ ধরা দেখতে?

ঃ হুঁ-হুঁ, ও হি বাত্।

ঃ কারা? কারা এখানে মাছ ধরে?

ঃ আরে তাজ্জব! সরোবর তো আমার হুজুরের। হুজুরের লোক ধরে। ফি বছর দু' দফা মছলী পাকড়াও করে।

ঃ আচ্ছা।

ঃ বহুত্ উম্দা এলাকা বাপজান। ইয়াব্বড়ো সবোরব, এত্তো তার পানি, আর বিলকুল খোলাঢালা। এক ধারছে হাওয়া বইছে হরওয়াক্ত। জান জুড়িয়ে যায়।

ঃ কৈ, সে কথা তো এতক্ষণ বলোনি?

ঃ ঐ তো উধার দিয়েই পথ বাপজান। উধার দিয়েই যেতে হবে।

ঃ তাহলে চলুন-চলুন। ওখানে গিয়েই একটু বসি।

অল্প আসতেই সামনে পড়লো সরোবর। সরোবর অর্থে বৃহৎ আকারের পুষ্করিণ বা দিঘী। সেখানে পৌছে শরীফ রেজা দেখলেন — দবির খাঁর বর্ণনায় কোন গল্তি নেই। সত্যিই সরোবরটা দেখার মতো, আর জায়গাটাও মনোরম। পাড়ের উপর কাতারবন্দি তাল গাছ। ছায়ার তলে মুক্ত হাওয়া লুটোপুটি খাচ্ছে। পানি ভেজা বাতাস।

দিঘীর পাড়ে এসেই তাঁরা গাছের ছায়ায় বসলেন। দিঘীটাকে নিরীক্ষা করে শরীফ রেজা বললেন — এই সরোবরটার ধরন দেখেতো ঠিক মানুষের কাটা দিঘী বা সরোবর বলে মনে হচ্ছে না চাচা? কেমন যেন সব ছোট বড় আর আঁকাবাঁকা পাড়গুলো?

ঃ জিনা বাপজান, এ সরোবর কোন ইনসান তৈয়ার করেনি। জব্বোর এক দরিয়া ছিল এটা। লম্বা এক নদী। এখন সে দরিয়ার তামাম দিক বন্ধ হয়ে গেছে আর এই সরোবর পয়দা হয়েছে।

ঃ ঠিক-ঠিক। তাই হবে। তা এই সরোবর দেখতে কনকলতা এসেছিল?

ঃ হ্যাঁ বাপজান। মছলী ধরা দেখতে একরোজ এসেছিল।

ঃ স্রেফ একরোজ?

ঃ জি হাঁ। মকান ছেড়ে উও বেটিতো জিয়াদা দূরে যায় না।

ঃ যায় না?

ঃ জিনা। বেটি আমার ডর পায়।

ঃ ডর!

শরীফ রেজা বিস্মিত হলেন। দবির খাঁ বললো — হ্যাঁ, ডর মানে, ভয় পায়।

ঃ কেন-কেন? কিসের ডর?

ঃ ইনসানের ডর। আম্মিজানের দীলে একটা ডর আছে। কোন খান্নাস্ আদমী এসে তাকে পাকড়াও করতে পারে — এই ডর।

শরীফ রেজা তাজ্জব হয়ে দবির খাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ত্রিবেণীতে কনকলতার অতীত জীবনের কথা তাঁর খেয়াল হলো। তাঁর ঐ অতুলনীয় খুব সুরাতের জন্যে ত্রিবেণীতে হামেশাই তাঁর উপর ছোটখাটো হামলা হতো। কনকলতাকে সবসময়ই একটা আতংকের মধ্যে থাকতে হতো। সেই ভীতি বা ডরটা কনকলতার দীল থেকে যায়নি তাহলে এখনও? শরীফ রেজা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন — কেন চাচা?

কনকলতার দীলে এমন ডর এখনও থাকবে কেন ? ফৌজদার সাহেব আছেন, আপনি আছেন, মইজুদ্দীন মালিকসহ আরো অনেক নওকর-নফর সেপাই-সেনা আছে এখানে। এত শক্তি তাঁর পেছনে থাকতে এমন কোন খন্নাস্ আদমী এই এলাকায় আছে, যারা হামলা করার সাহস করবে কনকলতার উপর ?

দবির খাঁ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন — বিলকুল নেই, একজনও নেই। এমন হিম্মত এ তল্লাটের কোন আদমীর নেই।

ঃ নেই ?

ঃ জরুর নেই। এতবড় বুকের পাটা কোন আদমীর থাকবে বাপ ? দবির খাঁর হাতের এই বল্লমটা কোন আদমী না দেখেছে ?

ঃ তবে ? এর পরেও আর কনকলতার ডর কেন ?

ঃ এ এলাকার নয়। কনকলতার ডর করে ভিন মুলুকের ইনসানের। তার বাপের মুলুকের ইনসানের। তারাই কেউ পাকড়াও করে তাকে উধাও করতে পারে, এই ডর।

ঃ বলেন কি ? বাপের মুলুকের ইনসানের ডর! সে মুলুকটা কোথায় চাচা ?

ঃ পয়চান নেহি বাপজান। উও বাত্ কনকলতার আম্মাও ঠিক ঠিক বলেননি, কনকলতাও জিয়াদা কিছু বলে না। সেরেফ বলে — ঐ দিকে — ঐ দিকে।

ঃ ঐ দিকে মানে কোন দিকে ?

ঃ পশ্চিম দিকে। ঐ সাতগাঁ আর লাখ্নৌতির দিকে ইশারা করে। ঐ এলাকার কোন এক জায়গায় মকান ছিল তার বাপের। বাপটাতো বহুত আগারী ইন্তেকাল ফরমায়েছেন। এখন ওখানের কোন হকদার বা আপন লোক তাকে পাকড়াও করে ঐ মুলুকে নিয়ে যেতে পারে — এই ডরটাই জোরদার তার।

ঃ সে কি! এতে আবার ডর ভয়ের কারণ কি চাচা ? নিজের লোকেরা এসে যদি তাঁকে তাঁর নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায়, তাহলে তাতে তার ভয় পাবার কি আছে আর নাখোশ হওয়ারই বা কারণ কি ? এখানে আপনারা যাঁরা তাঁকে মহব্বত করেন. এই লোকজন ছাড়াতো তাঁর আপন লোক বা রিস্তেদার কেউ নেই ?

ঃ তার ওয়ালেদের মকানেও আসলে তার নিজের লোক কেউ নেই। তারা নাকি সবাই তাঁর দুষমন। তার ওয়ালেদের মকানটাও বহুত আগারী বেদখল হয়ে গেছে। নিজের লোকের দোহাই দিয়ে আসলে তারা তাকে লুট করতে চায়।

ঃ ও, তাই ? তবু এ ধারণা কি করে দীলে তাঁর পয়দা হলো চাচা যে, তাঁর বাপের এলাকার লোকেরা এখানে এসে পাকড়াও করবে তাঁকে ?

দবির খাঁ তৎক্ষণাৎ সরবে জবাব দিলো — এসেছিলো-এসেছিলো! ইস্‌লিয়ে তো আম্মাজানের দীলে এত ডর!

আর এক দফা তাজ্জব হলেন শরীফ রেজা। বললেন — এসেছিলো ? কোথায় চাচা. এই ভুলুয়ায় ?

ঃ নেহি নেহি, ঐ ত্রিবেণীতে।

ঃ ত্রিবেণীতে!

ঃ জি-হাঁ। আম্মির সাথে সে দফায় আমিও গেলাম ত্রিবেণীতে। ঐ মহামন্দিরে হাজির হতেই মন্দিরের এক খাদেম এসে জানালো — দু'রোজ আগারী এক আদমী এসে জব্বোর খোঁজ করেছে আম্মির। সে আদমীর মকান নাকি ঐ পশ্চিম মুলুকে।

ঃ আচ্ছা।

ঃ শুনেই বেজায় ঘাবড়ে গেল আম্মিজান। আম্মির আম্মাতো এর আগেই মারা গেছেন। আমি ঐ খাদেম লোককেই সওয়াল করলাম — উও আদমী আভিতক্ ত্রিবেণীতেই আছে না চলে গেছে। উও আদমী জবাব দিলে — আভিতক এই ত্রিবেণীতেই থাকতে পারে জরুর।

ঃ তারপর ?

ঃ শুনেই ফের চমকে উঠলো আম্মিজান। ব্যস্। এরপরই সে সঙ্গে সঙ্গে ওয়াপস্ এলো ভুলুয়ায়। আর এক লহমা ত্রিবেণীতে থাকলো না!

ঃ বড় তাজ্জব ব্যাপার তো!

ঃ জি হাঁ। বড়ি তাজ্জব ব্যাপার। আমি বললাম — আরে বেটি, ইয়ে, দবির খাঁ তো হরওয়াক্ত হ্যায় তুমহারী পাস্ ? তোমার এতো ডর কিসের ? কোন আদমীর হিম্মত আছে আমার সামনে তকলিফ দেবে তোমায় ? লেকেন, আম্মি আমার কোন বাত্ শুনলে না। সিধা ভুলুয়ায় ফিরে এলে।

ঃ আচ্ছা!

ঃ এরপর আম্মিজান আর কভ্‌ভি ঐ ত্রিবেণীতে যায়নি।

ঃ কভ্‌ভি যায়নি মানে ? ঐ ঘটনার পর আর কখনও যাননি ?

ঃ জিনা। উধার যেতে আম্মি এখন বিলকুল নারাজ।

শরীফ রেজা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তিনি আর একদফা নিশ্চিত হলেন. কনকলতার পেছনে এক রহস্য আছে জ্বলন্ত। সেই সাথে আরো তিনি বুঝলেন, কনকলতা মুখ না খুললে, এ রহস্যের সন্ধান পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

আরো কয়দিন শরীফ রেজা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালেন। এরপর সেই নির্দিষ্ট হপ্তার পয়লা দিনে ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের সাথে তিনি ভুলুয়ায় এসে হাজির হলেন। ভুলয়ার প্রশাসক শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব তখনও খুব ব্যস্ত। ভুলুয়ার এলোমেলো প্রশাসনকে ছকে ঢালার কাজ তাঁর তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। এরই মাঝে তাঁর সাথে যে প্রাথমিক বৈঠক হলো তাঁদের, সে বৈঠক তেমন কিছু ফলপ্রসূ হলো না। মামুলী বৈঠকের মতো ব্যক্তিগত আলাপ সালাপ আর প্রাথমিক কিছু কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই সে বৈঠক শেষ হলো। ব্যক্তিগত আলাপের মধ্যে শরীফ রেজার প্রসঙ্গই ছিল মুখ্য। তাঁর তাকত-উম্মিদ, আদব-আখলাক আর ইদানিংকালে তাঁর উপর শায়খ শাহ শফী হুজুরের নির্দেশাবলী—এসব নিয়েই ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব আর শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব গরম গরম কথাবার্তা বললেন এবং শরীফ রেজার কর্ণমূল গরম করে তুললেন। বৈঠক শেষে সাকুল্যে যা কাজের কথা হলো, তা শরীফ রেজার এই মুহূর্তের কাজ সম্পর্কে কথা। অর্থাৎ তাঁর মতো একজন মুক্ত-স্বাধীন, হিম্মতদার আর আজাদীর কাজে নিবেদিত লোকের এক্ষণে কি করণীয়, তাই নিয়ে কথা। শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব তাঁকে চাটিগাঁ বা চট্টগ্রামে যাত্রা করার প্রস্তাব দিলেন। চাটিগাঁয়ে অবস্থিত দ্বীন ইসলামের অন্যতম সৈনিক কদল খান গাজী সহকারে অন্যান্যদের সাথে দেখা সাক্ষাত আর পয়-পরিচয় করে আসতে বললেন। তার কথার সারমর্ম হলো—যেহেতু স্রেফ অপেক্ষা করা ছাড়া তাঁদের এখন করার কিছুই নেই, সেহেতু ফৌজদার সাহেবের এলাকায় খালেবিলে না ঘুরে শরীফ রেজার মতো একজন জানবাজ লোকের এখন মাঝে মাঝে বাইরে বেরুনো উচিত এবং চাটিগাঁ, শ্রীহট্ট, সমতট ও অন্যান্য এলাকার সুফী দরবেশ–আউলিয়াদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা উচিত। এ মুলুকের আজাদী যে দ্বীন ইসলামের স্বার্থেই অতি প্রয়োজন — এ বোধ তাদের অনেকেরই আছে। যোগাযোগটা আগে থেকেই থাকলে মওসুম কালে তা কাজ দেবে অনেকখানি।

এটা ছিল শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের একটা মামুলী বা সাদামাটা প্রস্তাব। জোরদার বা চরম পর্যায়ের নির্দেশ কিছু নয়। কিন্তু কথাটা ত ৎক্ষণাৎ মনে ধরলো শরীফ রেজার। মনে ধরলো ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবেরও। ভুলুয়ার সদর থেকে ঘরে ফিরে এসেই তাঁরা এ নিয়ে

ফের বসলেই এবং কথাটা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখে শরীফ রেজা মনে মনে তৈয়ার হয়ে গেলেন। শরীফ রেজার শায়খ হুজুরের উম্মিদ — আজাদী আসুক বাঙ্গালার। শরীফ রেজার কাজ — এই আজাদী আসার প্রক্রিয়ায় মেহনত দান করা। এই পর্যন্তই চিন্তা–ভাবনা। কিন্তু কার মাধ্যমে আসবে সে আজাদী, কে হবেন তাঁর কর্ণধার, কে দেবেন তার নেতৃত্ব — এসব কিছুই নিশানা করা নেই। স্বাধীনতার পয়লা সাধক গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের সাথেই সে নিশানা ধুয়ে মুছে গেছে।

শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবকে কেন্দ্র করেই এখন বর্তমানের চিন্তা-ভাবনা, ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব, শরীফ রেজা, ইনসান আলী প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজন শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবকে কেন্দ্র করেই এই মুহূর্তে আজাদীর আঁক কষছেন। প্রশাসন বা ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ লোক এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে অগ্রণী ভূমিকা না নিলে, ফৌজদার সাহেব বা শরীফ রেজার মতো ভাসমান শক্তির অধিকারী বাইরের কোন লোকের পক্ষে সে খোয়াব দেখাও এখন বাতুলতা। কিন্তু এই ফখরউদ্দীন সাহেবের ভূমিকাটাই এখন বেশ কিছুটা জটিল। সাহসের প্রশ্ন ছাড়াও প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা তাঁকে পঙ্গু করে রেখেছে। বাহরাম খানের বর্তমানে তাঁর ভূমিকা গৌণ। বাঙ্গালা মুলুকের আজাদী নিয়ে ভাবতে তিনি আগ্রহী, অনুভূতিও তীক্ষ্ণ, কিন্তু সত্বর কোন পদক্ষেপ নিতে বিলকুল তিনি নারাজ। ভবিষ্যতেও তাঁর চিন্তা–ভাবনা ঝোপ বুঝে কোপ মারা — কোন বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে যাওয়া তেমন নয়। সুতরাং নিতান্তই তাঁর অনীহার মুহূর্তে শক্তিতো চাই-ই তাঁদের যে দিক থেকে আসুক। পেছনে শক্তি থাকলে নেতৃত্ব একটা পাওয়াই যাবে যেখান থেকে হোক। বাঙ্গালা মুলুকের আজাদীই যখন একমাত্র লক্ষ্য তাঁদের জিন্দেগীর, তখন শাহ ফখরউদ্দীনের পাশাপাশি আরো শক্তি তালাশ করতে দোষ কি?

ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব আর শরীফ রেজা উভয়েই এ প্রসঙ্গে এক নিমিষে একমতে পৌঁছলেন। এবং শরীফ রেজা সেই মোতাবেক তৈয়ার হয়ে গেলেন। খবর পেয়ে ছুটে এলেন কনকলতা। পাণ্ডুর মুখে এসে কনকলতা বললেন — সেকি কথা! আপনি একেবারেই দেশান্তর হয়ে যাচ্ছেন? মানে শ্রীহট্ট, চাটিগাঁ, চন্দ্র দ্বীপ — এমনই সব এলাকায়?

শরীফ রেজা হেসে বললেন — না, ঠিক দেশান্তর হয়ে নয়, মানে একেবারেই বিদেয় হয়ে যাচ্ছিনে। ফিরে আসবো জলদি-জলদি।

কনকলতার চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। বললেন — তাহলে যেতেই হচ্ছে সেখানে?

ম্লান হাসি হেসে শরীফ রেজা বললেন — আপনি জানেনই তো, আমার যা জিন্দেগী, তাতে কোন জায়গায় স্থির হয়ে দীর্ঘ দিন বসে থাকার ফুরসত আমার খুবই কম। শুধু চাটিগাঁ বা শ্রীহট্ট কেন, আরো অনেক দুর্গম ও খতরনাক এলাকাতেও যেতে হতে পারে আমার।

ঃ তার অর্থ—বালাই মুসিবত আর সংঘাত সংকটের বাইরে নিজস্ব কোন অস্তিত্বই নেই আপনার ?

ঃ একদিক দিয়ে দেখতে গেলে কথাটা আপনার মিথ্যা নয়। আমার জিন্দেগীটা মোটামুটি এই ছকেই ঢালা। তবে না-উম্মিদ হওয়ার কারণ নেই। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছে ছাড়া একটা কাঁটার আঁচড়ও গায়ে আমার লাগবে না।

ঃ সেই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছেতেই তো হয় সব। বিপদ আপদের মধ্যে আপনি সবসময়ই থাকবেন আর আল্লাহর ইচ্ছে হবে না, এটা ভাবছেন কি করে ?

ঃ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছে হলে, এখানে এই ঘরের মধ্যে খিল দিয়ে থাকলেও আমার মুসিবত কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কাজেই, খামাখা ওসব দুঃশ্চিন্তা দীলে কিছু রাখবেন না। আল্লাহ তায়ালার রহম হলে, অতি সত্বর ওয়াপস্ আসবো আমি — আপনি এ ভরসা রাখতে পারেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা দিনও থাকবো না।

শরীফ রেজা যখন সত্যি সত্যিই বেরিয়ে পড়লেন চাটিগাঁয়ের উদ্দেশ্যে, কনকলতা তখন আর উদগত অশ্রুধারা আটকে রাখতে পারলেন না। টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা পড়লোই গিয়ে জমিনে।

কিন্তু যত সত্বর ফিরবেন বলে ধারণা নিয়ে শরীফ রেজা বেরুলেন, চাটিগাঁয়ে পৌঁছে আর তত সত্বর ফিরতে তিনি পারলেন না। চাটিগাঁয়ে এসে তিনি দেখলেন, বাঙ্গালার মুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও বা কোন মুসলমান শাসকের শাসন এখানে না থাকলেও, এই চাটিগাঁয়ে দ্বীন ইসলামের তৎপরতা পিছিয়েই নেই আদৌ। মুহম্মদ-বিন-কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের যুগ বা তৎপূর্ব থেকেই আরব দেশের লোকেরা মূলতঃ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এবং সেই সাথে কিছু লোক দ্বীন ইসলামের সওগাত নিয়ে এ মুলুকে আসা যাওয়া শুরু করেন এবং সমুদ্র তীরবর্তী বন্দর এলাকাগুলোর সাথে পরিচিত হতে থাকেন। চাটিগাঁ বন্দর এলাকাগুলোর প্রধানতম স্থান। বাঙ্গালা মুলুকের অন্যান্য স্থানের চেয়ে এই চাটিগাঁয়েই সেই থেকে আরব বণিকদের অধিকহারে যাতায়াত এবং ইসলামের অনুপ্রবেশ বা মুসলিম সমাজ গড়ে উঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। চাটিগাঁ এ মুলুকের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর হওয়ায়, ব্যবসায়ীদের সাথে আলেম—আউলিয়া সুফী দরবেশগণ সমুদ্র পথে এসে এই চাটিগাঁয়েই অধিকহারে অবতরণ করতে থাকেন এবং প্রথমে আস্তে আস্তে এবং বাঙ্গালা মুলুকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

হওয়ার পর জোরদারভাবে ইসলাম প্রচারের কাজে মনোনিবেশ করেন। বাবা আদম শহিদ, শাহ সুলতান রুমী, শাহ সুলতান মাহি সওয়ার, মখদুম শাহদৌলা প্রভৃতি আউলিয়াগণ বাঙ্গালা মুলুকের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লেও, অনেক পীরদরবেশ—আউলিয়া চাটিগাঁয়ে সেই থেকে অবস্থান করতে থাকেন এবং এর ফলে কালক্রমে চাটিগাঁ অঞ্চল বার আউলিয়ার মুলুকরূপে খ্যাতি অর্জন করে।

শরীফ রেজা চাটিগাঁয়ে এসে দেখলেন, সুদূর অতীত থেকে আরব বণিক ও সুফী-দরবেশদের আসা যাওয়ার ফলে এখানে বেশ সংখ্যক মুসলমানদের বসতি স্থাপন হয়েছে এবং মুসলমান শাসন না থাকলেও, এখানে ইসলাম প্রচারের কাজ জোরদারভাবে চলছে। এই সময় যে সকল সুফী-দরবেশ মর্দে মু'মিন এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজ নিয়ে অধিক ব্যাপৃত ছিলেন, তাদের মধ্যে কদল খান গাজী ও বদর আলম প্রধান। যে বারজন আউলিয়া এই অঞ্চলে তৎকালে দ্বীনের কাজে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন, কদল খান গাজী ও বদর আলম সেই বারজনেরই দুইজন। শায়খ শরীফ উদ্দীনও ছিলেন সেই বারজনের আর একজন।

কদল খান গাজী শরীফ রেজাকে উষ্ণদীলে গ্রহণ করলেন। তাঁর সাথে আলাপকালে শরীফ রেজা দেখলেন, শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের সাথে এই কদল খান গাজীর অনেকখানি পরিচয় আছে আগে থেকেই। শরীফ রেজাদের ধ্যান ধারণার কথা শুনে কদল খান গাজী বিপুলভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং প্রয়োজন হলে তাঁরা যথাসাধ্য মদদ দান করবেন — এই মর্মে স্বতস্ফূর্ত ওয়াদা দান করলেন। সাতগাঁয়ের শায়খ হুজুরের খাদেম হিসাবে শরীফ রেজার পরিচয় পেয়ে কদল খান গাজী সহকারে চাটিগাঁয়ে অবস্থিত দ্বীন ইসলামের খাদেমেরা শরীফ রেজাকে কিছুতেই অল্পদিনে ছাড়লেন না। ফলে কদল খান গাজীর মেহমান হয়ে শরীফ রেজাকে অনেকদিন এই চাটিগাঁয়ে থাকতে হলো এবং আরো অনেক ব্যক্তিরই মেহমানদারী কবুল করতে হলো। এই সুবাদে শরীফ রেজা এই অঞ্চলের মোটামুটি প্রায় সকল পীর-দরবেশ আর অলি আউলিয়াদের সাথে পরিচয় করার প্রশস্ত এক মওকা পেলেন এবং সংশ্লিষ্ট সবার সাথেই ভাববিনিময় করলেন।

দীর্ঘ সময় চাটিগাঁয়ে অবস্থান করার পর এঁদেরই নসিহত মাফিক আরো কিছু স্থান এলাকা ঘুরে তিনি শ্রীহট্টে হাজির হলেন। সেখানেও পীর-দরবেশ ও সুফী-সাধকদের সাহচর্যে আরো কিছু দিন কাটিয়ে সমতট প্রদক্ষিণ করে শেষ পর্যন্ত তিনি যখন ভুলুয়ায় ফিরে এলেন, তখন তাঁর ধারণা মাফিক সময়ের চেয়ে অনেকগুণে অধিক সময় গুজরান হয়ে গেছে।

এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সোনার গাঁয়ের আবহাওয়াও পাল্টে গেছে বহুলাংশে। সরাসরি ফৌজদার সাহেবের বাসস্থানে না গিয়ে ভুলুয়ার সদরে এসে শরীফ রেজা দেখলেন–বাতাস বেজায় গরম। খৈ ফুটছে সেনাপতি জাফর আলীর মুখে।

শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের এক বিশেষ কক্ষে বসে উষ্ণকণ্ঠে কথা বলছেন জাফর আলী খান। শাহ ফখরউদ্দীনসহ ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব আর জাফর আলী খান — এই তিনজন মাত্র লোক ছিলেন কক্ষটিতে। সোলায়মান খান সাহেব নিজ গরজে এসেছেন শাহ সাহেবের মোলাকাতে। জাফর আলী এইমাত্র সোনার গাঁ থেকে এলেন।

জাফর আলী এখন এই ভুলুয়াতেই অধিক সময় থাকেন। ফরিদা বানুর হৃদয় রাজ্যে ইনসান আলী বা অন্য কাউকে প্রবেশ করতে না দিয়ে সে রাজ্য তিনি সেই থেকে একাই দখল করে আছেন। বাহরাম খানের আহবানে শাহ ফখরউদ্দীনের পক্ষ হয়ে এখন তিনি সোনার গাঁয়ে মাঝে মধ্যে যান। কাজ ফুরোলেই আর তিনি সোনার গাঁয়ে থাকেন না। তড়িঘড়ি ওয়াপস্ আসেন ভুলুয়ায়।

এবার গিয়ে জাফর আলী অনেকদিন আটকে ছিলেন সোনার গাঁয়ে। নানা রকম ঝুটঝামেলা সামাল দিতে আর বাহরাম খানের হরেক রকম চাহিদা নির্দেশ মেটাতে তাঁর অনেক সময় লেগেছে। এই অনেক সময় সোনার গাঁয়ে থেকে এবং সোনার গাঁয়ের হাওয়া বাতাস অনেক পরিমাণে পান করে তরুণ সালার জাফর আলী এবার বেজায় গরম হয়ে ফিরেছেন।

ভুলুয়ায় এসে শরীফ রেজা ইনসান আলীর মকানে আগে উঠেছিলেন। সেখানেই বিরাম বিশ্রাম নেয়ার পর শাহ ফখরউদ্দীনের আবাসে এসে হাজির হলেন। শরীফ রেজার আগমনবার্তা পেয়েই শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব তাঁকে এই বিশেষ কক্ষেই ডেকে নিলেন। কক্ষের দ্বারে পা দিয়েই শরীফ রেজা দেখলেন — খই ফুটছে জাফর আলীর মুখে। শরীফ রেজা দরজায় এসে দাঁড়াতেই তিনি একটু থামলেন এবং শাহ সাহেব ও খান সাহেব সাগ্রহে শরীফ রেজাকে কক্ষে এসে আসন গ্রহণ করতে বললেন।

সবার সাথে সালাম বিনিময় করে আসন গ্রহণ করতে করতে শরীফ রেজা হাসিমুখে জাফর আলীকে প্রশ্ন করলেন — কি ব্যাপার! ভাই সাহেবকে যে বেজায় পেরেশান মনে হচ্ছে?

জাফর আলী তখনও আবেগের মধ্যেই ছিলেন। শরীফ রেজার আগমনে বক্তব্যে তাঁর কিঞ্চিৎ বিরতিপাত ঘটলেও আবেগ তাঁর পূর্ববতই ছিল। তিনি সখেদে জবাব দিলেন — আর বলেন না ভাই সাহেব, সোনার গাঁয়ের লোকেরা

— বিশেষ করে মুসলমানেরা যে কতবড় আহম্মক, তারা তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এখন।

শরীফ রেজা আগ্রহী হয়ে বললেন — কি রকম?

শরীফ রেজাকে রাজনৈতিক ঝুটঝামেলার বাইরের একজন ভিন্ন জগতের লোক হিসাবে জাফর আলী জানতেন। তাই তিনি নিঃসংকোচে তাঁর বক্তব্য পূর্ববত চালিয়ে যেতে লাগলেন। শরীফ রেজার আগ্রহের প্রেক্ষিতে আবেগপ্রবণ জাফর আলী আরো অধিক আবেগ ভরে বললেন — রকমটা হলো, বিদেশী ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশী একটা কুকুরও যে হাজার গুণে উত্তম, এ সত্যটা এখন টের পাচ্ছে বাঙ্গালা মুলুকের বেয়াকুফরা। তারা এখন বুঝতে পারছে — গিয়াস উদ্দীন বাহাদুরকে এইভাবে ডুবিয়ে দিয়ে কি এক মস্তবড় আহম্মকীই না করেছে তারা।

ঃ আহম্মকী?

ঃ হ্যাঁ, তাদের ভাষায় নির্জলা আহম্মকী। এ নিয়ে এখন হেথা হোথা আফসোস্ করছেন অনেক লোক।

ঃ তাই নাকি?

ঃ তাই নাকি মানে? ঐ যে ঐ মুসাফির খানার লাড্ডু মিয়াকে তো জানেন? বেশ কয়েকদিন আপনার কাছেই ছিল। দিল্লীর হুকুমাতের এক অন্ধভক্ত। দিল্লীর হুজুরদের তারিফে তো হর ওয়াক্ত ঝড় বয় তার মুখে আর দিল্লীর শাসকদের প্রসঙ্গে কথায় কথায় হাত উঠে তার কপালে! সেই লাড্ডু মিয়ার দীলেও যে কত দুঃখ, এবার যদি যান কখনও ওখানে, একটু টোকা দিলেই টের পাবেন।

ঃ বলেন কি! লাড্ডু মিয়া?

ঃ হ্যাঁ ঐ লাড্ডু মিয়া। নিতান্তই সইতে না পেরে একদিন সে আমাকে বলেই ফেললো ফাঁকে পেয়ে — হুজুর আপনাদের চেয়ে তো আর কম ভালবাসিনা আমি দিল্লীর এইসব শাসকদের। কিন্তু এঁদের জন্যে এই যে আপনারা জানপ্রাণ ছেড়ে দিয়ে লড়লেন সবাই, তা কি এই জন্যে? এসব হতে লাগলো কি? এর বিহিত কি কিছুই করার নেই আপনাদের?

এবার কথা ধরলেন ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব। তিনি বললেন — খাঁ সাহেব কিন্তু শুরু থেকেই আফসোস আর অভিযোগই পেশ করছেন। কি ঘটছে ওখানে, কিসের বিহিত চায় সবাই, এসব কিন্তু স্পষ্ট করে এখনও বলেননি।

জাফর আলী বললেন — বলবো আর কি? আপনারাতো অবসর ফুরসুত নিয়ে ফাঁকে এসে বিলকুল বেঁচে গেছেন এসব ফ্যাসাদ থেকে। কিন্তু আমার তো জান ঝালাপালা। আমার এই হুজুরও এখানে এই ভুলুয়ায় এসে থাকায়, কার

কাছে যাবে সবাই দিশে করতে পারছে না। ফলে, ওখানে গেলেই এখন সবাই এসে ঘিরে ধরছে আমাকেই।

ফৌজদার সাহেব অতৃপ্ত কণ্ঠে বললেন — কিন্তু কেন ?

ঃ শাসনযন্ত্র অচল হয়ে গেছে বলে। বিচার-আচার শাসন-নিয়ন্ত্রণ বলে কি আর কোন কিছু আছে সেখানে ? হুজুরও তো ইতিমধ্যেই এ সম্বন্ধে অনেকখানি অবগত হয়েছেন। তিনি নিজেও কিছুটা দেখেছেন, আর নানাভাবে এসব খবর এখন হরহামেশাই পাচ্ছেন।

জাফর আলী শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের প্রতি ইংগিত করলেন এবং আপনভাবে বলেই চললেন—খুন-খারাবী, লুট-তরাজ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে তর তর করে। বিচারের নামে শুরু হয়েছে প্রহসন। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ আর খেয়াল-খুশী মতো ক্ষমতা প্রয়োগ করছে। নিয়মনীতির তোয়াক্কাই কারো নেই কিছু। ফলে, সাধারণ মানুষের জীবন, বিশেষ করে নীরিহ মানুষের জীবন একদম বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

ফৌজদার সাহেব সবিস্ময়ে বললেন — বলেন কি! তা বাহরাম খান সাহেব কিছু বলছেন না ?

ঃ উনি কি বলবেন ? উনার সমর্থনেই তো হচ্ছে সব।

ঃ উনার সমর্থনে!

ঃ হ্যাঁ, তাঁকে খুশী রেখেই তো ফায়দা লুটছে সবাই। যে যতবেশী খুশী রাখতে পারছে তাঁকে, তার দাপট ততই এখন দুর্বার। প্রশাসনের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্তির পথে এসেছে।

ঃ কি বলছেন আপনি! এত শিগগির এতটা অবনতি —

ঃ কেন হবে না ? রাজ্যের রাজা যদি এতটা উদাসীন হন, তাহলে প্রজার জীবন বিপন্ন হতে আর কত সময় লাগে ? এই সুযোগে ওদিকে আবার চারপাশের অমুসলমান রাজা জমিদারগুলোও ফণা তুলেছে ফোঁশ করে। কৌলিণ্য প্রথার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত সোনার গাঁয়ের চারপাশের যেসব নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মুসলমান শাসনের সহায়তাকারী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এই সব রাজা জমিদার আর বর্ণ হিন্দুরা ওদের উপর তাদের পূর্ব আক্রোশ চরিতার্থে এখন চরমভাবে উঠেপড়ে লেগেছে। এখন তারা ঐ সব নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নানাভাবে নাস্তানাবুদ করছে এবং তাদের উপর অমানুষিক জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামের নীতি আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্যে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের এই যে দুর্ভোগ, এই দুর্ভোগের প্রতিও একজন মুসলমান শাসক নজর দেয়ার তাকিদবোধ করছেন না। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে ? এ মুলুকে মুসলিম শাসনের জন্যে এ উদাসীনতা যে কতটা অনিষ্টকর একথাটা বুঝাবেই বা কে তাকে ?

ঃ আশ্চার্য! তাহলে বাহরাম খান সাহেবের এই উদাসীনতার কারণটা কি ?

ঃ কারণটা আমার হুজুরই ভাল জানেন আমার চেয়ে। আমি বলবো কি ?

'শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের প্রতি পুনরায় ইংগিত করলেন জাফর আলী খান। শাহ ফখরউদ্দনি সাহেব প্রথম থেকেই গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন এবং গম্ভীর হয়ে জাফর আলীর বক্তব্য শুধু শুনছিলেনই, কোন সাড়া শব্দ বা সওয়াল–জবাব কিছু করেননি। জাফর আলীর এই বক্তব্যে তিনি নাখোশ না হলেও খুশী ছিলেন — এমন বলা চলে না। বরং কিছুটা বিব্রত বোধই করছিলেন। জাফর আলীর এই ইংগিতের প্রেক্ষিতে তিনি নীরস কণ্ঠে বললেন — এত যখন বলছো, তখন এটুকুও তুমিই বলো। আমাকে আর টানছো কেন খামাখা ?

কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে জাফর আলী বললেন — জনাব!

শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব এবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন — বাহরাম খান সাহেবের ঐ উদাসীনতার কারণটা কি মনে হয় তোমার কাছে ?

জাফর আলী স্বচ্ছ কণ্ঠে বললেন — কারণতো হুজুর ঐ একটাই। তিনি দিল্লীর হুজুরের গোলাম। গোলামী করতে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী কিছু করার আগ্রহের তাঁর অভাব। গোটা বাঙ্গালা মুলুকের উপর একাই তিনি একচ্ছত্র প্রভুত্ব খাটাবেন বলে যে নেশা নিয়ে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের বিরুদ্ধে তিনি লেগেছিলেন, তা চরিতার্থ না হওয়ায়, সে নেশা তাঁর কেটে গেছে। কাজেই দশজনের দশ রকম ফ্যাসাদ মুসিবত দেখতে গিয়ে জানের আরামটা হারাম করতে আর তিনি রাজী নন।

ঃ বটে।

ঃ জনাবের তো সবই এসব জানা। দিল্লী সুলতানদের মতি-গতির উপর, বিশেষ করে সুলতান মুহাম্মদ-বিন-তোঘলকের মানসিকতার উপর তিনি আদৌ আর আস্থাবান নন। তাঁর মতে, সুলতান মুহাম্মদ-বিন-তোঘলক সাহেব সর্বাপেক্ষা অধিক অস্থির মনের মানুষ। কোন মুহূর্তে তাঁকে যে সোনার গাঁয়ের এই শাসনকর্তার দায়িত্ব থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে অন্য দায়িত্বে ফেলবেন এই মুহম্মদ-বিন-তোঘলক, এ সম্বন্ধে মোটেই তিনি নিশ্চিত নন। ফলে, প্রশাসনের বেল্না অধিক বেল্‌তে গিয়ে খামাখা জানটা তিনি কালো করতে নারাজ।

ঃ হুঁ!

ঃ গতানুগতিক নিয়মে যতটুকু চলে, তাতেই তিনি খুশী। সোনার গাঁয়ের শাসন নিয়ে বেশী কিছু মাথা ঘামানোর আগ্রহ তাঁর নেই।

ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব আর শরীফ রেজা একসাথে আওয়াজ দিলেন — তাজ্জব!

শাহ্ ফখরউদ্দীন সাহেব আরো অধিক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন — তাহলে এ ব্যাপারে কি করতে চাও তুমি ?

জাফর আলী বললেন — আমার তো নিজস্ব কিছু করার নেই হুজুর। বিষয়টা আপনার কাছে পেশ করা আমার কর্তব্য, তাই আমি করলাম। এরপর আপনি যা হুকুম করবেন, তাই আমি করবো। আপনার নির্দেশের বাইরে তো কখনও যাইনি। আপনি যা হুকুম করেছেন, বরাবর তা-ই আমি করে আসছি।

ঃ তো বিষয়টাকে আমার কাছেই পেশ করা প্রয়োজন, এ খেয়াল তোমার মাথায় এলো কি করে ?

ঃ সেকি হুজুর! আপনাকে ছাড়া এসব কথা কার কাছে আর বলবে কে ?

ঃ কিন্তু সেই আমাকেই তা কেন ?

ঃ বলেন কি জনাব! বাহরাম খান হুজুরের আপনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক। ক্ষমতার দিক দিয়েও তাঁর পরেই আপনার স্থান। প্রতিকার কিছু করতে কেউ পারলে একমাত্র আপনিই তা পারবেন।

শাহ্ ফখরউদ্দীন সাহেব এবার তীক্ষ্ণ নজরে জাফর আলীর দিকে তাকালেন এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন — তোমাকেই যদি বলি আমি — প্রতিকারের পথ একটা বাতাও, তাহলে কি করতে বলবে তুমি ?

জাফর আলী ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন — তা হুজুর, সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর যা এখন মানসিকতা, তাতে আরজ অনুরোধ করে যে ফল কিছু হবে — এমনটি মনে হয় না।

ঃ তাহলে ?

ঃ যে ভুল আমরা করেছি সবাই, একমাত্র সেই ভুলটা সংশোধন করতে পারলেই হয়তো প্রতিকার এর হবে কিছু। এ ছাড়া তো আর দুস্‌রা রাহা কিছু দেখিনে।

আরো অধিক শাণিত হলো শাহ সাহেবের নজর। আরো অধিক শাণদার হলো কণ্ঠ। তিনি প্রশ্ন করলেন — তা পারবে তুমি ?

ঃ হুজুর।

সেই ভুলটা সংশোধন করার হুকুমই যদি দেই তোমাকে আমি, পারবে তুমি তা সংশোধন করতে ?

ঃ তা মানে আমি একা ?

ঃ একা ছাড়া আর দুস্‌রা পাবে কোথায় ?

ঃ জনাব!

ঃ যে ভুল আমাদের হয়েছে তা সংশোধন করা প্রয়োজন — এই মুহূর্তে এই খোয়াব তুমি ছাড়া আর যদি দুস্‌রা কেউ না দেখে, তাহলে আর সাথে পাবে কাকে ?

ঃ তা মানে —

ঃ তোমার হাতে হাতিয়ার আছে, অধীনে একটা বাহিনী আছে। পারবে তুমি সংশোধন করতে ?

ঃ তা কি করে সম্ভব হুজুর। এই এতবড় একটা শক্তির বিরুদ্ধে ঐ ছোট্ট একটা বাহিনী নিয়ে কি করতে পারি আমি ?

ঃ তা যদি না পারো তো যাও, বহু দূর থেকে এসেছো, মাথাটা ঠাণ্ডা করে বিরাম বিশ্রাম নাওগে।

ঃ হুজুর!

ঃ আবেগের বশে অধিক হাত পা ছুড়ে নিজের জানের সাথে আমার জানটাও বিপন্ন করে তুলো না। যাও —

ঃ জি আচ্ছা জনাব —

নত মস্তকে বেরিয়ে গেলেন জাফর আলী। শাহ্ সাহেবের মন মেজাজের প্রেক্ষিতে শরীফ রেজা বা ফৌজদার সাহেব, ক্ষণকাল কেউ কিছুই বললেন না। ফলে, কক্ষের মধ্যে নিঃসীম এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। কিছুক্ষণ এভাবে কাটার পর শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব নিজেই এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ফৌজদার সাহেবকে বললেন — দেখলেন এসব তরুণ সেপাইদের বুদ্ধির বহর ? মাথা এদের গরম হলেই এরা লাফিয়ে উঠে সবকিছুরই মোকাবেলায়। নিজের সাধ্য আর অগ্রপশ্চাৎ কিছুই এরা দেখে না বা ফলাফলের কোন হিসেব কষে না।

ফৌজদার সাহেব ইতস্ততঃ করে বললেন — তা অবশ্য ঠিক। তবে —

শাহ সাহেব আপন খেয়ালেই বললেন — তবে লাভটা হলো, লোক আর একটা বাড়লো আমাদের।

ঃ মানে ?

ঃ সময়কালে একেও আমরা কাজে লাগাতে পারবো বলে মনে হচ্ছে।

ঃ তাতো অবশ্যই। তবে —

ঃ সবুরে মেওয়া ফলে ফৌজদার সাহেব। আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী অভিজ্ঞ আর বিজ্ঞ ব্যক্তি। আপনাকে সমঝাতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। ব্যতিব্যস্ত না হয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলে দেখা যাবে, ক্রমেই আমাদের ধ্যান ধারণার পক্ষে জনমত তৈরি হচ্ছে। জনমতটা পোক্ত হয়ে উঠার পর আমরা যদি এগোই, এক ডাকে সবাইকে সঙ্গে পাওয়া যাবে। কিন্তু গিয়াস উদ্দীন বাহাদুর সাহেবের মতো জনমত গড়ে উঠার আগেই একা একা দাঁড়িয়ে গেলে হাজার ডাকেও একটা লোক আসবে না।

শরীফ রেজা আর নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন — কিন্তু পরিস্থিতিরি খবর যা পাচ্ছি জনাব, তা তো সে জনমত পোক্ত হতে অধিক সময় লাগবে না। অল্প দিনের মধ্যেই পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে আসবে বলে মনে হচ্ছে। আর ব্যাপার যদি তাই হয়, তাহলেতো আমাদের এখন থেকেই —

হাত তুললেন শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব। বললেন — ধীরে। তোমাদের মতো নওজোয়ানদের নিয়ে মুসিবতটা এখানেই। তোমরা অল্পতেই অধিক উৎসাহী হয়ে উঠো। এখনই ওসব নিয়ে অতবেশী ভাবছো কেন ?

শরীফ রেজার পক্ষ হয়ে ফৌজদার সাহেব বললেন — না, শরীফ বোধহয় বলতে চায় — মওকা তো সবসময়ই আসে না। হঠাৎ যদি মওকাটা এসেই যায়, তাহলে আমাদের অপ্রস্তুত থাকা ঠিক হবে না।

ঃ মওকা!

ঃ মানে ঐ জনমত। জনমত যদি অনুকূলেই আসে আমাদের, তাহলে তো তার সদ্ব্যবহার আমাদের সঙ্গে সঙ্গে করা উচিত। নইলে কোন মুহূর্তে ঐ জনমত যে আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বা বিপক্ষের হস্তক্ষেপে উল্টা দিকে মোড় নেবে — তার নিশ্চয়তা কি ?

শাহ সাহেব পুনরায় গম্ভীর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন — আর একটু খোলাসা করে বলুন।

ঃ কথাটা হলো, জনমতটা বিলকুলই একটা হুজুগের ব্যাপার। গরম গরম অবস্থায় হুজুগটা কাজে লাগানো না গেলে পরে সেটা নেতিয়ে পড়ে। ও দিয়ে আর কাজ হয় না। ওদিকে আবার বিপক্ষ শক্তি কঠোর নীতি গ্রহণ করলে ভয়ে ত্রাশে ঐ জনমতও বিলকুল স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। উৎসাহী জনগণ দীর্ঘ অপেক্ষার পর না–উম্মিদ হয়ে হাল যদি ছেড়ে দেয়, তখনতো পুনরায় তাদের উৎসাহিত করা সহজ কাজ হবে না।

শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব এবার নাখোশ কণ্ঠে বললেন — আপনার মতো প্রবীণ ব্যক্তির মুখেও একথা আমি শুনবো, এটা আমি আশা করিনি। জনমত একটা শক্তি ঠিকই। কিন্তু যত গরমই হোক, ঐ এক জনমতের বলেই বিশাল এই শক্তিকে এঁটে উঠতে পারবো আমরা — একথা ভাবছেন কেন ?

ঃ জি ?

ঃ বাহরাম খানকে আপাততঃ একা মনে হলেও, সে ক্ষেত্রে আদৌ তিনি একা হয়ে থাকবেন না। লাখনৌতি আর সাতগাঁয়ের তামাম শক্তি ছাড়াও, দিল্লীর ঐ বিশাল শক্তি মহা প্লাবনের আকারে তাঁর পেছনে ছুটে আসবে এ দিকটা কেন দেখছেন না ?

এর জবাবে শরীফ রেজা সঙ্গে সঙ্গে বললেন — জনমতটা আমাদের পক্ষে থাকুক আর না থাকুক, ঐ তামাম শক্তি ছুটে আসবে সবসময়ই। ওদের হাত থেকে এ মুলুকটা বেরিয়ে যাচ্ছে দেখলেই, ওরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে এভাবেই। ও ভয় নিয়ে অধিক পেরেশান হলে তো এ মুলুকটা আজাদ কখনও হবে না বা কেউ তা করতে পারবে না।

ঃ তার অর্থ তোমরা এই মুহূর্তেই অগ্রসর হতে আগ্রহী ?

ঃ না, ঠিক সে কথা নয় জনাব। আমার বক্তব্য, এই জনমতটা পক্ষে থাকলে সুবিধে হয় অনেকখানি — এইটুকুই। নইলে কোন্ মুহূর্তে অগ্রসর হতে হবে আমাদের, সে নির্দেশ আপনার তরফ থেকেই পাওয়ার আশা রাখি আমরা। আমাদের ভিন্ন কোন ইচ্ছে ইরাদা নেই।

কি যেন চিন্তা করে শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব একেবারেই সহজ হয়ে এলেন এবং স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন — তাহলে সেই অপেক্ষাতেই থাকো নওজোয়ান। খামাখা ওসব নিয়ে মাথা গরম করে কাজ নেই।

ঃ জনাব!

ইচ্ছাকৃতভাবেই শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব মুখে হাসি টেনে বললেন–এসব কথা থাক। এবার বলো, এই যে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এক লম্বা সফর করে এলে, তার ফলাফলটা কি, তা আমাদের শুনাও ?

ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব ও শরীফ রেজা উভয়ে শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে দৃষ্টি বিনিময় করলেন এবং শরীফ রেজাকে নিরস্ত হওয়ার ইংগিত দিয়ে ফৌজদার সাহেব উৎসাহের সাথে বললেন — হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো! সেসব কথা শুনাও আমাদের। কোথায় গেলে, কি করলে–সেসব তো বলবে আগে ?

শরীফ রেজা অল্প একটু থামলেন। তারপর তাঁর ভ্রমণের তামাম কাহিনী তিনি একে একে বয়ান করে শুনালেন। সবশেষে জানালেন বাঙ্গালা মুলুকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কম বেশী সকলেই খুব উৎসাহী এবং এ মুলুক আজাদ হোক, এটা সকলেরই কাম্য।

শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন করলেন — সাহায্য সহানুভূতির ব্যাপারে তাদের আগ্রহটা বুঝলে কেমন ?

শরীফ রেজা বললেন — অধিকাংশেরই দেখলাম, সুসংগঠিত বাহিনী অর্থাৎ সামরিক বল তেমন কিছু নেই। প্রায় জনই কিছু কিছু শিষ্য-মুরিদ নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে দ্বীনের কাজ করছেন। তবে সময়কালে শক্তি দিয়ে সাহস দিয়ে সাহায্য করার আগ্রহ অনেকেই প্রকাশ করেছেন।

ঃ আচ্ছা।

ঃ হযরত শাহ জালাল হুজুরের মতো এক সময় অধিক শক্তি ছিল যাঁদের তাঁরা প্রায় অনেকেই ইবাদতে ধ্যানস্থ হয়ে গেছেন। সামরিক দিক দিয়ে তাঁদের তৎপরতা এক্ষণে খুব কম। তবে তাঁরা ছাড়াও অনেক জঙ্গী লোকই দ্বীন প্রচারের কাজে জেহাদ করে যাচ্ছেন। তাঁরাও অনেকে সাধ্য মতো করবেন — এ ভরসা পাওয়া গেছে।

ঃ কদল খাঁ গাজী সাহেব ? তিনি কি বললেন ?

শরীফ রেজা উৎসাহভরে বললেন — তাকে জনাব সবসময়ই পাওয়া যাবে বিপুল তাঁর উৎসাহ।

ঃ তাই ?

ঃ জি! জনাবকে তিনি বেশ ভালভাবেই চেনেন — দেখলাম।

ঃ হ্যাঁ, তাঁর সাথে একাধিকবার পরিচিত হওয়ার মওকা আমার জুটেছে। আমার প্রতি তাঁর মধ্যে একটা আন্তরিক টান পয়দা হয়েছে বলেই আমি মনে করি।

ঃ জি-জি। তাঁর মধ্যে সেটা আমি পুরোদস্তরই দেখলাম জনাব। আপনার কথা বলতেই তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এ ছাড়া, আমাদের ইরাদার কথা শুনে উনি এত খুশী হলেন যে, সময়কালে উনি আমাদের সর্বোতভাবে সাহায্য করার স্বতস্ফূর্ত ওয়াদা দান করলেন।

ঃ বহুত্ খুব — বহুত্ খুব।

অতপর এ নিয়ে আর অল্প কিছু কথাবার্তা অন্তে সে দিনের বৈঠক শেষ হলো। ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব সোনার গাঁয়ের কিছু কিছু খুচরো খবর শুনে সঠিক অবস্থা জানার জন্যে শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের মকানতক্ এসেছিলেন। সহকারী সালার জাফর আলীর মুখেই তিনি সেই ঈপ্সিত খবর পেয়ে গেলেন। বৈঠক শেষে উঠার ওয়াক্তে শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব তাঁর নিজের কথাটা ফৌজদার সাহেবদের জানাতে গিয়ে বললেন যে, কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে তিনি অনাসক্ত নন, তবে তিনি সবসময়ই যথেষ্ট ধৈর্য ধারণের পক্ষপাতী এবং লক্ষ্য তার দীর্ঘ মেয়াদী।

বৈঠক শেষে বিদায় নিয়ে শরীফ রেজা সহকারে ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব নিজ মকানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। হাতে জরুরী কাজ থাকায় শাহ সাহেবের আতিথেয়তা তিনি দীর্ঘ করতে গেলেন না। ফৌজদার সাহেব যাচ্ছেন দেখে একই সাথে যাওয়ার ইরাদায় শরীফ রেজাও ফৌজদার সাহেবের সঙ্গ নিলেন। তাঁর সফর সম্পর্কীয় খবরটুকু শাহ সাহেবকে দেয়ার যে তাকিদ

নিয়ে তিনি এখানে এসেছিলেন, সে খবরটা প্রদান করা শেষ হওয়ায়, শরীফ রেজাও আর অপেক্ষা করার যুক্তি খুঁজে পেলেন না। শাহ সাহেবের এজাযত নিয়ে শরীফ রেজাও বেরিয়ে পড়লেন।

শাহ সাহেবের মকান থেকে বেরিয়ে আসার মুখে ফটকের সামনে হঠাৎ তাঁদের ফরিদার সাথে দেখা। শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের তনয়া। ফরিদা বানু বেগম। মালীদের নিয়ে পাশেই তিনি ফুলবাগানের তদারকি করছিলেন। ফৌজদার সাহেব ও শরীফ রেজাকে বেরিয়ে যেতে দেখেই তিনি হৈ হৈ করে ছুটে এলেন। এসেই তিনি বললেন — সে কি বড় আব্বা! আপনি মানে আপনারা —

ফৌজদার সাহেব হেসে বললেন — আমি এখন যাচ্ছি মা।

একই রকম বিস্ময়ের সাথে ফরিদা বানু বললেন — যাচ্ছি মানে ? কোথায় যাচ্ছেন ? বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছেন ?

ঃ হ্যাঁ, বাড়ীতেই।

ঃ সে কি! আমাকে না বলেই ?

ঃ জরুরী কিছু কাজ আছে মা, একটু তাড়া আছে। আর তাছাড়া, তোমার সাথে তো আগেও তখন দেখা হয়েছে।

ফরিদা বানু এবার শরীফ রেজাকে ধরলেন। বললেন — আর আপনি ? আপনি এতদিন পর হঠাৎ কোত্থেকে ?

শরীফ রেজা স্মিতহাস্যে জবাব দিলেন — অনেক দূর থেকে। বলতে পারেন গোটা পূর্ব অঞ্চলটা ঘুরে এলাম।

ঃ আপনি তাহলে এতদিন ঐ পূর্ব অঞ্চলেই ছিলেন ?

ঃ জি হাঁ। পুরোপুরি না হলেও অনেকদিন ঐ দিকেই আমি ছিলাম। এই গতকাল শামওয়াক্তে ফিরেছি।

ঃ আজ আবার চলে যাচ্ছেন ?

শরীফ রেজা হাসি মুখে বললেন — হ্যাঁ। তবে ওখানে মানে ঐ পূর্ব অঞ্চলে নয়। এই জনাবের মকানে যাচ্ছি।

শরীফ রেজা ফৌজদার সাহেবকে দেখালেন। ফৌজদার সাহেব সবিস্ময়ে ফরিদা বানুকে বললেন — সেকি মা! একে তুমি চেনো, মানে- পরিচয় হয়েছে এর সাথে ?

ফরিদা বানু খেদের সাথের বললেন — জি হ্যাঁ বড় আব্বা, হঠাৎ ঐ অঘটনটা ঘটে গেছে।

ঃ তার মানে। একে তুমি অঘটন বলছো কেন ?

ঃ বলছি এই জন্যে যে, দুনিয়ায় এমন কিছু লোক আছে যাদের সাথে পরিচয় ঘটলে আনন্দই বৃদ্ধি পায় তাঁরা অন্যকে আপন বা আত্মীয় বান্ধব মনে করেন। আর কিছু লোক আছেন যাঁরা হরওয়াক্ত নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। অন্যের দিকে ফিরেও তাকান না বা অন্যের কথা মুহূর্তের জন্যেও ভাবেন না। এদের সাথে পরিচয় ঘটা মানেই স্রেফ পেরেশানীটাই বাড়িয়ে নেয়া।

শরীফ রেজাকে উদ্দেশে করে ফৌজদার সাহেব সহাস্যে বললেন এর অর্থ কি হে শরীফ রেজা ? আমার এই মায়ের কাছে জরুর তোমার গোস্তাকী আছে জিয়াদা ?

জবাবে শরীফ রেজাও হাসি মুখে বললেন — হ্যাঁ, তাঁর কথা শুনে তো তা-ই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি মোটেই খেয়াল করতে পারছিনে, গোস্তাকীটা ঘটলো আমার কোথায় ?

অভিযোগ আনলেন ফরিদা বানু। বললেন — খেয়াল করতে পারছেন না ? ইদানিং আপনি অনেক সময় এই বড় আব্বার মকানে, মানে ভুলুয়াতেই থাকেন, এটা তো ঠিক ?

ঃ জি, তা ঠিক।

ঃ এর আগেও আপনি আমাদের এই ভুলুয়ার মকানে এসেছিলেন। ঠিক কিনা ?

ঃ জি হাঁ, এসেছিলাম।

ঃ আজও এসে চলে যাচ্ছেন। যাচ্ছেন তো ?

বেকায়দায় পড়ে শরীফ রেজা আমতা আমতা করতে লাগলেন। অত্যন্ত বিস্মিত কণ্ঠে ফরিদা ফের বললেন — তাজ্জব! এরপরও আপনি খেয়াল করতে পারছেন না ?

ঃ জি ?

ঃ খেয়াল আপনি করতে পারছেন ঠিকই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনে — অপরাধ আমার পেলেন কি ?

শরীফ রেজাও বিস্মিত হলেন একথায়। ব্যস্তকণ্ঠে বললেন — কেন— কেন ? অপরাধ পাবো কেন ?

কণ্ঠশক্ত করে ফরিদা বানু বললেন — তা না হলে, আমি বলে যে একটা মানুষ এই মকানে আছি, তা আপনি বিলকুল ভুলে গেলেন। এতটা পয়পরিচয় হওয়ার পর মানুষকে মানুষ এত শিগ্‌গির ভুলে যেতে পারে ?

বাধা দিয়ে শরীফ রেজা বললেন — না-না, ভুলে যাইনি। আপনাকে আমি ভুলে গেলাম কোথায় ?

তেতে উঠলেন ফরিদা বানু। ক্ষোভের সাথে বললেন, তাহলে দেখা করেননি কেন ? সোনার গাঁয়ের ঐ সাক্ষাতের পর এত কাছে থেকেও আর আমাদের বাড়ীতে এসেও এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে একবারও আপনি দেখা করলেন না কেন ? এতটা আত্মসর্বস্ব লোক আপনি ?

কি যেন বলার জন্যে ফৌজদার সাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠতেই ফরিদা বানু বললেন — ওঁর কাছেই শুনবেন আপনি বড় আব্বা, কি দারুণ এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে পরিচয় হলো আমাদের আর তারপর আমাদের ঐ সোনার গাঁয়ের মকানে গিয়ে কি আন্তরিকতার পরিচয়টাই না দিয়ে এলেন উনি! এরপর যদি আমার মকানে এসেও উনি খোঁজ না করেন আমার, অন্ততঃ আমার শরীরিক শুভাশুভের খবরটাও যদি না নেন, তাহলে চোট লাগে না কার দীলে ?

শরীফ রেজা ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — না-না, আপনি আমার কথা শুনুন। আমি খুবই ব্যস্ত আছি ইদানিং। বলতে পারেন, দৌড়ের উপরই আছি। তা ছাড়া আপনার মকানে আমি এই জনাবের সাথে ঐ একবারই এসেছি, দুসরা বার আসিনি। আপনি অন্দর মহলে ছিলেন, তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমি যোগাযোগ করতে পারিনি।

ফরিদা বানু সংগে সংগে পাল্টা প্রশ্ন করলেন — এবারও বোধ হয় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যোগাযোগ করতে পারেননি ?

ইতস্ততঃ করে শরীফ রেজা বললেন — আসলে ব্যাপারটা তাই। আপনাকে সামনে কোথাও পেলাম না, সাক্ষাৎ করি কি করে ?

দুই চোখ কপালে তুলে ফরিদা বানু বললেন — তাজ্জব কথা! আমার এই মকানে কি চাকর-নফর লোকজনের এত অভাব পড়ে গেল যে, আমাকে ডেকে পাঠাতে পারলেন না ?

শরীফ রেজা নতমস্তকে বললেন — তা কি করে হয় বলুন! আপনি একজন শরীফ ঘরের অন্দর মহলের জেনানা। কোন কাজ নেই, উপযুক্ত কারণ নেই, অথচ অম্‌নি অম্‌নি আমি ডেকে পাঠাবো আপনাকে, এটা কেমন দেখায় ? আর এতে অন্যেরাই বা মনে করবেন কি ?

ঃ মনে করবেন!

ঃ আর এ ছাড়া, আপনার আব্বার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসি আমরা এই চত্তরে, মানে, অন্দরের উল্টো দিকে মহলের এই বাইরের অংশে। এর পেছন দিকের ঐ অন্দর মহলের যাবো আমি কোন অজুহাত নিয়ে, বলুন ?

ঃ কোন অজুহাত নিয়ে মানে ? ভাই আমার একটাই আর সেও খুব ছোট। আপনার মতো একটা বড় ভাইও তো থাকতে পারতো আমার ? আমার আব্বাও আপনাকে নিজের ছেলের মতো দেখেন। সে দাবী নিয়েও তো হৈ হৈ করে আপনি আমার খবর নেয়ার হকদার।

ফৌজদার সাহেব এবার সোল্লাসে বললেন — তাইতো হে শরীফ রেজা! এটাতো মোটেই ঠিক হয়নি তোমার ? আমি যদি জানতাম, তোমরা পরস্পর এতটা পরিচিত, তাহলে তো আমিই ডেকে দিতাম এই ফরিদা আম্মাকে। একথা তো আমাকে তুমি বলোইনি কখনও।

নিরুপায় হয়ে শরীফ রেজা মাথা নীচু করলেন। ফরিদা বানু এবার সহজকণ্ঠে বললেন — আফসোস্টাতো আমার এখানেই বড় আব্বা। উনি যে খুব লাজুক মানুষ সেটা আমি আগেই টের পেয়েছি। কিন্তু স্রেফ সেই অজুহাতেই যদি উনি উড়িয়ে যান আমাকে —

ফৌজদার সাহেব সোচ্চার কণ্ঠে বললেন — ঠিক ধরেছো, ঠিক ধরেছো। এই শরীফ রেজা সত্যি সত্যিই ভয়ানক লাজুক ছেলে। এ কসুর তার সর্বত্রই পাচ্ছি আমি।

ঃ বড় আব্বা।

ঃ আমি বুঝতে পারছি, তোমার সাথে সাক্ষাৎ না করার একমাত্র কারণ শরীফ রেজার ঐ লজ্জা। নিশ্চয়ই আর দুস্‌রা কিছুই নয়।

এরপর শরীফ রেজাকে লক্ষ্য করে বললেন — তাহলে কি করবে এখন, তুমি বলো ? আমি বলি, আমি যাই। তুমি না হয় এদের সাথে একটা দিন কাটিয়ে আগামী কালই আসো।

শরীফ রেজা অল্প একটু মাথা তুলে বললেন — তা মানে —

ফৌজদার সাহেব বলবেন — এর পরে আর তোমার তো এভাবে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না ?

ফরিদা বানু হেসেই ফেললেন এবার। বললেন—তা কি হয় বড় আব্বা ? কাউকে জোর করে আটকে রাখলে, না তিনি — না আমি কেউ কি সহজ হতে পারবো আমরা ? না আলাপ করে আরাম পাবো ? বরং যাচ্ছেন উনি আজ যান। তবে উনার যেন খেয়াল থাকে সময় করে আবার উনি আসবেন এবং এরপর যতবার উনি আসবেন, সম্ভব মতো সাক্ষাৎ করবেন আমাদের সবার সাথে ব্যস্ তাহলেই আমরা খুশী।

শরীফ রেজা এবার ফরিদা বানুকে লক্ষ্য করে সহজ কণ্ঠে বললেন — আপনি ঠিকই বলেছেন। আজ আমি যাই। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার কথা প্রায়ই আমার মনে হয়। আপনার মতো পাকদীল এক বহিনকে এত সহজে ভুলে যাবো, এমনটি কখনও ভাববেন না। কথা দিচ্ছি, কিছুটা শরমের বশেই যে ভুলটা আমার হয়ে গেছে বারেক আর তা হবে না।

শরীফ রেজা হাসতে লাগলেন। ফরিদা বানু খুশী হয়ে বললেন — শাব্বাশ! এই তো, এই কিসিমের আপনাকেই তো দেখতে চাই আমি। আর এই জন্যেই তো আপনাকে নিয়ে এত টানা হেঁছড়া আমার।

শরীফ রেজা পুনরায় হাসিমুখে বললেন — তাহলে এজাযত আমি পাচ্ছি তো ?

ঃ অবশ্যই অবশ্যই। আপনি আসুন, আল্লাহ্ হাফেজ।

শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের মকান থেকে বিরয়ে পথে এসে নেমেই শরীফ রেজা ফরিদা বানুর সাথে তার পরিচয়ের ঐ চমকপ্রদ কাহিনীটা ফৌজদার সাহেবকে আগাগোড়া শুনালেন এবং সেই সাথে ফরিদা বানুর ও তাঁর আব্বার উষ্ণ আতিথেয়তার কথাটাও শুনাতে গিয়ে একটানা তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। সব শুনে ফৌজদার সাহেব সকৌতুকে বললেন — শরমটা একটু কম করো হে সৈনিক! এত বড় বীর তুমি, অথচ আওরাতের প্রশ্নে তোমার এই সীমাহীন সংকোচ নিতান্তই বেমানান। অনেক ক্ষেত্রে এটা একটা অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এটা ঠিক নয়।

জবাবে শরীফ রেজাও হাসতে হাসতে বললেন — জি-জি, ওটা আমিও বুঝি। এর আগেও বুঝেছি, এই আজকেও আবার বুঝলাম। তবু কেন যেন এটা আমি একেবারেই কাটিয়ে উঠতে পারছিনে।

শরীফ রেজা পূর্ববত হাসতে লাগলেন। ফৌজদার সাহেব নসিহত করে বললেন — না-না, তা পারতেই হবে। এটাও কিন্তু এক ধরনের কাপুরুষতা। এরপর পথের মধ্যে অনেক বিষয় নিয়েই তাঁদের মাঝে কথা হলো বাঙ্গালার আজাদীর প্রসঙ্গটাই এর মধ্যে প্রধান। এক পর্যায়ে ফৌজদার সাহেব শরীফ রেজাকে বললেন — শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের কথাবার্তা আর মেজাজ-মর্জি থেকে কি উদ্ধার করলে তুমি, বলো ?

শরীফ রেজা বললেন — ব্যাপারটা ঐ একই। এ মুলুকটা স্বাধীন হওয়া যে একান্তই প্রয়োজন, এটা তিনি বোঝেন এবং অনেকের চেয়েই অনেক বেশী বোঝেন। অন্তর দিয়ে বিষয়টা অনুভব করেনও গভীরভাবে। কিন্তু প্রভুভক্তিই বলেন আর চক্ষু লজ্জাই বলেন, অনুভূতির অনুপাতে সাহসটা তাঁর কম। অল্প—আয়াসে কখন এই আজাদীটা আসবে, সেই অপেক্ষায় থাকতে তিনি আগ্রহী।

ঃ মারহাবা — মারহাবা! ঠিক ধরেছো। পারতপক্ষে কোন বড় রকমের ঝুঁকি উনি কখনও নিতে চাইবেন না।

ঃ তাঁর এই মানসিকতার পেছনে উপযুক্ত যুক্তিটা কি, তা বুঝতে পারছিনে। এতই উনি বুজদীল ?

ঃ না, ঠিক বুজদীলও নন। মানে ভীরু-কাপুরুষ নন তিনি। আসলে তিনি শংকিত। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের ঐ শোচনীয় পরিণতি দেখে আর এ মুলুকের মানুষের সীমাহীন গাদ্দারীর পরিচয় পেয়ে উনি অনেকটা ঘাবড়ে গেছেন। এখন উনি পা তুলতেই ভয় পাচ্ছেন — হয়তো তারও পরিণতি ঐ গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের মতোই হবে। তাই তিনি অল্প ঝুঁকি নেয়ার এত পক্ষপাতী।

ঃ জনাব!

ঃ এ ছাড়া, উনি অনেক বেশী বোঝেন আর তাই হিসেবটা অনেক বেশী কষে। এসব কাজ জানবাজদের কাজ। হিসেব কষা অবশ্যই ভাল। তবে অতি হিসেবী লোকদের নিয়ে মুসিবতটা এখানেই।

ঃ তাহলে ?

ঃ তাহলেও উপায় নেই। আন্তরিকতাটা আছে যখন, তখন আস্তে আস্তে তাঁকেই চাঙ্গা করে তুলতে হবে। আজাদীর পক্ষে দুস্‌রা কোন দরেজ শক্তি পয়দা হওয়ার আগে বিকল্প চিন্তার অবকাশ আমাদের নেই।

এ প্রেক্ষিতে শরীফ রেজা কিছুটা হতাশ কণ্ঠে বললেন — কিন্তু সেই দুস্‌রা শক্তি আর পয়দা হবে কোত্থেকে ? গোটা পূর্ব অঞ্চলতো ঘুরে দেখলাম — সকলেই বড় জোর সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে কাজে লাগতে পারেন। মূল শক্তি হতে পারেন, এমন কাউকে কোথাও খুঁজে পেলাম না।

ঃ সেটা পাওয়া যাবে না। দূরবর্তী অঞ্চলের ঐসব ভাসমান শক্তির কোন কেউই মূলশক্তি হিসেবে কাজ করতে গেলে সুবিধে করতে পারবে না মূল শক্তি আসতে হবে মূল এলাকা থেকে।

ঃ অর্থাৎ সোনর গাঁ থেকে ?

ঃ না, স্রেফ সোনার গাঁ থেকেই নয়। সোনার গাঁ, সাতগাঁ, লাখ্‌নৌতি বা গৌড় এই তিন এলাকাই মূল এলাকা। এর যে কোনটার কেন্দ্র থেকে শক্তি আবির্ভাব হলে, তা মূল শক্তি হিসেবে কার্যকরী হতে পারে। বিশেষ করে লাখ্‌নৌতিই বাঙ্গালা মুলুকের আদিপীঠ। সেখান থেকে শক্তির আবির্ভাব হলে সোনার গাঁয়ের চেয়েও তা কার্যকরী হতে পারবে অধিক।

ঃ কিন্তু সেই লাখ্‌নৌতির দিকে তো কোন নজরই আমাদের নেই জনাব। আমরা স্রেফ সোনার গাঁয়ের উপরই তামাম দৃষ্টি আবদ্ধ করে রেখেছি।

ঃ হ্যাঁ, আমরা তা রেখেছি এই শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবকে অবলম্বন হিসাবে সংগে সংগে পাওয়া গেছে বলে। ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত উৎসাহী লোক পাওয়া গেলে বাঙ্গালা মুলুকের স্বাধীনতা এই তিন এলাকার যে কোন এলাকা থেকে ঘোষিত হতে পারে।

ঃ জনাব!

ঃ অবস্থার এই প্রেক্ষিতে দৃষ্টি এখন আমাদের আরো প্রসারিত করতে হবে। খোঁজ করে দেখতে হবে, আড়ালে আবডালে আর কোন শক্তি কোথাও লুকিয়ে ছাপিয়ে আছে কিনা।

ঃ জনাব!

ঃ করার তো এখনও কিছুই আমাদের দেখছিনে। সময় মতো তুমি একবার যাও না ঐ লাখ্‌নৌতিতে। তোমার জন্মস্থান। কাজ কিছু হোক না হোক, একটু ঘুরে ফিরে দেখে আসতে দোষ কি ? তাড়াহুড়া নেই। যে কোন একসময় গিয়ে নিজের ঘরদোরের অন্ততঃ খোঁজ খবরটা করে এসো।

শরীফ রেজা উৎসাহ ভরে বললেন — জি জনাব, জি। ঠিক এই রকম এক চিন্তা-ভাবনাই মাথায় আমার জোরদারভাবে খেলছে এখন। আমারও মনে হচ্ছে — শুধু এই দিকেই নয়, ঐ পশ্চিম দিকেও নজর আমাদের মুক্ত রাখা উচিত।

ফৌজদার সাহেব উৎসাহ দিয়ে বললেন — শাব্বাশ্।

৯

ভুলুয়ার সদর থেকে বেরিয়ে ফৌজদার সাহেব ও শরীফ রেজার অশ্ব দু'টি ফৌজদার সাহেবের বাহির আঙ্গিনায় হাজির হতেই মকানের বিভিন্ন স্থান থেকে চাকর নফর সহিসেরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো। তাদের পিছে ছুটে এলো দবির খাঁ। মইজুদ্দীন মালিকসহ আরো কয়জন বেরিয়ে এলো পরেপরেই। কিন্তু

শরীফ রেজা লক্ষ্য করলেন, এদের আশে পাশে বা অন্য কোথাও কনকলতা নেই। সহিসের হাওলায় অশ্ব দিয়ে ফৌজদার সাহেবের দহলীজে বসে গল্পালাপেও অনেক সময় কেটে গেল। কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো সেখানেও কনকলতার উপস্থিতি ঘটলো না। শেষ পর্যন্ত যখন ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব দবির খাঁকে ডেকে শরীফ রেজার খানাপিনা আর তয় তদবিরের দিকে নজর রাখার নির্দেশ দিলেন, তখন শরীফ রেজা ঈষৎ বিস্ময়ে ফৌজদার সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন। তা লক্ষ্য করে ফৌজদার সাহেব ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — ওহ্‌হো! এই দ্যাখো, তোমাকে বলাই হয়নি সেকথা। আম্মি, মানে আমাদের কনকলতা অসুস্থ। দীর্ঘদিন ধরে ভুগছে। মাঝখানে তো তার অবস্থা খুব জটিল হয়ে উঠেছিল। আল্লাহ্ তায়ালার রহমে এক্ষণে বেশ ভাল। তবে শরীর এখনও দুর্বল, সেরে উঠতে সময় লাগবে।

শরীফ রেজা বললেন–জি ?

ফৌজদার সাহেব বললেন — কিছুটা তার একগুঁয়েমী বুঝলে ? কি সব দিনরাত ভাবে! বিমার তার হবে না কেন ?

শরীফ রেজা এতক্ষণে বুঝতে পারলেন, অশ্বের পায়ের শব্দ শুনেই যে কনকলতা বাড়ীর বাইরে ছুটে আসেন, সেই কনকলতার আজকের এই অনুপস্থিতির কারণ। দবির খাঁর পিছে পিছে তাঁর জন্যে সংরক্ষিত নির্দিষ্ট সেই কক্ষে এসে শরীফ রেজা দবির খাঁকে প্রশ্ন করলেন আচ্ছা চাচা, বিমারটা কি কনকলতার ?

দবির খাঁ মলিন মুখে বললেন মালুম নেহি বাপজান। খানাপিনা নিদঘুম তামাম দিকেই বেজায় তার গাফিলতি। তবিয়ত আর আচ্ছা থাকে ?

ঃ গাফিলতি ?

ঃ বিলকুল — বিলকুল। খাওয়ার দিকে খেয়াল নেই, নাওয়ার দিকে খেয়াল নেই, নিদ-ঘুম আরাম-বিরাম তামামই হারাম। ব্যস! শুরু হলো বিমার। এই মাহিনে আগারী তো বেটি আমার একদম খতম হয়েই গিয়েছিল। স্রেফ হায়াতটার জোরেই মউতের দরওয়াজা থেকে ওয়াপস্ আসতে পেরেছে।

ঃ বলেন কি !

ঃ আল্লাহতায়ালার রহম বাপজান, জিয়াদা রহম। ঐ রহমটা আল্লাহতায়ালার হয়েছিল বলেই হায়াত তার বেড়ে গেল আর আম্মিজান আমাদের কাছে ওয়াপস্ চলে এলো। নইলে তো সবাই বললে — আর আধা হপ্তাও —

দবির খাঁর কণ্ঠস্বর ভারী হলো। সে মুখের কথা শেষ করতে পারলো না। তা দেখে শরীফ রেজা আপাততঃ থামলেন। দবির খাঁ তার দুর্বলতা সামাল দিয়ে উঠলে শরীফ রেজা ফের প্রশ্ন করলেন — তা বিমার তাঁর কবে থেকে চাচা ? কতদিন ভুগলেন তিনি ?

ঃ বহুত দিন — বহুত দিন। আপনি সেই যে পূব মুলুকে চলে গেলেন, বলা যায় সেই থেকেই। সেই থেকেই সে কুছকুছ আওয়ারা। খানাপিনায় গাফিলতি।

ঃ চাচা!

ঃ পহেলী পহেলী জিয়াদা কিছু মালুম করা যায়নি। দো-তিন মাহিনে তামামটা ঠিকঠাক। লেকেন, উস্‌কিবাদ বিলকুল দিউয়ানা। কি ধার যাতি হ্যায়, কিয়া সোচ্‌তি হ্যায় — পাতা নেহি।

ঃ কিন্তু কেন চাচা ? এর কারণটা কি ?

দবির খাঁ সিধা মানুষ। বুঝে কম। কিন্তু যা বোঝে তার মধ্যে জড়তা নেই। শংকা–সংকোচ–চাতুরী নেই। একদম সোজা বোঝে। বলার সময় সোজা বলে। শরীফ রেজার প্রশ্নোত্তরে সে নির্দ্বিধায় বললো —আপ্ কি লিয়ে। আপনার জন্যে সোচ্ করেই তো আম্মির আমার এয়সা হালত।

ঃ আমার জন্যে!

ঃ জরুর। আপনাকে জিয়াদা পেয়ার করে আম্মিজান। মহব্বত করে। আর সেই আপনি উধাও। বিলকুল লাপাত্তা। তবিয়ত আর আচ্ছা থাকে কেমন করে, বলুন ?

ঃ চাচা !

ঃ দো-চার মাহিনের মধ্যেই আপনি ওয়াপস্ আসবেন, বাত্‌তো এয়সা মাফিক থা, ঠিক নয় ?

ঃ জি হাঁ — ঠিক। কিন্তু —

ঃ আরে বাপ! মাহিনের পর মাহিনে গুজরান হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনার কোন পাত্তা নেই। জেনানা আদমী, দীল কমজোর। ও কি করে সামাল দেবে, বাতাইয়ে ?

ঃ তা — মানে।

ঃ আমি বলি, আরে বেটি ঘাব্‌ড়াইয়ে মৎ। দূর মুলুকে গেছে — হাতে বহুত্ কাম। ওয়াপস্ আসতে সময় লাগবে জরুর। জোয়ানতাজা বাহাদুর আদমী শরীফ সাহাব। কৌন আয়েগা উস্‌কো সামনে ? কিন্তু আমি একদম বেকারার। জিয়াদা সময় গুজরান হয়ে যেতে দেখে আম্মি আমার মালুম করে নিলো, আপনি আর জিন্দা নেই, খতম হয়ে গেছেন। জিন্দা থাকলে ওয়াপস্ আসতেন জরুর।

ঃ সেকি ? তাজ্জব!

ঃ হুজুর ভি বললেন। আউর বহুত্ আদমী আম্মিজানকে ওহিবাত বললো লেকেন, তামাম না মঞ্জুর। আম্মির যেই মালুম হলো — আপনি আর জিন্দা নেই, সঙ্গে সঙ্গে খানাপিনা বন্‌ধ্। নিদ-ঘুম লাপাত্তা।

ঃ চাচা!

ঃ ব্যস, উস্‌কি বাদ বিমার। বিমার তো বিমার, বিলকুল মউত্‌কা পরোয়ানা।

শরীফ রেজা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। এ নিয়ে আর অধিক প্রশ্ন করলেন না। দবির খাঁর আবেগ থেকেই তিনি সবিশেষ বুঝলেন — কোন্ কিসিমের ঝড় উঠেছে কনকলতার দীলে। সেই সাথে আরো বুঝলেন — কোন্ কিসিমের বাঁধনে তিনি জড়িয়ে যাচ্ছেন ক্রমেই। এ বাঁধনের খোয়াবটাও শরীফ রেজার কাছে এক দুষ্প্রাপ্য বস্তু। এ বাঁধনের কল্পনাও শরীফ রেজার দীলে আনে অনবদ্য হিল্লোল।

কর্তব্যের দিকে তাকালে, ঠিক তখনই আবার এ বাঁধনের ন্যূনতম সম্ভাবনার প্রশ্নেও শরীফ রেজা শিউরে উঠেন আতংকে।

আর প্রশ্ন না করে শরীফ রেজা নীরব হয়ে গেলেন এবং ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁকে নীরব দেখে দবির খাঁ থামলো এবং সেও তার করণীয় কাজকামে আত্মনিয়োগ করলো।

পরের দিন সকাল বেলা আহার নাস্তা অন্তে শরীফ রেজা কুরসী টেনে বারান্দায় এসে বসলেন। গতরাতের মতোই দবির খাঁ আর মুইজুদ্দীন মালিকেরাই বাবুর্চিদের সামনে পিছে থেকে তাঁর নাস্তাপানির তদবির করে গেল। এর পরেই শরীফ রেজা একা। একদম নিঃসঙ্গ। আগের দিনগুলোতে একা বসে থাকলেও, শরীফ রেজা নিজেকে এত নিঃসঙ্গ বোধ করেননি, যতটা আজ করছেন। তখন তাঁর সবসময়ই এই খেয়াল ছিল যে, কনকলতা যে কোন সময় হাজির হবেন সশব্দে এবং অভিমানে–তামাসায় মাতিয়ে তুলবেন পরিবেশ। কিন্তু সেই কনকলতা আর আপাততঃ আসছেন না। শরীফ রেজা গতকালই জেনেছেন, শরীর খুবই দুর্বল হেতু ঘরের মধ্যেই থাকেন তিনি। বাইরে বেরিয়ে আসতে তার সময় লাগবে আরো কয়দিন।

খোলা বারান্দায় বসে বসে এসব কথাই শরীফ রেজা ভাবছেন। সামনে তাঁর সেই জনবিরল দিগন্ত। হেনকালে তাঁর কানে এলো এক নারীকণ্ঠের আওয়াজ — সালাম ছোট হুজুর —

চমকে উঠে শরীফ রেজা চোখ তুলে তাকালেন। তাজ্জব হয়ে দেখলেন — হাতের ডাইনের দিকে বারান্দা থেকে বেশ কয়েকহাত দূরে এক লম্বা চওড়া নারী মূর্তি সংযতভাবে দাঁড়িয়ে। গায়ের রং চকচকে কালো। নিটোল স্বাস্থ্য, নিপুণ দেহের বাঁধন, সুডোল মুখাকৃতি। যৌবনের সম্ভার তার সর্বাঙ্গে সদর্পে বিদ্যমান। সারা দেহে কৃষ্ণবর্ণের বিচ্ছুরিত দ্যুতি। সুদীর্ঘ কেশদাম সযত্নে আচড়ানো এবং সংযতভাবে পৃষ্ঠ ছেড়ে জানুর দিকে ধাবিত। সবচেয়ে যা লক্ষণীয় তা হলো, পরিধানে তার দুগ্ধ সফেদ থান কাপড়।

সংযত আচরণের এই আকর্ষণীয়া মেয়েটি সালাম দিয়ে দাঁড়াতেই সালাম নিয়ে বিস্মিত শরীফ রেজা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন পলক খানেক। সম্বিত ফিরে পেতেই বললেন — কে?

জবাবে মেয়েটি স্বচ্ছ কণ্ঠে বললো — আসতে পারি ছোট হুজুর?

শরীফ রেজা বললেন – আসুন —

মেয়েটি এগিয়ে এসে বারান্দার নীচে দাঁড়ালো এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে হাসিমুখে বললো–আমাকে তুমি বলবেন ছোট হুজুর। আমি আপনাদেরই এক প্রজার মেয়ে আর বয়সেও খানিক ছোট।

ঃ ও, আচ্ছা। তা তোমার নাম?

ঃ পদ্ম, ছোট হুজুর।

ঃ পদ্ম?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। নাম আমার পদ্মরাণী। সবাই বলেন পদ্ম। আবার পদ্মও বলেন কেউ কেউ।

ঃ আচ্ছা। তা কি বলছো তুমি?

ঃ দিদিমণি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন ছোট হুজুর। দিদিমণি জানতে চান —

ঃ দিদিমণি! কোন দিদিমণি?

ঃ আমি। এই বাড়ীর আমি ঐ কনকলতা দিদিমণি।

ঃ কনকলতা?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ ছোট হুজুর।

শরীফ রেজা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন — তা কেমন আছেন তিনি এখন? উঠতে বসেত পারেন?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি এখন অনেকখানি ভাল। ভগবান চানতো আর কয়দিনের মধ্যেই তিনি একদম সুস্থ হয়ে যাবেন।

ঃ তাই?

ঃ জি হুজুর। আপনি ভালভাবে ফিরেছেন শুনে দিদিমণির বিমারটা একদিনেই অনেকখানি কমে গেছে।

সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা পদ্মরাণীর ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ করে মিলিয়ে গেল। শরীফ রেজা বললেন–বলো কি!

ঃ আজ্ঞে হুজুর, তাই।

ঃ আচ্ছা তারপর? উনি কি জানতে চান?

ঃ দিদিমণি জানতে চাইছেন — আপনি কি আর দু'একদিন আছেন এখানে, না এখনই আবার চলে যাবেন?

ঃ কেন–কেন? যাবো কেন?

ঃ তা আমি জানিনে হুজুর। দিদিমণি বললেন–আপনি যদি সত্বরই আবার চলে যান, তাহলে উনি আজই আপনার সাথে দেখা করতে আসবেন।

ঃ সে কি! উনি এখানে আসতে পারবেন?

ঃ শরীর তাঁর এখনও ঠিক হয়নি ছোট হুজুর। আসতে তাঁর কষ্ট হবে। তবু একান্তই যদি আপনি আবার চলে যান, তাহলে যত কষ্টই হোক, উনি আসবেনই আপনার সাথে কথা বলতে।

ঃ আসবেনই?

ঃ পদ্মরাণী ঈষৎ করুণ কণ্ঠে বললো — না এসে উপায় কি ছোট হুজুর ? উনি তো আর আপনাকে ডেকে পাঠাতে পারেন না ? আপনি গিয়ে দেখা করুন তাঁর সাথে — এমন কথা উনি কোন্ আদবে বলবেন ? এতবড় গোস্তাকী কি করতে পারেন উনি ?

ঃ না-না, তা কেন ? মানে —

ঃ তাই উনি বললেন — আপনি যদি দয়া করে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করেন এখানে, তাহলে উনি আর মাত্তর দিন দুই বাদেই আপনার সাথে দেখা করতে আসবেন। তখন আর কষ্ট বেশী হবে না তাঁর। আর যদি তা না করেন, তাহলে আমি ফিরে গেলেই উনি আপনার এখানে আসবেন। অবশ্যি ধরে আনতে হবে তাঁকে। উনি পুরোপুরি হেঁটে আসতে পারবেন না।

একথায় শরীফ রেজা চমকে উঠলেন। তিনি বিপুল বেগে বাধা দিয়ে বললেন — না-না, খবরদার। উনাকে বারণ করে দাও, ওকাজ যেন কখনও উনি না করেন। আমি এখানে আছি আর অনেকদিন থাকবো।

আশান্বিত হয়ে পদ্মরাণী বললেন-অনেকদিন থাকবেন ?

শরীফ রেজা কণ্ঠস্বর জোরদার করে বললেন — হ্যাঁ-হ্যাঁ, অনেকদিন-অনেকদিন। যতদিন উনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে না উঠেন, ততদিন আমি কোথাও আর যাবো না।

ঃ ছোট হুজুর!

ঃ উনাকে গিয়ে বলো — আমার এখন আর কোথাও যাওয়ার কোন ইরাদা নেই। যদিও বা কোন কারণে যেতেই হয় কোথাও, আমি ওয়াদা করছি, উনার সাথে সাক্ষাৎ না করে আমি এক কদম এখান থেকে নড়বো না। আমার দোহাই রইলো, না দোহাই নয়, গিয়ে বলো — আমার হুকুম, উনি যেন অসুস্থ শরীর নিয়ে এ ব্যাপারে আদৌ আর ব্যতিব্যস্ত না হোন।

পদ্মরাণীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে হাসি মাখা তৃপ্তকণ্ঠে বললো — এবার বুঝতে পারছি হুজুর, আপনার প্রতি কেন তাঁর এত টান আর আপনার উপর কেন তাঁর এত দাবী।

হতভম্ব হয়ে শরীফ রেজা বললেন — মানে ?

পদ্মরাণী বললো — এমনটি না হলে কি দিদিমণির মতো মানুষকে এত সহজে এতখানি কব্জা করতে পারে কেউ ?

পুনরায় বিস্মিত হলেন শরীফ রেজা। বিব্রতও হলেন একটু। বললেন এ সব তুমি কি বলছো ?

সংযত হলো পদ্মরাণী। নিজেকে সামলে নিয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললো-জিনা হুজুর, কিছু না। আমি গিয়ে ঐ কথাই বলবো হুজুর। আপনি যা বললেন আমি গিয়ে ঠিক ঠিক ঐ কথাই বলবো। একটুও ভুল হবে না।

ঃ হ্যা, তাই বলো। উনি যেন এমন পাগলামী না করেন।

পদ্মরাণী পুনরায় প্রফুল্লকণ্ঠে বললো — আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ছোট হুজুর, দিদিমণি তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়ে এখানে নিশ্চয়ই আর আসবেন না। সে ব্যবস্থা আমি করবো। আপনিও এ নিয়ে অধিক চিন্তা করবেন না হুজুর।

অবাক হয়ে আর একবার পদ্মরাণীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন শরীফ রেজা। এরপর বিস্মিত কণ্ঠে বললেন — কথা দিচ্ছো তুমি ?

ঃ জি হুজুর। অসুস্থ দেহে তিনি আর আসবেন না।

ঃ তুমি বললেই তোমার কথা রাখবেন তিনি ? মানে তোমার কথাতেই নিশ্চিত হয়ে থাকবেন ?

ঃ থাকবেন বৈকি হুজুর।

ঃ তাহলে তুমি কে ? মানে তাঁর সাথে তোমার সম্পর্ক কি ?

ঃ ঐ বললাম হুজুর, নাম আমার পদ্ম — মানে পদ্মরাণী। দিদিমনির আমি সেবা করি। অন্য কোন সম্পর্ক নেই।

ঃ বাড়ী ? বাড়ী কোথায় তোমার ?

ঃ এককালে এই গাঁয়ের ঐ মাথাতেই ছিল হুজুর। এখন ঐ কনকলতা দিদিমণির বাড়ীই আমার বাড়ী।

ঃ মানে ?

ঃ ঐ দিদিমণির বাড়ীতেই অনেকদিন থেকে আছি হুজুর। ঐ দিদিমণিরই কাজ করি। তাঁর ঘর সংসার গুছাই।

ঃ ঘর সংসার গুছাও ?

ঃ জি। আমি তার দাসী বললেও দাসী, সখী বললেও সখী। দিদিমণির আশ্রয়েই আমি আছি।

ঃ খাওয়া দাওয়া ?

ঃ আগে পৃথক অন্নে ছিলাম, এখন এক সাথেই খাই।

ঃ থাকা-শোওয়া ?

ঃ ঐ দিদিমণির সাথেই ছোট হুজুর। আমরা দুইজন একঘরে থাকি।

শরীফ রেজা একটু থামলেন। কিঞ্চিৎ চিন্তা করে বললেন — ও আচ্ছা। তাহলে কনকলতার সাথে তুমিই থাকো ও বাড়ীতে ?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

শরীফ রেজার খেয়াল হলো, পৃথক বাড়ীতে থাকা নিয়ে কনকলতার সেই পয়লাবারের কথা। তিনি বলেছিলেন — 'আছে আছে। মেয়েছেলে মানুষ আমি, একেবারেই একা একা থাকিনে। আস্তে আস্তে সব দেখতে পাবেন।"

শরীফ রেজা ভাবলেন — এই তাহলে সঙ্গী তাঁর ? তা সঙ্গী হিসাবে বাস্তবিকই উপযুক্তই বটে। উপযুক্ত দেহরক্ষী। মেয়েটির যা স্বাস্থ্য শরীর, তাতে যে কোন হামলার পয়লা ধাক্কা সামাল দেয়ার তাকত তার যথেষ্টই আছে। এটা লক্ষ্য করে নিজের অজ্ঞাতেই শরীফ রেজাও মনে মনে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হলেন।

শরীফ রেজাকে নীরব দেখে পদ্মরাণী বললো — তাহলে হুজুর — হুঁশে আসতেই শরীফ রেজা ফের প্রশ্ন করলো — ও হ্যাঁ, তাহলে তোমরা স্রেফ দুইজনই ও বাড়ীতে থাকো ? মানে কোন পুরুষ মানুষ কেউ নেই ?

ঃ আছে হুজুর। আমার বাবাও থাকেন ও বাড়ীতে।

ঃ তোমার বাবা ?

ঃ জি হুজুর। আমার বাবাও ও বাড়ীতে আর এক ঘরে থাকেন, আর সবাই আমরা এক অন্নে খাই।

ঃ তোমার মা বা ভাইবোন কেউ নেই ? তারা ওখানে থাকেন না ?

ঃ আজ্ঞে না। আমার ভাইবোন কেউ নেই। মাও অনেক আগেই মারা গেছেন।

ঃ তোমার স্বামী ? মানে বিয়ে হয়নি তোমার ?

পদ্মরাণীর মাথা এবার অনেকখানি নুয়ে এলো। তার কালো মুখের তামাম আলো দপ্ করে নিভে গেল। লহমা কয়েক দম ধরে থাকার পর সে ধীরে ধীরে বললো হয়েছিল ছোট হুজুর! কিন্তু —

ঃ তিনি কি জীবিত নেই ?

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে পদ্মরাণী বললো — না ছোট হুজুর। দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমি থান পরে আছি ?

ঃ এ্যাঁ!

ঃ আমার হাতে শাঁখা নেই, মাথায় সিঁদুর নেই!

পদ্মরাণীর চোখে মুখে বেদনা ফুটে উঠলো। লজ্জা পেয়ে শরীফ রেজা সংকুচিত হয়ে গেলেন এবং ক্ষণকাল উভয়েই নীরব হয়ে রইলেন। এরপর পদ্মরাণী নড়ে চড়ে উঠতেই শরীফ রেজা ধীর কণ্ঠে বললেন — আচ্ছা, তুমি তাহলে যাও, আর গিয়ে তোমার দিদিমণিকে আসতে বারণ করো। আমি এখানে বহুত দিন আছি।

ঃ জি আচ্ছা হুজুর।

শরীফ রেজাকে সালাম দিয়ে পদ্মরাণী ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে রওনা হলো। বিস্মিত শরীফ রেজা সালাম নিয়ে সেই দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

সেইদিনই বিকেলে ফৌজদার সাহেব শরীফ রেজাকে বললেন — আম্বিজানকে দেখে এলাম দুপুরে। অবস্থা তার আল্লাহর রহমে খুবই ভাল শরীফ রেজা। আর হপ্তা খানেকের মধ্যেই সে দৌড়ে বেড়াতে পারবে বলে মনে হয়।

শরীফ রেজা বললেন–তাই নাকি ? আজ দুপুর বেলা গিয়েছিলেন ?

জবাবে ফৌজদার সাহেব বললেন–হ্যাঁ, এই দুপুরের একটু আগে ইচ্ছে করলে তুমিও যেতে পারতে আমার সাথে। ঐতো ওখানে বাড়ী। তোমার ঘরের অল্প একটু পশ্চিমে।

ঃ হ্যাঁ, তাতো শুনেছি। কিন্তু আমি তো আর জানিনে, আপনি যাচ্ছেন। জানলে অবশ্যই আমি যেতাম। বেচারীর বিমার। তাঁর খোঁজ নেয়াটা আমার খুবই উচিত ছিল।

ঃ তাতে কি হয়েছে ? ইচ্ছা করলে যখন তখন যেতে পারো তুমি। হিন্দুর মকান হলেও আমাদের জন্যে কোন বারণ নেই। ভেতরে ঢোকার আগে একটু জানান দিলেই হলো।

আসরের নামাজ আদায় করে ঘরে ফেরার পথে ফৌজদার সাহেব শরীফ রেজাকে এই কথা বললেন। ঘরে ফিরে শরীফ রেজা ফৌজদার সাহেবের কথাগুলো ভেবে দেখলেন কিছুক্ষণ। এই ভাবতে গিয়েই হঠাৎ তিনি উপলব্ধি করলেন, কনকলতারও ইচ্ছে, তিনি গিয়ে দেখা করেন কনকলতার সাথে। শুধু বেয়াদপী হয় বলেই পদ্মরাণীর মাধ্যমে কনকলতা কথাটা সরাসরি বলে পাঠাতে পারেননি। নইলে পদ্মরাণীর কথার মধ্যেই এ ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আকাশের পশ্চিম কোণে মেঘ জমেছে কিঞ্চিৎ। কি করবেন ভাবতে লাগলেন শরীফ রেজা। ভেবেচিন্তে শেষ অবধি স্থির করলেন, যাওয়াই তার উচিত। এই সুবাদে কনকলতার বাড়ীটাও দেখা হবে, কোন হালতে থাকেন তিনি, সেটাও দেখা হবে।

সিদ্ধান্ত স্থির করে শরীফ রেজা, রওনা হলেন। এক পা দু'পা করে তিনি কনকলতার মকানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছায়াঘেরা পথ। একদিকে ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের সুবিশাল চত্বর, অন্যদিকে নারিকেল—আদি বৃক্ষের ফাঁকা–ফাঁকা–ছায়ার নীচে ঘন ঘন বসতি। রাস্তাটা এর মাঝ দিয়ে। প্রশস্ত ও আঁকাবাঁকা। দুই পাশে পর পর কাতার বন্ধ সুপারী গাছ।

অল্প কিছু এগুতেই রাস্তার বামপাশে মজবুত এক কক্ষ শরীফ রেজার চোখে পড়লো। রাস্তার একদম উপরেই। রাস্তাটা কক্ষটির কোলঘেষে চলে গেছে। শরীফ রেজা এগিয়ে এলেন। ঐ কক্ষের কাছে এসেই তিনি চমকে গেলেন বিকট এক গর্জনে হুঁশিয়ার! কৌন হ্যায় ?

বেলা তখনও অনেকখানি অবশিষ্ট আছে। দেরী আছে সূর্যাস্তের। কিন্তু আসমানে মেঘ থাকায় আর দুইপাশের নিবিড় গাছ গাছড়ার দরুন রাস্তার উপর খানিকটা আঁধার নেমে এসেছে। জন বিরল রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে পাশ ফিরে চাইতেই শরীফ রেজা অবাক হয়ে দেখলেন–হুংকার দিয়ে বল্লম হাতে ছুটে আসছে দবির খাঁ।

সগর্জনে ছুটে এসে শরীফ রেজাকে দেখেই বিপুলদেহী দবির খাঁ শরমে ও সংকোচে এতটুকু হয়ে গেলেন। সে চমকে উঠে বললো —— তওবা! আরে বাপজান, আপ?

শরীফ রেজা স্মিতহাস্যে বললেন —— হ্যাঁ চাচা। আপনাদের ঐ আম্মিকে দেখতে যাচ্ছি। উনি নাকি এখন খুব কাহিল, তাই।

অপরাধের ভারে বিপর্যস্ত দবির খাঁ ব্যস্তভাবে বললেন–ও আচ্ছা। কসুর মাফ কি জিয়ে বাপজান। যাইয়ে-যাইয়ে —, ঐ তো ঐ সামনের মকানই মেরা আম্মির মকান। যাইয়ে-যাইয়ে, জরুর যাইয়ে।

অগ্রসর হতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন শরীফ রেজা। প্রশ্ন করলেন–আচ্ছা চাচা, এই যে আপনি হাঁক দিয়ে ছুটে এলেন, আপনার কি মনে হয়েছিল?

দবির খাঁ ঐ একই রকম ব্যস্তকণ্ঠে বললেন —— অচিন আদমী-অচিন আদমী। এ এলাকায় অচিন আদমীর ঘুরনা–ফির্না বিলকুল নাজায়েজ, একদম নিষেধ। আমার ঐ অন্দর থেকে দেখলাম, কে একজন নয়া আদমী আম্মিজানের মকানের দিকে যাচ্ছে। আঁধারীর জন্যে পয়চান করতে পারিনি বাপ।

দবির খাঁ তার কক্ষের দিকে ইংগিত করে ঈষৎ শরমে মাথা নীচু করলো। শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন —— ঐ কক্ষ আপনার?

ঃ জি–জি। আমি ঐ কামরাতেই থাকি।

ঃ আপনি ওখান থেকে দেখতে পেলেন কে একজন যাচ্ছে?

ঃ জরুর জরুর।

ঃ দেখেই আপনি ছুটে এলেন বাধা দিতে?

ঃ জি হাঁ বাপজান, বাইরের কোন আদমীরই উধার যাওয়ার হুকুম নেই।

ঃ কিন্তু চাচা, আপনি যখন বাইরে থাকেন, তখন কে বাধা দেয়? তখন তো যে কোন লোক ——

প্রবল বেগে আপত্তি তুলে দবির খাঁ পালোয়ান দরাজকণ্ঠে বললো নেহি-নেহি, কভ্‌ভি নেহি! জরুর আদমী থাকে পাহারায়। রাতদিন, সবেরা–শাম, হরওয়াক্ত লোক থাকে আমার এই মকানে। আমি মকানে ওয়াপস্‌ এলে তবেই তার ছুটি।

ঃ আচ্ছা!

ঃ উধার ঐতো আম্মির মকানের ওপাশেই ফের মুইজুদ্দীন মিয়ার মকান। একদম ঐ একই আনযাম ওখানেও। কুয়ী আদমীর তাকত নেই এই এলাকায় আসে আর আম্মির ডেরায় যায়।

শরীফ রেজার উৎসাহটা বেড়ে গেল। তিনি সকৌতুকে বললেন —— কিন্তু ওদিক দিয়ে আসে যদি? মানে ঐ দক্ষিণ দিক দিয়ে?

ঃ বন্‌ধ্‌, একদম বন্‌ধ্‌। ইয়া-বড়ো এক দেয়াল আছে না আম্মির মকানের ওদিকে? দেয়ালের গায়ে মজবুত এক দরওয়াজা। দরওয়াজা খুলে না দিলে আয়েগা কোন ব্যাটা?

ঃ বলেন কি!

ঃ ঐ দরওয়াজার ওপারেই ফের গিজ গিজ হিন্দু আদমীর বসত। কুয়ী খোলা রাহা নেই। এই এলাকায় না এলে কি রাহা পাবে কেউ তালাশ করে?

শরীফ রেজা বুঝলেন, কনকলতার হেফাজতির ব্যাপারে সবাই এঁরা অত্যন্ত সজাগ। দুর্গের মতো চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন তাঁকে। রাজকন্যার অন্দর মহল মাফিক এই খোলা চত্বরে কনকলতাকে অন্দর মহলের হেফাজতি দান করেছেন এঁরা। সেই সাথে শরীফ রেজা সপুলকে বুঝলেন, অমূল্য রতনের মতো অপরিসীম রূপ যেমন দুর্লভ, তেমনই বড় বালাই।

দবির খাঁকে নিষ্কৃতি দিয়ে পুনরায় অগ্রসর হলেন শরীফ রেজা। অল্প একটু এগিয়েই তিনি কনকলতার মকানে এসে হাজির হলেন। একটা মাঝারী ধরনের নবনির্মিত মকান। সুন্দর ও সুঠাম। রাস্তার সাথে ফটক। ফটক তখন খোলাই ছিল। ফটক দিয়ে শরীফ রেজা দেখলেন —— বাইরের দিকটা প্রস্তরময় হলেও ভেতরটা একেবারেই সাদামাটা। সাধারণ বাঙ্গালী হিন্দুর কাঁচা উঠোনের মতোই উঠোনটা আগাগোড়াই কাঁচা, তবে অনেক বেশী নিকানো আর পৌচানো।

ফটকে এসে শরীফ রেজা উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলেন। জানান দেয়ার ইরাদায় গলার অনেক কসরত করলেন। ফটকের গায়ে কয়েকবার করাঘাতও করলেন তিনি। তবু কারো সাড়া শব্দ না পেয়ে তিনি ফটক পেরিয়ে অল্প একটু ভেতরের দিকে এলেন। এরপর হাতের ডাইনে উঠোনের দিকে এগুতেই "কে-কে" আওয়াজ দিয়ে যে ব্যক্তি ছুটে এলেন, তাঁকে দেখে শরীফ রেজা হকচকিয়ে গেলেন। শ্যামলা রংয়ের দীর্ঘকায় এক বৃদ্ধ। নিতান্তই খাটো করে একখণ্ড শ্বেত বস্ত্র পরিধানে। কোমর থেকে হাঁটুর উপরি অংশ কোনমতে আবৃত। এরপর বাদ বাঁকী তামাম দেহ খোলা। কোথাও কোন বস্ত্র খণ্ড নেই। থাকার মধ্যে এক কাঁধে এক ধবধবে পৈতা। অন্য কাঁধের তল দিয়ে সূতোর এই গোছাটা বৃদ্ধটির দেহখানা আবেষ্টন করে রেখেছে। শ্মশ্রুহীন মুখ। ঠোঁটের উপর সজারুর কাঁটার

মতো খোঁচা খোঁচা পাকা গোঁফ। কেশ বিরল মস্তকে পুরুষ্টু এক টিকি। শরীফ রেজা লক্ষ্য করলেন, বৃদ্ধটির নাসিকায়, ললাটে, বক্ষ—কণ্ঠ—বাহুতে এলামাটির হরেক রকম পোঁজ।

এরই ফাঁকে শরীফ রেজা এক পলকে দেখলেন–বারান্দা—উঠোন — সিঁড়ি পৈঠা নানা রকম আল্পনায় রঞ্জিত। উঠোনের একদিকে ছোট্ট একটা গাঁদা আর দোপাটি ফুলের বাগান। অন্যদিকে তুলসী গাছের ঝোপ ও তুলসী গাছ সম্বলিত সুউচ্চ এক বেদী। এটা সন্ধ্যাদীপ জ্বালানোর আর প্রণাম প্রণতির স্থান। আরো তিনি লক্ষ্য করলেন, বেদীর মাথায় ঝুলন্ত সাদা সাদা সোলার ফুল আর বেদীর গায়ে তেল-সিঁদুরের একশো একটা দাগ।

শরীফ রেজা স্তম্ভিত হলেন নিদারুণ এই পৈবরীত্য লক্ষ্য করে। একাধিক নিষ্ঠাবান মুসলমানের একান্তই গৃহ সংলগ্ন এমন এক নিষ্ঠাবান হিন্দু বসতি শরীফ রেজা কল্পনাও করেননি, বিশেষতঃ মকানটি এমন এক মহিলার, যিনি মুসলমানদের আম্মিজান ও মুসলমানদের অত্যন্ত প্রিয়জন। চিন্তা করে শরীফ রেজা তাজ্জব হতে লাগলেন, ফৌজদার সাহেবের গোটা মকান যে আম্মিজান সকাল—সন্ধ্যা চষে বেড়ান সমানে, একটা মুসলমান পরিবারের পান থেকে চুনতক্ তামাম কিছুর একচ্ছত্র খবরদারী যাঁর হাতে, তাঁর মধ্যে এই মকানের লেশমাত্র আভাসও পরিলক্ষিত হয় না।

অধিক ভাবার ফুরসুত তখন শরীফ রেজার ছিল না। বৃদ্ধটি নাখোশ দীলে হৈ হৈ করে ছুটে এসেই শরীফ রেজাকে দেখে ফের শ্রদ্ধায় গদ গদ হয়ে গেলেন। বিগলিত কণ্ঠে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন-আদাব ছোট হুজুর, আদাব —আদাব! কি সৌভাগ্য —কি সৌভাগ্য! ছোট হুজুর হঠাৎ আজ এই গরীবের আলয়ে! আসুন হুজুর, আসুন–আসুন —

হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধটি আহবান করতে লাগলেন। শরীফ রেজা মাথাকুটে হয়রান হতে লাগলেন, এই বৃদ্ধের সাথে ইহলোকে তাঁর পরিচয় ছিল কোন্খানে! কি বলবেন, স্থির করতে না পেরে শরীফ রেজা আম্তা আম্তা করতে লাগলেন এবং কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন —তা আপনি, মানে আপনাকে তো —

দুলে উঠলেন বৃদ্ধটি। আবেগ ভরে বললেন —হরিচরণ, হরিচরণ। আমার নাম হরিচরণ ছোট হুজুর, শ্রী হরিচরণ দেব।

ঃ হরিচরণ দেব! মানে শ্রী —

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্রী হরিচরণ দেব। জাতে গোত্রে ব্রাহ্মণ হুজুর, নৈকষ্য কুলীন।

ঃ তা —আপনি এখানে —

ঃ আমি ঐ বড় হুজুরের প্রজা হুজুর, আর এই কনকলতা জননীর গৃহস্থালীর অভিভাবক। তার পিতৃতুল্য লোক।

বলেই মুখখানা যথাসাধ্য মেলে ধরে শ্রী হরিচরণ দেব মহাশয় হাসতে লাগলেন হা হা করে। শরীফ রেজা দেখলেন —আট গোণ্ডা দাঁতের জায়গায় কনকলতার এই পিতৃতুল্য লোকের মুখে পোয়া গোণ্ডা দাঁতেরও আর নাম—নিশানা নেই। কনকলতার পিতামহের সুযোগ্য প্রতিভু এই হরিচরণদেব মহাশয় অনেক বয়সের মানুষ।

শরীফ রেজা ইতস্ততঃ করে বললেন — আপনি আমাকে এর আগে কি দেখেছেন কোথাও কোন দিন ?

ঃ কেন হুজুর, ঐ বড় হুজুরের বাড়ীতে তো অনেকবার আপনি এসেছেন আর থেকেছেন। আপনার সামনা সামনি না গেলেও আমি আপনাকে ভাল করেই দেখেছি আর আপনার সব পরিচয় জানি।

ঃ তাই নাকি ? তা আপনি কি তাহলে ঐ পদ্মরাণীর —

ঃ বাপ হুজুর, বাপ। আমি তার জন্মদাতা পিতা। পদ্ম আমার মেয়ে।

এতক্ষণে শরীফ রেজা এই বৃদ্ধটিকে সনাক্ত করতে সক্ষম হলেন। এই তাহলে পদ্মরাণীর বাপ আর পদ্মরাণীর বাপের নাম হরিচরণ! শরীফ রেজা চিন্তা করলেন—তাঁর নামকরণের সার্থকতা আগে কিছু থাক না থাক, এখন তা পুরো মাত্রায় আছে। হরির চরণ স্মরণ করার আর হরির চরণ ঠাঁই খোঁজার যোগ্য সময় এখন তাঁর। শরীফ রেজার এই উপলব্ধি পোক্ত হওয়ার আগেই গোলমাল শুনে ছুটে এলো পদ্মরাণী এবং শরীফ রেজাকে এই মকানে হাজির দেখে আনন্দে ও আওয়াজে বাপের দ্বারা অর্ধউত্থিত গৃহখানা পদ্মরাণী একটানে মাথায় তুলে নিলো।

ছুটে এসে শরীফ রেজাকে দেখেই সে "দিদিমণি ও দিদিমণি, দেখো–দেখো, দেখো শিগ্গির কে এসেছেন" বলতে বলতে যেদিক থেকে এসেছিল ফের সেইদিকে ছুটতে লাগলো।

কনকলতার শোয়ার ঘর দক্ষিণ দুয়ারী ঘর। সাথে বড় বারান্দা। এই ঘরটাই সামনে। অন্যান্য ঘরদোর — রান্নাঘর, খাবারঘর, তামামই এর পশ্চিমে। এই শোয়ার ঘরের বারান্দায় বালিশে হেলান দিয়ে খাটের উপর বসেছিলেন কনকলতা। পদ্মরাণীর আওয়াজে তিনি কিঞ্চিৎ উচ্চ কণ্ঠে বললেন —কি হলোরে পদ্ম ? কে এসেছেন ?

"দেখো-দেখো, চোখ মেলে দেখোই না একবার ?" বলতে বলতে পদ্মরাণী ছুটে এসে খাটের পাশে দাঁড়ালো এবং "ছোট হুজুর এসেছেন" এইটুকু বলতে গিয়ে বেপরোয়া খুশীতে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো।

চমকে উঠে কনকলতা উঠোনের দিকে তাকালেন। হরিচরণ দেবের সাথের শরীফ রেজাকে আসতে দেখে তিনিও আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং

অত্যন্ত ব্যস্তভাবে খাট থেকে নামতে গেলেন। তা দেখে শরীফ রেজা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। "আরে করেন কি — করেন কি!" বলে তিনি ছুটে এসে তাঁর একদম বারান্দার নীচে দাঁড়ালেন।

যারপর নেই সোচ্চার হয়ে উঠে কনকলতা বললেন — আরে আপনি। আপনি এসেছেন ? কি আমার অদৃষ্ট, কি আমার নসীব!

কনকলতার পাণ্ডুর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। শরীফ রেজা দেখলেন কনকলতার দেহখানা অর্ধেক হয়ে এসেছে। চোখ দু'টো গর্তের মধ্যে ঢুকেছে। মুখখানা শুকিয়ে বিশীর্ণ হয়ে গেছে। এরই মাঝে কনকলতার মুখে যখন হাসি ফুটে উঠলো, তখন শরীফ রেজা দেখলেন, সে মুখখানা ফের আগের মতোই সুষমায় ভরে গেছে। শরীফ রেজা বুঝলেন, মুখ যার সুন্দর আর দীল যার পবিত্র, বিমারপিষ্ট হলেও সে মুখের হাসিতে পুষ্প ঝরে পড়ে।

কনকলতার অস্থিরতা পূর্ববতই ছিল। তখনও তিনি খাট থেকে নামার কোশেশ করছিলেন। শরীফ রেজা প্রবল বেগে বাধা দিয়ে বললেন–না-না, নামবেন না — নামবেন না। আমি এখান থেকেই কথা বলছি। আপনি স্থির হয়ে বসুন।

সহাস্য বদনে কনকলতা বললেন — পাগল! আমার পরম অতিথি বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে, আর আমি থাকবো খাটের উপর বসে ? এত বড় পাপিষ্ঠা আমি ?

বলতে বলতে কনকলতা খাটের নীচে পা বাড়িয়ে দিলেন। এবার রুষ্ট হলেন শরীফ রেজা। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, আপনি যদি এতটা অবাধ্য হোন, তাহলে আর থাকা চলে না আমার। আমি চললাম —

শরীফ রেজা ঘুরে দাঁড়াতে গেলেন। কনকলতা চমকে উঠে ভীত কণ্ঠে বললেন — সে কি! না-না, এই যে আমি এখানেই বসছি। দোহাই আপনার, নাখোস হবেন না আপনি।

ফের তিনি পা গুটিয়ে খাটের উপর বসলেন। শরীফ রেজা লক্ষ্য করলেন, কনকলতা সত্যি সত্যিই ভয় পেয়েছেন খুব। তাঁর মলিন মুখ আরো খানিক মলিন হয়ে গেছে। মুখে এবার হাসি ফুটিয়ে শরীফ রেজা বললেন — বেশী যাঁরা অবাধ্য, তাঁদের সাথে আমার আজন্মের আড়ি।

শরীফ রেজার হাসি দেখে কনকলতার মুখেও হাসি ফুটে উঠলো। বললেন — তাই ? তাহলে আমার ঘাঁট হয়েছে, কসুর হয়েছে। আমাকে মাফ করে দিয়ে এবার আপনি আসুন, উঠে বসুন।

বলেই তিনি পদ্মরাণীকে লক্ষ্য করে বললেন — আরে এই পদ্ম, চেয়ে চেয়ে দেখছো কি ? দাও-দাও, ঐ কুরসীখানা এখানে এনে আমার এই খাটের কাছে পেতে দাও।

পদ্মরাণী কুরসীর দিকে ছুটলো। অদূরে দণ্ডায়মান হরিচরণ দেবও দাঁড়িয়ে থাকা অনর্থক বোধে নিজের কাজে চলে গেলেন। পদ্মরাণীকে হুকুম করে কনকলতা পুনরায় শরীফ রেজাকে হাসি মুখে বললেন — আসুন-আসুন, উঠে আসুন —

বিস্মিত হয়ে শরীফ রেজা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কনকলতা তাকিদ দিয়ে বললেন — আসুন —

একই রকম ইতস্ততঃ করতে করতে শরীফ রেজা জড়িত কণ্ঠে বললেন — তা — মানে — আমি — আমি উঠে আসবো ?

মুখের হাসি জোরদার করে কনকলতা বললেন — হ্যাঁ, আপনিই তো! আপনাকেই তো বলছি।

ঃ আপনার এই বারান্দায় ?

ঃ হ্যাঁ, আমার এই বারান্দায়।

ঃ কিন্তু

ঃ এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। এটা আমার নিজের ঘর। আমার থাকার আর শোবার ঘর। বাবা, বড়বাপ, মুইজুদ্দীন চাচা — এঁরা এলে এখানেই আমি তুলি তাঁদের। সবাই তাঁরা এসে আমার এই ঘরেই বসেন। দুপুরের দিকে বড়বাপ এসে এখানে এই কুরসীতেই বসেছিলেন। আপনি এ ঘরে পা দিলে জাত যাবে না আমাদের।

ঃ তার মানে ?

ঃ যেসব ঘরে আপনারা এলে জাত আমাদের চুরমার হয়ে যায়, আমাদের সেসব ঘর – মানে রান্নাঘর, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর — এসব তামামই ঐ যে ঐ পশ্চিম দিকে। ওখানে আপনাকে নেবো না। আসুন-আসুন।

পদ্মরাণী ইতিমধ্যেই কুরসী এনে খাটের কাছে পেতে দিলো। কনকলতার কথায় শরীফ রেজা হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে উঠে এসে কুরসীতে বসতে বসতে বললেন — কি হলো কথাটা ? চুরমার হয়ে যায় নাকি ?

হ্যাঁ, যায়ই তো। আপনাদের জাতের মতো আমাদের জাতটাতো বেশী শক্ত নয়। মানে, আপনাদের জাত যতটা মজবুত তার তুলনায় আমাদেরটা একেবারেই ঠুনকো। একটা টোকা লাগলেই ভেঙে যায়।

ঃ কি রকম ?

ঃ এই দেখুন না, আমি একজন হিন্দুর মেয়ে। শুধু হিন্দুর মেয়েই নই, কুলেগোত্রে একেবারে কুলীন বামুনের মেয়ে। তার উপরও ফের একজন পূজারিণীর মেয়ে। সেই আমি আপনাদের রান্নাঘর, খাবারঘর, স্নানের ঘর, শোবার ঘর তামাম ঘরে সারা বেলা এদিক দিয়ে ঢুকছি, ওদিক দিয়ে বেরুচ্ছি। এতে আপনাদের জাত গেল, একথা আপনাদের কাউকে বলতে শুনিনি। অনেক

আলেম উলেমাও আপনাদের ওখানে আসেন থাকেন। তারাও কেউ এ নিয়ে ব্যস্ত হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। অথচ দেখুন, কোন হিন্দু নয়, আপনি একজন মুসলমান হয়েও ভাবছেন — কোন মুসলমান এ ঘরে এলে আমাদের জাত যাবে। কতবড় তাজ্জব আর লজ্জার ব্যাপার, দেখুন!

ঃ তা মানে — কথা হলো —

ঃ কথা হলো, আমরা ঈমান আনিনি বলে আর ইসলামের নির্দেশাদী মেনে চলি না বলে আমাদের হাতে খেতে আপনাদের কেউ কেউ কিছু ইতস্ততঃ করেন–এই যা। এটা নিতান্তই স্বাভাবিক। তাজ্জব হওয়ার মতো আদৌ কোন ব্যাপার নয়। তাজ্জব হওয়ার ব্যাপার হলো, আমাদের ছায়া গায়ে লাগলে আপনাদের কোন অলি-আউলিয়া মানুষকেও গোছল করতে হয় বলে আমি জানিনে, কিন্তু আপনাদের ছায়া গায়ে লাগলে আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোকই আছেন, যাঁরা সঙ্গে সঙ্গে দুস্‌রাবার স্নান করতে ছুটেন।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আপনারা আমাদের খাবার ঘরে ঢুকলে আমরা হাঁড়ি ফেলবো, ঘর ফেলবো না। ঘর বাড়ী অপবিত্র হয়ে গেছে বলে বাড়ী ফেলে অন্য বাড়ীতে বা বনারণ্যেও যাবো না। ভড়ং আর বলে কাকে!

ঃ থাক, থাক, এর মধ্যে খামাখা ওসব কথা আনবেন না।

ঃ আনছি কি আর সাধে ? একটা কুকুর ঢুকে হাঁড়ি বাড়ী তছনছ করে গেলেও জাত যায় না আমাদের। অথচ আমাদের দেয়া যবন — ম্লেচ্ছ নামের একটা মানুষ ঢুকলেই হুমকি আসে — "ফেলাও হাঁড়ি"। একটা শেয়াল কুকুরের চেয়েও কি মানুষ বেশী অপবিত্র–বলুন ?

শরীফ রেজা থ মেরে গেলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, কনকলতার দুই চোখে ছল ছল করছে পানি। যেন কোন এক ক্ষতস্থানে ঘা লেগেছে অলক্ষ্যে। না–জবাব হয়ে লহমা কয়েক চেয়ে থাকার পর শরীফ রেজা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন — আজ আপনার কি হয়েছে বলুনতো ? এসব কথা এমন করে কেন আপনি বলছেন আজ ?

বেদনাক্লিষ্ট কণ্ঠে কনকলতা বললেন — আজ বলছি, কথাটা হঠাৎ উঠলো বলে, আর বলছি হৃদয়ের যাতনায়।

ঃ হৃদয়ের যাতনায়!

ঃ হ্যাঁ, একদিকে যাতনায়, অন্যদিকে দুঃখে।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ আমাদের এই বাড়াবাড়ির জন্যেই তো আজ আমাদের এত দুঃখ — এত দুর্ভোগ, আর এত আপনাদের জয়জয়কার। আমরা এই গুটি কয় উচ্চ বর্ণের হিন্দু ছাড়া আর সব হিন্দুরই কাছে আপনারা এত প্রিয়। আপনাদের এত সাফল্য।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আমাদের এই বাড়াবাড়িটা না থাকলে, এত সংঘাত হয় না আপনাদের সাথে আমাদের। এই উগ্রতা না থাকলে যার যার মতো সবাই আমরা অনেকটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে পারতাম, যেমন করছে আমাদের জাতির সিংহভাগ অর্থাৎ নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা।

অভিভূত শরীফ রেজা বললেন — তাজ্জব!

বলেই চললেন কনকলতা — আমার ভাল লাগলে ইসলাম কবুল করতাম, না লাগলে এইসব দন্দ্ব সংঘাত এড়িয়ে অন্ততঃ তুলনামূলক শান্তিতে আপনাদের পাশাপাশি বসবাস করতে পারতাম। পারতাম না ?

ঃ জি ?

ঃ ইসলামের রাজ্যে অন্য জাতির স্থান নেই ?

ঃ কেন থাকবে না ? ইসলামের জন্ম লগ্ন থেকেই তো ইহুদিরা মুসলমানদের পাশাপাশি বসত করে আসছে। পাশাপাশি স্বাধীন মুলুক রয়েছে ইহুদিদের-খৃষ্টানদের।

ঃ তবে ? সেই কথাই তো বলছি। কিন্তু আমাদের এই অত্যধিক বাড়াবাড়ির কারণে সমর্থন হারিয়ে আমরা না পারছি টিকে থাকতে, না পারছি আপনাদের সাথে এক হয়ে মিশে যেতে। সংঘাত, বিদ্বেষ, আর পরিণামে যন্ত্রণাই বৃদ্ধি পাচ্ছে শুধু।

ঃ কিন্তু —

করুণ নয়নে চেয়ে কনকলতা বললেন — একটা অস্বস্তি বুঝলেন, সূক্ষ্ম একটা অস্বস্তি আমার দীলের তামাম শান্তি হরণ করে নিয়েছে। ওটা আর আমি দীল থেকে বিদায় করতে পারছিনে। কাঁটার মতো ওটা আমাকে অহরহঃ খোঁচা দিচ্ছে।

ঃ আপনার এই অস্বস্তি কি আপনার কওমের কথা ভেবে ?

ঃ না, কওমের কথা নয়। ও কথার সুরাহা কিছু নেই বলে ও কথা আমি বলিনে। আমি বলছি আমার নিজের কথা। আমার জিন্দেগীর কথা।

ঃ জিন্দেগীর কথা ?

ঃ আমাদের এই অত্যধিক বাড়াবাড়ির বিষফল অনেকের মতো আমাকেও ভক্ষণ করতে হয়েছে আর তার ফলে আমার জিন্দেগীটা একেবারেই বেসুরা হয়ে গেছে। বিশুদ্ধ সুর এ বীণাতে আর হয়তো কোনদিনই উঠবে না।

কনকলতা উদাস নয়নে শূন্যের দিকে চেয়ে রইলেন। অত্যধিক আগ্রহী হয়ে উঠে শরীফ রেজা বললেন — সেকি! এসব কি বলছেন আপনি ? কি সে ঘটনা, বলা যায় না তা ?

সম্বিতে ফিরে এসে কনকলতা জবাব দিলেন — এ্যাঁ ? না, তা বলা যায় না বা বলার মতোও নয়। সময় যদি আসে কোনদিন, তবেই হয়তো বলবো, তা না এলে আর সে কথা বলে বিড়ম্বনা বাড়াবো না।

কনকলতা গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিন্তু শরীফ রেজার আগ্রহ আরো বেশি বৃদ্ধি পেলো। তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — না — না, তা বললে হবে কেন ? কথাটা যখন তুললেনই —

ঃ দোহাই আপনার। ওয়াদা না করলেও আপনিতো একদিন কথা দিয়েছেন, আমার এদিকটা নিয়ে আপনি আর কখনও আগ্রহ প্রকাশ করবেন না।

ঃ কিন্তু —

ঃ ওসব কথা থাক। সময় এলে আমি নিজেই বলবো আপনাকে। আমার মাথার দিব্বি, এ নিয়ে আর অধিক আগ্রহী হবেন না।

শরীফ রেজা বাধ্য হয়ে থেমে গেলেন। তিনি বুঝলেন, কি যেন বলতে গিয়ে কনকলতা ফের চেপে গেলেন সে কথা।

পদ্মরাণী সেই থেকেই একপাশে দাঁড়িয়েছিলো। আসল কথা বাদ দিয়ে এসব তত্ত্ব কথা উঠে পড়ায় সে নাখোশ দীলে কেবলই উস্-খুশ করছিলো। তা দেখে কনকলতা বললেন— ওহো পদ্ম, শিগ্‌গির পাখাটা নিয়ে এসোতো ভেতর থেকে। কোথায় যেন রেখেছি, দেখো। পাখা এনে তোমার ছোট হুজুরকে বাতাস করো। উঃ! যা গরম পড়েছে! আকাশভরা মেঘ, বাতাস নেই। ঝড়টর কিছু উঠবে বোধহয়।

শরীফ রেজা একথায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন — হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঝড়ই উঠবে বোধহয়। তা যে জন্যে এলাম, সেসব কথা কিছুই হলো না। কেমন বোধ করছেন এখন আপনি ?

কনকলতা হাসি মুখে জবাব দিলেন — ভাল, খুব ভাল।

ঃ ভাল ?

ঃ বিশ্বাস করুন, কাল থেকেই আমি যেন বেজায় বল পাচ্ছি শরীরে।

ঃ তাই ?

বক্র নয়নে চেয়ে কনকলতা বললেন — জি। আসল বিমার দূর হলে আর ফালতু বিমার থাকে ?

ঃ আসল বিমার! সে আবার কি ?

ঃ দুশ্চিন্তা।

ঃ দুশ্চিন্তা !

ঃ জি হাঁ। পদ্মর এই ছোট হুজুরকে নিয়ে আমার নিদারুণ দুশ্চিন্তা। ঐ দুশ্চিন্তাই তো আমার এই দেহের ব্যাধির মূল কারণ।

ঃ তার মানে ? আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ?

ঃ তো আর কাকে নিয়ে ? এমন লোক আর কে আছে এই দুনিয়ায় যে, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করে বিমার ফাঁদিয়ে বসবো আমি।

ঃ তাহলে তা করতে গেলেন কেন ? মানে, আমাকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা কেন করতে গেলেন আপনি ?

ঃ বাঃ! দুই তিন মাসের জায়গায় মাস বছর একধারছে কেটে গেল, তবু আমি ভাববো — আপনি জিন্দা আছেন এখনও ?

ঃ বলেন কি! তাহলে আপনি ভাবলেন, মারাই পড়েছি আমি ?

ঃ তাই নয় তো কি ? তা না ভাবলে এত বড় এই বিমারটা অমনি অমনি হলো আমার ? তিন কুলে কেউ নেই। আমার সহায়সাথী বলতে মাত্র আপনারাই এই তিন-চারজন। আর সত্যি কথা বলতে কি, বড়বাপেরা আমার চরম সহায় হলেও, সাথী বলতে একমাত্র আপনি। আর সহায় বলতেও, ভাবতে গেলে, আপনিই শেষ পর্যন্ত প্রধান। বড়বাপের খুবই বয়স হয়েছে। বাবাটাও আধ পাগ্‌লা। আপনাকে পেয়ে অবধি আমার জীবনের তামাম আঁধার, একাকিত্বের তামাম জ্বালা, বিলকুল দূর হয়ে গিয়েছিল। বলা যায়, দুসৃরাবার জীবন খুঁজে নিলাম আমি। সেই আপনাকেই যদি হারিয়ে বসি আবার, তাহলে আর আমার থাকে কি ?

শরীফ রেজার অনুভূতি তৃপ্তিতে ভিজে গেল। সেই সাথে কিছুটা চিন্তান্বিতও হলেন তিনি। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন — কম্ম কাবার! এই আপনাকে নিয়েতো আখেরে বড় মুসিবত হবে আমার! আপনার কষ্ট হচ্ছে, আমাকে নিয়ে ভাবছেন আপনি, এসব কথা দীলে এলে তো কোথাও কোন কাজে গিয়ে টিকে থাকতে পারবো না ? অর্ধেক কাজ না হতেই ফের কাজ ফেলে আমাকে ছুটতে হবে পেছনে!

কনকলতা খুশী হয়ে বললেন — ছুটতেই হবে জরুর। আমি এখানে বেঁচে থেকে জিন্দেগীভর কষ্ট করবো আর আপনি গিয়ে যেখানে সেখানে সুখ করে মরে থাকবেন, ওটি আর হচ্ছে না।

ঃ হচ্ছে না ?

ঃ না। বাপ-মা, ভাইবোন আর পেছনের টান না থাকায় আগে যা করেছেন, করেছেন। সে মওকা আর আপনি পাচ্ছেন না। এমন একটা জীবন আপনি হেলায় বরবাদ করবেন তা হতে আর দিচ্ছিনে।

ঃ তার মানে ? আমার দ্বারা আর কোন কাজ হতে আপনি দেবেন না ?

ঃ কোন্‌টা কাজ আর কোন্‌টা অকাজ, ওটা আমিও কিছু বুঝি। কাঠকেটে তলোয়ার নষ্ট করবেন — ওটি হতে দেবো না। কাঠ কাটার অনেক হাতিয়ার আর জিয়াদা লোক এ দুনিয়ায় আছে।

ঃ আচ্ছা ?

ঃ তলোয়ারের কাজ সত্যি সত্যিই আসবে যেদিন, সেদিন আর পথ আপনার আগলাবো না। কিস্মতে থাকলে সেদিন নিজের হাতেই সাজিয়ে দেবো আপনাকে। কিন্তু ফাল্তু পাঁয়তারা করে আপনি বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াবেন সবসময়, ও মওকা আর নেই আপনার, তা জেনে রাখুন।

একথায় শরীফ রেজা সশব্দে হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন — তার মানে, কড়া শাসনে রাখবেন আমাকে ?

ঃ বিলকুল। আপনার পাগলামীর জেরটা খাটো করতে না পারলে তো বাঁচানো যাবে না আপনাকে। কঞ্চি আনতে বললে তো গোটা বাঁশঝাড়টাই তুলে আনার সখ আপনার।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আপনার ফিরে আসার খবর শুনে আমার আনন্দও হলো যেমন, রাগও হলো তেমনি। শরীরটা ভাল থাকলে তখনই ছুটে গিয়ে আপনার এই খেয়ালীপনার বিষটা ঝেড়ে ঝুড়ে খানিকটা খাটো করে দিয়ে আসতাম।

হাসির জের বাড়িয়ে দিয়ে শরীফ রেজা বললেন — ও, তাই বুঝি এই পদ্মরাণীকে পাঠিয়েছিলেন সেই বিষ ঝাড়ার মওকাটা পাকাপোক্ত করতে ? মানে যাতে করে সে মওকাটা ফস্‌কে না যায় আপনার ?

ঃ একশোবার। শুধু তাই নয়, ভাবলাম, পদ্মটা ফিরে এলে আজই যাবো আপনার ওখানে তা যত কষ্টই হোক। যে খেয়ালী মানুষ আপনি, হুট করে পালিয়ে যাবেন, সে মওকা দেবো না। কিন্তু —

ঃ কিন্তু কি ?

ঃ পদ্ম এসে হুকুম জারী করলো। বললো — আমার উপর হুকুম হয়েছে, নড়ন চড়ন বন্‌ধ। হুকুম করেছেন খোদ পদ্মরাণীর ছোট হুজুর। কি আর করি! বাধ্য হয়ে থেমে গেলাম।

ঃ থেমে গেলেন ?

ঃ যাবো না ? ও বাবা! কয়টা মাথা আছে আমার এই কাঁধে ? অনুরোধ ফেলা যায়, হুকুম ফেলা যায় ? তার উপর এখনইতো আবার শুনলাম, অবাধ্যের সাথে পদ্মর ছোট হুজুরের আজন্মের আড়ি।

এবার হো হো করে দুইজনই একসাথে হেসে উঠলেন। পাখা এনে পদ্মরাণী বাতাস করা শুরু করতেই শরীফ রেজার প্রবল আপত্তিহেতু শরীফ রেজার হাতে পাখা দিয়ে সে সরে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং এঁদের কথা শুনে মুখ চেপে হাসছিল। সেও এবার চাপতে চাপতে হেসে ফেললো সশব্দে। এমন সময় শব্দ হলো গুড়ু-গুড়ু-গুড়ুম্!

জমাটবাধা কালো মেঘের বিকট গর্জনে চমকে উঠলেন সকলেই। সেই সাথে শরীফ রেজা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন এবং এখনই বৃষ্টি আসবে সম্ভাবনায় বিদায়ের জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। তা দেখে কনকলতা ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — সেকি! এখনই চলে যাবেন ?

শরীফ রেজাও ব্যস্তকণ্ঠে জবাব দিলেন — হ্যাঁ-হ্যাঁ, যেতে হবে। বৃষ্টি নামলে আর যেতে পারবো না। মাগরিবের আর দেরী নেই।

ঃ কিন্তু শোনাতো কিছুই হলো না আমার ? কোথায় গেলেন, কি করলেন, এসব তো কিছুই বললেন না ?

একই রকম ব্যস্তভাবে শরীফ রেজা বললেন — আর একদিন বলবো, আজ যাই।

ঃ আর একদিন কবে ? আমার চলাফেরা করতে এখনও তো সময় লাগবে কয়েকদিন। এতদিন আমাকে এই আগ্রহ চেপে রাখতে হবে ?

ঃ তাহলে কাল বা পরশুই আবার আসবো। এসে সব শুনিয়ে যাবো।

কনকলতা পুলকিত হয়ে উঠলেন। বিপুল আগ্রহভরে বললেন — আসবেন আবার ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, আসবো–আসবো।

ঃ ঠিক তো ?

ঃ বিলকুল ঠিক। কথা দিচ্ছি।

ইতিমধ্যেই ফৌজদার সাহেবের মকানে মাগরিবের আজান শুরু হলো। আজানধ্বনী কানে পড়তেই ধড়মড় করে রওনা হলেন শরীফ রেজা। কনকলতাও এরপর আর বাধা দিতে গেলেন না।

পরের দিন আসবেন বলে ইরাদা একটা থাকলেও ঠিক পরের দিনই শরীফ রেজা কনকলতার মকানে আসতে পারলেন না। এলেন একদিন পরে। জহুরের নামাজ আদায় করেই সেদিন তিনি বেরুলেন। অবেলায় বেরুলে সময়ের অভাব ঘটে বলে প্রশস্ত সময় হাতে নিয়ে সেদিন তিনি এলেন। কিন্তু যে উৎসাহ নিয়ে তিনি বেরুলেন, কনকলতার মকানে এসে তাঁর সে উৎসাহটা তলানীতে নেমে এলো। জানান দিয়ে ভেতরে ঢুকেই শুনলেন — এই মাত্র ঘুমিয়ে গেছে কনকলতা। গতকল্য তিনি দিনমানই এন্তেজারে ছিলেন। আজকেও দুপুর তক্ অপেক্ষা করার পর তিনি ঘুমিয়ে গেলেন এইমাত্র। কনকলতার ধারণা, শরীফ সাহেব এলে ঠিক শেষ বিকেলেই আসবেন। ভর দুপুরে আসবেন না।

স্বাভাবিকভাবেই খবর শুনে হতাশ হলেন শরীফ রেজা। খবর দিলেন পদ্মর পিতা হরিচরণ দেব মহাশয়। ঠিক কনকলতার ঘরের পাশেই উঠোনের এক

কোণে গাছ গাছড়ার ছায়া পড়ে সুনিবিড় সেই ছায়ার নীচে খাটিয়া পেতে দেব মহাশয় দ্বিপ্রহরে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। মানুষের সাড়া পেয়ে তিনি কয়েক কদম সামনে এগিয়ে এলেন এবং এসেই শরীফ রেজাকে দেখতে পেলেন। আনুষ্ঠানিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পর দেব মহাশয় শরীফ রেজাকে এই বার্তা দিলেন।

অসুস্থ মানুষ ঘুমিয়ে গেছেন। তাঁকে এখন জাগ্রত করা একেবারেই অসংগতবোধে শরীফ রেজা ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু যেতে তিনি পারলেন না। তাঁকে আটকিয়ে দিলেন এই শ্রী শ্রী হরিচরণ দেব।

শরীফ রেজা একজন সদবংশ জাত কৃতিপুরুষ, এ খবর হরিচরণ মহাশয় বহুমুখেই শুনে আসছেন। ফৌজদার সোলায়মান খানের আশ্রিতজন হলেও তিনিও যে একজন একেবারেই ফালতুজন নন, এই পুণ্যবার্তা শরীফ রেজাকে প্রদান করার দুর্বার এক খাহেশ গত পরশুই দীলে তাঁর পয়দা হয়। কিন্তু সুযোগের অভাবে গত পরশু সে খাহেশ তিনি পূরণ করতে পারেননি। মওকা পেয়ে আজ আর তিনি সে মওকার অপব্যবহার করলেন না। খাহেশ পূরণের ইরাদায় মরিয়া হয়ে উঠলেন। শরীফ রেজা ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই তিনি হৈ — হৈ করে বললেন — আরে, সে কি হুজুর! ফিরে যাবেন কি ? মেয়েছেলের ঘুম একটা ঘুম হলো হুজুর ? তাদের হলো — এই নিদ্রা, এই জাগরণ। কষ্ট করে এসেছেন, আসুন–একটু বসি। বসে দু'টো কথাবার্তা বলি। এর মধ্যেই দেখবেন সে ঠিক ঠিক জেগে গেছে ঘুম থেকে।

শরীফ রেজা ইতস্ততঃ করে বললেন — তা মানে —

দেব মহাশয় সোচ্চার কণ্ঠে বললেন — ঐতো আমার খাটিয়া হুজুর। আসুন, ওখানেই একটু বসি আমরা। সুন্দর ছায়া, দিব্বি বাতাস!

শরীফ রেজা তবুও ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, অসুস্থ মানুষ নিদ্রা মগ্ন, তার জন্যে এখানে এই ভর দুপুরে বসে থাকাটা দৃষ্টিকটু। তা দেখে হরিচরণ দেব মহাশয় ভাবলেন, খাটিয়ায় বসার প্রস্তাব ছোট হুজুরের মনোপুত নয়। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না-না হুজুর, আপনাকে ঐ খাটিয়ায় বসতে বলবো না। কুরসীটা যদিও খুবই ভারী আর এই বৃদ্ধ বয়সে ওটা আনতে আমার কষ্ট হবে, তবু বারান্দার ঐ কুরসীটাই নামিয়ে আনছি হুজুর, আপনি আসুন কুরসীতেই বসবেন আপনি।

হরিচরণ কুরসীর দিকে অগ্রসর হলেন। শরীফ রেজার আর ভাবনার সময় রইলো না। বেকায়দায় পড়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — আরে না-না। করেন কি — করেন কি ? আপনি মরুব্বী মানুষ, জইফ আদমী। আপনি কেন কুরসী আনবেন আমার জন্যে ? আসুন-আসুন, ঐ খাটিয়াই যথেষ্ট। আমি ঐ খাটিয়াতেই বসছি।

বলেই শরীফ রেজা গিয়ে খাটিয়ার উপর বসে পড়লেন। তা দেখে অত্যন্ত প্রীত হলেন দেব মহাশয়। কুরসীখানা আসলেই ভারী কুরসী ছিল না। ভারী ছিল হরিচরণের মন। ওটা আনার মধ্যে হরিচরণের আন্তরিকতার অভাব থাকায় ঐ অজুহাত তিনি আনেন। ঝামেলাটা আপছে আপ্ কেটে গেল দেখে দন্তহীন মুখে তিনি প্রশস্ত হাসি টেনে বললেন — বাঃ–বাঃ–বাঃ! হুজুর দেখছি সত্যিই বড় মহৎ দীলের মানুষ। কোন রাগ অহংকার নেই। বৃদ্ধের প্রতি অসীম তার শ্রদ্ধা!

বলতে বলতে এসে শরীফ রেজার পাশে তিনিও ঐ খাটিয়ার উপর বসলেন। প্রত্যুত্তরে শরীফ রেজা কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন — থাক, থাক, ওসব কি বলছেন ?

কণ্ঠে জোর দিয়ে হরিচরণ বললেন–থাকবে কেন হুজুর ? মহৎকে যে মহৎ বলতে কুণ্ঠাবোধ করে সে তো একজন পাপিষ্ট। মহৎ লোক কি গোন্ডা গোন্ডা জন্মায় ?

ঃ জ্বি ?

ঃ আমারও পূর্ব-পুরুষের প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন মহৎ ব্যক্তি। দশ গাঁয়ের লোক তাঁদের গুণকীর্তন করতো আর ভিড় করে এসে পদধূলী নিতো। তাঁদের মতো অতবড় ডাক সাইটে মহৎ ব্যক্তি ঐ তল্লাটে আর দুস্রাটি ছিল না।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ বিখ্যাত লোক হুজুর, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্যক্তি সবাই। অধম এই হরিচরণকে দেখেই আমার বংশের বিচার করবেন না! ঐ দেশ বরেণ্য বংশের এই হরিচরণই একমাত্র কুলাঙ্গার!

শরীফ রেজা সবিস্ময়ে বললেন দেশ বরেণ্য বংশ!

নেচে উঠে হরিচরণ সদম্ভে বললেন — রাজাধিরাজ বল্লাল সেনের বংশ হুজুর। আমার পূর্ব-পুরুষের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা রাজাধিরাজ বল্লাল সেনের ভগ্নিপতি।

ঃ আপন ?

ঃ আপন বৈকি হুজুর ? মাসতুতো বোন খুরতাতো বোন — এরা কি কেউ আপনের চেয়ে কম ?

ঃ বলেন কি !

ঃ কুলীন–কুলীন। নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান এই ভাগ্যহীন হরিচরণ। আমার পূর্ব-পুরুষের প্রত্যেকটি লোক ছিলেন একাধারে যেমন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তেমনই ছিলেন রাজা মহারাজ মানুষ। যেমনই তাঁদের গুণ, তেমনই তাদের প্রতাপ। তাঁদের নামে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খেতো।

ঃ আচ্ছা!

ঃ এই ধরুন আমার ঠাকুরদা! আমার ঠাকুরদারই সমকক্ষ লোক এই গোটা বাঙ্গালা চষে বেড়ালে নখে গোণা কয়জন বৈ মিলতো না।

ঃ তাজ্জব।

ঃ রাজরাজা মানুষ হুজুর। অঢেল ধন-সম্পদ, বিশাল অট্টালিকা। তাঁর হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া আর বিরাট ভূসম্পত্তি।

শরীফ রেজা প্রথম থেকেই এই বৃদ্ধের বক্তব্যের মধ্যে সত্যের অভাব উপলব্ধি করছিলেন। এবার তাঁর বক্তব্যের অসারতা সম্বন্ধে প্রায় পুরোপুরিই নিঃসন্দেহ হলেন। সেই সাথে একজন প্রবীণ ব্যক্তির মুখ থেকে এই কিসিমের অবিশ্বাস্য কথা নির্দ্বিধায় বেরিয়ে আসতে দেখে যারপর নেই কৌতুক বোধও করলেন তিনি। আর তাই তিনি সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন–ঠাকুরদা মানে তো পিতার পিতা ?

ঃ আজ্ঞে–আজ্ঞে, পিতামহ মহাশয়।

ঃ মাঝখানে তো আপনার মাত্তর এক পুরুষের ফাঁক, না কি বলেন ? মানে আপনার পিতা ?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঃ আপনার ঠাকুরদার যেখানে ঐ রকম আলীশান অবস্থা, সেখানে আপনি আজ অন্যজনের আশ্রয়ে–মানে — ঐ হাতী ঘোড়ার —

শরীফ রেজাকে মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে শ্রী হরিচরণ দেব মহাশয় বিপুল খেদে বললেন — ভাগ্য-ভাগ্য, যাকে বলে ললাট হুজুর! সবই এই ললাটের খেল।

ঃ ললাটের খেল ?

ঃ আজ্ঞে হুজুর। বিলকুল এই ললাটের খেল। কুগ্রহের স্পর্শ একবার সংসারে যার লাগে, তার আর হেঁটে যাবার পথটাও থাকে না। ঐযে ঐ পদ্মরাণীকে দেখলেন সেদিন, আমার মেয়ে পদ্ম। ঐ পদ্মরাণীর অলক্ষী মাতাকে যেই দণ্ডে ঘরে নিয়ে এলাম, সেই দণ্ডেই ঘরে আমার শনি ঢুকে গেল।

ঃ অলক্ষী মাতা ?

ঃ অপয়া, একদম অপয়া! আমার আবার বড় দয়ার শরীর হুজুর। তাই মরতে এই শেষ বয়সে একজন গরীব ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম। ফলে, ঐ অপয়া রমণী এসে গৃহে আমার পা দেয়ার সাথে সাথেই আমার বিশাল সংসার ছারখার হয়ে গেল।

ঃ সে কি!

ঃ খোদ গিরিপতির দিব্বি দিয়ে বলতে পারি হুজুর, যা বলছি তার মধ্যে এক বর্ণ মিথ্যা খুঁজে পাবেন না। দ্বিতীয় পক্ষের অপয়া ঐ স্ত্রী এই পদ্মটাকে

প্রসব করার বছর কয়েক পরই ইহধাম ত্যাগ করলো আর সেই সাথে আমাকে একদম পথে বসিয়ে গেল।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ ধিঙ্গি ঐ পদ্মটাকে প্রাপ্তস্থ করতে গিয়ে আমার যথা সর্বস্ব বিরাণ হয়ে গেছে হুজুর। হাভাতে ঘরের ওর ঐ রাক্ষুসী মা'টা আমার ঘরে আসার ফলেই —

শক্ত এক ধমকে উভয়ে চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকালেন। পেছন ফিরে তাকিয়েই হরিচরণ দেব মহাশয় আর এক দফা আঁতকে উঠলেন। তাঁরা দেখলেন, কুরসীটা হাতে নিয়ে পদ্মরাণী তাঁদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দিয়ে তার আগুন ঝরে পড়ছে। কুরসী হাতে এসে পেছনে দাঁড়িয়েই পদ্মরাণী তার পিতাকে ধমক দিয়ে বললেন–বাবা —

খাটিয়া থেকে লাফিয়ে উঠে হরিচরণ ঢোকচিপে বললো— না মানে অন্য কোন কথাই আমি ছোট হুজুরকে বলিনি। আমি বলছি —

পূর্ববৎ শক্ত কণ্ঠে পদ্মরাণী বললো–থাক, আপনি কি বলছেন, তা আমি শুনতে চাইনে। ছোট হুজুরকে এখানে এই খাটিয়ার উপর বসালেন আপনি কোন আক্কেলে ? এই কুরসীখানা এনে দিতে পারলেন না ?

হরিচরণ হাঁফ ছেড়ে বললেন — হ্যাঁ-হ্যাঁ, দিচ্ছিলাম তো — দিচ্ছিলাম তো। কিন্তু ছোট হুজুর আমাকে কিছুতেই —

ঃ হয়েছে। এখন যানতো দেখি, কাউকে ডেকে গোটা কয়েক ডাব নামিয়ে আনুন তো। অতিথির পাশে বসে এই যে শুধু রাজা-উজির মারছেন, আর কিছু নাহোক, একপাত্র জল দিয়েও এই ভর দুপুরে অতিথি সেবার কথাটা একটুও ভাবছেন না ?

শরীফ রেজা আপত্তি করতে গেলেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর তলিয়ে দিয়ে হরিচরণ দেব বললেন — এ্যাঁ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো–তাইতো। এই যাচ্ছি, এই এখনই যাচ্ছি —

বলতে বলতে তিনি এমনভাবে গৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন, যেন বাঘের থাবা থেকে কোন মতে ফস্‌কে বাঁচলেন। তা লক্ষ্য করে শরীফ রেজা পদ্মারাণীকে সহাস্যে প্রশ্ন করলেন — কি ব্যাপার ? তোমার বাবা তোমাকে এতটা ভয় করেন ?

কুরসীখানা পেতে দিয়ে পদ্মরাণী বললো — করবেন না আবার। ফুটো হাঁড়ির বাহাদুরী কতক্ষণ টিকে ? নিন ছোট হুজুর, ঐ সব দায়িত্বহীন লোকদের কাণ্ড কারবারগুলো এই রকমই হয়। সেজন্যে কসুর নেবেন না দয়া করে। নিন, এখানে এসে বসুন।

মৃদু আপত্তি তুলে শরীফ রেজা বললেন–না না, এইতো বেশ আছি। ওসব কি দরকার ?

ঃ দোহাই ছোট হুজুর! আপনি এই খাটিয়ার উপর বসে আছেন, দিদিমণি তা দেখলে আমাকে জ্যান্ত কবর দেবেন। এতবড় গোস্তাকী করতে পারি আমি?

কুরসীতে এসে বসতে বসতে শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন — তাই নাকি? আচ্ছা, তা না হয় হলো। কিন্তু তোমার বাবা? মানে যেসব কথা বললেন উনি —

ঈষৎ হেসে পদ্মরাণী বললেন — কি কথা হুজুর? ঐ হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো উনি বললেন।

ঃ ওসব কথাতো হরহামেশাই শুনি আমরা ছোট হুজুর। আপনি না হয় একবার তা কষ্ট করে শুনলেন।

মুখটিপে হাসতে লাগলেন পদ্মরাণী। শরীফ রেজা সবিস্ময়ে বললেন — তার মানে! ওসব তাহলে সত্য নয়?

ঃ সত্য হলে কি কেউ যে আসে তাকেই ফলাও করে ওসব কথা শুনায়?

ঃ ভরাহাঁড়ি কি কখনও বেশী আওয়াজ দেয় হুজুর? কিছু বলতে কিছুই যার নেই, সেই না বাপদাদার আজগুবী কেচ্ছা গেয়ে নিজের দাম বাড়াতে চায়।

ঃ সে কি! উনার ঠাকুরদার তাহলে —

ঃ দুই বেলার ভাতটাই তাঁর জোটেনি হুজুর। হাতী ঘোড়া আসবে তার কোত্থেকে?

ঃ উনার বাবা? মানে তোমার ঠাকুরদা? উনি কি করে খেতেন?

ঃ ব্রাহ্মণ ভোজনের নেমতন্ন গ্রহণ করে?

ঃ কি রকম?

ঃ উনি ব্রাহ্মণ ভোজনের নেমতন্ন খুঁজে বেড়াতেন ছোট হুজুর। নেমতন্ন কেউ না দিলে উনি নিজে গিয়ে তা গ্রহণ করতেন। আমার বাবার একটা কথা খুবই সত্যি হুজুর। ব্রাহ্মণ হিসাবে আমার বাপদাদারা সত্যি সত্যিই কুলীন ব্রাহ্মণ।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আমাদের শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো পাপমুক্তির একটা মস্তবড় বিধান কিনা? উনি ঐ খেয়ে বেড়াতেন।

ঃ তাই খেয়ে চলে কারো? যেদিন সে খাওয়া কোথাও না থাকতো?

ঃ সেদিন অনাহারে থাকতেন।

ঃ স্ত্রী পুত্র পরিবার?

ঃ অন্যের দ্বারে ধর্ণা দিতো। পূজোপার্বণের যোগান দিয়ে আর দান-সাহায্য তুলে তাঁরা খেয়ে না খেয়ে কালাতিপাত করতেন।

ঃ তোমার বাবা? মানে এই হরিচরণ দেব মহাশয়?

ঃ ঐ একই পথের পথিক হুজুর। পূর্ব-পুরুষের গৌরব উনিও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

ঃ সে কি! এ বংশের তাহলে সকলেই অলস ছিলেন? খেটে খাননি কেউ?

ঃ খেটে খাবেন কি হুজুর! কুলীন ব্রাহ্মণ এঁরা যে? খেটে খেতে গেলে জাত থাকবে এদের? রৌরব নরকে যেতে হবে না?

ঃ তার মানে?

ঃ অন্যে খাটবে এঁরা খাবেন আর বসে বসে শাস্ত্রের বুলি আউড়িয়ে অন্যের জাত মেরে বেড়াবেন। এইতো এঁদের একমাত্র কাজ।

ঃ এইভাবেই সারাজীবন চলে?

ঃ কেন চলবে না ছোট হুজুর? যাদের শিষ্য মুরিদ বেশী আর কথায় কথায় অন্যের জাত মারার দুর্দান্ত তাকত যারা রাখে, তাদের তো রীতিমতো রাজার হালে চলে যায়।

ঃ তাহলে তোমাদের চলেনি কেন?

ঃ ও দু'টোর একটাও যে আমার বাপ ঠাকুরদার ছিল না। তাদের না ছিল শিষ্য মুরিদ, না ছিল জাতমারা-জাতরাখার চোখা শাস্ত্রজ্ঞান। তাদের চলবে কেন?

ঃ কেন, শাস্ত্রজ্ঞান থাকবে না কেন? তোমরা নাকি কুলীন বামুন?

ঃ শুধু কুলীনই নয়, নৈকষ্য কুলীন।

ঃ তবে?

ঃ তবে লেখাপড়া জানতে হবে তো? সেজন্যে যে অনেকখানি লেখাপড়া জানা চাই।

ঃ তা তাঁরা জানতেন না?

ঃ না।

ঃ তোমার বাবা?

ঃ ঐ একই অবস্থা। লেখাপড়া জানলে কি আর সারা গায়ে এত বেশী ফোঁটাতিলক কাটে কেউ?

ঃ যারা লেখাপড়া জানে, তারা ফোঁটা তিলক কাটে না?

ঃ কাটে। তবে এত বেশী বেশী নয়। বিদ্যার যাদের অভাব তারাই বেশী বেশী কেটে ঐ ঘাটতি পূরণ করতে চায়।

শরীফ রেজা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর তিনি ফের প্রশ্ন করলেন — তাহলে তোমার খবর কি? তোমার বাপ যে বললেন তোমার বিয়েতে নাকি সর্বস্ব তাঁর গেছে?

ঃ মিথ্যা কথা ছোট হুজুর। কিছু থাকলে তো তা যাবে? এক কড়া যৌতুক দেয়ার সামর্থ তাঁর না থাকায়, বিনা পণে এক সত্তর বছরের বৃদ্ধের সাথে আমার বিয়ে দেন আমার বাপ।

ঃ তারপর ?

ঃ তারপর আর কি ? যা হবার তাই হলো। ছয়টা মাসও পেরুলো না, আমি বিধবা হয়ে বাপের গাঁয়ে ফিরে এলাম।

ঃ সেকি! ছয়মাসের মধ্যেই তুমি বাপের বাড়ীতে ফিরে এলে ?

ঃ বাপের বাড়ী কোথায় হুজুর ? ভিটে মাটিটাও তো আমার জন্মের অনেক আগেই তিনি বিক্রি করে খেয়েছিলেন। তিনি থাকতেন অন্যের গৃহে অন্যের এক চালার নীচে।

ঃ তাজ্জব! তাহলে তুমিও এসে সেখানেই উঠলে ?

ঃ কোথায় আর যাবো হুজুর ? আমাদের তো আর দুস্‌রা ঠাঁই নেই!

ঃ তাহলে ? বাপবেটি এই দুইজন লোকের খাবার জুটতো কি করে ?

ঃ অনাহারে থেকে থেকে বাপতো প্রায় মরার অবস্থায় এসেছিলেন। আমি এসে অন্যের বাড়ীতে কাজ করা শুরু করলাম। আমি কাজ করে কোনমতে নিজের আর বাবার এই দুইজনের আহার জোটাতে লাগলাম।

ঃ কাজ করে ?

ঃ দাসীগিরি করে হুজুর। নরকের ভয় না করে আমি এসে খাটতে শুরু করলাম।

ঃ তারপর ?

ঃ এই গাঁয়েরই ঐ পাড়াতে আমরা থাকতাম। বড় হুজুর, মানে ফৌজদার হুজুর এই সময় এই কনকলতা দিদিমণিকে সঙ্গ দিয়ে থাকার জন্যে কুলীন ঘরের মেয়ে মানুষ খোঁজ করতে লাগলেন। আমি আমার বাবাকে নিয়ে দিদিমণির খেদমত করার আরজ পেশ করলে, বড় হুজুর তা মঞ্জুর করলেন। সেই থেকেই বলা যায় এখন আমি রাণীর হালে আছি হুজুর, বাবাও আমার রাজার হালে আছেন। ভগবান আমাদের উপর মুখ তুলেছেন বলেই যেমন দিদিমণির তেমনই বড় হুজুরের — মানে এদিকের সকলেরই অফুরন্ত স্নেহ দরদ আমরা বাপবেটি দুইজনই পেয়ে গেছি।

ঃ তাজ্জব! বড়ি তাজ্জব তোমার কাহিনী পদ্ম।

ঃ তাজ্জব বৈকি হুজুর। আসলেই তো দিদিমণির আমি দাসী। কিন্তু সে কথা কি বলার জো আছে দিদিমণিকে ? একবার তা বলে জব্বোর ধমক খেয়েছি ছোট হুজুর! দিদিমণি আমাকে বানিয়েছেন সখী আর বাবাকে বানিয়েছেন তাঁর অভিভাবক। জেঠা মশায় বলতে বলতে প্রায় বাপের জায়গায় এনে তাঁকে বসিয়েছেন তিনি। ভগবানের তাজ্জব লীলা ছাড়া আমাদের ভাগ্যে এমনটি কখনও জোটে ?

ঃ তাইতো।

ঃ আর এ জন্যেই মাঝে মাঝে খুবই ভয়ও হয় হুজুর। এত সুখ এই পো
কপালে কয়দিন যে সইবে, কে জানে ?

ঃ কেন, না সওয়ার মতো কারণ কি আছে ?

কিছুক্ষণ দমধরে থেকে পদ্মরাণী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো এবং তারপ
সে বললো—আছে হুজুর। সে আলামত কিছুটা দেখতে শুরু করেছি
দিদিমণির জীবনটাই যদি তছনছ হয়ে যায়, তাহলে আর আমরা আশ্রয় পাবে
কোথায় ?

সচকিত হয়ে শরীফ রেজা বললেন — তছনছ হয়ে যায় মানে ?

ঃ হুজুর!

ঃ মানেটা কি সে কথার ?

পদ্মরাণী ইতস্তত করে বললো — সে কথা খোলাসা করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় হুজুর।

ঃ সম্ভব নয়! কেন–কেন ?

ঃ ভয়ে।

ঃ ভয়ে ? কার ভয়ে ?

ঃ আপনার।

ঃ আমার!

ঃ আপনি যদি গোস্বা হোন, সেই ভয়ে। কথাটা যে আপনাকে নিয়েই হুজুর!

ঃ আমাকে নিয়ে! বলো বলো, যে কথাই হোক, আমি কথা দিচ্ছি, তা নিয়ে পারতপক্ষে গোস্বা আমি হবো না।

ঃ হুজুর, আপনাকে আমি যতদিন না দেখেছিলাম, ততদিন তেমন গুরুত্ব দেইনি বিষয়টার উপর। আপনাকে দেখার পর আমি বেশ বুঝতে পারছি, দিদিমণির জিন্দেগীটা তছনছ হয়ে যাবেই যাবে।

হতবুদ্ধি হয়ে শরীফ রেজা বললেন — পদ্ম!

ঃ এই চেহারা আর মন নিয়ে কেন আপনি দিদিমণির সামনে এলেন হুজুর ? এমন জুটি দুনিয়া খুঁজেও পাওয়া যাবে না যেখানে, সেখানে কেন আপনারা দুইজন মুখোমুখী হলেন ?

ঃ পদ্মরাণী!

ঃ আপনার পক্ষে তো হিন্দু হওয়ার প্রশ্নই অবান্তর। দিমিণিও যে ধরনের জেদি বামুন, যে নিষ্ঠার সাথে পূজো-আহ্নিক করেন তিনি, তাতে দিদিমণিও 'যে মুসলমান হতে রাজী হবেন, এমনটি মনে হয় না। ব্যাপারটা এমন হলে, ফায়সালা কি হুজুর ? আপনাকে দেখার পর থেকেই দিদিমণি যে আর কাউকেই বর হিসাবে চিন্তা করতেও পারছেন না।

ঃ কি করে তা বুঝলে ?

ঃ এই যে হুজুর আপনি যখন দেশান্তরে ছিলেন, তখন আমাদের এই হিন্দু পাড়ার মাতবরেরা দিদিমণির শুভাশুভ চিন্তা করে দিদিমণির জন্যে পর পর কয়েকটা বাছাই বাছাই সুপাত্র এনে হাজির করলেন। দিদিমণির আপত্তি না থাকলে, বড় হুজুরেরও আপত্তি নেই বলে বড় হুজুর তাঁর মতামত জানালেন। কিন্তু ফল হলো কি কিছু ?

ঃ হলো না ?

ঃ না।

ঃ কেন, তোমার দিদিমণি বিয়ে করতে রাজী হলেন না ?

ঃ প্রথমে তিনি আমতা আমতা করে নিজের সুদূর ভবিষ্যৎ চিন্তায় কোনমতে একবার আধা রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু এরপরই শুরু হলো উল্টো ঝড়। মানে উঠতেই আপনার কথা, বসতেই আপনার কথা! এর মাঝে কার মুখে যেই একটু শুনলেন, আপনি হয়তো বেঁচে নেই, আর তাঁকে সামলায় কে ? একদম উন্মাদিনী হয়ে গেলেন। পারেন তো এই আমার মতো থান পরে বিধবার বেশ ধারণ করেন আর কি, এই রকম অবস্থা।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে শরীফ রেজা বললেন—পদ্মরাণী!

ঃ এরপর তো দেখছেন এই বিমার। মরতে মরতে বেঁচে এলেন কোনমতে।

ঃ বিয়ে করতে আর রাজী হোননি এরপর ?

ঃ রাজী! ও কথা ভাবতেই কখনও পারেন আর ?

ঃ মানে ?

ঃ মানে তো বললামই হুজুর। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে ভাবতে কখনও পারলে তো। তাঁর দীলটা যে পুরোপুরিই আপনি দখল করে আছেন হুজুর।

ঃ পদ্ম।

ঃ আমি যে মেয়েছেলে হুজুর। আমি সবই বুঝি।

ঃ পদ্মরাণী!

ঃ সেই জন্যেই তো বলছি হুজুর, এ সমস্যার ফায়সালা কি ?

উভয়েই ফের চমকে গেলেন কনকলতার কণ্ঠস্বরে। কনকলতা ইতিমধ্যেই ঘুম থেকে উঠে এদের দিকে আসছিলেন। বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে পা দিতেই পদ্মর কথা শুনে তিনি হাসিমুখে বললেন কিসের ফায়সালারে পদ্ম ? মেহমানকে আড়ালে নিয়ে কিসের ফায়সালা-তালাশ করছো তুমি ?

হতভম্ব পদ্মরাণী থতমত করে বললো — না দিদি, ও কিছু নয়। এমনি একটা কথার কথা।

কনকলতা বললেন — কথার কথা ?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ দিদিমণি। মানে আমার বাবার ঐ হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া —

শব্দ করে হেসে উঠলেন কনকলতা। নিকটে এসে খাটিয়ার উপর থপ্ করে বসে পড়লেন। শরীফ রেজা খোশদীলে বললেন — বাঃ! আপনি দিব্বি উঠে দাঁড়াতে পারছেন দেখছি।

হাসতে হাসতে কনকলতা বললেন — হ্যাঁ। বললাম না পরশু, আসল বিমারটা দূর হয়েছে, শরীরটা আর সেরে উঠতে কতক্ষণ ?

ঃ ভাল-ভাল, খুব ভাল।

ঃ কখন এলেন আপনি ?

ঃ এই তো কিছু আগে।

ঃ কাল যে এলেন না বড় ?

ঃ একটু কাজ ছিল ওদিকে। মানে কিছু জরুরী আলাপ সালাপ।

খাটিয়ার উপর দুই পা তুলে আরাম করে বসে কনকলতা হাসি মুখে বললেন — তাহলে এবার বলুন, কোথায় কোথায় গেলেন, কি কি কাজ করলেন, দেশটাকে আজাদ করতে পারছেন কিনা — তামাম কথা এবার একে একে বলুন। আগাগোড়া সব ঘটনা না বলে আজ আর আপনার ছুটি নেই।

ঃ সব ঘটনা ?

ঃ বিলকুল।

এরপরই কনকলতা পদ্মরাণীকে উদ্দেশ করে বললেন — পদ্ম, গত পরশু এসে উনি অমনি অমনি ফিরে গেছেন। একবিন্দু জলও উনাকে মুখে দিতে দাওনি। আজ একটু ভাল করে নাস্তার আনযাম করোতো দেখি —

পদ্মরাণী খুশী হয়ে বললো-আজ্ঞে দিদি, এই এখনই করছি।

পদ্মরাণী চলে গেল। জোরদার কণ্ঠে আপত্তি তুলে শরীফ রেজা বললেন — আরে না-না, ওসবের কোন দরকার নেই। কেন খামাখা ব্যস্ত হচ্ছেন এ নিয়ে ?

কনকলতা সহাস্য মুখে বললেন — আপনার দরকার না থাকলেও আমাদের দরকার আছে।

ঃ আপনাদের দরকার আছে ?

ঃ জি হাঁ। আমাদের শাস্ত্রমতে অতিথি নারায়ণ। সেই নারায়ণ এসে শুকনো মুখে ফিরে গেলে আমাদের অকল্যাণ হয়।

ঃ কিন্তু —

ঃ ভয় নেই। মুখে নারায়ণ বললেও, আপনাকে নারায়ণের খানা দেবো না। পীর মোর্শেদের জন্যে যা হালাল, তাই আপনাকে দেবো। আপনি শুরু করুন।

শরীফ রেজা ঠাট্টা করে বললেন — শুরু করবো! কি ? খাওয়া ?

উভয়েই হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে কনকলতা বললেন — আরে না-না, খাওয়া পরে। আগে আপনার ঐ ভ্রমণকাহিনী শুরু করুন। কতদূর কি করছেন আপনারা, দেশটার ভরসা কি, তাই আগে শুনি।

আরো কিছু খুচরো কথার পর শরীফ রেজা তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত আগাগোড়া কনকলতাকে বলে বলে শোনালেন। গল্পের মধ্যেই হরিচরণ দেব ডাব হাতে হাজির হলেন। পদ্ম আনলো নাস্তা। কনকলতা এই সর্বপ্রথম নিজের হাতে পরিবেশন করে শরীফ রেজাকে খাওয়ালেন।

তর তর করে দিন কেটে যেতে লাগলো। কনকলতার ভাঙ্গা শরীর পূর্ণিমার চন্দ্রবৎ দিনে দিনে ষোল কলায় পরিপূর্ণ হলো। বিমার থেকে উঠে কনকলতা আরো বেশী স্বাস্থ্যবতী, আরো বেশী সুন্দরী ও আরো বেশী জৌলুশদার হয়ে গেলেন। দিনে দিনে কনকলতা ও শরীফ রেজার মধ্যে চলাফেরা আর মেলামেশা আরো অধিক ঘনিষ্ঠ এবং এই দুইয়ের মধ্যে আন্তরিকতা আরো অধিক গভীর হতে লাগলো। এখন শুধু ঘরেই নয়, এদের এখন এক সঙ্গে বাইরেও হরহামেশাই দেখা যায়। অচেনা মানুষ এভাবে এঁদের দেখে অবাক বিস্ময়ে ফিরে ফিরে এদের দিকে তাকায় এবং এই তুলনাহীন জুটি দেখে তারা সবাই তাজ্জবই শুধু হয় না, জাতিগত ফারাগের কথা দূরে থাক, এঁরা একই রক্তের ভাইবোন বা বিবাহিত জুটি নয়—এমনটি চিন্তা করতেও পারে না।

কনকলতা সুস্থ হয়ে উঠার কিছু পরের কথা। শরীফ রেজাকে হিন্দু পাড়াটা বেড়িয়ে দেখানোর কথা কনকলতার তো ছিলই, এর উপর পদ্মদের পূর্ব আস্তানা দেখার একটা অতিরিক্ত খাহেশ শরীফ রেজার দীলে উসখুস করছিলো। ফলে, কনকলতার সাথে একদিন তিনি হিন্দুপাড়াতে ঢুকলেন। বেলাভর তাঁরা দুইজন এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে গোটা পাড়াটা বেড়িয়ে দেখতে লাগলেন। এই বেরিয়ে দেখার কালে যে বিষয়টি তাঁরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন, তা হলো, নারী পুরুষ প্রত্যেকেরই চোখে মুখে এক ঐকান্তিক জিজ্ঞাসা। শরীফ রেজার চেহারা আর সেপাইয়ের লেবাস দেখে ভয়ে কেউ সরাসরি প্রশ্ন করতে না এলেও, তাদের মুখের দিকে তাকিয়েই শরীফ রেজা ও কনকলতা দেখতে পেলেন এক অদম্য কৌতূহল সেখানে বিদ্যমান। এই জিজ্ঞাসাটা যে কিসের তা উপলব্ধি করতে আদৌ তাঁদের পেরেশান হতে হলো না। চারপাশের গুঞ্জরণ ও কানাকানিতে কান দিয়েই তারা বুঝলেন, যারা শরীফ রেজাকে ইতিপূর্বে দেখেনি তারা জানতে চায় — কনকলতার সাথের এই লোকটার জাত গোত্র কি আর কনকলতার সাথে তার সম্পর্কটাই বা কি ?

নীরিহ গ্রামবাসীর নিদারুণ এই কৌতূহল দুইহাতে ঠেলে ঠেলে শরীফ রেজাকে নিয়ে কনকলতা এসে এক বৃদ্ধার দ্বারে দাঁড়ালেন। এই বৃদ্ধাটিকে কনকলতা দিদিমা বলে ডাকতেন এবং এই বৃদ্ধা ও কনকলতার মধ্যে একটা উষ্ণ আন্তরিকতা বিদ্যমান ছিল। এই বৃদ্ধার গৃহে এসে কনকলতা ডাক দিতেই অত্যন্ত খোশদীলে আর ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধাটি এবং কনকলতার পাশে শরীফ রেজাকে দেখে সবিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। গভীর মনোযোগ দিয়ে শরীফ রেজার মুখমণ্ডল কিছুক্ষণ জরিপ করার পর বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাটি নেচে উঠলেন উল্লাসে এবং সহাস্যে বললেন—ওমা! বরকে একদম সঙ্গে নিয়ে এসেছো ? কি সৌভাগ্য-কি সৌভাগ্য! তা আসার আগে খবরটা একটু দিয়ে আসতে হয়তো! নাত জামাইকে বরণ করে তোলার একটা ব্যবস্থা আমি রাখতাম!

অপ্রতিভ হয়ে কনকলতা বললেন — দিদিমা!

দিদিমা তখন আপনভাবেই বিভোর ছিলেন। বললেন — আহা! দু'টিতে বড়ই মানান মানিয়েছে গো! ঠিক যেন হর-গৌরী!

কনকলতা ফের বললো–দিদিমা, মানে তুমি —

ঃ না-না, আমি কিছু মনে করিনি লো! বিয়েতে আমাকে নেমতন্ন করতে পারোনি তো কি হয়েছে ? আমি কি কিছু বুঝিনে ? নিজেই তুমি কনে, ফের নিজেই তুমি অভিভাবক। বাপ-মা কেউ নেই। ক'দিক সামলাবে তুমি ? নেমতন্ন দিতে ভুল হয়েছে বলে রাগ করবো কেন আমি ?

ঃ আহ্হা! দিদিমা, আমার কথাটা তুমি শোনো আগে —

ঃ শুনবো আবার কি লো ? গাঁয়ের মাতবরেরা তোমার জন্যে ভাল ভাল বর আনছে, একথা তো আগেই আমি শুনেছি। এখন তোমার পছন্দের আমি তারিফ না করে পারছিনে। ঐ ভাল ভাল বরের মধ্যে কার্তিক ঠাকুরের মতো একেবারেই সরেস যেটা, সেটার গলাতেই মালা দিয়েছো দেখছি। খাশা তোমার পছন্দরে নাতনী! এ ব্যাপারে তোমার কাছে স্বয়ং দেব রাণীকেও হার মানতে হবে!

হাসিতে আর খুশীতে সরল হৃদয় বৃদ্ধাটি লুটোপুটি খেতে লাগলেন। এহেন এক অচিন্ত-পূর্ব পরিস্থিতির মুখে কনকলতা কি করবেন বা কি বলবেন, সঙ্গে সঙ্গে দিশে করতে পারলেন না। শরমে ও সংকোচে শরীফ রেজার লাল মুখ আরো অধিক রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। কপালে তাঁর দেখা দিলো বিন্দু বিন্দু ঘাম।

অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলার পর কনকলতা যখন বৃদ্ধাটিকে বোঝালেন যে, শরীফ রেজা তাঁর বর নন, স্বধর্মের লোকও নন, তিনি একজন

মুসলমান, তখন বৃদ্ধার মুখমণ্ডলে বিষাদের যে ছায়া পড়লো তা দেখে শরীফ রেজার মনে হলো, বৃদ্ধার প্রতি এই মাত্র শূলের আদেশ জারী করলেন কনকলতা। অত্যন্ত নির্জীব ও হতাশকণ্ঠে বৃদ্ধাটি বললেন আমার পোড়া কপাল! এত সুন্দর জুটিটা আসলেই কোন জুটি নয়, একথা শোনার আগে ভগবান আমাকে মরণ দিলেন না কেন ?

বৃদ্ধটিকে শান্ত করে কনকলতা ও শরীফ রেজা ফের যখন পথে এসে নামলেন, তখন তাঁরা উভয়েই বিশেষভাবে অনুভব করলেন — আর তাঁরা আগের মতো সহজ হতে পারছেন না। লজ্জায় শরমে, আনন্দে ও আবেগে নিজের মধ্যে নিজেই তারা লুকিয়ে যেতে চাইছেন।

ভ্রমণের উৎসাহ তাদের খর্ব হলো অতপর। ভ্রমণ সংক্ষেপ করে বাড়ীর পথ ধরলেন তাঁরা। ফেরার কালে সারাপথ আঁড় চোখে চেয়ে চেয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সরস টিকা পিপনি কাটলেন এবং আবেগে ও আবেশে মুখমণ্ডল লাল করে নিয়ে অসমান পদক্ষেপে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ঘরে ফিরে এলেন।

১০

কনকলতার সাথে কনকলতাদের স্বজাতিদের এলাকাটা বেড়িয়ে আসার পরের দিনই সাতগাঁ থেকে লোক এলো ফৌজদার সাহেবের মকানে। শায়খ শাহ শফীউদ্দীন সাহেব নিজেই তাঁর এক মুরিদকে পাঠিয়েছেন শরীফ রেজার তালাশে। শায়খ সাহেব খবর নিয়ে জেনেছেন। আজাদী হাসিলেন পক্ষে এ পর্যন্ত কোন অগ্রগতিই হয়নি। ওটি যেমন সুদূর প্রসারী ছিল, তেমনই সুদূর প্রসারীই রয়ে গেছে। এক ধাপও এগোয়নি। গরম কোন পদক্ষেপ নেয়ার লোক শরীফ রেজারা অদ্যাবধিও তালাশ করে পায়নি। ফলে আজাদীর জন্যে করার মতো এখন কোন জরুরী কাজ শরীফ রেজার হাতে নেই। তার দিন এখন অনেকটা শুয়ে বসেই কাটছে।

তাই, বার্তাবাহকের মাধ্যমে শায়খ সাহেব শরীফ রেজাকে তাঁর আস্তানায় ডেকে পাঠিয়েছেন। দিন কয়েক শরীফ রেজাকে তাঁর আস্তানাটা আগ্‌লে রাখতে হবে। শায়খ সাহেব তাঁর নিজের হুজুর সুফী বু-আলী কলন্দর সাহেবের গোর জিয়ারতের নিয়াতে অচিরেই পানিপথ কর্ণালে যাত্রা করবেন। তাঁর হুজুরের মৃত্যু বার্ষিকী আসন্ন। তিনি যাবেন আর আসবেন। শরীফ রেজাকে এই অল্প কয়দিন তাঁর আস্তানার উপর নজর রাখতে হবে।

খোদ শায়খ হুজুরের ইচ্ছা। কোন তরফ থেকেই তাই ওজর—আপত্তির কারণই কিছু ছিল না। বরং ফৌজদার সাহেবের সাথে কনকলতাও শরীফ রেজাকে অবিলম্বে সাতগাঁ যাওয়ার জন্যে তাকিদ দিতে লাগলেন। কনকলতা বললেন, মাত্তর অল্পদিনের ব্যাপার। হুজুরের কাজ শেষ হলেই ফের চলে আসবেন এখানে। এর মধ্যে গড়িমসির কিছু নেই। যান-যান, বিলম্ব হলে হুজুর হয়তো নাখোশ হতে পারেন।

গড়িমসির কোন কিছুই শরীফ রেজার ছিল না। এতদিন পর সাতগাঁ যাওয়ার আচানক এই মওকা আসায় মন প্রাণ তাঁর খুশীতে ভরে গেল। দীর্ঘদিনের আবাসভূমি সাতগাঁয়ের টান তাকে দুর্বার বেগে টানতে লাগলো। খোদ হুজুরই তাঁর সাতগাঁ যাওয়ার দরওয়াজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কয় দিনের জন্যে হলেও সেই হুজুরই আবার সেই দরওয়াজা উন্মুক্ত করে দিলেন। শরীফ রেজার জন্যে এটা একটা আনন্দের ব্যাপার বৈকি ? বেলা বেশী না থাকায় সেদিন তাঁকে ধৈর্য ধারণ করতে হলো। পরের দিন প্রত্যুষেই তিনি বার্তাবাহকের সাথে সাতগাঁয়ে ছুটলেন।

সাতগাঁয়ে পৌছলে শায়খ শাহ শফীউদ্দীন সাহেব তাঁকে যা জানালেন তা হলো, শায়খ সাহেবের সাতগাঁয়ের এই আস্তানা বা মোকামটা শরীফ রেজাকে হরওয়াক্ত পাহারা দিয়ে থাকতে হবে—এমন কথা নয়। হরওয়াক্ত পাহারা দেয়ার কাজ তিনি অন্য একজন অপেক্ষাকৃত নির্ভরশীল ও সামর্থবান মুরিদের উপর দিয়েছেন। তবে সাতগাঁয়ের পরিবেশ বর্তমানে অনেকখানি ঘোলাটে। সাতগাঁয়ের পূর্ববর্তী শাসনকর্তাদের সাথে শায়খ সাহেবের যে উষ্ণ সম্পর্ক ছিল, হাল আমলের শাসনকর্তা ঈজউদ্দীন ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর সম্পর্ক তত উষ্ণ নয়। তেমন কোন জটিলতা দেখা দিলে, শরীফ রেজাকে এই পাহারাদারের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।

এক্ষণে শরীফ রেজার এই সাতগাঁয়ে অবস্থান করার জরুরত আছে কিনা, এটা জানতে চাইলে, শায়খ সাহেব শরীফ রেজাকে জানালেন, আজাদীর স্বার্থে জরুরী কোন কাজ হাতে না থাকলে, শরীফ রেজার কিছুদিন এখানেই থাকা ভাল। মোকামে যেসব লোকলস্কর রয়েছে, তাতে তারা দীলে অনেকটা জোর পাবে। শায়খ সাহেবের হঠাৎ এই অনুপস্থিতির কারণে তারা অধিক হতাশ হবে না। তবে সার্বক্ষণিকভাবে নয়, শায়খ সাহেবের ফিরে আসতে অধিক বিলম্ব হলে, মাঝে মাঝে কিছুদিন সাতগাঁ এসে থাকলেই তাঁর চলবে।

কয়দিন পরেই পানিপথ কর্ণালের পথ ধরলেন দরবেশ শাহ শফীউদ্দীন সাহেব। তাঁর নিজের হুজুরের গোর জিয়ারতে গমন করলেন তিনি। শরীফ রেজা আপাততঃ কিছুদিনের জন্যে সাতগাঁয়েই রয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা অল্পদিনেরই ছিল। কিন্তু শায়খ সাহেব সেই যে গেলেন, আর অল্পদিনের মধ্যে ফিরে আসতে পারলেন না। সুফী বু-আলী কলন্দর সাহেবের অন্যান্য শিষ্য মুরিদের সাথে হুজুরের মাজারে নানা কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। অবশেষে শায়খ শাহ শফীউদ্দীন শরীফ রেজাকে খবর পাঠালেন — ফিরতে তাঁর আরো অনেক দেরী হবে। জরুরী কাজ দেখা দেয়া মাত্রই শরীফ রেজা যেন আজাদীর সেই জরুরী কাজেই চলে যায়। আজাদীর কাজ ঢের ঢের গুরুত্বপূর্ণ। মোকামের লোকের সাহস যোগানোর জন্যে সে যেন সাতগাঁয়েই পড়ে না থাকে। হাতের কাছে কোন কাউকেই না পেলে, তাঁর আস্তানার লোকেরা নিজেদের হেফাজতি আস্তে আস্তে নিজেরাই নিশ্চিত করতে শিখবে। কারণ, গরজ বড় বালাই।

অতপর শরীফ রেজা একবার সাতগাঁ একবার ভুলুয়া — এমনই করে অনেকদিন কাটালেন। কিন্তু শায়খ সাহেব ফিরলেন না। শেষ অবধি শরীফ রেজা খবর পেলেন, শায়খ সাহেব সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ। তাঁর আর উত্থানশক্তি নেই। অপরপক্ষে, ওখানে তাঁর যথাযথ খেদমতের লোকও কেউ নেই।

খবর পেয়েই শরীফ রেজা পানিপথ কর্ণালের দিকে ছুটলেন। কর্ণালের পথে যাত্রা করার আগে ফৌজদার সাহেবকে তিনি এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করলেন যে, শায়খ সাহেব সুস্থ হয়ে না উঠা তক্ তিনি পানিপথ থেকে ফিরবেন না। আল্লাহ তায়ালার রহমে শায়খ সাহেব সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে, তাঁকে নিয়েই তিনি বাঙ্গালা মুলুকে ফিরে আসবেন। এই সময়টা ফৌজদার সাহেব যেন মোটামুটি সবদিক কোন মতে সামাল দেন।

কিন্তু শায়খ সাহেবের বিমারটা ছিল অত্যন্ত জটিল। একে তিনি বৃদ্ধ মানুষ, তার উপর এই জটিল বিমার। ফলে, শায়খ সাহেবকে উঠে দাঁড়াতে অনেক বেশী সময় লাগলো। শায়খ সাহেব পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলে, তাঁকে সাতগাঁয়ে এনে রেখে শরীফ রেজা যখন ভুলুয়ায় ফিরে এলেন, তখন অনেক সময় কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময় শরীফ রেজা ভুলুয়া থেকে সাতগাঁ, সাতগাঁ থেকে পানি পথ কর্ণাল—এই করেই বেড়ালেন, সোনার গাঁ আর লাখ্‌নৌতির রাজনৈতিক তেমন কোন খবর রাখতেই পারলেন না। ফৌজদার সাহেবের কাছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা যেসব খবর পেলেন, তার মাধ্যমেই তিনি দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মেটালেন। অন্যদিকে, শরীফ রেজার এই দীর্ঘ সময় অনপস্থিতির দরুন কনকলতাও মানসিকভাবে সুপ্রসন্ন ছিলেন না। এদিকটাও সামাল দিতে শরীফ রেজাকে অনেক কশ্‌রত করতে হলো।

এরপরও সময়ই শুধু কাটতে লাগলো, কাজ কিছু এগুলো না। শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের সাথে অতপর আরো কয়েকটা বৈঠক দিলেন তাঁরা।

কিন্তু ফলাফল ঐ শূন্য। শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের ঐ এক কথা, বাহরাম খানের বর্তমানে সোনার গাঁয়ের বিরুদ্ধে ফৌজ হাঁকানোর কোন ইরাদা শাহ সাহেবের নেই। হতাশদীলে ফিরে এসে শরীফ রেজাকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন ফৌজদার সাহেব। তাদের ঐ পূর্ব সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ লাখ্‌নৌতির দিকে নজর দেয়ার তাকিদ পুনরায় তাঁরা বিশেষভাবে অনুভব করতে লাগলেন।

অবস্থা যখন এমন, ঠিক সেই সময়ই ফৌজদার সাহেবের মকানে এসে হাজির হলো লাল মোহাম্মদ লাড্ডু মিয়া। ইতিপূর্বে আরো একবার এই ভুলুয়াতে লাড্ডু মিয়া এসেছিল। কিন্তু শরীফ রেজা তখন সাতগাঁয়ে ছিলেন। অনেকদিন পর এবার লাড্ডু মিয়ার সাক্ষাৎ পেয়ে শরীফ রেজা অত্যন্ত খুশী হলেন। লাড্ডু মিয়াও দীর্ঘকাল অন্তর এই মোলাকাতে অতিশয় পুলকিত হয়ে উঠলেন। সাক্ষাতের পয়লা মুহূর্ত আনন্দ উল্লাস প্রকাশে আর কুশলাদি আদান প্রদানেই কেটে গেল।

এরপর আসল কথার বৈঠকে তাঁরা বসলেন। লাড্ডু মিয়া জানালেন, সোনার গাঁয়ের প্রশাসনিক অবস্থার আরো অনেক অবনতি ঘটেছে। বাহরাম খানের উপর জনগণের আস্থা প্রায় উঠে গেছে। অতপর লাড্ডু মিয়া সোনার গাঁয়ের খুটিনাটি তামাম খবর সবিস্তারে বর্ণনা করে গেল। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় অন্যান্য সবাই এসে এই বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। লাড্ডু মিয়ার বিবরণ গভীর মনোযোগে সকলেই শুনলেন। লাড্ডু মিয়ার বিবরণ থেকে সোনার গাঁয়ের যে চিত্র ফুটে উঠলো তাতে উপস্থিত সকলেই পরিষ্কারভাবে বুঝলেন, চরম মুহূর্ত না হলেও আজাদীর জন্যে চেষ্টা নেয়ার মোটামুটি বেশ একটা উত্তম সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের নিদারুণ উদাসিনতার কারণে তাঁরা কিছুই করতে পারছেন না। পঙ্গুর মতো বসে বসে কেবলই মাথা কুটতে হচ্ছে তাঁদের।

এ নিয়ে আফসোস্ করলেন সবাই। অনেকে অনেক রকম মন্তব্যও করলেন। সবশেষে লাল মোহাম্মদ লাড্ডু মিয়া এ প্রেক্ষিতে যে অভিমত প্রকাশ করলো, তাতে ফৌজদার সাহেব ও শরীফ রেজার বর্তমানের চিন্তা-ভাবনার গতিটা আরো অধিক তীব্র হয়ে উঠলো। লাল মোহাম্মদ বললো — হুজুর, যেখান থেকেই হোক, বাঙ্গালা মুলুকের আজাদীটা শুরু হওয়ার দরকার, এটা ঠিক। তবে সত্যি কথা বলতে কি, গৌড় মানে ঐ লাখ্‌নৌতিটাকে একেবারেই ছেড়ে দিয়ে রেখে, লাখ্‌নৌতিরাজ্যের এক অংশের আজাদী নিয়ে আমাদের সকলের এই হুটপিটটা আমাদের লক্ষ্য হাসিলের পথে খুব একটা কার্যকর কোন পদক্ষেপ নয়। কারণ, ঐ গৌড়টাকে কব্‌জা করতে না পারলে, স্রেফ সোনার গাঁ থেকে গোটা বাঙ্গালা আজাদ করা বড়ই কষ্টকর কাজ হবে।

লাড্ডু মিয়ার কথায় ফৌজদার সাহেব তার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন —অর্থাৎ ?

লাড্ডু মিয়া বললো — দেখতেই তো পেলেন হুজুর, গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের বেলায় কেমন হৈ হৈ করে সাতগাঁ আর গৌড় থেকে তেড়ে এলো সবাই ? আসলে গৌড়ই তো এ রাজ্যের রাজধানী। আদি কালেও ছিল, মুসলিম বিজয়ের পর এই কিছুদিন পূর্বতকও ঐ গৌড়ই ছিল তামাম কর্মকাণ্ডের আদ্দিপীঠ। সাতগাঁ-ই বলুন আর সোনার গাঁ-ই বলুন, প্রশাসনের এই সমস্ত নয়া কেন্দ্রগুলো এখনও অনেকখানি অরক্ষিত স্থান। সোনার গাঁয়ের বদলে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেব যদি ঐ গৌড়ে বসে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারতেন। যেমন একবার কিছুটা আনযাম করেছিলেন, তাহলে একমাত্র দিল্লীর বাহিনী ছাড়া এসব ক্ষুদে প্রদেশের ফৌজ গিয়ে ঐ সুরক্ষিত রাজধানীতে প্রবেশ করতেই পারতো না। বেঈমানীর মাত্রাটা খুব বেশী না হলে, দিল্লীর ফৌজই যে বারবার সফলকাম হতে পারতো, তাইবা নিশ্চিতভাবে বলতে পারে কে ?

লাড্ডু মিয়ার কথা শুনে ফৌজদার সাহেব দ্বিধার সাথে প্রশ্ন করলেন — তাহলে তোমার আসল কথাটা কি ? শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবকে নিয়ে সোনার গাঁ আজাদ করার আমাদের এই চিন্তা-ভাবনা ভুল ?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে লাল মোহাম্মদ ধীর কণ্ঠে বললেন — না হুজুর, ভুল আমি বলবো না। কথায় বলে—নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল। তাছাড়া, আমি যা বলছি, তা কোন কায়েমী কথাও নয়। এটা আমার স্রেফ একটা ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা।

ফৌজদার সাহেব বললেন — উহুঁ, পরিষ্কার হলো না। আর একটু খোলাসা করে বলো।

ঃ হুজুর, প্রথম থেকেই আপনাদের সাথে আমিও তো জড়িয়ে আছি। দেখছি তো সব। আর দেখে দেখেই এসব কথা দীলে আসছে আমার। দ্বীন-ইসলামের স্বার্থেই যখন এই বাঙ্গালা মুলুককে আজাদ করার চিন্তা-ভাবনা আমাদের, স্রেফ একটা সুলতান বা বাদশাহ হওয়ার নিয়াত কারো আমাদের নেই, তখন আজাদীটা যেখান থেকেই শুরু হোক, কালক্রমে এই গোটা বাঙ্গালাকে আজাদ করতে পাড়লে তবেই আমাদের আসল উম্মিদ হাসিল হবে, তার আগে নয়। খণ্ড আজাদী টিকিয়ে রাখাও কঠিন, তেমনই আবার তা দিয়ে কয়েকদিনের বাদশাহগিরি চললেও আমাদের মূল লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। গৌড় দখল করতেই হবে আমাদের আজ হোক আর কাল হোক।

ঃ আচ্ছা।

ঃ তাই আমি বলছিলাম হুজুর, জনাব শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবকে নিয়ে আমাদের এদিকের কাজ যেমন চলছে চলুক। সেই সাথে ঐ রাজধানী শহরে একটা নয়া ঘাঁটি স্থাপন করার কোশেশ আমাদের করা উচিত। শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবকে তো বরাবরই দেখে আসছি হুজুর। জ্ঞান বুদ্ধির তুলনায় উনি যদি জানবাজ হতেন সমান সমান, তাহলে হয়তো এত কথা ভাবতেই হতো না আমাদের।

অতিশয় বিস্মিতকণ্ঠে ফৌজদার সাহেব আওয়াজ দিলেন — লাল মোহাম্মদ মিয়া!

লাল মোহাম্মদ পুনরায় বিনীত কণ্ঠে বললো — অবশ্যি এগুলো সবই আমার ছোট মুখে বড় কথা বলা হুজুর! এর জন্যে কসুর কিছু কেউ আপনারা নেবেন না।

লাল মোহাম্মদ লাড্ডু মিয়ার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন সকলেই। ফৌজদার সাহেব, শরীফ রেজা সহকারে বৈঠকে উপস্থিত সকলেই লাড্ডু মিয়ার রাজনৈতিক এই বুৎপত্তি দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন। সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন — আচ্ছা লাড্ডু মিয়া, আজ আপনি এসব কথা বলছেন, কিন্তু এর আগে তো সেবার অনেক কথাই হলো এ নিয়ে। কৈ ? তখন তো এ রকম কোন ইঙ্গিতও আপনি দেন নি ?

লাড্ডু মিয়া বললো — বুঝে উঠতে পারিনি হুজুর। পরাজয়ের ধকলটা সামাল দিয়ে উঠতেই তখন ব্যস্ত ছিলাম। এতটা তখন বুঝে উঠতে পারিনি। আর তা ছাড়া —

ঃ তা ছাড়া ?

ঃ এই তো সেদিন কথাটা একদম পরিষ্কার করে দিয়ে গেলেন লাখ্নৌতির শাসনকর্তা কদর খানের এক সেনাপতি।

ঃ কদর খানের সেনাপতি ? কি বললেন তিনি ?

ঃ বললেন, রাজধানীতে দাঁত বসাতে না পেরে গৌড় থেকে সোনার গাঁ এসে স্বাধীনতার খোয়াব দেখেছে ঐ ব্যাটা গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর। সোনার গাঁ, সাতগাঁ — এরপর যেখানেই আর যে ব্যাটা এখন সে খোয়াব দেখুক —, আমরা — অর্থাৎ হুজুরে পাক দিল্লী শাহর নেমকহালাল খাদেমেরা এই রাজধানী শহর লাখ্নৌতিতে থাকতে সে খোয়াব আর কোন ব্যাটার টিকছে না। আবার কেউ সে আনযাম করে দেখুক, আরো কত জলদি জলদি আর করুণভাবে সে খোয়াব তাদের ছুটে যায়। সে জন্যে তৈয়ার হয়ে আছি আমরা।

ফৌজদার সোলায়মান খানের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন — এই কথাই বললেন ঐ সেনাপতি ?

ঃ জি হুজুর।

শরীফ রেজা বললেন — বটে! কে সে সেনাপতি ? দিল্লীর এতবড় নেমকহালাল সে লোকটা কে ? সেনাপতিদের মধ্যে এতবড় স্পর্দ্ধাওয়ালা কাউকেই তো আমি কখনও লাখ্নৌতিতে দেখিনি ?

লাড্ডু মিয়া বললো — তার নাম আলী মুবারক হুজুর। তিনি একজন বহিরাগত। অল্পদিন আগে তিনি ঐ লাখ্নৌতির ফৌজে এসে ঢুকেছেন আর এই অল্পদিনের মধ্যেই উঠতে উঠতে একদম সালারপদে উঠে গেছেন।

ঃ হুঁউ।

সকলেই নীরব হলেন। লাড্ডু মিয়া ফের বললে — সেই জন্যেই তো বলছি হুজুর, রাজধানীটাকে একেবারেই উপেক্ষা করা ঠিক নয়। আজাদীর শুরু ঐ সোনার গাঁয়ে হলেও গৌড়টাকে কব্জা করার চিন্তা-ভাবনা আমাদের এখন থেকেই রাখা উচিত। কারণ, গৌড় মানে ঐ লাখ্নৌতি তো দখল করতেই হবে আমাদের।

ফৌজদার সাহেবের চিন্তার সাথে মিলে গেল। তাই অধিকতর গুরুত্বের সাথে লাল মোহাম্মদ লাড্ডু মিয়ার মতামতটা গ্রহণ করলেন ফৌজদার সাহেব। অতপর এই প্রসঙ্গে শরীফ রেজার সাথে তিনি এককভাবে বসলেন। এই বৈঠকে ভুলুয়ার দিকটা দেখার দায়িত্ব নিজের উপর রেখে, তিনি লাখ্নৌতির দিক দেখার দায়িত্ব শরীফ রেজাকে দিলেন এবং এই মর্মে শরীফ রেজাকে অচিরেই লাখ্নৌতি যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। শরীফ রেজার ঠিকানা এখন ফৌজদার সাহেবের আবাস স্থল হলেও, তিনি তাকে অস্থায়ীভাবে নিজ মকানে বসে এবার ঐ উত্তর—পশ্চিম অঞ্চলে তাদের দাঁড়াবার মতো কিঞ্চিৎ মাটি তৈয়ার করতে বললেন।

লাল মোহাম্মদ লাড্ডু মিয়া সোনার গাঁয়ে ফিরে গেলেন। ফৌজদার সাহেবই আবার তাকে জলদি জলদি পাঠালেন। নিজের কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে পূর্ববৎ সোনার গাঁয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করার কাজে তিনি তাকে বহাল থাকতে বললেন।

শরীফ রেজাও রওনা হলেন লাখনৌতি। রওনা হওয়ার আগে শরীফ রেজার দীলে একটা মস্তবড় ভয় ছিল কনকলতাকে নিয়ে। তিনি ভেবেছিলেন আবার তাঁর বাইরে যাবার খবর শুনে না জানি কি কাণ্ডই করে বসে কনকলতা। কিন্তু কনকলতা তার ব্যবহারে শরীফ রেজাকে তাজ্জব বানিয়ে দিলেন। তামাম ঘটনা শুনে কনকলতা হাসি মুখে বললেন — না-না, আমি এতে নাখোশ হবো কেন ? এ কাজ তো আপনারই। আপনারই নিজ এলাকা — নিজের স্থান। অনেকেই

আপনার চেনাজানা মানুষ। আপনি যতটা সুবিধে করতে পারবেন ওখানে, অন্য কেউ তা পারবে না। একশোবার যাবেন আপনি লাখ্নৌতি।

অভিভূত শরীফ রেজা খোশদীলে বললেন — বলেন কি ?

কনকলতা বললেন — যে কাজটা আপনি ছাড়া অন্যের দ্বারাও যথাযথভাবে হতে পারে, সে কাজেও আপনি গিয়ে সময়-শক্তি ক্ষয় করবেন আর নিরাপত্তার কথা না ভেবে পথেঘাটে পড়ে থাকবেন, এখানে আমার আপত্তি। আপনি তো এক সাধারণ জন নন। যে যত বড় বাহাদুর, তার তত বেশী দুশমন, আর পদে পদে তার তত বেশী বিপত্তি।

ঃ আচ্ছা।

ঃ একশো একটা অন্য লোক বাজে খরচ হয়ে গেলেও বাঙ্গালা মুলুকের আজাদী হাসিল বিশেষ ব্যাহত হবে না। কিন্তু আপনি, বড়বাপ, লাড্ডু মিয়া — এই রকম পাঁচটা লোক আলতু ফালতুভাবে খরচ হয়ে যাওয়া মানে বাঙ্গালা মুলুকের আজাদীটা অনেক দূরে পিছিয়ে যাওয়া, এমন কি নাগালের বাইরে চলে যাওয়া। একথাটা খেয়াল রেখে আপনারা সবাই চলুন, এটুকুই আমার কথা।

বুকভরে শ্বাস টেনে শরীফ রেজা বললেন — শাব্বাশ্! বহুত উম্দা আপনার উপলব্ধি। সত্যি সত্যিই তারিফ পাওয়ার যোগ্য।

বাহবাতে কান না দিয়ে কনকলতা বলেই চললেন — যে লড়াইটা অন্যেরাই জিততে পারবে, সে লড়াইটা অন্যের উপরই ছেড়ে দিন। যেটা আপনি বা আপনারা ছাড়া অন্য কেউ পারছে না, সেখানে তো যেতেই হবে আপনাদের। সেখানেও না গিয়ে আপনারা বোরকা পড়ে বসে থাকুন — এমন কথা আমি বলবো — এটা ভাবলেন কি করে ?

এই রকম আরো কিছু ভাল ভাল কথাই কনকলতা হেসে হেসে বলে গেলেন। কিন্তু রওনা হওয়ার উদ্দেশ্যে শরীফ রেজা যখন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলেন, তখন আর তাঁর মুখে কোন হাসির চিহ্ন রইলো না। তামাম হাসিই এক পলকে দপ্ করে নিভে গেল। ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে শরীফ রেজা শেষের বার পেছন ফিরে দেখলেন, কনকলতার মুখমণ্ডলে একরত্তি রক্ত নেই, তাঁর দুই চোখে ঢেউ খেলছে থৈ থৈ পানি।

দিল্লী প্রাসাদের একাংশ একদিন হঠাৎ করেই অত্যন্ত উষ্ণ হয়ে উঠলো। উষ্ণ করলেন শাহজাদা ফিরোজ-বিন-রজব। ফিরোজ-বিন-রজব ছিলেন দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ-বিন-তুঘলকের মেঝো চাচা রজব তুঘলকের ছেলে। মুহম্মদ—বিন-তুঘলকের ইন্তেকালের পর এই ফিরোজ-বিন-রজবই সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক নামে দিল্লীর তখ্তে বসেন।

সুলতান মাহম্মদ-বিন-তুঘলক ছিলেন এক অনন্য পুরুষ। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত ও উচ্চমার্গের দার্শনিক। কালের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী হওয়ায় এবং তাঁর সঙ্গী সাথী ও প্রজাকুল ঐ ক্ষুরধার চিন্তা-ভাবনার খেই ধরতে না পারায়, তাঁর পরিকল্পনা তামামই ব্যর্থ হয়ে যায় বটে, তবে শ্রমে-কর্মে মেধায়-মগজে তিনি ছিলেন এ বিশ্বের এক অবিস্মরণীয় সুলতান। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবেও তিনি ছিলেন ভাস্বর। তাঁর চরিত্র ছিল নিষ্কলুষ, ঈমান ছিল মজবুত। পিতার সম্বর্ধনা তোরণ ভেঙ্গে পড়ার দুর্ঘটনা নিয়ে উদ্দেশ্য প্রবণ ব্যক্তিরা যে যা-ই বলুন, তাঁর পিতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের মউত ছিল ঐ মহান গায়েবী শক্তিরই একটা খেল, জুনা খান ওরফে মাহম্মদ-বিন-তুঘলকের কোন হাত সেখানে ছিল না বা এতটা কমতি ঈমানের লোকও তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাফ দীলের মানুষ।

ফিরোজ-বিন-রজব অর্থাৎ পরবর্তীকালের ফিরোজ শাহ তুঘলকও একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও ধর্মভীরু লোক ছিলেন। ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল অনেক। তবু, যৌবনের জুনা খান আর যৌবনের ফিরোজ-বিন-রজব — এই দুইয়ের মধ্যে ফারাগ ছিল মস্তবড়।

বছপন কাল থেকেই জুনা খান ছিলেন সুদৃঢ় ঈমানের সাচ্চা এক মুসলমান। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথেই অর্থাৎ কৈশোর কাল থেকেই তিনি ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ লাড়াইয়া। লড়াইয়ার দক্ষতা ফিরোজ-বিন-রজবের কোন দিনই ছিল না। তদুপরি, ফিরোজ-বিন-রজবের যৌবনের প্রথম দিকের দিনগুলিও ছিল অনেকটা ঢিলেঢালা। যৌবনের প্রথম ভাগে তিনি ছিলেন অনেকখানি আরাম প্রিয়, ফূর্তিবাজ ও কিয়দংশে উচ্ছৃঙ্খল। চরিত্রের দৃঢ়তা ও ইসলামের আদর্শ তাঁর মধ্যে এই সময় অস্পষ্ট ছিল। এর একটা বড় কারণ তাঁর বাল্যকালের পরিবেশ। ফিরোজ-বিন-রজবের মাতা ছিলেন একজন অমুসলমান রমণী। দিপালপুরের জনৈক রাণা মালভট্টির কন্যা নয়লা দেবীকে ফিরোজের পিতা রজব তুঘলক শাদী করেন। শাদী কালে নয়লা দেবীর নাম হয় কাদবানু বা কদভান বিবি। এই কাদবানুর গর্ভেই ফিরোজ-বিন-রজবের জন্ম। শিশুকালেই ফিরোজ-বিন-রজবের পিতৃ বিয়োগ ঘটে। ফলে, বছপন কালে মায়ের প্রভাবই তাঁর চরিত্রে অধিকহারে পড়ে বলেই ইসলামের আদর্শ থেকে তিনি অনেকখানি সরে যান এবং সরাব, আউরাত ও আমোদ ফূর্তির দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। শাহজাদার নেক নজর হাসিল করে আখের গুছানোর ধান্দায় এই সময় একাধিক বাঈজী, নর্তকী, সখী ও সজনী শাহজাদার চারপাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে। শাহজাদাও এই সময় পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী নারী ঘেঁষা হয়ে উঠেন এবং সফর-শিকারে যাবার কালেও সখী সজনী সঙ্গে নিয়ে যেতে থাকেন। পিতৃহারা শাহজাদার প্রতি

আন্তরিক দুর্বলতা হেতু সুলতান মুহাম্মদ-বিন-তুঘলক এসব দিকে তেমন একটা নজর দিতে যাননি। এমনই এক সজনী অম্বুরীকে নিয়েই ঘটে গেল ঘটনাটা।

অম্বুরী ছিল শাহজাদার সবচেয়ে বিশ্বাসী ও প্রিয় সখী। কিন্তু অম্বুরী তা ছিল না। ফায়দা লুটার উদ্দেশ্যেই অম্বুরী এই মুহব্বতী খেল খেলতে থাকে। অনেক আগে থেকেই অম্বুরী বালার সংযোগ ছিল তার মহল্লারই কয়েকজন প্রতাপশালী লম্পটের সাথে। এদের ঘাড়ে সওয়ার হয়েই রূপের পসরা নিয়ে সে আমীর-উমরাহ্দের দোর পর্যন্ত পৌছে। সেখান থেকে শেষ অবধি এই শাহজাদার সুনজরে পড়ে যায় অম্বুরী।

ঘটনাটা আচমকাই ঘটে গেল। শাহজাদা ফিরোজ-বিন-রজবের এক বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন সমর বিদ্যায় পারদর্শী এক নওজোয়ান। নাম তার আলী মুবারক। প্রাসাদেরই এক অংশে সপরিবারে বাস করতেন আলী মুবারক। স্ত্রী ছাড়া আর যে দুই জন লোক প্রথম দিকে তাঁর সংসারে ছিলেন, তাঁদের একজন তাঁর দুধমাতা ও অন্যজন তাঁর দুধভাই ইলিয়াস। সবাই এরা পূব ইরানের লোক। হিন্দুস্থানে এসে এঁরা একই এলাকায় বসবাস করতে থাকেন। ঘটনাচক্রে মাতৃহীন শিশু আলী মুবারককে বুকের দুধ দান করে ইলিয়াসের মাতা তাঁকে পুত্রবৎ পালন করেন এবং সেই সুবাদে সবাই এঁরা এক পরিবারে জড়িয়ে যান। আলী মুবারকের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন ইলিয়াস এবং সমর বিদ্যায় আলীর মুবারকের চেয়েও ঢের ঢের অধিক দক্ষ ছিলেন তিনি। এর চেয়েও ইলিয়াসের বড় পরিচয়, তিনি ছিলেন একজন পাক্কা ঈমানের মুসলমান। ইসলামের অনুশাসনের প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল অগাধ। সেই কারণে একান্ত কাঁচা বয়সেই তিনি হজ্জব্রত পালন করেন এবং হাজী ইলিয়াস নামে তিনি তাঁর পরিমণ্ডলে সুপরিচিত হন।

হাজী ইলিয়াস প্রথম জীবনে শাহী ফৌজে নকরী করেন। হজ্জব্রত পালন করার পর থেকেই তিনি ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং শাহী নকরী ছেড়ে দিয়ে শাহজাদা ফিরোজ-বিন-রজবের ফৌজে হালকা এক কাজ গ্রহণ করে দুধভাই আলী মুবারকের মকানের পাশেই সপরিবারে বসবাস করতে থাকেন। আলী মুবারক অবশ্য তাঁর দুধমাতাকে বরাবরই নিজের কাছে টানতেন আর এতে করে নিজপুত্রের চেয়ে পালিত পুত্রের মকানেই এই দুধমাতা বা ধাত্রী অধিক সময় থাকতেন।

এই সময়ই ঘটনাটা ঘটে। পর পর দুইদিন অম্বুরী বালা শাহী মহলে আসেনি। এ কারণে শাহজাদা চঞ্চল হয়ে উঠেন। সৌখিন ভ্রমণে গমন করার তামাম আয়োজন তিনি সম্পন্ন করে নিয়েছেন। হাতীঘোড়া, পাল্কী-টাংগা, লোক-লস্কর সব প্রস্তুত। অন্যান্য সখী সজনী হাজির। গভীর রাতে হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন, সবাই আছে, অম্বুরী বালা নেই। খোঁজ নিয়ে জানলেন, দুই দিন

ধরে নেই। দুই দিন ধরে অম্বুরী বালা শাহী মহলে গরহাজির। চিন্তায় পড়লেন শাহজাদা। ঘটনা কি ? বিমার ব্যাধি হলো নাতো অম্বুরীর ? হাতের কাছে লোক না পেয়ে হাজী ইলিয়াসকেই শাহজাদা নির্দেশ দিয়ে বসলেন। ফজরের নামাজ অন্তেই অম্বরীকে শাহীমহলে হাজির করার ব্যবস্থা করতে বললেন তাঁকে। বিমার-ব্যাধি হয়ে থাকলে, সে খবরও হাজী সাহেবকে পৌঁছে দিতে বললেন। অম্বুরী বালা অসুস্থ থাকলে তামাম আনযাম বাতিল করতেও পারেন তিনি — এমন ভাবও প্রকাশ করলেন। অম্বুরীহীন সৌখিন ভ্রমণ নিতান্তই প্রাণহীন বলে শাহজাদা অনুভব করতে লাগলেন।

হাজী ইলিয়াসের ইরাদা ছিল, তাঁর কোন লোক মারফতই এই কাজটি তিনি করবেন। কিন্তু ফজরের নামাজ আদায়ের পর তালাশ করেও তেমন কোন বিশ্বস্ত লোক হাতের কাছে পেলেন না। কাজটি খুবই জরুরী। শাহজাদার মানসিকতা আঁচ করে হাজী ইলিয়াস নিজেই বেরিয়ে এলেন শাহী প্রাসাদের বাইরে এবং অম্বুরী বালার মহল্লার দিকে যাত্রা করলেন।

ফজর ওয়াক্তের ঘটনা। নিশি অবসান হলেও আঁধার তখনও আঁকড়ে আছে ধরণীকে। সদ্যোত্থিত প্রিয়ার মতো প্রিয়র বাঁধন খুলতে যেন বেদন লাগছে বড়ই। আড়ালে আবডালে থোকা থোকা অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে তখনও। এমনই ওয়াক্তে অম্বুরী বালার দেউটিতে এসে হাজির হলেন হাজী সাহেব। অজ্ঞাত কোন কারণে দেউটি তার অর্ধোন্মুক্ত ছিল। তা দেখে আওয়াজ দিয়েই অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন তিনি। তবুও কারো সাড়া শব্দ না পেয়ে হাজী ইলিয়াস প্রধান কক্ষের বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। বারান্দায় উঠে ডাকাডাকি শুরু করতে যেতেই খোলা জানালা দিয়ে অকস্মাৎ যে দৃশ্য চোখে পড়লো তাঁর, তাতে তাঁর কর্ণমূল গরম হয়ে উঠলো। চোখ তাঁর মুজে এলো শরমে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তওবা-তওবা করতে করতে নেমে এলেন বারান্দা থেকে।

তিনি দেখলেন, প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় একজন প্রায় উলঙ্গ পুরুষকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে অম্বুরী। তার কেশ বেশ বিছানা বালিশ তামাই বিধ্বস্ত।

চমকে উঠে হাজী সাহেব তওবা-তওবা আওয়াজ দিতেই সুখ-নিদ্রা টুটে গেল অম্বুরীর ও তার নাগরের। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দুয়ার খুলে বেরিয়ে এলো তারা। বারান্দার নীচে হাজী সাহেবকে দেখেই নাগরটি পরণের কাপড় কোন মতে তার দেহের সাথে জড়িয়ে নিয়ে ঊর্ধশ্বাসে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে গেল। হতবুদ্ধি অম্বুরী বালা থপ করে বসে পড়লো বারান্দায়। এত সকালে হাজী ইলিয়াস তার বাড়ীর ভেতরে হাজির হয়ে তার তামাম কীর্তি দেখে ফেলবে—এটা সে কল্পনা করতেও পারছে না। হাজী সাহেব তার অন্দর মহলে

প্রবেশ করলেন কি করে, এটা চিন্তা করতে গিয়েই তার খেয়াল হলো, অনেক রাতে নাগরটিকে আসার সুযোগ করে দিতে গিয়ে দেউটিটা নিজেই সে খুলে রেখে এসেছিল। নাগরটি তার গৃহে ঢুকে প্রেমের জোশে দরওয়াজাটি বন্ধ করতে ভুল করেছে নিশ্চয়ই।

অম্বুরী বালা বুঝে দেখলো, এই খবর শাহজাদার কর্ণগোচর হওয়া মাত্র নির্ঘাত তাকে পুঁতে ফেলবেন শাহজাদা। চাতুরীর অভাব ছিল না অম্বুরীর। ঐ অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় সে প্রেম সম্ভাষণ করতে করতে হাজী সাহেবকে আঁকড়ে ধরতে ছুটে এলো। তার ধারণা, হাজী সাহেবকেও প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলতে পারলে, এ তথ্য আর ফাঁশ হবে না কোনদিন।

কিন্তু তার এ চাতুরী টিকলো না। হাজী সাহেবের হুঁশবুদ্ধি ইতিমধ্যে বিলুপ্তির পথে এসেছিল। লজ্জায় ঘৃণায় সর্বাঙ্গ তাঁর রি-রি করছিলো। কেমন করে এই মকান থেকে বেরিয়ে যাবেন, তিনি সেই পথই খুঁজছিলেন। এর উপর আবার অম্বুরী বালার এই আচরণ দেখে আর এক দফা যারপরনেই আঁতকে উঠলেন তিনি এবং কতকটা বেহুঁশেই অম্বুরী বালার মকান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। এরপর কতকটা দৌড়ের উপর সরাসরি নিজ মকানে ফিরে এলেন। শাহজাদার কাছে গেলেন না। কেমন করে এই ঘটনা শাহজাদাকে বলবেন তিনি, বসে বসে সেই কথাই ভাবতে লাগলেন।

কিন্তু অম্বুরী বালা বসে রইলো না হাজী সাহেবের মতো। এ চাল তার ব্যর্থ হওয়ায় তৎক্ষণাৎ সে আর এক চাল চাললো। হাজী সাহেব বেরিয়ে যেতেই সে চীৎকার দিয়ে উঠে আলু থালু বেশে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো শাহজাদার কাছে। শাহজাদার সামনে এসেই সে আছাড় খেয়ে পড়লো এবং মায়াকান্নার সাথে শাহজাদা সমীপে এই মর্মে অভিযোগ পেশ করলো যে, অতি ভোরে হাজী ইলিয়াস তার মকানে গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করে। হাজী সাহেবের ডাকশুনে সে সাদাদীলে দরজা খুলে দিলে মকানে তাকে একা দেখে হাজী ইলিয়াস সবলে তাকে জড়িয়ে ধরে এবং তাকে বেহুরমতি করার চেষ্টা করে। তার চীৎকার ও আর্তনাদে লোকজনের আনাগোনা শুরু হলে হাজী তাকে ছেড়ে দিয়ে তার মকান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। তার মহল্লার অনেকেই তাকে সন্ত্রস্তভাবে পালিয়ে যেতে দেখেছে।

অম্বুরী এই অভিনয়টি এমন নিখুঁতভাবে করে আর হাজী সাহেবকে উদ্ভ্রান্তভাবে অম্বুরী বালার মকান থেকে পালিয়ে যাওয়ার এমন চাক্ষুষ প্রমাণ মিলে যে, ঘটনাটি সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে শাহজাদার বিশ্বাস জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে "পাক্‌ড়ো ঐ লম্পটকে, শির লাও উসকো" বলে হুংকারের পর হুংকার ছেড়ে শাহী প্রাসাদের একাংশ অতিশয় উষ্ণ করে তোলেন।

বায়ুর বেগে এ কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন মওকাও আর হাজী সাহেবের থাকে না। দু' একজন শাহজাদাকে আসল ঘটনা বলার কোশেশ করেন। কিন্তু শাহজাদা তখন এতই উত্তপ্ত হয়ে ছিলেন যে, তিনি তাদের উপরই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং কারো কথায় কান না দিয়ে ইলিয়াসকে কোতল করার হুকুম জারী করেন।

নিদারুণ এই লজ্জা আর শাহজাদার আক্রোশ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাল বিলম্ব না করে হাজী ইলিয়াস গা-ঢাকা দিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সপরিবারে দিল্লী মুলুক ত্যাগ করেন। হাজী ইলিয়াস পালিয়ে যাওয়ায় অম্বুরী বালার অভিযোগ আরো শক্তিশালী ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে ইলিয়াসের দুধভাই আলী মুবারকও নিঃসন্দেহ হয়ে যান।

হাজী ইলিয়াস আর দিল্লী শহরে নেই, তিনি সপরিবারে পালিয়ে গেছেন, এই সংবাদ শাহজাদার কানে পড়ার সাথে সাথে শাহজাদার পা থেকে মস্তকতক্ সারা অঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে। তৎক্ষণাৎ তিনি ইলিয়াসের দুধভাই আলী মুবারককে যেখান থেকে হোক, ইলিয়াসকে ধরে আনার হুকুম দেন এবং ব্যর্থ হলে আলী মুবারকের গর্দান নেবেন বলে প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। নিরুপায় আলী মুবারক গোটা দিল্লী মুলুক ও তার আশেপাশের তামাম মুলুক দিনের পর দিন হন্যে হয়ে তালাশ করে বেড়ান। কিন্তু বিশাল এই হিন্দুস্তানের কোন এলাকায় হাজী ইলিয়াস গেছেন, আলী মুবারক তার হদিস করতে পারেন না। সুদীর্ঘ কয়েক মাস পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত ক্লান্ত আলী মুবারক হতাশ দীলে পুনরায় দিল্লীতে ওয়াপস্ আসেন। স্ত্রী-পরিজন ত্যাগ করে ইচ্ছে হলেও পালিয়ে যাওয়া সম্ভব তাঁর হয় না। মউত নিশ্চিত জেনেও তিনি একা একাই শাহী মহলে ফিরে আসেন।

ইলিয়াসের খবর আনতে ব্যর্থ হয়ে আসায় শাহজাদা পয়লা মহূর্তে আলী মুবারকের প্রাণ নিতেই উদ্যত হন। কিন্তু অতপর কি জানি কি ভেবে তিনি তাকে প্রাণভিক্ষে দিয়ে শুধু প্রাসাদ থেকেই নয়, দিল্লীর মুলুকের চৌহদ্দির বাইরে তাকে তাড়িয়ে দেন।

পরিবার পরিজন নিয়ে আলী মুবারক অতপর পথে পথে ঘুরতে থাকেন। এভাবে ঘোরার কালে একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন, যেন সাধক শায়খ জালাল উদ্দীন তাব্রিজী তাঁকে একটা রাজ্যের মালিক হওয়ার জন্যে বাঙ্গালা মুলুকে যেতে বলছেন এবং তাঁকে সেখানে এক নির্দিষ্ট স্থানে একটি দরগা নির্মাণের নির্দেশ দিচ্ছেন। এই প্রেরণার সূত্র ধরে তিনি ঘুরতে ঘুরতে এসে বাঙ্গালা মুলুকের লাখ্নৌতিতে হাজির হন। স্ত্রী পরিজন সহকারে ক্ষুৎপিপাসায় উদ্ভ্রান্ত

আলী মুবারক উপায়ান্তর না দেখে সরাসরি লাখ্নৌতির শাসনকর্তা কদরখানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং অনুনয় বিনয়ের মাধ্যমে কদর খানের ফৌজে মামুলী এক পদে নিযুক্তি লাভ করেন। এই নকরী নিয়েই লাখ্নৌতিতে নয়াজিন্দেগী শুরু করেন আলী মুবারক এবং কদর খান ও দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ -বিন-তুঘলকের মনোরঞ্জন হেতু দিল্লীর শাহের এন্তার গুণগান শুরু করেন। এই সুবাদে ও রণবিদ্যায় নিজের পারদর্শিতার গুণে উঠতে উঠতে তিনি এক্ষণে সালার পদে উঠে গেছেন।

— গৌড় বা লাখ্নৌতি শহরে পৈতৃক বাড়ীতে বসে আলী মুবারক ও হাজী ইলিয়াসের এ কাহিনী শ্রবণ করছেন শরীফ রেজা, বলে যাচ্ছেন হাজী ইলিয়াসের বাহিনীরই এক বিশ্বস্ত সৈনিক। লাখ্নৌতির নগর কোতোয়াল নূর হোসেন জুটিয়ে দিয়েছেন তাঁকে।

অশ্রুভারাক্রান্ত কনকলতার মুখের দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে শরীফ রেজা সেই যে ভুলুয়া থেকে অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন, এরপর আর যাত্রা ভঙ্গ করেননি বা অন্যদিকেও যাননি। একটানা ছুটে লাখ্নৌতি বা গৌড়ে এসে হাজির হলেন। পথের মাঝেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে এলেন—কোন ইয়ার বন্ধু বা আত্মীয়ের মকান আর নয়, এবার তিনি নিজ মকানেই উঠবেন এবং তার রিস্তেদারের দখল থেকে একটা কামরা খুলে নিয়ে যতদিন তিনি লাখ্নৌতিতে থাকবেন ততদিন নিজ মকানেই থাকবেন। কিন্তু মকানে এসে পৌছার পর অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। দেখলেন, তার সেই রিস্তেদারের কোন কেউ আর সে মকানে নেই। অপর পক্ষে মকানটিও ফাঁকা নেই। গোটা মকানই দখল করে বসে আছে কদর খানের সেনাপতি আলী মুবারক সাহেবের এক অনুগ্রহ পুষ্ট পরিবার। সেনাপতির হস্তক্ষেপে তাঁর সেই রিস্তেদারেরা উচ্ছেদ হয়ে গেছেন।

শরীফ রেজা এসে "এ বাড়ী আমার"— একথা বলতেই হৈ হৈ করে তেড়ে এলো ঐ পরিবারের লোকজনেরা এবং শরীফ রেজার কথায় কোন গুরুত্বই না দিয়ে তাঁকে একরূপ তাড়িয়েই দিলো বাড়ী থেকে। সেনাপতির লোক তারা, খামাখা তাদের বিরক্তির কারণ হলে ধরে তাঁকে ফাটকে পাঠিয়ে দেবে —তারা এমন হুমকিও দিলো।

এরা তৃতীয় পক্ষের লোক। এদের সাথে তর্ক করা অযৌক্তিকবোধে শরীফ রেজা প্রশাসনের আশ্রয় নিলেন। কে এই সেনাপতি, কি তার অধিকার —এসব কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি সরাসরি লাখ্নৌতির শাসনকর্তা কদর খানের সামনে এসে হাজির হলেন এবং তাঁর অভিযোগ পেশ করলেন।

কদর খান বিলক্ষণ তাঁকে চিনতেন। বাড়ীটাও যে শরীফ রেজার তাও তিনি জানতেন। বাড়ীটা তাঁর বেদখল হয়ে গেছে এই টুকু ছাড়া, শরীফ রেজার জন্মকর্ম ও চরিত্র সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতেন তিনি। এই শরীফ রেজাকে নিজে তিনি উপযাচক হয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীর সালারের পদে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দোর্দণ্ড প্রতাপশালী লাখ্‌নৌতির অধিপতি কদর খানের সে ইচ্ছার কোন মর্যাদাই শরীফ রেজা দেয়নি। সেদিন তিনি মুখে কিছু না বললেও, সেদিনের সেই উপেক্ষা কদর খানের দীলে যে মর্মপীড়া পয়দা করে, আজও তা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। শরীফ রেজাকে দেখা মাত্রই তাঁর সেই মর্মপীড়া পুনরায় জোরদার হয়ে উঠল। আজও তিনি মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু সে পীড়ার তিনি শোধ নিলেন অন্যভাবে যে শরীফ রেজাকে দেখামাত্রই আমির-উমরাহের চেয়েও অধিক সম্মান দিয়ে কাছে ডাকতেন তিনি, সেই শরীফ রেজাকে আজ কোন মর্যাদাই তিনি দিলেন না। একজন অতি সাধারণ প্রজার মতো দূরে দাঁড়িয়ে রেখে তাঁর বক্তব্য তিনি শুনলেন এবং বাড়ীটা যেহেতু শরীফ রেজারই সেইহেতু নগর কোতোয়ালের প্রতি তাঁর বাড়ী তাঁকে ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ দিয়ে দোর গোড়া থেকেই বিদেয় করলেন শরীফ রেজাকে। তাঁর দিকে তিনি ফিরেও আর তাকালেন না।

কদর খানের এই আচরণের কারণ শরীফ রেজাও বুঝতে পারলেন। কিন্তু সে জন্যে তিনি ক্ষুণ্ন-ক্ষুব্ধ কোন কিছুই হলেন না। প্রয়োজন তার মকানটা কদর খানের প্রীতি নয়। কদর খানের খাতির-প্রীতি নিয়ে শরীফ রেজার কিছুমাত্র চিন্তা-ভাবনা ছিল না। তার কারণ, সবাই এঁরা দিল্লীর দাস। বাঙ্গালা মুল্লুকের আজাদীর এরা দুশমন। এসব লোকের খোশ-নাখোশে শরীফ রেজাদের এসে যায় না কিছুই। বরং তাঁর হক তাঁকে ফেরত দেয়ার জন্যে কদর খানের প্রতিই তিনি খুশী হলেন কিঞ্চিৎ।

রায় নিয়ে ফিরে আসতেই রাস্তার মাঝে লাখ্‌নৌতির নগর কোতোয়াল নূর হোসেন হাসিমুখে শরীফ রেজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। অন্যান্য আরো কিছু সেপাই-লস্করের মতো এই নগর কোতোয়ালও শরীফ রেজার পূর্ব পরিচিত লোক ছিলেন। লাখ্‌নৌতির বাহিনীতে নকরী করার কালে এরা শরীফ রেজাকে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। নগর কোতোয়াল নূর হোসেন সামনে এসেই সালাম দিয়ে বললেন —আপনি কিছু ভাববেন না হুজুর। কয়েক লহমার মধ্যেই বাড়ী আপনার সাফা হয়ে যাবে। পাইক পেয়াদা ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছি আমি।

খোশদীলে নূর হোসেনের কুশলাদি নিয়ে শরীফ রেজা উৎসুককণ্ঠে বললেন —কি ব্যাপার ? এত জলদি!

নূর হোসেন এর জবাবে বললেন — দেরী করা ঠিক নয় হুজুর। ওদের পেছনে শক্ত খুঁটি আছে। রাখতে হয়তো শেষ পর্যন্ত পারবে না, কিন্তু ফ্যাসাদ পয়দা করতে পারে।

ঃ ফ্যাসাদ!

ঃ হ্যাঁ হুজুর। ব্যাটারা অরাজকতা পেয়েছেতো! নিজের নয়, অন্যের মকান। তবু দীল চাইলো—দখল করলাম, ব্যস্‌! দখল তোদের করাচ্ছি! খোদ লাখ্‌নৌতির শাসনকর্তার হুকুম হয়েছে। আর কি চাই! জলদি জলদি আপনার মকান আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারলে, পরে আর যে ব্যাটাই যত বাহাদুরী করুক, ফল হবে না কিছুই।

ঃ কি রকম ?

ঃ হুকুম তামিল হয়ে গেলে আর কার কি করার থাকবে হুজুর ? হাকিম ফেরে হুকুম তো আর ফেরে না! তার উপর এটাতো আবার তামিল করা হুকুম।

অনুমান করতে পারলেও পুরো ঘটনা শরীফ রেজা তৎক্ষণাৎ অনুধাবন করতে পারলেন না। পারলেন কিছু পরে। দলবল নিয়ে কোতোয়াল সাহেব অবিলম্বেই এসে দখলকারীদের সামানাদি সহকারে মকান থেকে নামিয়ে দিলেন। খোদ প্রশাসনের লোক এসে নামিয়ে দিচ্ছে দেখে হতভম্ব দখলকারীগণ নত মস্তকে বিদেয় হলো এবং শহরের অন্য প্রান্তে অন্য এক মকানে গিয়ে উঠলো। শরীফ রেজা সহজেই তাঁর পৈতৃক গৃহের দখল পেলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যেই খবর গেল সেনাপতি আলী মুবারকের কাছে। এই আলী মুবারকই সেই শক্ত খুঁটি তাদের। খবর পেয়েই আলী মুবারক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠালেন উচ্ছেদ রোধ করতে। কিন্তু তাঁর লোকেরা এসে দেখলো — হুকুম তামিল ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। তারা ফিরে গিয়ে এই খবর যখন আলী মুবারককে দিলো, তখন আর করার কিছুই খুঁজে পেলেন না আলী মুবারক। কদর খানের অজ্ঞাতেই এই জবরদখল করেন তিনি। যার বাড়ী খোদ কদর খানই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ নিয়ে ফের ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে কদর খান নাখোশ হতে পারেন — এই ভয়ে বাধ্য হয়েই চেপে গেলেন আলী মুবারক।

কিন্তু দীলের রাগ চাপতে তিনি পারলেন না। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়ার এই স্পর্ধার জন্যে শরীফ রেজার উপর তিনি হাড়ে হাড়ে গোস্বা হয়ে রইলেন। এরপর ফের তিনি যেদিন জানলেন, লাখ্‌নৌতির প্রশাসনের যে পদটি পেয়ে

তিনি নিজেকে গর্বিত মনে করছেন. এই শরীফ রেজা একদিন তার চেয়েও উমদা এক সালারের পদ অগ্রাহ্য করে কবুল করেননি যেচে দেয়া সত্ত্বেও. তখন থেকে আর এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় আলী মুবারক সাহেব দগ্ধ হতে লাগলেন।

কয়েকদিন পর শরীফ রেজার আহবানে নগর কোতোয়াল নূর হোসেন সাহেব শরীফ রেজার মকানে আবার এলেন এবং কথায় কথায় আলী মুবারকের এই মর্মদাহের কথা রসিয়ে রসিয়ে বয়ান করে গেলেন। শরীফ রেজাও নূর হোসেনকে ডেকেছিলেন এই প্রসঙ্গেই। অর্থাৎ কে এই আলী মুবারক. কোথা থেকে আগমন তার — এসব হদিস জানার জন্যেই। প্রশ্ন করলে. নূর হোসেন সাহেব বললেন — হুজুর, আমি তো বেশী জানিনে এসব, তবে আমার বাড়ীর পাশে দিল্লী থেকে আগত এক সেপাই থাকেন। খুবই ঈমানদার আর নির্ভরযোগ্য লোক। তিনি সব কিছুই জানেন। যদি এজাযত দেন তো তাকেই পাঠিয়ে দেই। খুঁটিনাটি সব খবরই দিতে পারবেন উনি।

শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন — তিনি কি তা আসবেন আর সেসব কথা বলতে রাজী হবেন ?

উৎসাহিতকণ্ঠে নগররক্ষী বললেন — জি হুজুর, অবশ্যই তিনি আসবেন আর বলবেন। যদিও সহজে তিনি এসব কথা কাউকে বলেন না. তবু আমাকে উনি জিয়াদা বিশ্বাস করেন হুজুর। আমি তাঁকে বলতে বললে, সব তিনি বলবেন। কিছুই গোপন করবেন না। তাঁর কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন, লোকটার দীলে জিয়াদা দুঃখ আছে। এ ছাড়া লোকটা যে খুবই সহজ-সরল এটাও বুঝতে পারবেন।

শরীফ রেজা সাগ্রহে রাজী হলেন। তিনি উৎসাহভরে বললেন তাই নাকি ? বেশ-বেশ! তাহলে তাঁকে পাঠিয়ে দিন যত জলদি সম্ভব।

কোতোয়াল নূর হোসেনের নির্দেশ মাফিক পরের দিনই সেই লোকটা শরীফ রেজার মকানে এসে হাজির হলেন। কোতোয়াল সাহেব পাঠিয়েছেন — এটা জেনেই শরীফ রেজা তাকে সমাদরে কাছে ডেকে বসালেন। মামুলী কিছু আলাপের পরই শরীফ রেজার অনুরোধে আগন্তুকটি আলী মুবারকের হদিস সংক্রান্ত কাহিনী শুরু করলেন। এই আগন্তুকই হাজী ইলিয়াসের বাহিনীর সেই বিশ্বস্ত সৈনিক। তিনি অন্তুরী ঘটিত তামাম কাহিনী একটানা বর্ণনা করতে লাগলেন। লাখ্নৌতির মকানে নিবিষ্টচিত্তে বসে বসে সে কাহিনী শুনতে লাগলেন শরীফ রেজা।

আলী মুবারকের ইতিবৃত্ত শেষ করে সেপাইটি বললেন — এরপর তো দেখলেনই আপনি সেই আলী মুবারক সাহেবকে। দেখলেন তো কেমন তাঁর দাপট ? সেনাপতি হয়ে খোশহালে আর মেজাজের সাথেই আছেন তিনি এখানে।

সেপাইটি থামলেন। শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন — আচ্ছা. তা সেই হাজী সাহেবের কি হলো ? হাজী ইলিয়াস সাহেবের ?

সেপাইটির চোখে মুখে বেদনা ফুটে উঠলো। আজাবপিষ্ট কণ্ঠে তিনি বললেন — না, এরপর তাঁর আর কোন খবরই মেলেনি।

ঃ মেলেনি ?

ঃ জিনা। অনেক খোঁজ করলাম। আলী মুবারক সাহেব আর তাঁর দুধভাই হাজী সাহেবের কতটুকু খোঁজ করেছেন ? আমি গোটা হিন্দুস্তানের বাদ রাখিনি কোথাও। কিন্তু ফল কিছু হলো না।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলেন সেপাই সাহেব। শরীফ রেজা সবিস্ময়ে বললেন — আপনি ?

ঃ জি জনাব। দিল্লীতে আমি তো তাঁর বাহিনীতেই ছিলাম। খুবই ভাল মানুষ ঐ হাজী সাহেব। বাহিনীর সবাইকে তিনি ভাইয়ের মতো ভালবাসতেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ আর দরদ ছিল মাত্রাধিক।

ঃ আচ্ছা!

ঃ এই এমন একটা ভাল মানুষের উপর এমন জুলম নেমে আসায়, তাঁর ফৌজের তামাম লোকই ক্ষোভে দুঃখে মুষড়ে পড়েন।

ঃ বলেন কি!

ঃ আমার মতো তাঁরাও অনেকে হাজী হুজুরের খবর করতে বেরিয়ে ছিলেন। হুজুরের সন্ধান পাওয়া গেলে. তাঁর বাহিনীর অনেকেই দিল্লী ছেড়ে তাঁর সাথে চলে আসতেন। এত বড় বেইনসাফীর পরও দিল্লীর নকরী আঁকড়ে ধরে থাকতেন না। কিন্তু পাওয়াই গেল না হুজুরকে।

ঃ তাঁরা এখন কোথায় তাহলে ? ঐ দিল্লীর নকরীই করছেন ?

ঃ কি করবেন তারা বলুন ? বাপ-মা বউ বাচ্চা নিয়ে সবাইকে সংসার করতে হয়। এদের নিয়ে যাবেনই বা কোথায় আর খাবেনই বা কি ? রোজগার তো করতেই হবে সবাইকে!

ঃ আপনি ? আপনার কোন বালবাচ্চা বা পোষ্য নেই ?

ঃ জি, আমারও আছে।

ঃ তাহলে আপনি এখানে যে ? আপনি ফিরে যাননি ?

ঃ যেতে আর পারলাম কৈ জনাব ? কোথায় তিনি গেলেন, পরিবার পরিজন নিয়ে তিনি বেঁচে রইলেন. না খতম হয়ে গেলেন, সে হদিস না পাওয়ায় আমি আর ঘরে ফিরতে পারলাম না।

ঃ তারপর ?

ঃ পথে পথে ঘুরতে লাগলাম। তারপর একদিন শুনলাম, হুজুরের দুধভাই আলী মুবারক এই বাঙ্গালা মুলুকে এসে বসবাস শুরু করেছেন। শুনেই আমি ভাবলাম, হুজুরও তাহলে এদিকেই বোধহয় আছেন। তাই আমিও শেষে এই বাঙ্গালা মুলুকে চলে এলাম। কিন্তু এখানে এসে আলী মুবারককে পেলাম শুধু, আমার হুজুরকে পেলাম না।

এবার সশব্দে নিঃশ্বাস ফেললেন সেপাই সাহেব। চাপতে আর পারলেন না। তা লক্ষ্য করে শরীফ রেজা কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন — তারপর ? তারপর আর কোথাও যাননি ?

ঃ আর কোথায় যাবো জনাব ? এতদিন গরহাজির থাকার পর দিল্লীর ফৌজে আমার তো আর নকরী থাকার কথা নয়। বালবাচ্চাদের কথা ভেবে ঐ নিষ্ফল ঘুরে বেড়ানো বাদ দিয়ে এখানের বাহিনীতেই কোন মতে একটা সেপাইপদে ঢুকে পড়লাম। এরপর একদিন দিল্লীতে গিয়ে বিবি বাচ্চাদের নিয়ে এলাম।

ঃ আচ্ছা!

ঃ ঐ আলী মুবারক সাহেবের বিবির মুখেই আমার বিবি একদিন এসব কথা মানে, ওঁরা কোথায় কোথায় গেলেন, কি ভাবে এখানে এলেন, এসব ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনেছিলেন। ওঁদের এই বাঙ্গালা মুলুকে আসার কথাগুলো আমার বিবির কাছেই আমার শোনা।

ঃ তাই ? তা আছেন কোথায় এখন ? সরকারী মকানে ?

ঃ জিনা, সরকারী কোন মকান আমি পাইনি। রুজি রোজগার কম, তাই ঐ কোতোয়াল সাহেবের মকানের পাশে ছোট্ট একটা মকান যোগাড় করে নিয়ে কোন মতে আছি।

ঃ ওটা বেসরকারী বাড়ী ?

ঃ জি, ছোট্ট একটা নড়বড়ে বাড়ী।

ঃ তকলিফ হচ্ছে না তাতে ?

ঃ হলেই বা কি করবো বলুন ? দিল্লীতে আমি যে পদ নিয়ে ছিলাম, এখানে তো তা পাইনি। তকলিফ তো জরুর হবেই।

শরীফ রেজা ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো, ভদ্রলোকের নামটাই এখনও জানা হয়নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সোচ্চার কণ্ঠে বললেন — আরে-আরে, এই দেখুন, তা নামটা কি ভাই সাহেবের ?

জবাবে সৈনিক বললেন — বরকতুল্লাহ। সেপাই বরকতুল্লাহ বললে মোটামুটি এখানের অনেকেই আমাকে চিনতে পারে।

ঃ ওখানে ঐ দিল্লীতে আপনি কোন পদে ছিলেন ?

ঃ সহকারী সালার পদে। দিল্লীর ফৌজে হাজী হুজুরের পরেই ছিল আমার স্থান।

শরীফ রেজা তাজ্জব হয়ে গেলেন। একজন সহকারী সালার আদমী, একজনকে ভালবেসে আজ এই মামুলী এক সেপাই হিসাবে খাটছেন! কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শরীফ রেজা পুনরায় প্রশ্ন করলেন আপনার ঐ হুজুরকে, মানে ঐ হাজী সাহেবকে আপনি খুবই ভালবাসতেন, তাই নয় ?

বরকতুল্লাহ সাহেক ক্লিষ্ট হাসি হাসলেন। এরপর তিনি বললেন — তা বেসেই বা ফল কি হলো জনাব ? তাঁর তো কোন কাজেই আসতে পারলাম না। জীবনে তো ভালকাজ কিছু করিনি, এ রকম একটা লোকের এই দুর্দিনে যদি কাজে লাগতে পারতাম কিছু, তবু একটা সান্ত্বনা থাকতো দীলে আমার।

ছুটির দিন থাকায় বরকতুল্লাহ সাহেবের তাড়া কিছু ছিল না। তবু গল্পে গল্পে দ্বিপ্রহর হয়ে গেল দেখে তিনি ধড়মড় করে উঠতে গেলেন। কিন্তু শরীফ রেজা আটকিয়ে দিলেন তাঁকে। এই ভর দুপুরে এমন একটা মেহমানকে অনাহারে বিদায় করার কথা ভাবতেও তিনি পারলেন না। বরকতুল্লাহ সাহেবের বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও শরীফ রেজা তাকে নিয়ে আহার করলেন, বিরাম করলেন এবং লাখ্নৌতি ও দিল্লীর রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে গল্প-আলাপ করে প্রায় গোটাদিন কাটিয়ে দিলেন।

এই গল্পালাপের মাঝেই শরীফ রেজা হঠাৎ এক সময় বললেন, আমার দীলে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ভাই সাহেব। এজাযত দিলে সে প্রশ্নটা আমি করতে চাই আপনাকে।

বরকতুল্লাহ সাহেব সাগ্রহে বললেন — জি, করুন-করুন।

শরীফ রেজা বললেন — সাধারণত কোন মানুষ যখন কাউকে ভালবাসেন তখন তিনি সেই লোকের গুণই শুধু দেখতে পান, কসুর দেখতে পান না। আপনি আপনার হাজী হুজুরের এই যে একটানা প্রশংসাই করে গেলেন, তাঁর চরিত্রে ত্রুটি বিচ্যুতিও তো থাকতে পারে কিছু ?

ঃ আলবত পারে। ত্রুটি বিচ্যুতি তো কম বেশী সব মানুষেরই আছে। যার কোন ত্রুটি নেই তিনি তো ইনসান নন, ফিরিস্তা। আপনি এখন কোন কিসিমের ত্রুটির কথা বলছেন —

শরীফ রেজা বললেন — আমি ঐ অম্বুরী বালার ব্যাপারটা নিয়ে বলতে চাই। অম্বুরী বালা যে বিলকুলই মিথ্যা নালিশ করেছিল — এ সম্বন্ধে আপনি এতটা নিশ্চিত হলেন কি করে ?

একথায় বরকতুল্লাহ সাহেব অতিশয় বিস্মিত হয়ে শরীফ রেজার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। এরপর তিনি বিস্মিত কণ্ঠে

বললেন — সেকি! নিশ্চিত হবো না মানে ? আমার বাড়ীটাই যে ঐ মহল্লায় অম্বুরীর বাড়ীর পাশেই। মাঝখানে দুইটি বাড়ী মাত্র। অম্বুরীকে তো অনেক আগে থেকেই দেখে আসছি আমরা। মুখখানাই যা সুন্দর, কিন্তু চরিত্র তার একেবারেই কুৎসিত। কতজনকে নিয়ে যে কতকীর্তি আছে তার, কত জঘন্য জঘন্য লোকের যে তার বাড়ীতে যাতায়াত, শুধু আমি কেন, ঐ মহল্লার কোন লোক তা না জানে ?

ঃ সেকি! তাহলে শাহজাদাকে এসব কথা বলেননি কেন আপনারা ?

ঃ পাগল হয়েছেন জনাব ?

ঃ জি ?

ঃ শুনবে কে ? এসব রাজাবাদশাহর ব্যাপার। এর মধ্যে নাকগলাতে গেলে মাথা থাকবে কারো ?

ঃ এ্যাঁ!

ঃ তার উপর শাহী হেরেমের কথা বলে কথা! নসিহত করা দূরে থাক, ঐ হেরেমের গন্ধ শুঁকতে গেলেও আর ফিরে আসবে কেউ ?

ঃ আলী মুবারক ? ঐ আলী মুবারক সাহেবও এসবের কোন খোঁজ খবর রাখলেন না ?

ঃ কি করে রাখবেন ? হুজুর যদি দিঘীর পানি উঁচু নীচু দেখেন, এরাও যে তাই দেখা লোক। এদের কি নিজের নজর আছে ? না কান আছে নিজের ?

ঃ তাহলে ঐ হুজুরই বা এতটা অজ্ঞান হলেন কি করে ?

ঃ অজ্ঞান হলেন!

ঃ আমি ঐ শাহজাদার কথা বলছি। একটা শাহজাদা মানুষ। কোন খোঁজ খবর না নিয়েই তিনি মজে গেলেন অম্বুরীর মতো একটা পাড়ার মেয়ের প্রেমে ?

ঃ একটা শাহজাদা কেন, দশটা শাহজাদা হলেও তো সে খোঁজ কেউ রাখতেন না।

ঃ কি রকম ?

ঃ এঁরাও যে আবার নিজের মুখে খান না। ঝাল-মধু সবই এঁরা অন্যের মুখে খান। মতলববাজ লোকেরা এঁদের যে স্বাদ পাওয়াবেন, এঁরা তো সেই স্বাদই পাবেন।

ঃ তাজ্জব!

ঃ তা ছাড়া তো আরও একটা কথা আছে। অম্বুরীর রূপটাতো তুচ্ছ করার মতো নয়। ঐ যে কথায় বলে "রূপেতে মজিল মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম" ব্যাপারটা এই রকম।

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ এতো আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষের ব্যাপার নয় জনাব! বললামই তো, রাজা বাদশাহর ব্যাপার। সাধারণ মানুষ যখন কারো রূপে মজে তলিয়ে যায়, তখন তারা কিছুটা চিৎকাত্ হয়েই তলিয়ে যায়। কিন্তু রাজা বাদশাহরা তলিয়ে গেলে, খাড়া তলানো তলিয়ে যায়। এক বিন্দু হেলেও না দুলেও না।

এবার উভয়েই এক সাথে হো হো করে হেসে উঠলেন।

এরপর আরো কয়েকদিন এলেন গেলেন বরকতুল্লাহ সাহেব। কখনও বা একা একা, কখনও বা কোতোয়াল নূর হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে। লোকটার আচরণে শরীফ রেজা ক্রমশঃই মুগ্ধ হতে লাগলেন। যেমনই সৎ তেমনই রসিক। ওদিকে আবার মজবুত একজন লড়াইয়াও বটেন তিনি। হাজী ইলিয়াসের সাথে সাথে তাঁর যেসব লড়াই লড়ার খবর শরীফ রেজা কথায় কথায় জানলেন, তাতে সেসব লাড়াইয়ে শহীদ হওয়াই খুব স্বাভাবিক, মজবুত লড়াইয়া না হলে, গাজী হয়ে ফিরে আসার মওকা বড়ই সংকীর্ণ। সেই সাথে শরীফ রেজার দীলে হাজী ইলিয়াসের রণদক্ষতার ব্যাপারেও একটা উচ্চ ধারণা পয়দা হলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, এই ধরনের কিছু লোক পাওয়া গেলে আর উদ্বুদ্ধ করা গেলে, এই গৌড়েও তাঁদের একটা নির্ভরশীল অবলম্বন তৈয়ার হয়ে যায়।

শরীফ রেজার যা কিছু অতি বিশ্বাসী ইয়ার-বন্ধু ও ভক্তবৃন্দ তখনও ঐ গৌড়ে অবশিষ্ট ছিল, তাদের সবার সাথে একে একে সাক্ষাৎ করলেন শরীফ রেজা। তাদের সাথে আলাপ করলেন এবং তাঁর ইরাদার প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের সাথে ভাব বিনিময় করলেন। পরবর্তী পর্যায়ে নিজ মকানে ডেকে নিয়ে তাদের সাথে তিনি মাঝে মাঝেই বসতে লাগলেন। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে তাঁর মকানে একদিন জমজমাট বৈঠক বসলো তাঁর ঐ ইরাদাকে কেন্দ্র করে।

বৈঠকের প্রারম্ভে শরীফ রেজা তাঁর লক্ষ্য ও ইরাদা-উম্মিদের কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে সবাইকে শোনালেন। শরীফ রেজার বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে শুনে তাঁর ইরাদার প্রতি উপস্থিত সকলেই উষ্ণ সমর্থন জানালেন। তবে তাঁরা অনেকেই বললেন — এতবড় কঠিন একটা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা দু'দশটা লোকের বা দু'দশটা দিনের কাজ নয়। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় বিরাট একটা শক্তি এখানে পয়দা করা গেলে তবেই সে কাজে হাত দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করা যায়। আলোচনার মাঝখানে কোতোয়াল নূর হোসেন সাহেব ফস্ করে বললেন—কিছু ভাসা-ভাসা ইংগিত ছাড়া, এত সুস্পষ্ট করে এসব কথা আগে তো কখনও বলেননি হুজুর ? তা এতবড়ই যখন চিন্তা-ভাবনা আপনার তখন কদর খান সাহেবের সেবারের ঐ প্রস্তাব আপনি গ্রহণ করেননি

কেন ? তখন যদি এই লাখ্‌নৌতির একটা সালারের পদ কবুল করতেন আপনি, আপনার মতো লোক নির্ঘাত এতদিন সিপাহসালারের পদে উঠে যেতেন। আর সিপাহসালার হলে আপনার হাতেই কতশক্তি থাকতো আজ! লাখ্‌নৌতির শাসনকর্তা তো হতো আপনার হাতের স্রেফ একটা পুতুল!

নূর হোসেনের কথা শুনে শরীফ রেজা অল্প একটু হাসলেন। তারপর তিনি বললেন — ভাই সাহেব, এখানে যে একটা মস্তবড় কথা থেকে যাচ্ছে। আর সে কথাটি হলো, তখ্‌ত্‌ দখল করে সুলতান গিরি করা। কিন্তু ওটা তো আমার আর আমার মতো আরো কয়েকজনের লক্ষ্যও নয়, কাম্যও নয়।

কথাটা বোধগম্য না হওয়ায় নূর হোসেন ফের প্রশ্ন করলেন — কি রকম ? মেহেরবানী করে আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

শরীফ রেজা বললেন — ক্ষমতাসীনকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর আমি যদি সুলতান না হই আর স্বাধীনতা ঘোষণা না করি, ক্ষমতা দখলের পর অন্যের হাতে ক্ষমতা দিলে তিনি সে ঝুঁকি নিতে চাইবেন কেন ? আর নিতে চাইলেও নিজের ইরাদা অন্যজনে বাস্তবায়ন করে দেবেন—তার নিশ্চয়তাই বা কি ? এর উপর আবার, তা যদি তিনি না করেন, যে সমস্ত লোক-লস্কর সেই নিয়াতে জান প্রাণ কোরবান করে আমার পেছনে লড়বেন, তাঁরাই বা আমাকে ছেড়ে কথা বলবেন কেন ?

নূর হোসেন সাহেব লা-জবাব হয়ে গেলেন। কথা খুঁজে না পেয়ে তিনি বললেন — হুজুর!

শরীফ রেজা বললেন — আমরা কেউ সুলতান হবো, এ নিয়াত আর লক্ষ্য আমাদের কারো নয়। বিশেষ করে আমরা যারা মহাপ্রাণ দরবেশ শায়খ শাহ শফী হুজুরের খাদেম, পয়লা থেকেই আমাদের জিন্দেগীর নিয়াত আর অঙ্গিকার এই যে, মসনদের মোহ কারো আমাদের থাকবে না।

সুলতান হতে কেউ আমরা চাইবো না। ফকির দরবেশ মানুষ আমরা। আমাদের কাজ দ্বীন ও কওমের খেদমত করা, সুলতানগিরি করা নয়।

ঃ তাহলে ?

ঃ এই বাঙ্গালা মুলুককে স্বাধীন করার খাস্‌ নিয়াতে যিনি মসনদ দখল করতে আসবেন, দ্বীনের কথা ভেবেই যিনি তা করতে আসবেন, আমাদের কাজ সেই ব্যক্তিকে নিষ্ঠার সাথে মদদ দেয়া। এর অধিক কিছু নয়।

নূর হোসেন সাহেব থেমে গেলেন। অন্যান্য সকলেই ক্ষণকালের জন্যে নীরব হয়ে রইলেন। শরীফ রেজার অন্য একজন ইয়ার হতাশ দীলে বললেন — মসনদ দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণার ঝুঁকি নেবেন, এমন লোকতো এই

লাখ্‌নৌতিতে কোন কালেই কাউকেই দেখিনে। কিছুমাত্র ক্ষমতা যাদের আছে, তারা সবাই তো দিল্লীর তোয়াজকারী গোলাম আর স্বার্থপর মানুষ। কওমের জন্যে এত বড় সৎচিন্তা এখানে কারো আছে বলে তো মনে হয় না।

শরীফ রেজা বললেন — এখানে কারো না থাকলেও অন্য কোথাও যদি তেমন লোক কেউ বেরিয়ে পড়েন আর সেই ইরাদায় খাড়া হোন, সেই সময় তাঁর পেছনে দাঁড়াবার মতো লোক বা তাঁকে সমর্থন দেয়ার লোক, সাতগাঁ, সোনার গাঁ, লাখ্‌নৌতি — সবখানেই তো থাকতে হবে কিছু কিছু ? চর্তুদিক থেকে সাহায্য-সমর্থন না পেলে এতবড় শক্তির বিরুদ্ধে সে বেচারা একাতো করতে পারবেন না কিছুই। পেছনে কেউ না এলেও এখানেও তাঁর সমর্থক আছে — এটা জানলেও তো দীলে তিনি জোর পাবেন জিয়াদা ?

জবাবে সকলেই এক বাক্যে বললেন — ঠিক-ঠিক!

শরীফ রেজা বললেন — সেই জন্যেই আমি চাই, বাঙ্গালা মুলুকের আজাদীর কিছু সমর্থক তৈয়ার হোক এখানেও এবং সেই নিয়াতে এখানে একটা শক্তিশালী লড়াইয়া দল গড়ে উঠুক আস্তে আস্তে। তাদের একমাত্র নিয়াত হবে—দিল্লীর শেকল খুলতেই হবে আমাদের। সেই সাথে লক্ষ্য হবে, দিল্লীর এই উচ্ছৃঙ্খল সেবাদাসদের উচ্ছেদ করে কওমের প্রতি দরদী একজন স্বাধীন সুলতানকে বসাতেই হবে বাঙ্গালা মুলুকের তখ্‌তে। দ্বীন আর কওমের খেদমতের ঈমান আমাদের অটল থাকলে, আল্লাহ তায়ালার রহমে এমন মানুষ কোথাও না কোথাও থেকে উঠে দাঁড়াবেই একদিন।

আবার সবাই বললেন — আলবত-আলবত।

শরীফ রেজা বললেন — এখান থেকেই যে বেরিয়ে পড়বে না সে মানুষ, তা কে বলতে পারে ?

অনেকেই বললেন — তা বটে — তা বটে!

এই প্রেক্ষিতে নূর হোসেন সাহেব ফের বললেন — তাহলে দিল্লীর শাসনের বিপক্ষের লোক এখানে যাঁরা আছেন তাদের মধ্যে থেকে আর দিল্লী থেকে উচ্ছেদ হয়ে এখানে যাঁরা আসছেন তাঁদের মধ্যে থেকে খুঁজে খুঁজে লোক জোটাতে হবে আমাদের।

শরীফ রেজা উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন — বিলকুল! বিলকুল! এবার আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন। খুব বাস্তব আর গুরুত্বপূর্ণ কথা। এই কিসেমের লোকদের কাছেই উষ্ণ সাড়া পাওয়া যাবে। আসুন, এখন থেকে আমরা এই দিকে নজর দেই এবং বিশেষভাবে যাচাই করে লোক সংগ্রহ করতে থাকি। প্রাথমিকভাবে আমিই এখানে নেতৃত্ব দেবো আমাদের এই গোপন সংগঠনের। ইতিমধ্যে ইনশাআল্লাহ নেতৃত্ব দেয়ার লোক কেউনা কেউ আলবত বেরিয়ে আসবেন আমাদের মধ্য থেকেই।

একথারও উষ্ণ সমর্থন এলো এবং সেই সাথে সেদিনের মতো বৈঠকের কাজ শেষ হলো। উঠার আগে হঠাৎ একজন প্রশ্ন করলেন — সংগঠন মজবুত হয়ে গেলে সাতগাঁ, সোনার গাঁ — যেখান থেকেই হোক, কেউ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেই কি আমরা আত্মপ্রকাশ করে বেরিয়ে আসবো এই প্রশাসনের বিরুদ্ধে ?

প্রবল বেগে বাধা দিয়ে শরীফ রেজা বললেন — জ্বিনা-জিনা। তা করে কেউ কোথাও এককভাবে এই প্রশাসনকে এঁটে উঠতে পারবেন না। আমাদের কাজ হবে কাউকে সমর্থন করতে আত্মপ্রকাশ করা। তার আগে নয়। যেমন ধরুন এই লাখ্‌নৌতিতে সে কাজে দাঁড়িয়ে গেল কোন শক্তি, বা সে কাজে কোন শক্তি বাইরে থেকে এলো, তখন তারপক্ষ সমর্থন করে আত্মপ্রকাশ করা।

প্রশ্নকারী তৃপ্ত হলেন। তৃপ্ত কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন — বহুত আচ্ছা! বহুত আচ্ছা!

শেষ হলো বৈঠক, শুরু হলো কাজ। পরের দিন থেকেই অতিবিশ্বস্ত পুরাতন লোক সহ দু' একজন করে নয়া আদমীও দলভুক্ত হতে লাগলো। এরই মধ্যে একদিন কোতোয়াল নূর হোসেন এসে বললেন, হুজুর লোকে যে বলে আলোর নীচেই অন্ধকার, কথাটা ঠিকই। এত লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা, আর বরকতুল্লাহ সাহেবকে কেউ দেখতেই আমরা পেলাম না ?

শরীফ রেজা বললেন — বলেন কি!

নূর হোসেন বললেন—একদম তৈরী লোক। তাঁর সাথে কথা বলে দেখলাম, এই রকম লোকই আসল লোক। এ জন্যে উনি এক পায়ে খাড়া আছেন। দিল্লী থেকে তিনি এ মুলুকে এসেছেন বড় দুঃখ বুকে নিয়ে। মওকা দিলে তাঁর দ্বারা অনেক কাজ হতে পারে।

শরীফ রেজার নির্দেশে বরকতুল্লাহ সাহেবকে হাজির করলেন নূর হোসেন সাহেব। মানসিকভাবে বরকতুল্লাহ সাহেব প্রস্তুতই ছিলেন। শরীফ রেজা প্রস্তাব দিতেই তিনি লুফে নিলেন সে প্রস্তাব। বললেন — কুচ পরোয়া নেই জনাব। এই রকম একটা কাজই মনে মনে আমি তালাশ করে বেড়াচ্ছিলাম। দিল্লীর ঐ সব দাম্ভিকদের দৌরাত্ম রোধ হোক, এই আমার আন্তরিক কামনা। আপনি লাখ্‌নৌতির এদিক দেখুন। বাইরের লোকের দায়িত্বটা আমার উপর ছেড়ে দিন। আমার চেনা জানা ঈমানদার লোক যে যখনই এ মুলুকে আসবেন, সবাইকে আমি আমাদের দলে টেনে নেবো।

শরীফ রেজা বললেন — শাব্বাশ্! আপনার এই মানসিকতাকে আমি মোবারকবাদ জানাই।

বরকতুল্লাহ সাহেব খুব উৎফুল্ল ছিলেন। শরীফ রেজার কথার দিকে তেমন খেয়াল না করে তিনি জোশের সাথে বললেন — উঃ! আজ যদি আমার হাজী হুজুরকে পাওয়া যেতো জনাব তাহলে যা কাজ হতো, তা বলার নয়। খুবই ধর্মপ্রাণ লোক তিনি। এ মুলুকে দ্বীন আর কওমের পক্ষে কিছু করার মওকা পেলে উনি জান প্রাণ ছেড়ে দিতেন সে কাজে। এর উপর তিনি তো শুধু ঈমানদার লোকই নন, একজন জবরদস্ত লড়াইয়া। তিনি রুখে দাঁড়ালে, একাই তিনি একশো জনের ধাক্কা ধরতে পারতেন।

নূর হোসেনের কথাই ঠিক। বরকতুল্লাহ সাহেবই আসল লোক। তিনিই সবচেয়ে অধিক তৎপর হয়ে দলের কাজ করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে বাঙ্গালা মুলুকের স্বাধীনতার স্বপক্ষে লাখ্‌নৌতিতে বেশ একটা শক্তি আর বেশ কিছু সমর্থক তৈরী হয়ে গেল। শরীফ রেজার পর বরকতুল্লাহ সাহেবই এ দলের নেতৃত্বে চলে এলেন। লাখ্‌নৌতি থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে বরকতুল্লাহ সাহেবকেই তিনি তাঁর শূন্য মকানের একাংশে এনে তুললেন এবং সংগঠনের প্রধান কাজ তাঁর উপরই ন্যস্ত করে লাখ্‌নৌতি থেকে আপাততঃ বিদায় নিলেন। পছন্দ মতো আবাস আর কাজ পেয়ে বরকতুল্লাহ সাহেবও বর্তে গেলেন। শরীফ রেজার সেই রিস্তেদার তখন অনত্র কায়েমীভাবে আস্তানা গেড়ে নিয়েছিলেন। তাদের নিয়ে শরীফ রেজার আর চিন্তা করতে হলো না।

ইতিমধ্যেই শরীফ রেজা তাঁর লাখ্‌নৌতির সেই ক্ষমতাসীন রিস্তেদার মালিক হুসামউদ্দীন আবু রেজার মকানেও কয়েকদিন ঘোরাফেরা করলেন। কিন্তু দেখলেন এখনও তিনি সেই আগের মতোই নকরীগত প্রাণ আর "জি-হুজুর এর ছানা" হয়েই আছেন। তাঁকে দিয়ে কোন আশাই নেই।

অসুস্থ হুজুরের খবর নেয়ার ইরাদায় লাখনৌতি থেকে বেরিয়ে শরীফ রেজা সাতগাঁ এসে হাজির হলেন। সুফী সাহেব তখন মোটামুটি বেশ সুস্থই ছিলেন। সার্বিক অবস্থা ও শরীফ রেজার বর্তমান কার্যক্রমের কথা শুনে শায়খ শাহ শফীউদ্দীন সাহেব বললেন — মওকা একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে এই রকমই হয়। না-উম্মিদ হওয়ার কারণ নেই। সর্বত্রই যথাসম্ভব লোকজনদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকো। আল্লাহ তায়ালা রাজী হবেন যখন, তখন ফয়সালা একটা এসেই যাবে। যেভাবে আর যেদিক দিয়ে হোক।

সেই সাথে শায়খ সাহেব আরো তাঁকে জানালেন, যদিও তাঁর মোকামের লোক-লস্কর আগের চেয়ে সামর্থে আর সংখ্যায় অনেকটা খাটো হয়ে এসেছে, তবু সেটা সাতগাঁয়ে তৈরী থাকবে সবসময়। প্রয়োজনে শরীফ রেজা যখন তখন সে লোকদের কাজে লাগাতে পারবেন।

হুজুরের অনুমতিক্রমেই শরীফ রেজা কয়েকটা দিন সাতগাঁয়ে থাকলেন। এই সময় একদিন এক বিশেষ মুহূর্তে শায়খ শাহ শফীউদ্দীন সাহেব আফসোস্

করে বললেন — কওমের কথাই ভাবলাম শুধু শরীফ রেজা, তোমার সুখ দুঃখের কথা কোনদিনই ভাবলাম না। এ ছাড়া, আল্লাহ তায়ালার কি যে ইচ্ছা তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন, সে মওকা তিনিও তোমাকে বড় দিলেন না।

কিছুটা বিস্মিত কণ্ঠে শরীফ রেজা বললেন — হঠাৎ একথা বলছেন কেন হুজুর?

শায়খ সাহেব বললেন — উলুগ জিয়াখানের এক আত্মীয় কিছুদিন আগে আমার এখানে এসেছিলেন। আমাদের উলুগ জিয়া খান। তুমি তো কিছুটা জানো আর শুনেছো, জিয়া খানকে সাতগাঁয়ের শাসনকর্তার পদ থেকে দিল্লীর সুলতান সেই সময় সরিয়ে নিয়ে প্রথমে বিহারে আর তারপর অযোধ্যার ওদিকে নিয়ে গেলেন। ওখানে গিয়ে কাঁচা বয়সেই স্বামী স্ত্রী দুইজনই তারা পর পর দুনিয়া থেকে চলে গেল। ওদের এক আত্মীয় কি এক কাজে সাতগাঁয়ে এসেছিলেন। কাজের ফাঁকে আমার সাথে দেখা করে গেলেন তিনি আর কথায় কথায় তোমাদের নিয়ে কিছু কথা বলে গেলেন।

ঃ কি কথা হুজুর?

ঃ কথাটা তোমার ঐ বিয়ের ব্যাপার নিয়ে। মেয়েটা যে এত বড় বেঈমানী করবে, উলুগ জিয়া খান বা তার বিবি — কেউই এটা ভাবতেও পারেনি। জিয়া খানের বিবি মানে ঐ ভূদেব নৃপতির মেয়ে চন্দ্রাবতী মউতের আগে নাকি এ নিয়ে খুবই আফসোস্ করে গেছে। তোমার দীলে হঠাৎ ঐ চোট লাগার জন্যে নাকি সে নিজেকে অনেকটা দায়ী বলে ঠাউরিয়েছে।

শায়খ সাহেব উদাস হয়ে উঠলেন। শরীফ রেজা আপত্তি তুলে বললেন—থাক হুজুর, যা চুকে বুকে গেছে, কি হবে আর ওসব কথা ভেবে?

ঃ না, ভাবছিনে তেমন কিছু। তবে ঐ জেদী মা-বেটির নাকি ঐ উৎকলেও ঠাঁই হয়নি। ঐ লোকটাই বললেন, ওদেরকে নাকি কেউ কেউ ঐ ময়ূরভঞ্জনা ধলভূমের দিকে আবার দেখেছে। ওরা নাকি আবার এই বাঙ্গালা মুলুকে এসেছে আর পথে পথে ঘুরছে।

চমকে উঠলেন শরীফ রেজা। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন কবে হুজুর? কবে তাঁরা এসেছেন?

ঃ কিছুদিন আগে হবে বোধহয়। সে লোক তা সঠিকভাবে বলতে পারেননি। তাঁরও তো শোনা কথা। যারা দেখেছে তারাই নানাজনকে বলেছে। অন্যের কাছে তাঁর এসব শোনা কথা।

ঃ শোনা কথা?

ঃ কবে দেখেছে তা এ লোক জানে না। তা যাক, ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই।

ঃ হুজুর!

ঃ তাদের সদেচ্ছা কিছু থাকলে তো আমার এখানে আসতে পারতো তারা? আর কাউকে না চিনুক আমাকে তো মেয়ের মা, মানে ঐ মাননৃপতির স্ত্রীর না চেনার কথা নয়।

কথাটা ন্যায্য কথা। শরীফ রেজা তা উপলব্ধি করলেন আর তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন — ঠিক হুজুর, ঠিক। ওরা মেনে কোন দিন নেননি, নেবেনও না। খামাখা ও প্রসঙ্গ টেনে লাভ নেই হুজুর। ওদের কথা বাদ দিন।

ঃ হ্যাঁ। সেই ভাল। যে কাজে আছো তুমি এই কাজটাই একিন দীলে করে যাও। আল্লাহ তায়ালা তুষ্ট হলে, তোমার দীলের তুষ্টি তিনিই বিধান করবেন।

শরীফ রেজা উৎসাহের সাথে বললেন — আমাকে দোয়া করুন হুজুর, বিনিময় কিছু পাবো কিনা সেটা কোন কথা নয়। আমি যেন আল্লাহ তায়ালার তুষ্টি হাসিল করতে পারি।

খুশী হলেন শায়খ সাহেব। তিনি সোচ্চার কণ্ঠে বললেন — পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা তোমার সহায় হোন।

১১

লড়াই শুরু হয়ে গেল। তুমুল লড়াই। আলাউদ্দীনের চেরাগের দুই দৈত্যের লড়াই। দুই দৈত্যের হুংকারে কেঁপে গেল আসমান জমিন, চমকে গেল চারপাশের জ্বিন-ইনসান, জীব-জানোয়ার!

এই দুই দৈত্যের এক দৈত্য ভুলুয়ার সদরের। ইনি আদিল খাঁ আফগান। অপরটি ভুলুয়ার মফস্বলের। বলা বাহুল্য, দবির খাঁ পালোয়ান। অকস্মাৎ এই দুই দৈত্ত মুখোমুখী হয়ে গেল। আর পহেলী মোলাকাতেই আচানক অগ্ন্যুৎপাত!

সোনার গাঁয়ে থাকতেই ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের সাথে শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের কন্যা ফরিদা বানু বেগমের যথেষ্ট ঘনিষ্টতা ছিল। তাঁকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করতেন ফরিদা বানু। বড় আব্বা বলে ডাকতেন। ফৌজদার সোলায়মান খানও বরাবরই স্নেহপরায়ণ ব্যক্তি। তিনিও ফরিদাকে কন্যাবৎ স্নেহ করতেন। ভুলুয়ার সদরে এসে খান সাহেবের সাথে একাধিকবার মোলাকাতের ফলে খান সাহেবের মকানে ভ্রমণ করতে আসার প্রবল এক সখ জাগে ফরিদা বানুর দীলে। ইদানিং আবার খান সাহেবের মকানই শরীফ রেজার হাল অবস্থান হওয়ায়, তাঁর সেই সখটা আরো জোরদার হয়ে উঠে। আর না হোক ঐ লাজুক সরল লোকটার সাথে বেশ খানিকটা চুটিয়ে গল্প করা যাবে। পিতার কাছে ফরিদা বানু প্রস্তাব পেশ করলেন।

শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবও মেয়ের প্রতি অতিশয় স্নেহশীল ছিলেন। তাঁর কোন আকাঙ্খাই পারতপক্ষে অপূরণ তিনি রাখেন না। এবারও রাখেননি। প্রস্তাব অতি সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য হওয়ায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তাব অনুমোদন করে খান সাহেবের মকানে ফরিদাকে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে দিলেন নির্ভরশীল অভিভাবক আদিল খাঁ আফগানকে এবং পথের মাঝে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে জাফর আলী আপাততঃ অনুপস্থিত থাকায়, ইনসান আলীকে পাঠালেন কয়েকজন পাইকসহ।

ফরিদা বানু যে সময় খান সাহেবের মকানে এসে পৌছলেন, শরীফ রেজা সে সময় ভুলুয়াতে ছিলেন না, তখন তিনি গৌড়ে। ঘটনা চক্রে ফৌজদার সাহেবও সেই মুহূর্তে মকানে হাজির ছিলেন না। পাশেই কোথায় গিয়েছিলেন। ফলে, পরিচিত লোকজন কোন কাউকেই না পেয়ে জেনানাদের তালাশে ফরিদা বানু অন্দর মহলে গেলেন। পাইক পেয়াদা নিয়ে ইনসান আলী বসে রইলেন দহলীজে। আদিল খাঁ আফগান ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পল্লীর সাথে কিছুটা পয়পরিচয় থাকলেও, প্রত্যন্ত এলাকার এতটা গভীরে আদিল খাঁন আফগান বড় একটা আসেননি। এখানে এসে দেরাখ্‌-ঘেরা-বসতি আর ছায়াঘেরা পথ দেখে তিনি মনের সাধে হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ফৌজদার সাহেবের বাহির আঙ্গিনা পেরিয়ে শরীফ রেজার ঘরের সামনে চলে এলেন। এবং পশ্চিমমুখী পথ ধরে কনকলতার মকান বরাবর চলতে লাগলেন। পরিচ্ছন্ন পথ আর ঝিরঝিরে হাওয়া রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘপথ পরিভ্রমণের শ্রান্তি আদিল খাঁ এই পূবাল হাওয়া বিমোহিত ছায়া ঢাকা পথে এসে জিরিয়ে নিতে লাগলেন। আরামের পরশে আদিল খাঁ ক্রমেই আনমনা হয়ে উঠলেন এবং অর্ধোন্মীলিত নয়নে ধীর লয়ে হাঁটতে হাঁটতে গুনগুনিয়ে গান ধরলেন—"কেয়া তাজ্জব ইয়ে দুনিয়া আওর জিন্দেগীকা খেল —"

আকাশ বাতাস প্রকম্পিত বিকট এক শব্দে আদিল খাঁ লাফিয়ে উঠে দেখলেন — তাঁর নিজের জিন্দেগীর খেল তখন চরম হুমকির সম্মুখীন। তাঁর মতোই বিশাল দেহের অন্য এক পালোয়ান হাতে ধরা বল্লমের সুতীক্ষ্ণ ফলাটা তাঁর বুকবরাবর বাগিয়ে ধরে বাঘের মতো ফুঁসছে।

এ পালোয়ান দবির খাঁ। এই সংরক্ষিত এলাকার অতন্দ্রপ্রহরী। দবির খাঁ দেখলো, বিশাল আকার এক ব্যক্তি এক পা দু'পা করে চুপি চুপি সিধা আম্মিজানের মকানের দিকে এগুচ্ছে। দেখা মাত্রই চমকে উঠলো দবির খাঁ। এ লোক এ অঞ্চলের নয়। বিলকুল অচিন লোক। তৎক্ষণাৎ তার খেয়াল হলো, জরুর এ আদমীর বদমতলব আছে। ত্রিবেণীতে তালাশ করে না পেয়ে জরুর সে আম্মিজানের সন্ধানে ভুলুয়াতে এসেছে। নির্ঘাত সে আম্মিজানকে পাকড়াও করতে চায়।

এই খেয়াল তাঁর মাথায় আসতেই সে এক লাফে আদিল খাঁর সামনে এসে পড়লো এবং বল্লম বাগিয়ে ধরে বাঘের মতো গর্জে উঠলো — রোখ যাও —

আদিল খাঁ আফগান চমকে উঠে দাঁড়াতেই দবির খাঁ ফের বললো — মউত! মউত তেরা নযদিক।

হতভম্ভ হয়ে আদিল খাঁ বললেন — মউত!

একই রকম বিক্রমে দবির খাঁ বললো — আলবত। তুম কৌন হো?

আদিল খাঁ এর জবাবে বললেন — পর দেশী।

ঃ কেয়া? পরদশী? তব্‌ মউত কে লিয়ে তৈয়ার হো যাও।

বল্লম হাতে দুস্‌রাবার লাফিয়ে উঠলো দবির খাঁ। তা দেখে আদিল খাঁ সঙ্গে সঙ্গে একপাশে সরে এলেন এবং যারপরনেই তাজ্জব কণ্ঠে বললেন — আরে মুসিবত! কসুরটা আমার কি, তাতো আগে বলবে?

ঃ কসুর? তুমি তো জরুর এক লুটেরা, এক চোট্টা আদমী।

ঃ চোট্টা আদমী! ম্যয়?

ঃ বিলকুল। খন্নাস আদমী। মওকা পেয়েই ঢুকে পড়েছো। আজ আর তোমার রেহাই নেই। — বলেই সে উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিলো — আরে ও মুইজুদ্দীন মিয়া? ওই সেতাবউদ্দীন — আব্বাস আলী? জলদি ইধার আও! ছালে জব্বোর এক খন্নাস আদমী কো পাকোড় লিয়া হাম্‌। জলদি আও —

দবির খাঁর এই অহেতুক আচরণে রাগ হলো আদিল খাঁরও। তিনিও ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন—আব্বে চোপ্‌ রও! এসব কি বলছো উল্লুকের মতো?

আর একবার লাফিয়ে উঠলো দবির খাঁ। সগর্জনে বললো—কিয়া কাহা?

ঃ তুমি বিলকুল একটা দিউয়ানা আদমী! একটা গিদ্ধর! ভাগ্‌ যাও হিয়াছে —

ব্যস্‌! যেটুকু হুঁশ বুদ্ধি দবির খাঁর ছিল সে টুকুও গেল। আর এক লাফে এসে সে একদম আদিল খাঁর মুখের সামনে পড়লো এবং বল্লম বাগিয়ে ধরে হাঁক দিলো — হুঁশিয়ার বেঈমান —

তলোয়ার টেনে বের করে আদিল খাঁও হুংকার দিলেন — খামুশ কমবখ্‌ত!

শুরু হলো লড়াই। একে অপরকে আঘাত করার কায়দা খুঁজতে গিয়ে ঐ বিশাল দেহী দুই পালোয়ান সমানে লাফাতে শুরু করলো।

হৈ চৈ শুনে ইতিমধ্যেই রাস্তার দিকে ছুটে এলেন কনকলতা, হরিচরণ দেব ও পদ্মরাণী। ওদিকে থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকজন সঙ্গীসহ মুইজুদ্দীন। দবির খাঁর মকান থেকে বেরিয়ে এলো সশস্ত্র সেতাবউদ্দীন, আব্বাস আলী ও আরো কয়েকজন।

হুলুস্থূল কাণ্ড! সবাই গিয়ে আদিল খাঁকে ঘিরে ধরার উদ্যোগ করতেই ছুটে এলেন ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব। বাইরে থেকে ফিরে বাড়ীর দিকে আসতেই তিনি গোলমাল শুনে সরাসরি এই দিকে ছুটে এলেন। এসেই এদের এই অবস্থায় দেখে তিনিও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে রণলীপ্ত দুইজনকে কড়া একটা ধমক দিয়ে বললেন — আরে এই-এই, খবরদার! কি হচ্ছে এসব?

বিপর্যস্ত আদিল খাঁ ফৌজদার সাহেবকে দেখেই ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন — দেখিয়ে, দেখিয়ে হুজুর। ইয়ে পাগেলা আদমী কো কেয়াগজব, ঘোড়া দেখিয়ে —

দবির খাঁও চীৎকার করে বলতে লাগলো — ডাকু, লুটেরা, খন্নাস আদমী! মওকা পেয়েই —

পুনরায় ধমকে উঠলেন ফৌজদার সাহেব। বললেন — খামুশ্।

চমকে উঠে দবির খাঁ নিষ্ক্রীয় হয়ে গেল। ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব সেই সাথে আদিল খাঁ আফগানকেও শক্ত কণ্ঠে বললেন — এ কিয়াবাত আদিল খাঁ? তুমি কোত্থেকে এসে এই পাগলের সাথে পাগলামী শুরু করেছো?

বন্ধ হলো লড়াই। আদিল খাঁ আফগান এবার তামাম কাহিনী বর্ণনা করে শোনালেন। শুনেই ফৌজদার সাহেব উল্লাসভরে বলে উঠলেন — আরে সে কি! কখন এসেছো তোমরা? ফরিদা আম্মাও এসেছে? মারহাবা-মারহাবা! এসো-এসো, মকানে এসো চট্‌পট্। কি যেসব্ আজগুবী কাণ্ড!

ফৌজদার সাহেবের ভাব দেখে আরো অধিক ঘাবড়ে গেলো দবির খাঁ। সে ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো — কেয়া হুজুর, এ লোক তাহলে কোন ডাকু নয়?

আবার একটা ধমক দিয়ে ফৌজদার সাহেব বললেন — থামো! তোমার হুঁশবুদ্ধি কি কিছুই আর রইলো না? দিনে দিনে তামামই খতম হয়ে গেল?

ঃ হুজুর!

ঃ মেহমান-মেহমান। শাহী মেহমান।

ঃ কেয়া গজব! মেহমান?

ঃ বহুত পেয়ারা মেহমান।

ঃ তব্ জব্বোর গল্‌তি হো গিয়া।

দবির খাঁ শরমে মাথা নীচু করলো। তার প্রতি ইংগিত করে আদিল খাঁ প্রশ্ন করলেন — এ আদমী কৌন হ্যায় হুজুর? কোথাকার লোক?

জবাবে ফৌজদার সাহেব বললেন — আমার লোক। আমার নিজের লোক। বিলকুল ভাই বরাবর।

ঃ এঁ্যা!

ঃ মাথায় একটু ছিট আছে এই যা। নইলে বহুত আচ্ছা আদমী

আদিল খাঁও শরম পেলেন। দুই ধাপ এগিয়ে এসে দবির খাঁকে বললেন — বিলকুলই এটা পয়চান করতে না পারার গজব। কেউ কাউকে চিনি না আমরা, তাই। এর জন্যে কসুর নেবেন না ভাই সাহেব।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দবির খাঁ বললো — মেরা কসুর-মেরা কসুর, বিলকুল মেরা কসুর! আমাকে মাফ করে দিন দোস্ত।

ঃ নেহি-নেহি। আপ আগারী মাফ কিজিয়ে হামকো।

ঃ জরুর নেহি। আপ আগারী মাফ কিজিয়ে ইয়ে নাদানকো — ইয়ে গুনাহ্- গারকো —

ঃ কভ্‌ভি নেহি। আপ্ আগারী —

আর এক ফ্যাসাদের সম্ভাবনা দেখে ফৌজদার সাহেব এই সমস্যার ফয়সালা করে দিলেন। বললেন — থাক-থাক, কেউ কাউকে মাফ করতে হবে না। আজ থেকে তোমরা দুইজন দুইজনের দোস্ত। মিল হো যাও আপ্ আপ্‌কা দোস্ত্‌কো সাথ্!

সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠলো দুই পালোয়ান। "দোস্ত্, মেরে দোস্ত্" — বলে এক সাথে আওয়াজ দিয়ে দুই পালোয়ান ছুটে এসে বিপুল আবেগ ভরে একে অন্যের সিনার সাথে এমনভাবে সিনা লাগিয়ে দিলো, যেন হিমালয় আর হিন্দুকুশ পর্বত দু'টি অজ্ঞাত এক কারণে একের উপর অন্যে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

আদিল খাঁর বর্ণনা শুধু ফৌজদার সাহেবই শুনলেন না, কনকলতা — পদ্মরাণী সহকারে সকলেই শুনলেন। সকলেই শুনলেন, ভুলুয়ার সদর থেকে কয়েকজন মেহমান খান সাহেবের মকানে এসে পৌঁছেছেন। খান সাহেব বা অন্য কোন পরিচিত জন না পেয়ে তাঁরা নানাজন নানাস্থানে অবস্থান করছেন। আদিল খাঁ রাস্তায়, ইনসান আলী দহলীজে আর ফরিদা বানু অন্দর মহলে। ফরিদা বানু অন্দর মহলে মেজবানের খোঁজে গিয়েছেন। এখনও তাঁরা যথাযথ আহবান আশ্রয় পাননি।

কনকলতা আরো অধিক মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, ভুলুয়ার প্রশাসক খোদ শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের কন্যা ফরিদা বানু বেগম এখানে এসেছেন এবং এখন তিনি ফৌজদার সাহেবের অন্দর মহলে আছেন। এই সেই ফরিদা বানু যাঁর সম্বন্ধে তিনি ফৌজদার সাহেবের কাছে ইতিমধ্যে অনেক কথাই শুনেছেন যা তাঁর দীলের শান্তি হরণ করার উপক্রম করেছে। এ ছাড়া এই ফরিদা বানু এমনই এক মেহমান যাকে দাওয়াত করেও ভুলুয়ার এই পল্লীতে পাওয়া সহজ সাধ্য নয়। অথচ তিনি নিজে আজ উপযাচক হয়ে এসে অনাহারভাবে ঘুরছেন। কনকলতার জন্যে ফরিদা বানু আজ এক দুর্বার আকর্ষণ।

এ খবর শুনামাত্রই কনকলতা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইশারা দিলেন পদ্মকে এবং ঐ দুই দৈত্যের দোস্তী নিয়ে কুস্তি চলার আগেই তিনি পদ্মরাণীকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুতপদে ফৌজদার সাহেবের মকানের দিকে ছুটলেন।

দবির খাঁ ও আদিল খাঁর মধ্যে দোস্তী স্থাপন করার পরেই আদিল খাঁকে সঙ্গে নিয়ে ফৌজদার সাহেবও শশব্যস্তে দহলীজে ছুটে এলেন এবং সঙ্গী সাথী সহকারে ইনসান আলীকে উদাসভাবে বসে থাকতে দেখে তিনি অত্যন্ত কষ্টবোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর লোকজনদের ডেকে অতিথিদের আতিথেয়তার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বললেন আর সেই সাথে এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে ইনসান আলীদের কাছে তিনি বিনয়ের সাথে মার্জনা চেয়ে নিলেন। অবশ্য, মার্জনা চাইতে গিয়ে ইনসানদের কেবলই তিনি লজ্জিত করে তুললেন।

চাকর-নফর লোক-লস্কর সংখ্যায় অনেক হলেও ফৌজদার সাহেবের সংসার একক মানুষের সংসার। তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে দবির খাঁর বা কনকলতার হুকুম নির্দেশ ছাড়া, কোন লোকের মেহমানদারীর ব্যাপারে অন্য কেউ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বিশেষ করে কনকলতার নির্দেশ এখানে বিশেষভাবে প্রয়োজন। অথচ সেই কনকলতা জানেনই না এসব খবর। দবির খাঁও ওদিকে তার পাগলামী নিয়ে ব্যস্ত। কাজেই, ফরিদা বানু অন্দর মহলে এসে দাস-দাসীদের কার হাওলায় কোন হালতে আছেন, এসব ভেবে ফৌজদার সাহেব পেরেশান হয়ে পড়লেন। ইনসান আলী সাহেবদের ব্যবস্থা করে দিয়েই তিনি অত্যন্ত সংকুচিত চিত্তে অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন। কিন্তু অন্দর মহলে এসেই তাঁর অন্তরের তামাম মেঘ কেটে গেল। তিনি খোশদীলে দেখলেন, এ নিয়ে তাঁর ব্যস্ত হওয়ার অপেক্ষাই কিছু নেই। কনকলতা ইতিমধ্যেই এসে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে সে দায়িত্ব।

দায়িত্ব নেয়ার খাতিরেই শুধু দায়িত্ব নেয়া নয়, কনকলতা এসে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে ফরিদা বানুর আরাম ও স্বাচ্ছন্দ নিশ্চিত করতে লাগলেন। অন্দর মহলের ঝামেলা থেকে সরিয়ে ফরিদা বানুকে তৎক্ষণাৎ তিনি শরীফ রেজার নিরিবিলি ও মুক্ত কক্ষে নিয়ে এলেন এবং কয়েকজন দাস-দাসীকে তার পরিচর্যায় নিয়োগ করলেন। ইতিমধ্যে মুইজুদ্দীন মালিক এসে হাজির হলে, পদ্মরাণীকে সাথে দিয়ে মুইজুদ্দীন মালিককে তিনি অন্যান্য মেহমানদের তত্ত্বাবধানে পাঠিয়ে দিলেন এবং ফরিদা বানুর তত্ত্বাবধান নিজের হাতে রাখেন।

কনকলতার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলেন ফরিদা বানু। এ মকানে তাঁর এই অপরিসীম আধিপত্য দেখে অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন তিনি। ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের নিজের কোন মেয়ে নেই — এটা তিনি জানতেন।

তাই কনকলতার ব্যতিব্যস্ততা খানিকটা স্তিমিত হয়ে এলেই তিনি কনকলতাকে প্রশ্ন করলেন — আপনাকে তো সঠিক আমি চিনলাম না বহিন ? আপনি কি বড় আব্বার মানে এই ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের কোন আত্মীয়া ?

এ প্রশ্নের জবাবে কনকলতা মৃদু হেসে বললেন — জি না আপা। আপনার ঐ বড় আব্বার সাথে আমার কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। আপনাদের স্বজাতীও নই আমি। তবে আপনার ঐ বড় আব্বা আমারও বড়বাপ। আমিও তাঁকে বড়বাপ বলে ডাকি।

চমৎকৃত হয়ে ফরিদা বানু বললেন — তাই নাকি ? তা আপনার নামটা ?

ঃ আমার নাম কনকলতা। কিন্তু এ মকানের কেউই আমাকে ও নামে ডাকে না। সবাই আমাকে আম্মি বা আম্মিজান বলে ডাকেন।

উৎসাহিত হয়ে উঠে ফরিদা বানু — হ্যাঁ হ্যাঁ, এই রকমই একটা নাম বড় আব্বার মুখে কয়েকবার শুনেছি। শরীফ রেজা সাহেবও হয়তো বলে থাকবেন দু' একবার। তা আপনিই সেই মেয়ে ?

ঃ জি আপা।

ঃ আপনি এই মকানেই থাকেন ?

ঃ জিনা। এই সামনেই মানে এখান থেকে সামান্য একটু পশ্চিম দিকে এগুলোই আমার বাড়ী। তবে বড়বাপের নিজের লোক কেউ নেই তো ? সবাই চাকর-বাকর আর বাইরের লোক। তাই আমাকেই হর হামেশা এ বাড়ীর অনেক কিছু দেখতে হয়।

ঃ তাজ্জব! এতো বড় খুশীর ব্যাপার!

কনকলতা ব্যস্ত থাকায় সেই মুহূর্তে আর আলাপ বেশী এগুলো না। কিন্তু অতপর ক্রমেই কনকলতার আচরণে ফরিদা বানু অধিকতর প্রীত ও উৎফুল্ল হতে লাগলেন। উভয়ের সম্পর্ক খানিক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলে, এক অবসর মুহূর্তে ফরিদা বানু হাসিমুখে কনকলতাকে বললেন — যাক বহিন, আপনাকে এখানে পেয়ে আমার এই ভেস্তে যাওয়া সফরটা সার্থক হয়ে উঠলো।

জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে কনকলতা বললেন — কি রকম ?

ফরিদা বানু বললেন — যাঁকে বিশেষভাবে উদ্দেশ্য করে আমার এখানে আসা, এসে তাঁকে না দেখে আমি তো একদম হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। এসে যখন শুনলাম, তিনি এখন নেই এখানে, তখন ভাবলাম — যাঃ! আমার এই সফরটা স্রেফ মাটি হয়েই গেল! কিন্তু বহিন, আপনাকে পেয়ে সে অভাব আমার বিলকুলই পূরণ হয়ে গেছে। দীলে আমার আর কোন আফসোস্ নেই।

ঃ আপা!

ঃ সত্যিই আপনি বড় অদ্ভুত মেয়ে বহিন!

অত্যন্ত উৎসুকভাবে কনকলতা প্রশ্ন করলেন — আপনি কার কথা বলছেন আপা ? কাকে উদ্দেশ্য করে আপনি এখানে —

কনকলতার কথার মাঝেই ফরিদা বানু কলকণ্ঠে বললেন — শরীফ রেজা শরীফ রেজা! শরীফ রেজা সাহেব এখানে আছেন জেনেই তো এত চটপট আমার আসা।

ঃ শরীফ রেজা সাহেব ?

ঃ হ্যাঁ। চেনেন না আপনি তাঁকে ? এখানেই তো থাকেন, এই মকানেই ?

কনকলতা স্মিতহাস্যে বললেন — কেন চিনবো না ? এ মকানে কাকে না আমি চিনি ?

ঃ তাহলে ? উনি নাকি এখন —

ঃ ঐ লাখ্‌নৌতির ওদিকে গেছে।

ঃ এই দেখুন, তাহলে তো জানেন আপনি অনেক কিছু। তা এখানে উনি কোন চত্বরে থাকেন বহিন ?

কনকলতা আর একবার একটু হাসলেন। হেসে বললেন — এই ঘরেই থাকেন উনি। এইটেই উনার ঘর।

সঙ্গে সঙ্গে ফরিদা বানু যে কাণ্ড করলেন, তা দেখে কনকলতা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই ঘরই শরীফ রেজার — একথা শুনামাত্রই উল্লাসে নেচে উঠলেন ফরিদা বানু বেগম। অত্যন্ত আবেগ ভরে বললেন — ওমা সেকি! এই ঘরেই আমাকে এনে ঠাঁই দিয়েছেন আপনারা ? ওহ্! কি আনন্দ! কি নসীব! যাক, বেয়াড়া ঐ লোকটার দেখা না পেলে কি হবে, তাঁর পালংকে এসেতো আমি গড়াগড়ি দিয়ে গেলাম!

— বলেই অমনি ফরিদা বানু বিছানার উপর গড়িয়ে পড়লেন এবং হাসির তুফান তুলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। স্তম্ভিত কনকলতা এবার সবিস্ময়ে বললেন — উনাকে এতো বেশী চেনেন আপনি ?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন ফরিদা বানু বেগম। বললেন — চিনবো না মানে ? তাঁর মতো এমন মানুষ কটা আছে এই দুনিয়ায় ? এতবড় বীর অথচ কি শিশুর মতো সরল! কি সফেদ তাঁর দীল! দেখলেই ভাল না বেসে পারা যায় না।

ঃ বলেন কি ?

ঃ কেন, জানেন না আপনি ? শুনেননি কিছু ?

ঃ কোন কথা ? তাঁর দীলের কথা ?

ঃ দীলের কথা না হোক তাঁর বীরত্বের কথা শুনেননি আপনি আজও ? তাঁর মতো বীর এ তল্লাটে খোঁজ করে বড় একটা পাবেন না। ইচ্ছে করলে তিনি

এতদিন দু'পাঁচটা এলাকা জয় করে নিজেই অমন রাজা বাদশা বনে যেতে পারতেন। কিন্তু তাতো উনি করবেন না। সুফী দরবেশ আর অলি আল্লাহ লোকের উনি খাদেম। তাঁদের সাথে বাস! রাজ্য-ঐশ্বর্য এঁদের কাছে খোলাম-কুচির মতোই অতি তুচ্ছ পদার্থ। আর এ জন্যেই তিনি ওদিকে নজর দেননি। উনি শুধু নিজের জাতি আর ধর্মের খেদমত করতে চান।

ঃ তাই নাকি ? তাঁর এত খবরও জানেন আপনি আপা ?

ঃ জানবো না ? আমার আব্বাই তো তাঁর হুজুরের কাছে আর বড় আব্বার কাছে শুনেছেন এসব। এই বড় আব্বা বলেন — শরীফ রেজার যা সামর্থ, তাতে ইচ্ছে করলে সে ঐ পশ্চিম মুলুকের ছোট ছোট হিন্দু রাজাদের অনেক রাজ্য জয় করে নিজেই একটা নয়া রাজ্য স্থাপন করতে পারতো। কিন্তু সে শিক্ষা তাকে দেয়া হয়নি। লোভ-মোহের উর্ধে থাকার এলেমই সে পেয়েছে।

এবার ফাঁক পেয়ে কনকলতা সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন — এতই যদি বীর, তাহলে এ মুলুকটা এতদিন স্বাধীন করতে পারছেন না কেন তিনি ? শুনি, উনি নাকি এই বাঙ্গালা মুলুকটা আজাদ করতে চান ?

জবাবে ফরিদা বানু বললেন — সে কথা আলাদা বহিন। গোটা বাঙ্গালা মুলুক আজাদ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এটা একার ব্যাপারও নয়। দু' পাঁচটা সামন্ত রাজ্য জয় করা আর গোটা বাঙ্গালা মুলুক আজাদ করা সম্পূর্ণ পৃথক কথা।

ঃ ও, আচ্ছা। তা উনার আপনি ভেতর-বাহিরের অনেক কথা জানেন দেখছি।

ঃ হ্যাঁ বহিন। জানি বলেই তো দুঃখ। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কাছে রাখতে পারলাম না। অথচ বেচারা কত অসহায়!

ঃ অসহায়!

ঃ মরে গেলেও মুখ ফুটে নিজের দুঃখ কষ্ট বা অসুবিধার কোন কথাই উনি কারো কাছে বলবেন না। এক পেয়ালা পানিও উনি কারো কাছে চাইবেন না। বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন নেই। নিজের জানের উপর মায়াদরদও নেই। যতক্ষণ কাছে পাই ততক্ষণই কিছুটা তাঁর দুঃখ মোচন করতে পারি। স্নেহ-মহব্বত দিয়ে জানের প্রতি তাঁর কিছুটা আগ্রহ পয়দা করতে পারি। কিন্তু সব সময়তো তাঁকে কাছে রাখতে পারছিনে।

ঃ সবসময় ?

ঃ হ্যাঁ। আমার ইচ্ছে তো তাই। কিন্তু তাঁর ইচ্ছে থাকলেও তো তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না সেটা।

ঃ কেন ?

ঃ তাঁর আসল কাজটাই যে এই বড় আব্বার সাথে। যে কাজে এখন তিনি

আছেন তাতে তো এক জায়গায় বসে থাকার উপায় তাঁর নেই। বিশেষ করে ফৌজদার সাহেবের পরামর্শ তাঁর সবসময়ই দরকার। তাই ভুলুয়ার সদরে না থেকে উনি ভুলুয়ার এই মফস্বলে থাকায় আমি নাখোশ কিছু হইনি।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আমার আব্বাও তাঁকে যথেষ্ট ভালবাসেন। তবু তাঁকেও এ অবস্থা মেনে নিতে হচ্ছে।

ঃ আপা!

ঃ আপনি একটু মেহেরবানী করে ঐ বেচারার প্রতি নজর রাখবেন বহিন। বড় লাজুক মানুষ এই শরীফ রেজা সাহেব। যে কয়দিন এখানে উনি থাকেন তাঁর আহার-বিহার সুখ-স্বাচ্ছন্দের কোন অসুবিধা যাতে করে না হয়, সে দিকে আপনি দয়া করে বিশেষভাবে নজর রাখবেন। তাঁর কষ্ট হলে দীলে আমার ভয়ানক চোট্ লাগবে।

তাঁর কষ্ট হলে ফরিদা বানুর দীলে ভয়ানক ছোট্ লাগবে — এটা ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু এইক্ষণে — এই বর্তমানে কনকলতার দীলে যে চোট্টা লাগলো, একমাত্র আলেমুল গায়ের ছাড়া তা অনুভব ও নিরুপণ করার আর কেউ ছিল না। ফরিদা বানুর আচরণে ও কথায় কনকলতার স্বপ্নঘেরা সুরম্য ইমারতে বিশাল এক ফাটল ধরে গেল। ফরিদা বানুর একদিনের একথাতেই হয়তো এতটা ফাটল ধরতো না, ধরলো ফৌজদার সোলায়মান খান কর্তৃক পূর্ব-রচিত পটভূমির জন্যে।

শরীফ রেজার লাখ্নৌতিতে চলে যাওয়ার কিছুদিন পরের কথা। কনকলতার সাথে একদিন এক নিরিবিলি মুহূর্তে ফৌজদার সাহেবই কথায় কথায় তুলে বসলেন কথাটা। শরীফ রেজাকে নিয়ে কথা বলতে বলতে তিনি ফরিদার কথায় এলেন এবং শরীফ রেজার প্রতি ফরিদা বানুর দরদের কথা বলতে গিয়ে বললেন — তা যা-ই বলো আম্মি, ঐ ফরিদা বানু বেগমটা জব্বোর পেয়ার করে শরীফকে। ভুলুয়ার সদরে গিয়ে কোন কারণে শরীফ যদি ফরিদার সাথে সাক্ষাৎ করতে দেরী বা গাফিলতি করে, তাহলে আর ফরিদাকে রোখে কে? রাগে অভিমানে এক হুলুস্থুল কাণ্ড করে ছাড়ে।

ফৌজদার সাহেবের এই কথায় কনকলতা সচকিত হয়ে উঠলেন। তিনি উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলেন — তাই নাকি? তাহলে তখন শরীফ রেজা সাহেবের ভূমিকাটা কি হয়, মানে তখন তিনি কি করেন?

ঃ কি করবে? সেও যে ফরিদার সঙ্গ খুব পছন্দ করে। ফরিদার হাতের

খেতে পেলে, তার সাথে গল্প করার মওকা পেলে, সেও তো বর্তে যায়! সে তখন এতিমের মতো দাঁড়িয়ে থেকে কেবলই মাফি মাঙে।

ঃ বলেন কি?

ঃ ঐ যে শরীফ রেজা সেবার পূব অঞ্চলে গিয়েছিল মনে আছে? মানে ঐ যে তোমার অসুখ হলো? ঐ পূব অঞ্চল থেকে ফেরার পর ফরিদার সাথে দেখা না করে স্রেফ তার আব্বার সাথে কথা বলেই সে চলে আসতে গিয়েছিল। আমিও তার সাথে ছিলাম সে সময়। ও বাবা! যেই আমরা ফটকের কাছে এসেছি, অমনি আমাদের সামনে পড়লো ফরিদা বানু। তারপর যা ঘটলো, তা দেখলে তুমি তাজ্জব হয়ে যেতে!

— বলেই হাসতে লাগলেন ফৌজদার সাহেব। কনকলতা প্রশ্ন করলেন — কি ঘটলো?

ফৌজদার সাহেব বললেন — ফরিদা বানু অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে রইলো। এরপর শুরু হলো শরীফ রেজার ক্ষমা ভিক্ষার পালা। কতভাবে যে বুঝিয়ে আর অনুনয় করে সে ফরিদাকে শান্ত করলো, তা দেখে নিজেরই আমার হাসি পেলো। আসলে দু'জনই তো দু'জনকে ভালবাসে খুব!

ঃ তারপর?

ঃ তারপর ঐ ভুল আর শরীফ রেজা করে না। পয়লা পয়লা শরমের জন্যে শরীফ রেজা ফরিদা বানুর খোঁজে অন্দরে যেতে সংকোচবোধ করতো। ফরিদা বানু নিজে সে শরমটা ভেঙ্গে দেয়ায় আর শাহ সাহেবের উৎসাহ পাওয়ায়, এখন ভুলুয়ার সদরে গেলে শরীফ রেজার প্রথম কাজ—অন্দর মহলে হাজিরা দেয়া। এ ছাড়া সদরে গিয়ে থাকার প্রশ্ন উঠলে, শরীফ রেজা এখন আর বাইরে কোথাও থাকে না। শাহ সাহেবের মকানেই তাকে থাকতে হয়, আর সে নিজেও সেখানে থাকাটা খুব পছন্দ করে।

কনকলতার দীলে ঝড় বইতে শুরু করলো। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন — বড়বাপ!

ফৌজদার সাহেব সাদা মানুষ। সাদা দীলে তিনি তার উপলব্ধি ব্যক্ত করে চলেছেন। কনকলতার কণ্ঠের এই বিবর্তন আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি আপনভাবে বললেন — আমার সাথে কাজ না থাকলে শরীফ রেজাকে ওরা হয়তো থাকতেই দিতেন না এখানে। শরীফ রেজার উপর ওঁদের যা-টান!

কনকলতা নির্জীব কণ্ঠে বললেন — আর শরীফ রেজা সাহেব? উনি কি করতেন?

ঃ শরীফ রেজাও আমাদের এখানে থাকতো না। ফরিদা বানু জিদ ধরলে শরীফ রেজা আর না করতে পারে?

ঃ ফরিদা বানুই বা জিদ ধরতে যাবেন কেন?

ঃ কেন যাবে না ? কোন উপযুক্ত ভাই বোন তার নেই। আম্মাও নেই। অনেকদিন আগেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। শূন্য মকানে সঙ্গী সাথীর প্রয়োজন নেই তার ? এখন তো পর দিয়েই তাদের সংসার। বিশেষ করে শরীফ রেজার মতো এমন একটা লোভনীয় ছেলে পেলে তাঁরা তাকে তো লুফে নেবেই।

দীল তাঁর পর্যুদস্ত হলেও সে দিনের সে ধাক্কাটা কনকলতা সম্বরণ করে নিয়েছিলেন। সরল সহজ বৃদ্ধমানুষ ফৌজদার সাহেব। হয়তো বা কি বুঝতে কি বুঝেছেন, তা নিয়ে পেরেশান হওয়া ঠিক নয় — এই ছিল কনকলতার সে দিনের সান্ত্বনা।

সেদিনের সেই পটভূমির উপর খোদ ফরিদা বানুর আজকের এই ঢালাও স্বীকৃতি। দীলকে আর কনকলতা প্রবোধ দেন কি দিয়ে ? সুদীর্ঘ সময় ধরে হৃদয়ের মাধুরী ঢেলে রসে গন্ধে ভরপুর যে সুরম্য প্রাসাদ কনকলতা দিনে দিনে নির্মাণ করে নিয়েছিলেন, ফরিদা বানু আজকের এই বিবৃতিতে ঝড়ে ভাঙ্গা নীড়সম সে প্রাসাদ পলকেই চুরমার হয়ে গেল। কনকলতা আজ সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন, শরীফ রেজা একমাত্র তাঁর একার সম্পদ নয়, অংশিদার আরো আছে এ সম্পদের। শরীফ রেজার দীলে তিনি একাই শুধু বিরাজমান নন, প্রতিদ্বন্দ্বি আরো একজন বিরাজ করছেন সেখানে। আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নেও কনকলতা উপলব্ধি করলেন তিনি এক অত্যন্ত দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বিনী। তাঁর তুলনায় ফরিদা বানু ঢের ঢের যোগ্য ও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। ফরিদা বানুর দাবী অনেক বেশী জোরদার ও ন্যায়সঙ্গত। ফরিদা বানুর দাবীর পাশে তাঁর দাবী সাগরের পাশে ডোবার মতোই কিঞ্চিৎকর। তিনি ভিন জাতির ভাসমান এক মেয়ে। অতীত তাঁর যা-ই হোক, বর্তমানে তিনি একজন অপরের আশ্রিতা ও পরান্নভোজী জীব। শরীফ রেজা শুধু একজন মুসলমানই নন, দরবেশ গোত্রের মুসলমান। ফরিদা বানুও একজন নিষ্ঠাবতী মুসলমান। তদুপরি তিনি একজন প্রশাসকের মেয়ে। ভবিষ্যতে সুলতানের মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনাও প্রশস্ত। কনকলতার পুঁজি বলতে রূপটুকুই। এ সম্পদে ফরিদা বানুও একেবারেই কাঙ্গালিনী নন। সুতরাং টানাটানি যতই করেন তিনি, শরীফ রেজা যে শেষ অবধি ফরিদার দিকেই গড়ে যাবেন, এ নিয়ে দ্বিরুক্তির বা সন্দেহের কোন অবকাশই তাঁর রইলো না। কনকলতা আজ নিশ্চিতভাবে বুঝলেন, বসে বসে তিনি শুধু ছাইয়ের দড়িই পাকিয়ে যাচ্ছেন এ যাবত।

ফরিদা বানু যে কটা দিন মেহমান হয়ে রয়ে গেলেন, কর্তব্যের খাতিরে

কনকলতা তাঁকে স্বাভাবিক ও সহজভাবে সঙ্গ দিয়ে গেলেন। তীব্রতম বেদনা দীলের মধ্যে চেপে রেখে, মুখে হাসি ফুটিয়ে কনকলতা ফরিদা বানুর মেহমানদারী করে গেলেন। ফরিদা বানু চলে গেলে ঘরে গিয়ে সরাসরি শয্যা নিলেন কনকলতা। কয়দিন আর ঘর থেকে বাইরেই বেরুলেন না। যখন তিনি বেরুলেন, তখন তিনি ভিন্ন মানুষ। সেই উচ্ছলতা নেই, সেই প্রফুল্লতা নেই, প্রাণের সেই স্বাভাবিক স্পন্দনও নেই। তখন তিনি গম্ভীর ও জীবনের প্রতি নিতান্তই এক অনাসক্ত মানুষ। ফৌজদার সাহেব সহকারে অনেকেই এটা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু কারণটা কিছু আঁচ করতে পারলেন না। দু' একবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সবাই তাঁরা বুঝলেন, তার অতীত জিন্দেগীর কোন না কোন একটা প্রসঙ্গ বা তার ভবিষ্যৎ জিন্দেগীর কোন একটা চিন্তা-ভাবনা তার মধ্যে এই পরিবর্তন এনেছে। ও নিয়ে কারো টানা হেঁচ্‌রা করতে যাওয়া ঠিক নয়।

শরীফ রেজা ফিরে এলেন। লাখনৌতির কাজ সেরে। শায়খ হুজুরের দোয়া নিয়ে ভুলুয়ায় ফিরে এলেন শরীফ রেজা। ফৌজদার সাহেবের মকানে এসে পৌঁছলে কনকলতা পূর্ববত তার খেদমতে এসে হাজির হলেন এবং যথা নিয়মে খেদমত করে যেতে লাগলেন। তবে প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অতিরিক্ত কথা বা অন্য কোন উৎসাহের মধ্যে গেলেন না। মান-অভিমান আলাপ-ঠাট্টার বাহুল্যের মধ্যেও না। স্বাভাবিকতা বজায় রেখে তিনি কলের মতো কাজ করে যেতে লাগলেন। স্পষ্টভাবে শরীফ রেজাকে বুঝতে কিছুই দিলেন না।

বেখাপ্পা কিছু লাগলেও কনকলতার আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলার মতো উল্লেখযোগ্য কোন প্রসঙ্গ শরীফ রেজাও পেলেন না। প্রেম-প্রীতির অভিব্যক্তি দীলের ব্যাপার, মনের জিনিস। কনকলতার কৃচ্ছতা যা, তা এইখানে। এই অভিব্যক্তির মধ্যে। আগের মতো সেই স্বতস্ফূর্ততা নেই। কেমন যেন এখানে একটা অকাল নেমে এসেছে। কিন্তু এটা কোন প্রশ্ন তোলার বিষয় নয়। এ নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা যায়ও না। তাছাড়া, প্রথম প্রথম কয়েকদিন লাখ্‌নৌতির কাজকর্মের অগ্রগতি ও অন্যান্য ঘটনাবলী নিয়ে শরীফ রেজা ফৌজদার সাহেবের সাথেই ব্যস্ত হয়ে রইলেন। অবসর যা পেলেন, তাও আবার ঘিরে রইলো লতা ওরফে লতিফা বানুর কথা। তাঁরা মা-বেটি দুইজনই ফের বাঙ্গালা মুলুকে এসেছেন এবং পথে পথে ঘুরছেন। এখন তাঁরা কোথায় আছেন, কেমন আছেন — এ উৎসুক্য মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেও তিনি পুরোপুরি ফেলে দিতে পারেননি। অসতর্ক মুহূর্তে আবার ঐ প্রসঙ্গ মনে এসে ঢুকছে। আর এতে করে তিনি সময় সময় আনমনা হয়ে পড়ছেন। প্রথম কয়দিন শরীফ রেজার এই ভাবেই কাটলো। কনকলতার মধ্যে কিছু ভাবান্তর। লক্ষ্য করা সত্ত্বেও তার উপর

গুরুত্ব দেয়ার প্রশস্ত অবকাশ তাঁর ছিল না। তিনি ভাবলেন, তাঁর দীর্ঘদিন অনুপস্থিতিরই চিরাচরিত প্রতিক্রিয়া ওটা। অল্প কথায় কনকলতার দীল খোলাসা হবে না। সময় নিয়ে বসতে হবে।

সেই সময় যখন এলো, তখনই ফের ডাক এলো ভুলুয়ার সদর থেকে। জরুরী এক আহবান। শরীফ রেজার অবিলম্বে ভুলুয়ার সদরে এসে হাজির হওয়া চাই-ই। আহবানকারিনী ফরিদা বানু ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের কাছে ঐই মর্মে তিনি বার্তা প্রেরণ করেছেন। বার্তা নিয়ে সদর থেকে বার্তা বাহক এসেছে। ফরিদা বানু কেমন করে জেনে গেছেন, সফর থেকে ফিরে এসেছেন শরীফ রেজা।

বার্তা পেয়ে ফৌজদার সাহেবও শরীফ রেজার উপর খুব চাপ সৃষ্টি করলেন। তাঁর কথা—দীর্ঘদিন গুজরান হয়ে গেছে। তার একবার যাওয়া উচিত সেখানে। বিশেষ করে ফরিদা এসে ঘুরে গেছে। তার ঘুরে যাওয়ার পর শরীফ রেজার সেখানে একবার যাওয়া খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। দিন কয়েক সেখানে গিয়ে কাটিয়ে ফের সে ফিরে আসুক এখানে।

শরীফ রেজা তৈয়ার হতে লাগলেন। অবশ্য তার আগে তিনি কথাটা কনকলতাকে জানালেন। এমনেতেই কনকলতার মেজাজ মর্জি থমথমে। তার উপর না জানিয়ে আবার কোথাও বেরুলে, তিনি বিলকুল বিগড়ে যাবেন। তাই, কনকলতাকে সামনে পেয়ে আগে কথাটা তাঁকে বললেন। শুনে কনকলতা বললেন—এতো করে বলেছেন যখন, তখন তো আপনার যাওয়াই উচিত একবার। আপনার পথ চেয়ে বেচারী হয়তো সকাল-সন্ধ্যে হরদম ঘর-বাহির করছেন!

নির্লিপ্তকণ্ঠে বলে গেলেন কনকলতা। শরীফ রেজা একথার গভীরে না গিয়ে খুশীতে ভরপুর হয়ে বললেন — তা যা বলেছেন! এই বার্তা পাঠানোর পর নির্ঘাত তিনি এখন আমার পথ চেয়ে বসে আছেন। এই এক অদ্ভুত মেয়ে বুঝলেন? আমার প্রতি মাত্রাধিক তার দরদ।

কনকলতা স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন — হ্যাঁ, তাতো বুঝতেই পারছি! উনি এখানে এ বাড়ীতে এসেছিলেন, তাতো শুনেছেন?

শরীফ রেজা উল্লাসভরে বললেন — হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি। কি তাজ্জব ব্যাপার দেখুন, একেবারেই এই গ্রাম অঞ্চলে আসবেন উনি, এটা চিন্তা করা যায়?

ঃ তাতো যায়-ই না। কিন্তু উনি কি জন্যে এখানে এসেছিলেন, তাকি জানেন?

ঃ কি জন্যে?

ঃ আপনার জন্যে।

ঃ আমার জন্যে!

ঃ হ্যাঁ ফৌজদার সাহেবের বাড়ীতে বেড়াতে আসাটা তাঁর স্রেফ একটা অজুহাত। আসলে এসেছিলেন আপনার খোঁজে।

খুশীতে শরীফ রেজার দুইচোখ চিকচিক করতে লাগলো। প্রশ্ন করলেন — কি করে বুঝলেন?

ঃ নিজেই উনি বললেন। এসে আপনাকে না পেয়ে উনি যে নিরাশ হয়ে গেছেন, — একথাও বললেন।

ঃ তাই? কি সাংঘাতিক কাণ্ড! এরপর আর না গিয়ে পারা যায় বলুন? না গেলে উনি ব্যথা পাবেন না দীলে?

ঃ অবশ্যই পাবেন। যে যাকে ভালবাসে সে তাকে তো সবসময়ই কাছে রাখতে চায়। বিশেষ করে মেয়েরা তাদের প্রিয়জনকে অল্প দিন না দেখলেই কাতর হয়ে পড়ে। কিন্তু এই আপনারাই তো বোঝেন না।

ঃ বুঝি বুঝি। কে বললে বুঝিনে? সেই জন্যেই তো জল্দি জল্দি যাচ্ছি আমি ওখানে। তা আপনার খবর কি? মানে আপনার সাথে এবার আমার আলাপই তেমন হলো না। আপনার শরীর নাকি মাঝখানে আবার খারাপ হয়েছিল?

কনকলতা এবার একটু ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললেন — যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই আগে যান তো! এক সাথে দুই দিক ধরে টানাটানি করবেন না।

ঃ জি?

ঃ এক সাথে দুই নৌকায় পা দিলে কোন নৌকাই পাওয়া যায় না। আমার খবর থাক। যেদিকটা সামলানো আপনার একান্ত প্রয়োজন, সেই দিকটাই সামলান আপনি গিয়ে।

বেসুরা লাগলো কথাটা। কিঞ্চিৎ চকিতভাবে শরীফ রেজা বললেন — মানে?

চাপসৃষ্টি করে কনকলতা বললেন — খামাখা সময় খাটো করছেন কেন? দেরী হলে দুঃখ পাবেন না উনি?

শরীফ রেজা খুশী হয়ে বললেন — তা ঠিক, তা ঠিক। আর আমার বিলম্ব করা ঠিক নয়।

ঘরে এসে শরীফ রেজা তৈয়ার হতে লাগলেন।

শরীফ রেজার চিন্তা ছিল বিক্ষিপ্ত। লাখ্নৌতি, লতা, শায়খ হুজুর, কনকলতা, ফরিদা বানু — চিন্তা-ভাবনার ঘুড়ি তাঁর সকল দিকেই ঘুরপাক খেয়ে ফিরছিলো। কনকলতার চিন্তা ছিল এক কেন্দ্রিক ও নির্দিষ্ট। তিনি ছিলেন শরীফ রেজার মনের গতি নিরিক্ষণে। বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ভাবনা কোন কিছুরই

গভীরে না যাওয়ায় কনকলতা কি তালাশ করছেন, শরীফ রেজা তা বুঝলেন না। তিনি খুশী হয়ে সদরে চলে গেলেন। কনকলতা তাঁর বুঝার ব্যাপার গভীরভাবে বুঝে নিয়ে বিধ্বস্ত দীলে ঘরে ফিরে ডুকরে উঠলেন বেদনায়। শয্যার উপর আছড়ে পড়ে উন্মাদিনীর মতো তিনি কেবলই গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

পদ্মরাণী ব্যাপারটা আগেই আঁচ করেছিল। কনকলতার ঐ অবস্থা দেখে সে ছুটে এসে কনকলতার পাশে বসলো এবং নানাভাবে কনকলতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। পদ্মরাণী বললো — শান্ত হোন দিদিমণি! এতটা ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন?

মর্মদাহে পুনরায় ডুকরে উঠলেন কনকলতা। আর্তনাদ করে বললেন— পদ্মরে! এ কি হয়ে গেল আমার?

পদ্মরাণী বললো — কিছুই হয়নি দিদিমণি। সবকিছু সঠিকভাবে না জেনে এতটা উতলা হওয়া ঠিক নয়।

ঃ পদ্ম!

ঃ তাঁর মতো মানুষ এত সহজে আপনাকে ভুলে গিয়ে অন্যদিকে মন দেবেন, এটা হতে পারে না দিদিমণি।

ঃ কিন্তু আমি যে নিজের চোখে দেখলাম আর নিজের কানে শুনলাম। সঠিকভাবে জানার আর বাঁকী রইলো কি?

ঃ তবুও আমার সন্দেহ আছে দিদিমণি। ছোট হুজুর আপনাকে ছাড়া আর কারো কথা ভাবতে পারেন — এটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। হয়তো উনাদের মধ্যে অন্য কোন সম্পর্ক আছে।

ঃ অন্য কোন সম্পর্ক! একেবারেই অপর দুইজন যুবক-যুবতীর মধ্যে এত গভীর টান আর কোন্ সম্পর্কে পয়দা হয়? ফরিদা বানু বেগম যদি বিবাহিতা মেয়ে হতেন, স্বামী সংসার থাকতো তাঁর, তাহলে হয়তো তোমার একথা ভেবে দেখতে পারতাম। কিন্তু তা তো তাঁর নেই?

ঃ দিদিমণি!

ঃ তোমার এই ছোট হুজুরের মতো এমন একজন পুরুষকে স্বামী হিসাবে পাওয়ার জন্যে যেখানে যেকোন রাজকন্যা বা শাহজাদী আগুনে ঝাঁপ দিতে দ্বিধাবোধ করবে না, সেখানে ফরিদা বানু বেগম এমন কোন নয়া দুনিয়ার আউরাত যে, তোমার হুজুরের এমন উষ্ণ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও তাঁকে অন্য নজরে দেখবেন?

পদ্মরাণী ফাঁপড়ে পড়ে গেল। তার দিদিমণির একথাও ফেলে দেয়া যায় না। কিছুটা ইতস্তঃ করে ফের পদ্মরাণী বললো — তবুও আরো যাচাই করে দেখা উচিত দিদিমণি! ও টুকুতেই একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে যাওয়া উচিত হবে না। অনেক ব্যাপারেই তো আমরা যা ভাবি তা ঠিক হয় না।

ঃ পদ্ম!

ঃ আরো খোঁজ খবর নিন দিদিমণি।

ঃ খোঁজ খবর! আরো কি খোঁজ খবর নেবোরে পদ্ম? কেমন করে নেবো?

ঃ মনকে যদি একান্তই বুঝ দিতে না পারেন, তাহলে আপনিও ঐ ভুলুয়ার সদরে এখন যান না? একটু বেড়িয়ে আসুন না এই সময়। ঐ ফরিদা বানু দিদিমণি আপনাকে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে এত অনুরোধ করে গেলেন. ঐ অছিলায় এই সময় একটু যান না আপনি ওখানে?

ঃ এ্যাঁ!

ঃ দুইজনকে এক সাথে এক জায়গায় পেলে, মানে দুই জনের এক সাথে মেলামেশা করার কালেই ওদের আসল সম্পর্ক সঠিকভাবে আঁচ করতে পারবেন আপনি। আর যাকেই ফাঁকি দিতে পারুক ওঁরা, কোন নারীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

শুয়ে ছিলেন কনকলতা। একথায় ধড়মড় করে উঠে বসলেন তিনি। একেবারে চরম কথাই পদ্মরাণী বলেছে। দুইজনকে এক জায়গায় চলাফেরা করতে দেখলে বাস্তবিকই সবকিছু সঠিকভাবে বোঝা যাবে। কথাটা বেজায় তাঁর মনে ধরলো। ফৌজদার সাহেবের কাছে গিয়ে তখনই তিনি বায়না ধরলেন — ফরিদা বানুর মকানে বেড়াতে যাবেন তিনি। অনেক করে বলে গেছেন ফরিদা বানু বেগম। তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করা নিতান্তই বেয়াদবী। কনকলতা এখনই তাঁর সে অনুরোধের মর্যাদা দিতে চান।

প্রথমে একটু আপত্তি তুলে শেষ অবধি ফৌজদার সাহেবও রাজী হলেন কনকলতার প্রস্তাবে। তিনিও বেশ দায়ে ঠেকে ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁকেও বিশেষভাবে বলে গেছেন ফরিদা বানু। বলতে গেলে, কনকলতাকে তাঁদের মকানে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বটা ফরিদা বানু ফৌজদার সাহেবের উপরই ন্যস্ত করে গেছেন।

ফৌজদার সাহেব নিজে যেতে পারলেন না। দবির খাঁ, মুইজুদ্দীন মালিক আর পদ্মরাণীকে সাথে দিয়ে শরীফ রেজার ভুলুয়ায় যাওয়ার দিন কয়েক পরেই কনকলতাকেও তিনি পাঠিয়ে দিলেন ওখানে।

ফরিদা বানুর বার্তা পেয়ে শরীফ রেজা ভুলুয়ার সদরে এসে হাজির হলেন। শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের বাসভবনে ঢুকতেই তাঁর সামনে পড়লেন সোনার গাঁয়ের সেনাপতি জাফর আলী খান। শরীফ রেজাকে দেখেই জাফর আলী সাহেব বিপুল উল্লাসে হৈ হৈ করে উঠলেন। বললেন — আরে এই যে ভাই
উচিত দিদিমণি! ও টুকুতেই একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে যাওয়া উচিত হবে না।

সাহেব, আসুন-আসুন! আপনার পথ চেয়ে থাকতে থাকতে আমার তো দুই চোখে রীতিমতো জ্বালা ধরে গেছে। ফৌজদার সাহেবের মকান থেকে এই ভুলুয়ার সদরে আসতে এত সময় লাগলো আপনার ?

এসব কথার অর্থ শরীফ রেজা কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন — কি ব্যাপার ভাই সাহেব ? কি হয়েছে এ দিকে ?

জাফর আলী সাহের তাঁর আবেগের মাত্রাটা আরো খানিক বাড়িয়ে দিয়ে বললেন — বিগ্‌ড়ে গেছে, বিগ্‌ড়ে গেছে, বিলকুল বিগ্‌ড়ে গেছে! কি যে সব কাণ্ড আপনাদের! এর খেই পায় সাধ্যিকার ?

ঃ বিগ্‌ড়ে গেছে। কে বিগড়ে গেল ?

ঃ আপনাদের ঐ ফরিদা বানু বেগম। যান, আপনি গিয়ে থামান গে এখন তাঁকে।

ঃ বিগ্‌ড়ে গেছে মানে ?

ঃ মানে ভাইয়ের দরদে বহিনের নিদ্‌ঘুম হারাম হয়ে গেছে। ভাইকে আগে সুখী করতে না পারলে, নিজের কোন সুখের কথাই আপনার ঐ পেয়ারের বহিন চিন্তা করতে পারছেন না।

ঃ কি রকম ?

ঃ রকমটা আবার কি ? আমার উপর হুজুরাইন শর্ত আরোপ করেছেন — তাঁর ভাইকে আগে সুখী করার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। তারপর উনি আমার উপর সদয় হওয়ার বিষয়টা দয়া করে বিবেচনায় নেবেন, তার আগে নয়। কি আর করি ? বাধ্য হয়েই হুজুরাইনের খত সহ আপনার কাছে লোক পাঠিয়ে দিয়ে এই যে আপনার পথ চেয়ে হত্যা দিয়ে পড়ে আছি।

এবার শরীফ রেজাও হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন — বিষয়টা কিন্তু জিয়াদা হেঁয়ালী হয়ে যাচ্ছে ভাই সাহেব। আসল কথাটা কি, তাই আগে খোলাসা করে বলুন।

ঃ আসল কথা তো তামামই আপনার মধ্যে — মানে আপনাদের মধ্যে।

ঃ আমাদের মধ্যে!

ঃ বুঝলেন না ? আপনাদের ওখানে ঐ যে আম্বিজান না কনকলতা নামের কোন এক আসমানী আউরাত বাস করেন, আসল কথা তো তাঁকে নিয়ে।

ঃ কনকলতা ?

ঃ হ্যাঁ, ঐ কনকলতা। ঐ কনকলতাকে দেখে আসার পর থেকেই পেয়ারের বহিন আপনার বিলকুল আওয়ারা।

ঃ কেন ?

ঃ তাঁকে তাঁর চাই। তাঁকে ভাবী বানাবেন তিনি। তাঁকে ঐ ভাবী বানানোর

আগে এই অধম জাফর আলী খানের মুখখানাও উনি খোশদীলে দর্শন করতে নারাজ।

শরীফ রেজা অসহিষ্ণু হয়ে উঠে বললেন — আহা! ওসব রসিকতা বাদ দিয়ে ব্যাপারটা একটু সোজা করে বলুনতো ? ভাবী বানাবেন মানে কি ?

ঃ মানেটা হলো, ঐ কনকলতাকে দেখে খুবই মনে ধরেছে বহিনের আপনার। তিনি নাকি এক পরমা সুন্দরী আউরাত। তাঁকে দেখামাত্রই আপনার এই খেয়ালী বহিনের মাথায় এই খেয়াল চেপেছে যে, তার সুন্দর ও সুদর্শন ভাই এই শরীফ রেজা সাহেবের একমাত্র জুটি ঐ মেয়েটি ছাড়া এ বিশ্বে আর কেউ হতে পারে না। আসলে নাকি ওর জন্যেই আপনি এই পৃথিবীতে এসেছেন আর আপনার জন্যেই নাকি উনি এই মাটির ধরায় অবতীর্ণা হয়েছেন। কাজেই, ওঁকে ছাড়া আপনার এবং আপনাকে ছাড়া ওঁর আর যোগ্য জুটি আল্লাহ তায়ালার এই বিশাল বিশ্বে নেই।

ঃ আচ্ছা!

ঃ অতএব হে অধমাতীত অধম জাফর আলী খাঁ, তুমি যদি তোমার জীবনের কিছুমাত্র সুখ-আহলাদের খোয়াব দেখতে চাও, তাহলে এই জুটিটা যেভাবে হোক, আগে এক করে দাও, তারপর গিয়ে নিজের কথা ভাবো।

ঃ তাহলে অর্থটা কি দাঁড়ালো ?

আর এক দফা দুলে উঠলেন জাফর আলী সাহেব। আপত্তির ঝড় তুলে বললেন — আরে, আরে! এই দাঁড়িয়ে থেকেই আপনি সব মানে অর্থ নেবেন নাকি ? আসুন-আসুন —

ঃ জি ?

ঃ ওসব মানে-অর্থ পরে। বহুত দূর থেকে এসেছেন। আগে আসুন দহলীজে গিয়ে শান্ত হয়ে বসুন। এরপর যত মানে-অর্থ চাই, সব আপনি পাবেন।

দহলীজে বসে জাফর আলী যা বললেন তাহলো — কনকলতাকে ফরিদা বানুর খুবই মনে ধরেছে। তাঁর ইচ্ছে, যেভাবে হোক, এ বিয়েটা জুটিয়ে দিতেই হবে। শরীফ রেজাকে ডেকে এনে তাঁর মতামত জানা হোক। তিনি রাজী থাকলে, কনকলতাকে রাজী করানোর দায়িত্ব ফরিদা বানুই নেবেন। কনকলতাকে মুসলমান হতে আর শরীফ রেজাকে শাদি করতে রাজী করানোর জন্যে সত্বর আবার তিনি ফৌজদার সাহেবের মকানে যাত্রা করবেন। কিন্তু তার আগে শরীফ রেজার মতামতটা দরকার।

শরীফ রেজা নিজেই যদি রাজী না হোন কনকলতাকে শাদি করতে, তাহলে তো আর কোন কিছুই করার গরজ পড়বে না। এসব চিন্তা করেই শরীফ রেজাকে এই জরুরীভাবে ডেকে আনা হয়েছে।

এর জন্যে এত তাড়াহুড়া কেন, এ প্রশ্ন করলে জাফর আলী বললেন, ফরিদা

বানুর সাথে তাঁর শাদির তামাম কথা পাকা হয়ে গেছে। যে কোন একটা শুভ দিন দেখে এখন ওটা সুসম্পন্ন করা হবে। কিন্তু এরই মাঝে ফরিদা বানুর খেয়াল চেপে বসেছে, এই দু'টো শাদিই এক সাথে হোক কিংবা শরীফ রেজার শাদিটাই আগে হয়ে যাক। বড় এতিম মানুষ শরীফ রেজা। একেবারেই সহায় সাথী অবলম্বনহীন। সুযোগ যখন পাওয়াই গেছে হাতের কাছে, তখন তাঁর একটা সদ্‌গতি না করে, নিজের শাদির আনন্দটা তিনি পুরোপুরি ভোগ করতে পারবেন না।

তামাম কিছু শুনে শরীফ রেজার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। একেবারেই এক পরম প্রশ্নে হাত দিয়েছেন ফরিদা বানু। সেই সাথে এদের এই তাড়াহুড়া দেখে তিনি আবার চিন্তিতও হয়ে পড়লেন। প্রসঙ্গটা শরীফ রেজার প্রিয় প্রসঙ্গ ঠিকই। কিন্তু শাদির প্রশ্ন পড়ে মরুক এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অবকাশটাই তাঁর কোথায়?

আহার-বিরাম অন্তে জাফর আলী সাহেব সহ নিরিবিলি এক কক্ষে বসে ফরিদা বানু বেগম যখন এ প্রসঙ্গ তুললেন এবং সংক্ষেপে তাঁর ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করলেন, তখন শরীফ রেজা অতিশয় বিনয়ের সাথে বললেন—বহিন, আমাকে নিয়ে আপনার এই ইচ্ছে-ইরাদার কথা এই জাফর আলী ভাই সাহেবের কাছে এসেই আমি শুনেছি। আপনার এই আন্তরিকতার প্রতি কিভাবে যে আমি সম্মান প্রদর্শন করবো, দিশে করতে পারছিনে। আপনার এই মহৎ ইরাদার প্রসঙ্গে আমি আমার অভিমতটা এইভাবে প্রকাশ করতে চাই যে, আপনার এই পছন্দটা ঠিক যেন আমারই পছন্দ, আপনার এই অনুভূতি ঠিক যেন আমারই অন্তরের অনুভূতি। আমার স্থলে ভূমিকাটা আপনি গ্রহণ করেছেন — ফারাগটা স্রেফ এখানে। দরদের স্তরটা কত গভীর হলে যে একজনের অন্তরটা অন্যজনের কাছে সাফা হয়ে যায়, তা এক কথায় বিন্যাস করা শক্ত। আপনার পাকদীলের সেই গভীরতম দরদ আর স্নেহ-মুহব্বত লাভ করার নসীব যে পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা দান করেছে আমাকে, সে জন্যে লাখোবার আমি শোকর গুজারী করি। কিন্তু এখানে একটা মস্তবড় প্রশ্ন রয়েছে বহিন — শরীফ রেজার বিনয়ে জাফর আলীসহ ফরিদা বানু বেগম অভিভূত হয়ে গেলেন। ফরিদা বানু বললেন — কি প্রশ্ন ভাইজান?

শরীফ রেজা বললেন — আমার জন্যে এ প্রসঙ্গ এখন খুবই অগ্রিম প্রসঙ্গ বহিন। যে কাজে আমার হুজুর আমাকে নিয়োগ করে রেখেছেন, তার একটা ফয়সালা হওয়ার আগে এসব কথা চিন্তা করার অবকাশ কোথায় আমার?

জাফর সাহেব বললেন — অর্থাৎ?

শরীফ রেজা বললেন — আমাদের নিয়াত তো আপনি জানেনেই। দ্বীন ও কওমের স্বার্থে বাঙ্গালা মুলুকের আজাদীটা অপরিহার্য। সেই আজাদী হাসিল হওয়ার আগে বিয়ে শাদি করে ঘর-সংসার পেতে বসার প্রশ্নই তো কিছু আসে না, সে বিষয়ে এখনই চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাওয়াটাও যুক্তিহীন।

ঃ বাঙ্গালা মুলুকের আজাদীটা কোন দিনই যদি না আসে, তাহলে কি করবেন? আজীবন এভাবেই থাকবেন?

ঃ এভাবে থাকাটাই যদি নসীব হয় আমার তাহলে তা থাকা ছাড়া গত্যন্তর কি বলুন? নিয়াত আর হুজুরের নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোন প্রশ্নই তো উঠে না।

ঃ তাহলে কি তার অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, ঘর-সংসার পাতার কোন পরিকল্পনাই নেই আপনার?

ঃ তা থাকবে না কেন? যে কাজ নিয়ে আছি এখন, আল্লাহর রহমে যথা-সত্বর তার একটা ফায়সালা হয়ে গেলেই, ঘর-সংসার পেতে বসবো অবশ্যই। সংসার ত্যাগী দরবেশ হবো, এমন ইরাদা এখনও আমার নেই।

শরীফ রেজার জিন্দেগীর এ দিকটা গভীরভাবে তলিয়ে না দেখেই তাঁর শাদির ব্যাপার নিয়ে ফরিদা বানু বেগম ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। শাদির ব্যাপারে শরীফ রেজার বাস্তব ঐ অন্তরায়টি সবিশেষ উপলব্ধি করে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। এ ব্যাপারে অতপর আর কি বলবেন, এতক্ষণ তা স্থির করতে পারেননি। এবার শরীফ রেজার এই শেষ মন্তব্যের জের ধরে ফরিদা বানু সঙ্গে সঙ্গে বললেন — তাহলে ভাইজান, ঘর-সংসার পাতার যখন ইরাদা আপনার আছেই, তাহলে শাদিটা এখন না করুন, পাত্রীটা চূড়ান্ত করে রাখতে আমাদের দোষ কি? এ নিয়ে আমি কথা বলি কনকলতার সাথে?

শরীফ রেজা ঈষৎ হেসে বললেন — বহিন, অন্ধকার ভবিষ্যতের জন্যে বর্তমানের কোন সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। কি আছে ঐ ভবিষ্যতের উদরে কেউ আমরা জানিনে। অর্থাৎ ঐ ভবিষ্যৎটা যে কিভাবে বর্তমান হয়ে দেখা দেবে, জিন্দেগীর গতি, দেশ দুনিয়ার পরিস্থিতি আর শরীর-স্বাস্থ্য-মন যে কোন দিকে মোড় নেবে, এখন তা কিছুই চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা যায় না।

ঃ তাহলে?

ঃ একটা ইচ্ছে আমরা মনে মনে পোষণ করতে পারি, মানে প্রাথমিকভাবে কাউকে আমরা মনে মনে পছন্দ করে রাখতে পারি, এমন কি ভবিষ্যতের জন্যে তাকে আমরা দুর্বারভাবে আকাঙ্ক্ষা করতেও পারি, কিন্তু একটা অনির্দিষ্ট ও সুদূর ভবিষ্যৎ সম্মুখে রেখে কারো সাথে কোন প্রকার চূড়ান্ত ফয়সালায় বসতে যাওয়া এবং কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করে রাখা একেবারেই যুক্তিহীন। কে বলতে পারে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ ফয়সালা একেবারেই তুচ্ছ হয়ে যাবে না?

ঃ ভাইজান!

ঃ আমার যা দীলের কথা তাতো বলেই ফেলেছি আমি। আপনাদের মতো কনকলতাকে আমারও পছন্দ। কিন্তু যে শাদিটা কবে হবে বা আদৌ তা হবে কি না — কিছুই ঠিক নেই, সে শাদির ব্যাপার নিয়ে কনকলতার সাথে এখন বসাটা যেমনই হাস্যস্পদ, তেমনি অস্বস্তিকর। বরং যেভাবে এখন আছি, সেই ভাল। এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ কোন পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে আপনাদের এই ইচ্ছা আল্লাহ তায়ালা যেন সত্যি সত্যিই পূরণ করেন—এই মর্মে তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন; সেইটেই হবে এখন সবচেয়ে যোগ্য ও বুদ্ধিমানের কাজ।

ফরিদা বানু থেমে গেলেন। জাফর আলী খোশদীলে আওয়াজ দিলেন—শাব্বাশ্ ভাই সাহেব! আপনি শুধু বাহাদুরই নন, একজন অত্যন্ত দানেশমান্দ আদমী, এলেমদার লোক।

শরীফ রেজা হাসিমুখে বললেন — আমার ভাবনা না ভেবে, আপনারা বরং আপনাদের নিয়ে ভাবুন। আপনাদের শাদিটা যথাসত্বর সুসম্পন্ন হতে দেখলে আর আমার এই বহিনের দাম্পত্য জীবনটা মধুময় হয়ে উঠলে, আপনারা আমার ভাবনা ভাবার চেয়ে আমি সত্যি-সত্যিই অধিক খুশী হবো।

আনন্দে ফুলে উঠলেন জাফর আলী সাহেব। হাততালী বাজিয়ে জোশের সাথে বললেন — মারহাবা-মারহাবা! আমি আবার আপনাকে মুবারকবাদ জানাই।

ঃ শুধু সাধুবাদ জানালেই হবে না, বহিনটাকে আমার খুশী করা চাই।

এবার উল্লাসে ফেটে পড়লেন জাফর আলী। করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি চীৎকার করে বললেন — ওয়াদা, একদম ঈমানদার ভদ্রলোকের ওয়াদা!

বোরখাবৃতা ফরিদা বানু মুখের ঢাকনা তুলে এতক্ষণ বসেছিলেন। শরমে এবার ত্রস্তহস্তে মুখের ঢাকনা নামিয়ে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে যাবার কালে মুখের হাসি কাপড় দিয়ে চাপতে চাপতে বললেন — ভাইজান!

এরপর আর কয়েকদিন শরীফ রেজা শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের মকানে মেহমান হয়ে রইলেন এবং জাররা সময় শাহ সাহেবের দপ্তরে আর জিয়াদা সময় শাহ সাহেবের অন্দরে হাজিরা দিয়ে কাটালেন।

জরুরী এক কারণে সেদিন ফরিদা বানুর তালাশে শরীফ রেজা ব্যস্তভাবে ফরিদা বানুর কক্ষের দিকে এলেন। ফরিদা বানুর কক্ষটা একটু আড়ালে। আর একটা কক্ষ প্রদক্ষিণ করে এলে ছোট্ট আর এক আঙ্গিনা এবং আঙ্গিনার পরে

বারান্দা যুক্ত কক্ষ। ফরিদা বানুর আঙ্গিনা [illegible]
দিকে গেছে। এই গলি পথেই ফরিদা বানু [illegible]
ফরিদা বানুর কক্ষের দিকে স্বাভাবিকভাবেই [illegible]

সামনের কক্ষ প্রদক্ষিণ করে শরীফ [illegible] আঙ্গিনাতে পা দিলেন এবং পা দিয়েই [illegible] দেখলেন, বারান্দাটির এক কোণে একটা ফুলের [illegible] করেই ফরিদা বানু তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান জাফর আলীর [illegible] ফেলে দিলেন। চমকে উঠে জাফর আলী বললেন — আরে [illegible] জন্যে এনেছি।

সে কথায় কান না দিয়ে জাফর আলীর গলার দিকে চেয়ে [illegible] বানু বললেন — মানিয়েছে, জব্বোর মানিয়েছে।

ফরিদা বানুর পেছনে একটু দূরে ফুল ভর্তি ঝুড়িসহ বাগানের [illegible] দাঁড়িয়েছিল। তার মালাটা ফরিদা বানুর পছন্দ হয়েছে বোধে সে [illegible] আওয়াজ দিলো — আর লাগবে হুজুরাইন?

সবই এক পলকের ব্যাপার। মালা পরিয়ে দিতে দেখেই শরীফ রেজা হোঁচট খেয়ে পেছন ফিরতে গেলেন। কিন্তু মালীকে সেখানে দেখে এবং তাঁদের কথোপকথন শুনে তিনি বুঝলেন, এটা কোন নিভৃতের অন্তরঙ্গ বা গোপন ব্যাপার নয়। প্রকাশ্যে দাঁড়িয়েই এঁরা এই রসিকতা করছেন। তখন ওখান থেকে তিনিও মালীকে উদ্দেশ্য করে আওয়াজ দিলেন — আরে লাগবেই তো-লাগবেইতো। খোশনসীব ছাড়া বদনশীব লোকও তো এ মকানে আরো দু' একজন আছে! তারাও তো আশা করে দু' একটা।

সচকিত হয়ে সকলেই সামনের দিকে তাকালেন। শরীফ রেজাকে দেখেই জাফর আলী ও ফরিদা বানু হেসে ফেললেন। জাফর আলী অস্ফুট কণ্ঠে বললেন — ওরে ব্যস্! মরগিয়া!

— বলেই তিনি মালা খুলে সামনের এক তাকের উপর রাখলেন এবং লজ্জিতভাবে প্রস্থানোদ্যগ করলেন। শরীফ রেজা তাঁদের দিকে আসতে আসতে বললেন — আরে-আরে, শরম কি? যান কেন?

জাফর আলী সলজ্জকণ্ঠে বললেন — পাগল! এমনিতেই চোরাপথে অন্দর মহলে ঢুকেছি। এরপর আর দেরী করলে গর্দান থাকবে আমার?

জাফর আলীকে বিদায় হতে দেখে তাঁর সঙ্গের মালীটা জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বললো — হুজুর —

জাফর আলী বললেন — এসো-এসো, ঢের হয়েছে! আর মালা বিলিয়ে কাজ নেই।

দ্রুতপদে জাফর আলী বারান্দার নীচে নেমে এলেন। তা দেখে শরীফ রেজা বললেন—আরে সেকি! যাবেনই যদি তাহলে এ মালাটা এখানে ফেলে যাচ্ছেন কেন ? এটাতো উপহারের জিনিস ?

প্রস্থানরত জাফর আলী এর জবাবে বললেন — ও উপহার আমি আমার বড়কুটুমকে — তওবা — গুরুজনকে দিয়ে গেলাম। তাঁর একটু দোয়া পেলেও আখের আমাদের উজালা হবে।

মুখের হাসি চাপতে চাপতে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন জাফর আলী। মালীটাও তাঁর পেছনে ছুটলো। শরীফ রেজা ফরিদা বানুকে বললেন—তাজ্জব! ব্যাপারটা কি ?

শরম পেয়ে ফরিদা বানুও নত মস্তকে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। জবাবে তিনি মুখ তুলে লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—বেচারা খুব শরম পেয়েছেন!

ঃ কেন-কেন ?

ঃ মালাটা তার পছন্দ হওয়ায় উনি মালীকে নিয়ে বাগান থেকে আমার এখানে এসেছিলেন। এসেই উনি মালাটা আমাকে দিলেন। তারপরের টুকু তো সবই দেখলেন আপনি।

শরমে পুনরায় মুখ নামালেন ফরিদা বানু। শরীফ রেজা উৎসাহ দিয়ে বললেন—আরে-আরে, এতে এতো শরম পাওয়ার কি আছে ? শাদি মুবারক সুসম্পন্ন হতে যে আর দেরী হওয়া আদৌও ঠিক নয়। এটা আমি বুঝতে পারাটাতো খারাপ কিছু নয়। বরং বলতে পারো, ভালই হলো একদিক দিয়ে।

ঃ ভাইজান!

ঃ শাহ চাচা ব্যস্ত মানুষ। সবকিছু তার খেয়াল থাকা সম্ভব নয়। বড় ভাই হিসাবে আমারও তো একটা কর্তব্য আছে ? এ ব্যাপারে যাতে করে সত্বর সত্বর পদক্ষেপ নেন তিনি, আমিই সেটা দেখবো এখন।

আঁড়চোখে চেয়ে লজ্জা জড়িত হাসিমুখে ফরিদা বানু বললেন — ভাল হচ্ছে না কিন্তু।

ঃ কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, বহিনের চেয়ে ভাইজান তা ভাল বোঝেন। কিন্তু সে কথা থাক এখন। হাতে আমার সময় নেই। যে কথা বলতে এসেছি, তাই বলেই এক্ষুণি আমাকে বেরুতে হবে।

আস্তে আস্তে মুখ তুললেন ফরিদা বানু। প্রশ্ন করলেন — কি কথা ভাইজান ?

ঃ ইনসান আলী সাহেবের সাথে এক্ষুণি একটু বাইরে যাচ্ছি। খুব জরুরী। ফিরতে হয়তো দুই একদিন দেরী হবে।

ঃ ভাইজান!

ঃ না বলে উধাও হলে বহিন আমার গোস্বা হবেন, এই জন্যেই বলতে আসা। আমি চলি বহিন —

ঃ এক্ষুণি ?

ঃ হ্যাঁ। এমনিতেই দেরী হলো অনেকখানি। চলি —

শরীফ রেজা ঘুরে দাঁড়ালেন। ফরিদা বানু তড়িৎ বেগে তাঁর সামনে এসে বললেন — দাঁড়ান, দাঁড়ান —

— বলেই তিনি অত্যন্ত দ্রুতপদে তাক থেকে মালাটা নিয়ে এলেন এবং ফের বললেন — এটা উনি আপনাকেই দিয়ে গেছেন ভাইজান। আপনি আমাদের প্রাণ খুলে দোয়া করুন —

বলতে বলতে শরীফ রেজা বুঝে উঠার আগেই ফরিদা বানু মালাটা শরীফ রেজার গলায় পরিয়ে দিলেন এবং তাঁকে কদমবুঁচি করতে লাগলেন।

ঘটনার বিভ্রাট! জাফর আলী সাহেবের গলায় মালা পরিয়ে দিতে দেখে শরীফ রেজা যেখানে এসে হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক এই মুহূর্তে পদ্মরাণী সহকারে কনকলতা সেই জায়গাতে এসে এ দৃশ্য দেখে স্রেফ দাঁড়িয়েই গেলেন না, সর্পদৃষ্টবৎ চমকে উঠলেন ভীষণভাবে।

আজই একটু আগে কনকলতারা ফরিদা বানুদের মকানে এসে পৌছলেন। আদিল খাঁ সদর ফটকেই ছিলেন। এদের দেখেই তিনি অত্যন্ত খোশদীলে ও ব্যস্ততার সাথে "দোস্ত-মেরে দোস্ত" বলে ছুটে গিয়ে দবির খাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। অতপর পুরুষদের সাথে কোলাকুলি ও মোসাফেহা শেষ করে তিনি একজন পরিচারিকাকে ডাক দিলেন। পরিচারিকাটির মারফত কনকলতা ও পদ্মকে অন্দরে পাঠিয়ে দিয়ে দবির খাঁদের নিয়ে তিনি বিশ্রাম কক্ষে গেলেন।

অন্দর মহলে প্রবেশ করার কালেই কনকলতা পরিচারিকাটিকে প্রশ্ন করলেন — ফরিদা বানু আপার শরীর স্বাস্থ্য কেমন এখন ? ভাল তো ?

পরিচারিকাটি বিনীতভাবে জবাব দিলেন — জি জি, ভাল।

ঃ তিনি এখন কোথায় ?

ঃ তাঁর ঘরে আছেন, দেখেছি।

ঃ আচ্ছা, শরীফ রেজা নামে একজন মেহমান আছেন না এখানে ?

ঃ জি-হাঁ, আছেন-আছেন।

ঃ তিনি কোথায় থাকেন, এই অন্দর মহলেই ?

ঃ জি। রাতে তিনি মহলের এক বাইরের কক্ষে থাকেন, তবে দিনে প্রায় সব-সময়ই এই ভেতরেই তিনি থাকেন।

ঃ তাই ? তা এখনও কি ভেতরেই আছেন উনি ?

ঃ জি তাই আছেন।

ঃ কোথায় আছেন ভেতরে ?

ঃ ঐ আপার মহলেই বোধ হয়।

পদ্মরাণীর মুখের দিকে কনকলতা এবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন এবং সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন — আপার মহলে মানে? ফরিদা আপার মহলে?

ঃ জি-হাঁ। তাঁকে ঐ দিকেই যেতে দেখেছি।

ঃ উনি কি বেশীর ভাগ সময়ই তোমাদের আপার মহলে থাকেন?

হেসে ফেললো পরিচারিকাটি। সে বললো — তো আর কোথায় থাকবেন? এই মহলে আপা ছাড়া তাঁদের মতো মানুষের তো কথা বলার উপযুক্ত লোক আর কেউ নেই।

ঃ তাই বলে সর্বক্ষণ?

ঃ সর্বক্ষণই তো। ঐ সাহেবকেও বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে দেখিনে, আবার আপাও একটু না দেখলেই ঐ সাহেবকে ডাকাডাকি শুরু করেন। উনাদের দুইজনের মধ্যে খুব মিলতো।

আবার কনকলতা ও পদ্মরাণীর মধ্যে চোখাচোখী হলো। পরিচারিকাটি এঁদের নিয়ে ইতিমধ্যেই ফরিদা বানুর কক্ষের কাছে এসেছিলো। ফরিদা বানুর কক্ষে যাওয়ার পথটা এদের দেখিয়ে দিয়ে পরিচারিকাটি এখান থেকেই বিদায় হলো। কনকলতারা এগিয়ে ফরিদা বানুর আঙ্গিনায় এসে পা দিয়েই এ দৃশ্য দেখে চমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

মুসলমানদের জন্যে কারো গলায় মালা দেয়াটা তেমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু হিন্দুদের নজরে এই মালা দেয়ার অর্থই হলো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া। অনুষ্ঠানাদি যখনই যা হোক, মালা দেয়াই বিয়ে বা বিয়ে হওয়ার অঙ্গিকার। কনকলতা ও পদ্মরাণী এই দুইজনই হিন্দু রমণী। এ অনুভূতি এঁদের একদম দীলের সাথে গাঁথা। ফলে, এ দৃশ্য দেখামাত্রই কনকলতার দীলটা ভেঙ্গে একদম টুকরো টুকরো হয়ে গেল। শুকিয়ে বিবর্ণ হলো পদ্মরাণীর মুখমণ্ডল।

শরীফ রেজাকে কদমবুঁচি করে উঠেই এ দিকে তাকিয়ে ফরিদা বানু কলকণ্ঠে বলে উঠলেন — আরে একি! বহিন যে!

— বলেই তিনি এঁদের কাছে ছুটে এলেন এবং এঁদের কক্ষের দিকে টেনে নিতে নিতে তিনি অনর্গল বলতে লাগলেন—কখন এলেন, কি করে এলেন, কেমন আছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

মালা খুলে হাতে নিয়ে শরীফ রেজাও এগিয়ে এসে সানন্দে বললেন — কি তাজ্জব, আপনি! সাথে আর কে কে আছেন?

শরীফ রেজার মুখের দিকে চকিতে একবার চোখ তুলতেই কনকলতার মুখ-খানা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তাঁর কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে বা তাঁকে আর একবারও চোখ তুলে না দেখে কনকলতা ফরিদা বানুর সাথে আলাপরত

হলেন এবং ফরিদা বানুর সাথে তাঁর কক্ষে এসে বসলেন। শরীফ রেজাও এঁদের পিছে পিছে কক্ষে এসে ঢুকলে, কনকলতা তিক্ত কণ্ঠে বললেন — আপা, এসব পুরুষ মানুষ জেনানাদের কক্ষে এসে ঢুকবে কেন? ওকে বাইরে যেতে বলুন।

ফরিদা বানু ও শরীফ রেজা উভয়েই একথায় আকাশ থেকে পড়লেন। পরম বিস্ময়ে ফরিদা বানু বললেন — সে কি! এঁকে আপনি চেনেন না? এইতো সেই শরীফ রেজা সাহেব?

মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে কনকলতা নাখোশ কণ্ঠে বললেন — কেন চিনবো না ওকে? ওদের মতো মানুষকে চিনতে খুব বেশী সময় লাগে?

ফরিদা বানু ব্যথিত কণ্ঠে বললেন — বহিন!

কনকলতা ঐ একই রকম তিক্ত কণ্ঠে বললেন — যাক কিছুদিন! এরপর আপনিও ওকে ঠিকই চিনতে পারবেন আপা। তা যাক সে কথা। অনেকদূর থেকে তেতে পুড়ে এসেছি। উনাকে যেতে বলুন, আমরা একটু সহজ হই।

বলতে কিছুই হলো না। ফরিদা বানু চোখ তুলে দেখলেন — শরীফ রেজা ইতিমধ্যেই সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছেন।

এরপর ভদ্রতার খাতিরে কনকলতা সে রাতটা কোন মতে ফরিদা বানুর মেহমান হয়ে কাটালেন। পরের দিনই তিনি ফালতু এক বাহানায় সকলের কাছে বিদায় নিয়ে নিজ মকানে রওনা হলেন। শরীফ রেজার প্রসঙ্গ কনকলতার কাছে একেবারেই অবাঞ্ছিত দেখে কনকলতার মেহমানদারী করার মধ্যে ফরিদা বানুও জোশ্‌ কিছু পেলেন না। ফলে, অল্প কথায় তিনিও তাঁকে বিদায় দিলেন।

ইনসান আলী সাহেবের সাথে যেখানে যাবার কথা, ফরিদা বানুর ঘর থেকে বিধ্বস্ত দীলে বেরিয়ে শরীফ রেজা সেখানেই চলে গেলেন। দিন দুয়েক তাঁর সাথে সদরের বাইরে কাটিয়ে শরীফ রেজা শাহ সাহেবের মকানে এসে দেখলেন, কনকলতারা ইতিমধ্যেই চলে গেছেন।

ফরিদা বানু বেগমের প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিগ্‌গিরই আবার আসবেন বলে কথা দিয়ে শরীফ রেজাও সফর থেকে ফিরে আসার পরের দিনই বিদায় নিলেন এবং ভুলুয়ার সদর থেকে সরাসরি ফের ফৌজদার সাহেবের মকানে এসে হাজির হলেন।

কনকলতার এই পরিবর্তনের যথাযথ কারণ শরীফ রেজা তালাশ করে পেলেন না। ফরিদা বানুকে তিনি বোনের মতো স্নেহ করেন। গলদ কিছুই নেই এখানে। কাজেই, ফরিদা বানুর সাথে তার অন্তরঙ্গ মেলামেশা কনকলতার এই পরিবর্তনের কারণ হতে পারে, এমন কোন ধারণাই শরীফ রেজার দীলে কখনও

এলো না। ও নিয়ে ভাবতেই তিনি গেলেন না। তিনি সোচ্ করে দেখলেন, শাহ সাহেবের মকানে গিয়েই নয়, কনকলতা বিগড়ে আছেন আগে থেকেই। তার খেয়াল হলো, লাখ্নৌতি থেকে ফিরে আসার পর থেকেই কনকলতা তার উপর বেশ নারাজ। শরীফ রেজার ধারণা হলো, কনকলতা তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ ও সান্নিধ্য কামনা করে এসেছেন। তা না পাওয়ার কারণেই হয়তো তার প্রতি কনকলতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর উপর থেকে কনকলতার মোহ মুহব্বত উঠে গেছে কিংবা এমনও হতে পারে, তাঁর এই দীর্ঘ সময় অনুপস্থিতির ফলে কনকলতার মনের গতি অন্যদিকে ঘুরে গেছে। তাঁকে যে একদিন কনকলতার ভাল লেগেছিল, এবং তাঁর সেই ভালবাসার যথাযথ মূল্য তিনি দেননি, হয়তো অন্য অবলম্বন পেয়ে, কনকলতা তার শোধ আজ এভাবে নিচ্ছেন।

তাঁর এই ধারণাগুলো আরও অধিক পোক্ত হলো, যখন তিনি দেখলেন, ফৌজদার সাহেবের মকানে তাঁর ফিরে আসার পর কয়েকটা দিন কেটে যাওয়া সত্ত্বেও একটা বারও কনকলতা তাঁর খবর নিতে এলেন না। শরীফ রেজা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন, কনকলতা ইদানিং ঘর থেকে বড় বেশী বেরোনই না। স্রেফ খান সাহেবের খেদমতটুকু ছাড়া তাঁর মকানেও অধিক সময় থাকে না।

তবুও শরীফ রেজা পথ চেয়ে রইলেন। আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করার পরও যখন দেখলেন, কনকলতা আর এলেনই না, তখন নিজেই তিনি এক পা দু'পা করে কনকলতার মকানে এসে হাজির হলেন।

হরিচরণ দেব ভেতরের ব্যাপার তেমন একটা জানতেন না। তিনি সমাদরেই শরীফ রেজাকে ভেতরে ডেকে নিলেন এবং কনকলতার কাছে খবর পৌঁছে দিলেন। শরীফ রেজার আগমন বার্তা পেয়েই জ্বলে উঠলেন কনকলতা। তিনি অত্যন্ত গোস্বাভরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। শরীফ রেজা তখনও উঠোনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর প্রতি কোন প্রকার সৌজন্য প্রকাশ না করেই কনকলতা প্রশ্ন করলেন — আপনি এখানে মানে ?

শরীফ রেজা ইতস্ততঃ করে বললেন—মানে আপনার সাথে এই একটু সাক্ষাৎ করতে এলাম।

ঃ আমার সাথে সাক্ষাৎ! আমার সাথে কি কাজ আপনার ?

শরীফ রেজা মনে এবার বল এনে বললেন — আচ্ছা, কি হয়েছে আপনার বলুনতো ? আমার সাথে হঠাৎ আপনি এমন আচরণ করছেন কেন ?

কনকলতা তিক্ত কণ্ঠে বললেন — তার আগে আপনি বলুন, একজন যুবতী হিন্দু মেয়ের বাড়ীতে আপনি কি মতলবে ঢুকেছেন ?

বল্লমের ফলার মতো এ কথাটা গিয়ে শরীফ রেজার কলিজায় আঘাত করলো। তিনি আর্তনাদ করে বললেন — কনকলতা!

কনকলতাও তাঁর গলার তেজ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—থামুন! আপনি আমার কে যে আমার নাম ধরে ডাকছেন ?

শরীফ রেজা বিলকুল হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। জবাব খুঁজে না পেয়ে তিনি থতমত করে বললেন—মানে!

কনকলতা বললেন—বড় বাপের মকানে থাকেন বলে সৌজন্যের খাতিরে আপনাকে কিছুটা প্রশ্রয় আমি দিয়েছি। সেই সুযোগ নিয়ে আপনি এভাবে আমার মকানে যখন তখন প্রবেশ করেন কেন ? এতটুকু লজ্জা বা আত্মসম্মানবোধও নেই আপনার ?

ফেটে পড়লেন শরীফ রেজা। বললেন — খামুশ্! আপনি কি বলতে চান ?

কনকলতা টললেন না। একই রকম তেজের সাথে জবাব দিলেন—কি বলতে চাই, তা আপনি বোঝেন না ? আমি একজন ভিন্নধর্মের অবিবাহিত মেয়ে। আমার সমাজগোত্র আছে, আমার ভবিষ্যৎ আছে! অন্যের আশ্রয়ে আছি বলেই আমাকে আপনি ভোগের সামগ্রী বানাতে চান ? এমন আপনার মনোবৃত্তি ?

শরীফ রেজা দিশেহারা হয়ে গেলেন। পুরুষ মানুষ হলে হয়তো আঘাত করেই বসতেন এবার। কি করবেন তিনি স্থির করতে না পেরে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। কাঁপতে কাঁপতে অকস্মাৎ তিনি অসহায়ভাবে আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁর দুই চোখ ফেটে পানির ঢল নেমে এলো। কান্না জড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন — আপনি থামুন, আপনি থামুন! আমি কি এমন ক্ষতি আপনার করেছিলাম, যার জন্যে কাছে টেনে নিয়ে আজ এত বড় আঘাত আমাকে করলেন আপনি ? আমার মধ্যে কি এমন অপরাধটা পেলেন, যার জন্যে এমন আঘাত আমাকে করতে পারলেন আপনি ?

পদ্মরাণী ইতিমধ্যেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সে অস্থির হয়ে বললো, ছোট হুজুর-ছোট হুজুর —

শরীফ রেজা তখন টলতে টলতে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছেন। তা দেখে পদ্মরাণী আরো অধিক অস্থির হয়ে বললো — দিদিমণি-দিদিমণি, ছোট হুজুর চলে যাচ্ছেন —

কনকলতা ছিটকে এসে পদ্মরাণীর বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। তিনি সশব্দে ডুকরে উঠে বললেন—পদ্মরে! আর আমি বাঁচতে চাইনে। আমার মাথায় তোরা মুগুর মার — শক্ত করে মুগুর মার —

টলতে টলতে ঘরে ফিরে শরীফ রেজা তাঁর চোখে মুখে পানি দিতেই ছুটে এলেন অবসরপ্রাপ্ত ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব। তিনি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির কণ্ঠে বললেন—শরীফ রেজা, লড়াই-লড়াই — তৈয়ার হো যাও —

হতবুদ্ধি শরীফ রেজা অস্ফুট কণ্ঠে বললেন — লড়াই! একইভাবে ফৌজদার সাহেব বললেন — হ্যাঁ লড়াই। এই মাত্র খবর — বাহরাম খান সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব তাঁর ফৌজ নিয়ে সোনার গাঁয়ে ছুটেছেন। শিগ্‌গির তৈয়ার হও। এখনই ফৌজ নিয়ে সোনার গাঁয়ে ছুটতে হবে।

শরীফ রেজা অকূলে কূল পেলেন। এই আঘাতের পর তাঁর জিন্দেগীর আর অবলম্বন কি, কিভাবে অতপর দিন কাটাবেন তিনি এসব ভেবে ইতিমধ্যেই শরীফ রেজা উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই খবর পেয়ে অবলম্বনের আনন্দে ঐ উদ্ভ্রান্ত অবস্থাতেই তিনি চীৎকার করে উঠলেন — নারায়ে তকবির —

আশে পাশে অবস্থিত ব্যতিব্যস্ত সেপাইরা সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ দিলো — আল্লাহু আকবর!

১২

গৌড় থেকে সোনার গাঁ। বাঙ্গালা মুলুকের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব আর একবার চলে এলো গৌড় থেকে সোনার গাঁয়ে। গৌড় বা লাখ্‌নৌতির প্রথম দিকের খণ্ড চেষ্টার পর গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবই সর্বপ্রথম গৌড় ছেড়ে সোনার গাঁয়ে এসে স্বাধীন নিশান উড়িয়ে দেন এবং সোনার গাঁয়েই বাঙ্গালা মুলুকের স্বাধীনতার সূতিকাগারে পরিণত করার কোশেশ করেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় না। অচিরেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু এবার যে স্বাধীন নিশান উড়ে উঠে সোনার গাঁয়ে, তা উত্থান-পতন ও চড়াই উৎরাই পেরিয়ে টিকে থাকে দীর্ঘকাল এবং সাময়িকভাবে হলেও বাঙ্গালা মুলুকের তামাম আকর্ষণ গৌড় থেকে চলে আসে সোনার গাঁয়ে।

অকস্মাৎ মারা গেলেন সোনার গাঁয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খান। কয়েকদিনের বিমারেই ইন্তেকাল করলেন তিনি। সোনার গাঁয়ের আসন ফাঁকা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বার্তা এলো ভুলুয়ায়। বার্তা পেয়েই শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের মকানে লোক পাঠিয়ে দিলেন এবং তারপরই তৎক্ষণাৎ সোনার গাঁয়ে ছুটলেন। তাঁর সঙ্গে রইলেন সেনাপতি জাফর আলী ও ভুলুয়ার তামাম ফৌজ।

ভুলুয়ার প্রশাসন সাময়িকভাবে ইনসান আলীর হাতে দিয়ে শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব সোনার গাঁয়ে রওনা হলেন।

খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তৈয়ার হলেন। ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব ও শরীফ রেজা। মকানের রক্ষণাবেক্ষণ দবির খাঁ ও মুইজুদ্দীন মালিকের উপর দিয়ে লোক লস্কর সহকারে তারাও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছুটে সোনার গাঁয়ের কাছাকাছি এক স্থানে এসে তাঁরা শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের ফৌজের সাথে সামিল হলেন।

সরাসরি ফৌজ চালনা করে কর্তৃত্ব দখল করতে যাবেন, না আমির উমরাহদের সাথে পরামর্শক্রমে তখতে গিয়ে বসবেন — এই চিন্তায় শাহ ফখরউদ্দীন তখন ইতস্ততঃ করছিলেন এবং ফৌজদার সাহেব ও শরীফ রেজার অপেক্ষায় ধীরগতিতে এগুচ্ছিলেন। ফৌজদার সাহেব বৃদ্ধ লোক হলেও জোশের তাঁর অভাব কিছু ছিল না। কিন্তু শরীফ রেজার উদ্দাম তখন বাঁধভাঙ্গা উদ্দাম। এসেই তিনি বললেন — অন্য চিন্তার কোনই অবকাশ নেই। একেবারেই ক্রান্তি লগ্ন এখন। 'এস্পার কি ওস্পার' এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই এখন এগিয়ে যাবার সময়। এই মুহূর্তে ইতস্ততঃ করা মানেই অর্ধেক সাফল্য হারিয়ে ফেলা। পারতপক্ষে মসনদে কেউ কাউকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসাবে না। আসল শক্তির চেয়ে ঢের ঢের বেশী শক্তির হুংকার গর্জন তুলে এগিয়ে যেতে হবে এবং ঐ মেজাজেই গিয়ে মসনদে বসতে হবে।

শরীফ রেজাকে সমর্থন দিলেন জাফর আলী ও ফৌজদার সাহেব। শরীফ রেজার এই পরামর্শ আরো অধিক জোরদার হলো গোয়েন্দাদের খবরে। ঠিক এই মুহূর্তে ছুটে এলো লাল মুহাম্মদ লাড্ডু মিয়া প্রেরিত কয়েকজন গোয়েন্দা। তারাও এসে জানালো — পরিস্থিতি খুব অনুকলে। হঠাৎ করে বাহরাম খান ইন্তেকাল করায় সকলেই এখন দিশেহারা হয়ে আছেন। কে কি করবেন, সোনার গাঁয়ের ফাঁকা তখতে কে এসে বসবেন — এসব কোন খেয়ালই কারো মগজে এখন নেই। শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবই বাহরাম খানের পরে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। নিজের ভাবমূর্তি নিয়ে এই মুহূর্তে নির্দ্বিধায় ও সবিক্রমে এগুলে, সকলেরই আনুগত্য তাঁর দিকে চলে আসবে। দেরী করলেই সর্বনাশ। সময় আর সুযোগ পেলে অনেকের মাথায় বদ মতলব আর উচ্চাকাঙ্খা গজাবে।

শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে তিনি তাঁর সেপাই সেনাদের নির্দেশ দিলেন — সামনে বাড়ো —

শরীফ রেজা ও গোয়েন্দাদের উপলব্ধিই যে সঠিক—বাস্তবে তা প্রমাণ হলো। সোনার গাঁয়ে ঢুকতেই, সোনার গাঁয়ে অবস্থিত জাফর আলীর তামাম সেপাই খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে জাফর আলীর পেছনে এসে দাঁড়ালো। সদল বলে ও গুরু গম্ভীর মেজাজে শাহ সাহেবকে এগিয়ে আসতে দেখেই সোনা রগাঁয়ের অধিকাংশ আমীর–উমরাহ ও সেপাই–সালার অবলীলাক্রমে এসে কাতার বদ্ধ হলেন এবং কুর্নিশ করে শাহ ফখরউদ্দীনের প্রতি তাঁদের আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন। ফখরউদ্দীনের এককালের সহকারী ও বর্তমানে সোনার গাঁয়ের অন্যতম সালার বান্দা মুখলিস আরো এক ধাপ এগিয়ে এলেন। আনুগত্য প্রকাশের সাথে বান্দা মুখলিস তাঁর সেপাই–সৈন্য নিয়ে মহোল্লাসে আওয়াজ তুললেন —জনাবে আলা শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব — জিন্দাবাদ!

পানি একবার একদিকে গড়াতে শুরু করলে, তামাম পানিই সেই দিকে ছুটে। সঙ্গে সঙ্গে এ আওয়াজে শরিক হলো সোনার গাঁয়ের সরকারী ও বেসরকারী বিপুল জনতা। শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের জিন্দাবাদে মুহূর্তেই সোনার গাঁ মুখরিত হয়ে উঠলো। তাঁর তখ্ত দখলের পথে আর বিপত্তি কিছুই রইলো না।

তখ্ত দখল করেই শাহ ফখরউদ্দীন সাহেব দিল্লীর জিঞ্জির খুলে ফেললেন। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে সগর্বে স্বাধীন পতাকা উড়িয়ে দিলেন এবং সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ নাম ধারণ করে সোনার গাঁয়ের তখ্তে উঠে বসলেন। দিল্লীর কিছু একনিষ্ঠ সেবাদাস বাদে সোনার গাঁয়ের প্রশাসনের সামরিক ও বেসামরিক তামাম লোক সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের প্রভুত্ব হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নিলেন।

এভাবে সূচিত হলো বাঙ্গালা মুলুকে স্বাধীন সোল্‌তানাতের গোড়া পত্তন।

সোনার গাঁয়ের মসনদ দখল করে সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ সোনার গাঁয়ে স্থায়ীভাবে বসে গেলেন। ইনসান আলীকেই ভুলুয়ার প্রশাসক পদে রেখে সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ তাঁর আত্মীয় পরিজন সবাইকে সোনার গাঁয়ে নিয়ে এলেন।

কিন্তু ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের এই সোনার গাঁ দখল অপ্রতিহত রইলো না। স্বাধীন সোল্‌তানত প্রতিষ্ঠার এটা ছিল তাঁর একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়। সংখ্যায় অধিক নাহলেও, সোনার গাঁয়ে অবস্থিত দিল্লীর সেবাদাসদের তৎপরতা শুরু হলো। অন্য কথায় শাহ ফখরউদ্দীনের দিল্লীর গোলামী অস্বীকার করার সাথে সাথেই তারা সোচ্চার হয়ে উঠলো। সংবাদ গেল লাখ্‌নৌতিতে, সাতগাঁয়ে ও দিল্লীতে। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরকে পাকড়াও করার মতো দিল্লী থেকে ঐ একই ধাঁচে আওয়াজ এলো — পাকড়ো বেতমিজকো —

গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের সময়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন সাতগাঁয়ের প্রশাসক বাহরাম খাঁ। সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের বিরুদ্ধে এবার অগ্রণী ভূমিকা নিলেন লাখ্‌নৌতির শাসনকর্তা কদর খান। তৎকালীন বাঙ্গালা মুলুকের মূল শক্তি তখনও লাখ্‌নৌতিতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। সেনাপতি আলী মুবারকের উপর লাখ্‌নৌতি বা গৌড়রাজ্যের প্রতিরক্ষার ভার অর্পণ করে লাখ্‌নৌতির ঐ সমুদয় শক্তি নিয়ে সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের বিরুদ্ধে বিপুল বিক্রমে বেরিয়ে পড়লেন কদর খান। অন্যান্য সেনাপতিরা ছাড়াও কদরখানের সঙ্গে এলেন হিসাব রক্ষক হুসামউদ্দীন আবু রেজার মতো আরো অনেক উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা। একইভাবে সাতগাঁয়ের তামাম শক্তি নিয়ে এসে কদর খানের ফৌজের সাথে সামিল হলেন সাতগাঁয়ের শাসনকর্তা আজম মালিক ওরফে ঈজউদ্দীন ইয়াহিয়া। দিল্লীর সুলতানের নির্দেশে বিপুল বাহিনী নিয়ে এসে তাঁদের সাথে সামিল হলেন কারা প্রদেশের শাসনকর্তা ফিরুজ খান। সামিল হলো ছোট বড় আরো কয়টি খণ্ড শক্তি। কারণ এরা বুঝেছিল, গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের ঐ পরিণতির পর আবার যখন এই বিদ্রোহ, তখন পায়ের তলে কাঁচা মাটি নিয়ে এবার দাঁড়ায়নি বিদ্রোহী। এতে করে তামাম কিছু মিলে কদর খানের নেতৃত্বে যে শক্তি পয়দা হলো, সে শক্তি অনায়াসে বাঙ্গালা মুলুকের মতো বিরাট আর এক নয়া মুলুক জয় করার শক্তি ছিল।

সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ ও তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা তা জানতেন। তাঁরা জানতেন, সোনার গাঁ থেকে আপাততঃ কোন বাধা না এলেও এই বিচ্ছিন্নতা দিল্লীর সুলতান নীরবে মেনে নেবেন না। বিশেষ করে, শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের এই উত্থান বাঙ্গালা মুলুকের অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দুই চোখে কিছুতেই সইবে না। তাঁরা জ্বলে পুড়ে মরবেন। তাই ফখরউদ্দীন সাহেবেরাও যথাসত্বর প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। কিন্তু গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের মতোই সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহও প্রতিরোধকল্পে তৈয়ার হওয়ার অধিক সময় পেলেন না। স্থানীয় সেবাদাসদের তৎপরতায় এত দ্রুত গতিতে এবং এত উত্তপ্ত হয়ে এ খবর বিভিন্ন স্থানে পৌছলো যে, এবং এর ফলে এত ক্ষিপ্রগতিতে হামলা এসে ঘাড়ের উপর চাপলো যে, সদ্যঘোষিত সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ অনেকটা হল্-টলে হয়ে গেলেন।

ফৌজদার সোলায়মানের ফৌজ সহ যে ফৌজ সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ সঙ্গে করে এনেছিলেন, তার পরিমাণ এমন কিছু অধিক নয়। সোনার গাঁয়ে এসেও ফৌজ তিনি পেলেন, সেটাও কিছু তাজ্জবভাবে বিপুল নয়। সোনার গাঁয়ের মতো নয়া একটা প্রশাসনিক বিভাগে তেমন ফৌজ থাকেও না। ফলে,

সবকিছু একত্র করে তাৎক্ষণিকভাবে যে বাহিনী খাড়া করলেন তিনি, তা কদরখানের বাহিনীর মতো একটা বিশাল বাহিনীকে সাময়িকভাবে ঠেকা দেয়ার মতো, উৎখাত করার মতো নয়। একমাত্র অদম্য মনোবল দক্ষ পরিচালনা আর সবার উপর জান–কোরবান করার এক উত্তপ্ত আগ্রহ নিয়ে লড়লে, তবেই কদর খানের বাহিনীকে কব্জা করা সম্ভব ছিল।

কিন্তু কাজের বেলায় তা হলো না। অচিরেই এই আগ্রহ বা নিয়াত আর সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব দেখা দিলো। কদর খানের বিশাল ঐ বাহিনী এসে সোনার গাঁকে তিনদিক দিয়ে ঘিরে ফেললো যখন, তখন কতকটা দিশেহারার মতো সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ নিজেই এসে তাঁর ঐ সদ্যগঠিত বাহিনীর সম্মুখভাবে দাঁড়ালেন এবং ফৌজ চালনার নেতৃত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন। ফৌজদার সাহেব, শরীফ রেজা, জাফর আলী, বান্দা মুখলিস প্রভৃতি সেনাপতিদের মধ্যে নিজেই তিনি সেপাই বন্টন করে দিলেন এবং তিনদিক দিয়ে ঘিরে নেয়া ঐ দুশমন বাহিনীর এক একদিকে এক একজনকে প্রেরণ করলেন। এই ব্যবস্থায় সুলতান গিয়ে দাঁড়ালেন শত্রুবেষ্টনীর মাঝখানে কদর খানের সামনে। তাঁর ডাইনে কদর খানের বাহিনীর মূল অংশের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সেনাপতি বান্দা মুখলিস ও জাফর আলী খান এক সাথে। সুলতানের বামদিকে সাতগাঁয়ের শাসনকর্তা ঈজউদ্দীন ইয়াহিয়ার সামনে পড়লেন শরীফ রেজা। তাঁরও বাঁয়ে কারার শাসক ফিরুজ খানের সামনে পড়লেন বৃদ্ধ ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব ও অন্যান্য সেনাপতি, ফৌজদার, কিল্লাদাররা শত্রুসেনার বিশাল ঐ কাতারের হেথা হোথা নিয়োজিত হলেন।

রণবিদ্যায় সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের দখল কিঞ্চিৎকর না হলেও এবং অন্যান্য যে কোন সালারের তা সমীহযোগ্য হলেও, শরীফ রেজার সাথে তাঁর তুলনাই চলে না। দুর্ধর্ষ লড়াইয়া ও বিচক্ষণ রণবিশারদ হিসাবে ত্রিবেণী বিজয়ী বিখ্যাত বীর জাফর গাজীর পরেই সাতগাঁ ও রাঢ় অঞ্চলে এই তরুণ সৈনিক শরীফ রেজা ছিলেন কিংবদন্তির নায়ক। ফৌজদার সাহেব সহকারে অনেকেরই এমন কি সালার জাফর আলী খানেরও, এই ধারণাই ছিল যে, শরীফ রেজার মতো একজন জানবাজ ও সুদক্ষ যোদ্ধার হাতেই সুলতান এই লড়াইয়ের মূল দায়িত্ব দেবেন। কিন্তু সুলতান যখন নিজেই নেতৃত্ব দিতে এলেন তখন অনেকেই হকচকিয়ে গেলেন। অগ্রসর হওয়ার মুহূর্তে তাই চকিতে একবার শরীফ রেজার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে অগ্রসর হলেন জাফর আলী। শরীফ রেজাও অগ্রসর হওয়ার কালে ফৌজদার সাহেবকে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন — স্বাভাবিক লড়াই নয়, এ লড়াইয়ে লড়তে হবে একেবারেই মরণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে। মুরুব্বী মানুষ সুলতান বাহাদুর। তলোয়ার চালানোর সাথে সাথে সকলের মধ্যে উনি এই প্রতিজ্ঞা আর উদ্দীপনা প্রবাহিত করতে পারবেন তো?

জবাবে ফৌজদার সাহেব বিব্রত কণ্ঠে বললেন সহযোগিতা করা — মদদ দেয়া। আমাদের কাজে আ[illegible] না করি, এটেই আমাদের দেখার বিষয়। যেভাবে [illegible] সুলতানকে তাঁর নিজের কাজ সেইভাবে করতে দাও।

আর কোন প্রশ্ন না তুলে শরীফ রেজা তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন।

ফৌজদার সাহেবও তার বাহিনী নিয়ে এসে কাতারের শেষ ফিরুজখানের বাহিনীর সামনে দাঁড়ালেন।

এ পক্ষের এক একজনের বাহিনী বলতে ও পক্ষের এক একজনের বিশাল বাহিনীর তুলনায় পাহাড়ের সামনে এক একটি উইয়ের ঢিপি। এই নিয়েই অগ্রসর হলেন এ পক্ষের সকলেই। শুরু হলো লড়াই। অল্পক্ষণেই সে লড়াই তুমুল আকার ধারণ করলো। তুমুল লড়াই চলতে লাগলো সোনর গাঁয়ের তিনদিকে—শহরের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর প্রান্ত জুড়ে।

নিষ্ঠা ও প্রতিজ্ঞা নিয়েই অগ্রসর হলেন সুলতানের সেপাই–সেনা। কিন্তু তুমুল লড়াই শুরু হওয়ার পরপরই কেন্দ্রীয় প্রেরণাও নির্দেশনা স্তিমিত হয়ে এলো এবং এক পর্যায়ে এসে সুলতানের প্রত্যেকটি বাহিনীই কেন্দ্রীয় নির্দেশনার অভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বিচ্ছিন্নভাবে থেকেই তারা লড়াই করতে লাগলো।

এভাবে লড়েই সুলতানের সেপাইরা দুশমনের ঐ বিশাল বাহিনীকে তটস্থ করে তুললো। বিশেষ করে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শরীফ রেজা ও ফৌজদার সাহেবের মরণকামড়ে পড়ে শত্রুবেষ্টনীর পুরোপুরি দক্ষিণ অংশে ও পশ্চিম অংশের অর্ধেকটা জুড়ে হাহাকার পড়ে গেল। কারাপ্রদেশের ফিরুজ খান বৃদ্ধ শার্দুল সোলায়মান খানের ক্ষুব্ধ থাবায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পশ্চাদধাবন করলেন এবং সসৈন্যে পালিয়ে লাখ্নৌতির ফৌজের আড়ালে এসে দাঁড়ালেন। পাশাপাশি, শরীফ রেজার হাতে সাতগাঁয়ের বাহিনীটাও গোটাই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। ঈজউদ্দীন ইয়াহিয়াও তাঁর ফৌজ নিয়ে পিছুহটার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে অবকাশ তিনি পেলেন না। মুহূর্তেই শরীফ রেজার আঘাতে তিনি ভূপতিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করলেন। ঈজউদ্দীন ইয়াহিয়ার মৃত্যু ঘটার সাথে সাথে তার সেপাইরা লড়াই থেকে পালিয়ে গিয়ে মহাতংকে ছুটোছুটি করতে লাগলো।

অতপর ফৌজদার সাহেব ও শরীফ রেজা নিজ নিজ ফৌজ নিয়ে যথা সত্বর উত্তর–পশ্চিম ও উত্তর এলাকায় অন্যান্যদের সাহায্যে ছুটে এলেন। কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম। তাঁরা এগিয়ে এসে দেখলেন, লড়াই এদিকে খতম!

যে নিয়াত আর প্রতিজ্ঞা নিয়ে শরীফ রেজা আর ফৌজদার সাহেব লড়লেন, লড়াইটা তুমুল আকার ধারণ করার পরেই সে প্রতিজ্ঞা আর নিয়াতের

সবকিছু একত্র করে তাৎক্ষণিকভাবে যে বাহিনী খাড়া করলেন তিনি, তা কদরখানের বাহিনীর মতো একটা বিশাল বাহিনীকে সাময়িকভাবে ঠেকা দেয়ার মতো, উৎখাত করার মতো নয়। একমাত্র অদম্য মনোবল দক্ষ পরিচালনা আর সবার উপর জান–কোরবান করার এক উত্তপ্ত আগ্রহ নিয়ে লড়লে, তবেই কদর খানের বাহিনীকে কবজা করা সম্ভব ছিল।

কিন্তু কাজের বেলায় তা হলো না। অচিরেই এই আগ্রহ বা নিয়াত আর সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব দেখা দিলো। কদর খানের বিশাল ঐ বাহিনী এসে সোনার গাঁকে তিনদিক দিয়ে ঘিরে ফেললো যখন, তখন কতকটা দিশেহারার মতো সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ নিজেই এসে তাঁর ঐ সদ্যগঠিত বাহিনীর সম্মুখভাবে দাঁড়ালেন এবং ফৌজ চালনার নেতৃত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন। ফৌজদার সাহেব, শরীফ রেজা, জাফর আলী, বান্দা মুখলিস প্রভৃতি সেনাপতিদের মধ্যে নিজেই তিনি সেপাই বন্টন করে দিলেন এবং তিনদিক দিয়ে ঘিরে নেয়া ঐ দুশমন বাহিনীর এক একদিকে এক একজনকে প্রেরণ করলেন। এই ব্যবস্থায় সুলতান গিয়ে দাঁড়ালেন শত্রুবেষ্টনীর মাঝখানে কদর খানের সামনে। তাঁর ডাইনে কদর খানের বাহিনীর মূল অংশের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সেনাপতি বান্দা মুখলিস ও জাফর আলী খান এক সাথে। সুলতানের বামদিকে সাতগাঁয়ের শাসনকর্তা ঈজউদ্দীন ইয়াহিয়ার সামনে পড়লেন শরীফ রেজা। তাঁরও বাঁয়ে কারার শাসক ফিরুজ খানের সামনে পড়লেন বৃদ্ধ ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব ও অন্যান্য সেনাপতি, ফৌজদার, কিল্লাদাররা শত্রুসেনার বিশাল ঐ কাতারের হেথা হোথা নিয়োজিত হলেন।

রণবিদ্যায় সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের দখল কিঞ্চিৎকর না হলেও এবং অন্যান্য যে কোন সালারের তা সমীহযোগ্য হলেও, শরীফ রেজার সাথে তাঁর তুলনাই চলে না। দুর্ধর্ষ লড়াইয়া ও বিচক্ষণ রণবিশারদ হিসাবে ত্রিবেণী বিজয়ী বিখ্যাত বীর জাফর গাজীর পরেই সাতগাঁ ও রাঢ় অঞ্চলে এই তরুণ সৈনিক শরীফ রেজা ছিলেন কিংবদন্তির নায়ক। ফৌজদার সাহেব সহকারে অনেকেরই এমন কি সালার জাফর আলী খানেরও, এই ধারণাই ছিল যে, শরীফ রেজার মতো একজন জানবাজ ও সুদক্ষ যোদ্ধার হাতেই সুলতান এই লড়াইয়ের মূল দায়িত্ব দেবেন। কিন্তু সুলতান যখন নিজেই নেতৃত্ব দিতে এলেন তখন অনেকেই হকচকিয়ে গেলেন। অগ্রসর হওয়ার মুহূর্তে তাই চকিতে একবার শরীফ রেজার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে অগ্রসর হলেন জাফর আলী। শরীফ রেজাও অগ্রসর হওয়ার কালে ফৌজদার সাহেবকে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন — স্বাভাবিক লড়াই নয়, এ লড়াইয়ে লড়তে হবে একেবারেই মরণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে। মুরুব্বী মানুষ সুলতান বাহাদুর। তলোয়ার চালানোর সাথে সাথে সকলের মধ্যে উনি এই প্রতিজ্ঞা আর উদ্দীপনা প্রবাহিত করতে পারবেন তো ?

জবাবে ফৌজদার সাহেব বিব্রত কণ্ঠে বললেন — আমাদের কাজ সহযোগিতা করা — মদদ দেয়া। আমাদের কাজে আমরা যেন গাফিলতি কিছু না করি, এটেই আমাদের দেখার বিষয়। যেভাবে তিনি ভাল বোঝেন, সুলতানকে তাঁর নিজের কাজ সেইভাবে করতে দাও।

আর কোন প্রশ্ন না তুলে শরীফ রেজা তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন।

ফৌজদার সাহেবও তার বাহিনী নিয়ে এসে কাতারের শেষ প্রান্তে ফিরুজখানের বাহিনীর সামনে দাঁড়ালেন।

এ পক্ষের এক একজনের বাহিনী বলতে ও পক্ষের এক একজনের বিশাল বাহিনীর তুলনায় পাহাড়ের সামনে এক একটি উইয়ের টিপি। এই নিয়েই অগ্রসর হলেন এ পক্ষের সকলেই। শুরু হলো লড়াই। অল্পক্ষণেই সে লড়াই তুমুল আকার ধারণ করলো। তুমুল লড়াই চলতে লাগলো সোনর গাঁয়ের তিনদিকে—শহরের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর প্রান্ত জুড়ে।

নিষ্ঠা ও প্রতিজ্ঞা নিয়েই অগ্রসর হলেন সুলতানের সেপাই–সেনা। কিন্তু তুমুল লড়াই শুরু হওয়ার পরপরই কেন্দ্রীয় প্রেরণাও নির্দেশনা স্তিমিত হয়ে এলো এবং এক পর্যায়ে এসে সুলতানের প্রত্যেকটি বাহিনীই কেন্দ্রীয় নির্দেশনার অভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বিচ্ছিন্নভাবে থেকেই তারা লড়াই করতে লাগলো।

এভাবে লড়েই সুলতানের সেপাইরা দুশমনের ঐ বিশাল বাহিনীকে তটস্থ করে তুললো। বিশেষ করে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শরীফ রেজা ও ফৌজদার সাহেবের মরণকামড়ে পড়ে শত্রুবেষ্টনীর পুরোপুরি দক্ষিণ অংশে ও পশ্চিম অংশের অর্ধেকটা জুড়ে হাহাকার পড়ে গেল। কারাপ্রদেশের ফিরুজ খান বৃদ্ধ শার্দুল সোলায়মান খানের ক্ষুব্ধ থাবায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পশ্চাদধাবন করলেন এবং সসৈন্যে পালিয়ে লাখ্‌নৌতির ফৌজের আড়ালে এসে দাঁড়ালেন। পাশাপাশি, শরীফ রেজার হাতে সাতগাঁয়ের বাহিনীটাও গোটাই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। ঈজউদ্দীন ইয়াহিয়াও তাঁর ফৌজ নিয়ে পিছুহটার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে অবকাশ তিনি পেলেন না। মুহূর্তেই শরীফ রেজার আঘাতে তিনি ভূপতিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করলেন। ঈজউদ্দীন ইয়াহিয়ার মৃত্যু ঘটার সাথে সাথে তার সেপাইরা লড়াই থেকে পালিয়ে গিয়ে মহাতংকে ছুটোছুটি করতে লাগলো।

অতপর ফৌজদার সাহেব ও শরীফ রেজা নিজ নিজ ফৌজ নিয়ে যথা সত্বর উত্তর–পশ্চিম ও উত্তর এলাকায় অন্যান্যদের সাহায্যে ছুটে এলেন। কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম। তাঁরা এগিয়ে এসে দেখলেন, লড়াই এদিকে খতম!

যে নিয়াত আর প্রতিজ্ঞা নিয়ে শরীফ রেজা আর ফৌজদার সাহেব লড়লেন, লড়াইটা তুমুল আকার ধারণ করার পরেই সে প্রতিজ্ঞা আর নিয়াতের

কণামাত্রও এই উত্তর ও উত্তর–পশ্চিম এলাকায় অবশিষ্ট রইলো না। ক্ষণিকেই তা কর্পূরবৎ উবে গেল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকেও আর কোন তাকিদ বা প্রেরণাদি না আসায় সেনাপতিরা হতোদ্যম হয়ে গেলেন এবং তাঁদের সেপাইরা দায়সারা লড়াই লড়তে লাগলো। অপর দিকে, দক্ষিণ অংশের ঐ বিপর্যয় লক্ষ্য করে কদর খান মরিয়া হয়ে উঠলেন। জানের মায়া ছেড়ে দিয়ে নিজে তিনি লড়তে লাগলেন এবং সেই সাথে সেনাপতি ও সেপাইদের দুর্বারভাবে অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। ফলে, কদর খানের সেনাপতিরাও বেপরোয়া হয়ে উঠলে, ভাগ্নোদ্যম লড়াইয়া বান্দা মুখলিস আর জাফর খান সে চাপ সহ্য করতে পারলেন না। বাহিনীর সামনে থেকে এক সময় তাঁরা ছিটকে পশ্চাতে চলে এলেন। শুরু হলো বিপর্যয়ের পালা। সেনাপতিদের পিছু হটতে দেখে সেপাইদের মনোবল ভেঙ্গে গেল। তারাও ক্রমে ক্রমে পিছু হটতে লাগলো।

তবুও শেষ রক্ষে হতে পারতো। রণক্ষেত্রে সৈন্য সংখ্যাই লড়াই জয়ের একমাত্র শর্ত নয়। মনোবল ও নিষ্ঠাই জয়লাভের মূল মন্ত্র। শরীফ রেজারা এসে এদের সাথে শামিল হতে পারলেই হয়তো পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারতো। কিন্তু সে ফুরসুত্‌ তাঁরা পেলেন না। অন্য কথায়, খোদ সুলতানই তাঁদের সে ফুরসুত্‌ দিলেন না।

অত্যন্ত চাপে পড়ে সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ গোটা ময়দানের লড়াই পরিচালনা ছেড়ে দিয়ে স্রেফ নিজে লড়াই করা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন আর এতে করেই গোটা ময়দানের খবর রাখতে পারেন না। একে নিজেও তিনি সুবিধে করতে পারছিলেন না, তার উপর তাঁর ডানপাশের এই সেপাই-সেনাদের পিছু হটতে দেখে তিনি বুঝলেন, এ লাড়াইয়ে পরাজয় তার আসন্ন। এটা বুঝে তিনি চমকে উঠলেন। পরাজয় বরণ করতে এমন কি মরতেও তিনি রাজী ছিলেন, কিন্তু গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের ঐ পরিণতির কথা স্মরণ করে এদের হাতে বন্দি হতে কিছুতেই রাজী ছিলেন না। ধরা পড়ার ঐ আতংকেই তিনি শেষ অবধি লড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে পারলেন না। পলায়নই এই মুহূর্তে একমাত্র করণীয় বোধে তিনি তৎক্ষণাৎ পিছু হটলেন এবং সসৈন্যে রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

ফৌজদার সাহেব ও শরীফ রেজা এগিয়ে এসে দেখলেন, বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো দুশমনেরা বিপুল উল্লাসে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তাদের বাধা দেয়ার পরিবর্তে সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ সসৈন্যে দ্রুত বেগে পশ্চাৎ ধাবন করছেন। মরিয়া হয়ে লড়ার ফলে ফৌজদার সাহেব ও শরীফ রেজার সেপাই সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে এসেছিল। নিতান্তই ঐ নগণ্য শক্তি নিয়ে এই দুর্বার বন্যারোধের অপচেষ্টা করা তাঁরাও আর সমীচিন মনে করলেন না।

লড়াই থেকে পিছিয়ে এসেই সুলতান মুবারক শাহ যথা সম্ভব অর্থাদি পরিবার–পরিজন ও সেনা-সৈন্য নিয়ে সোনার গাঁ থেকে বেরিয়ে পূব দিকে চলে এলেন। বাধ্য হয়ে ফৌজদার সাহেব ও শরীফ রেজাও সসৈন্যে এসে তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। কদর খানের বাহিনী তাঁদের পিছু নিলে তাঁরা সোনার গাঁয়ের পূব দিকের এক বিশাল স্রোতস্বিনী পেরিয়ে সেই স্রোতস্বিনীর অর্থাৎ মেঘনা নদীর পূব পাড়ে এসে ছাউনি ফেলে বসলেন এবং সেখান থেকে শত্রু হামলার মোকাবেলা করার জন্যে তৈরি হলেন।

কদর খানের সাথে নৌযান না থাকায় এবং তাঁর সেপাইরা নৌযুদ্ধে পারদর্শি না হওয়ায়, তিনি ঐ স্রোতস্বিনী অতিক্রম করতে পারলেন না। বরং ঐ ডুবা অঞ্চলে ঢুকে পানি আটকা পড়ার ভয়ে সেনা সৈন্য নিয়ে কদরখান তাড়াতাড়ি মেঘনার এপার থেকেই সোনার গাঁয়ে ফিরে এলেন এবং দিল্লীর গোলামরূপে সোনার গাঁয়ের তখ্‌তে উঠে বসলেন।

পুনরায় পাল্টে গেল সোনার গাঁয়ের প্রেক্ষাপট! লড়াই অন্তে অন্যান্য সহযোগিরা সেনা সৈন্য নিয়ে স্ব স্ব এলাকায় প্রর্ত্যাবর্তন করলেন। নিহত ঈজউদ্দীন ইয়াহিয়ার সেপাইরাও ফেরত এলো সাতগাঁয়ে। কদরখান তাঁর লোকজন ও সেনা সৈন্য নিয়ে সোনার গাঁয়ে রয়ে গেলেন এবং সোনার গাঁয়ের উপর কর্তৃত্ব করতে লাগলেন।

সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ লাখ্‌নৌতির ঐ উঁচু এলাকার সেপাইদের তথা কদরখানের দুর্বলতা ধরে ফেললেন। তাই বর্ষা মওসুমের অপেক্ষায় মেঘনা নদীর পূব পাড়ে বসে তিনি মনোনিবেশ সহকারে নৌবহর তৈয়ার করতে লাগলেন। ও দিকে আবার সোনার গাঁয়ে কিয়ৎকাল অবস্থানের কালে যে বড় কাজটি সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ করেছিলেন, তা হলো গোয়েন্দা বাহিনীটাকে মজবুত ভাবে খাড়া করা এবং সেই সাথে সোনার গাঁয়ে তাঁর কিছু স্থায়ী শুভাকাঙ্খী তৈয়ার করে রাখা। এই উভয় গোত্রই সোনার গাঁয়ে বসে বসে এখন নিজ নিজ সাধ্যমতো সুলতানের পক্ষে কাজ করতে লাগলো। বিশেষ করে লাল মুহাম্মদ লাড্ডু মিয়ার অধীনে গঠিত ঐ সুদক্ষ গুপ্তচর বাহিনী এই সময় অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠলো এবং সোনার গাঁয়ের খবর সহ অন্যান্য খবরাদি সংগ্রহ করে সুলতানকে প্রেরণ করতে লাগলো।

দিন কেটে যেতে লাগলো। দিনের পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর মাস। এই ঘটনায় শুধু সোনার গাঁয়ের প্রেক্ষাপটই পরিবর্তিত হলো না, এর ধাক্কা গিয়ে ভুলুয়াতেও লাগলো। খোদ ভুলুয়ার প্রশাসকই বিদ্রোহী। ফৌজদার সোলায়মান

খান ও শরীফ রেজা তাঁর সহযোগী। সুতরাং দিল্লীর অর্থাৎ কদরখানের আক্রোশ গিয়ে স্রেফ ভুলুয়ার সদরেই পড়লো না, ভুলুয়ার মফস্বলে ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের মকানে গিয়েও পড়লো।

মেঘনার পাড়ে বসে ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবও এই চিন্তাই করছিলেন। এই বিপর্যয়ের ফলে যে তার মকানের উপর একটা চরম মুসিবত আসবে এটা ভেবে তিনি পেরেশান হয়ে যাচ্ছিলেন। তবে এখানে তাঁর একটা মস্তবড় সান্ত্বনা ছিল যে, দুশমনদের জুলুম তাঁর লোকদের কাউকেই স্পর্শ করতে পারবে না। কারণ, একটা স্থায়ী নির্দেশ ছাড়াও সোনার গাঁয়ে রওনা হওয়ার আগে তিনি তাঁর মকানের ও তাঁর অনুগত সবাইকে এই নির্দেশই দিয়ে এসেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা না করুন, কোন বিপর্যয় দেখা দিলে, সবাই যেন সরাসরি সাতগাঁয়ে চলে যায় এবং শায়খ শাহ শফীহুজুরের শরণাপন্ন হয়। তাদের হেফাজত করার মতো অনেক উপযুক্ত স্থান ও শিষ্যমুরিদ শায়খ হুজুরের আছে। ফৌজদার সাহেব ভেবে দেখলেন এই বিপর্যয়ের খবরটা অবশ্যই তাঁর লোকজনেরা ইতিমধ্যেই পেয়েছে এই সেই মুতাবেক সবাই তারা সাতগাঁয়ে চলে গেছে। এ নিয়ে ফৌজদার সাহেবের চিন্তা তেমন ছিল না। তাঁর ভাবনা হলো, তাঁর বাড়ী-ঘর ও বিষয় বিত্ত তামামই এই কদর খান তছনছ করে ফেলবে বা ইতিমধ্যেই ফেলেছে।

এই সময় এক খবর এলো, ফৌজদার সাহেবের মকানের সবাই সেই মকানেই এখনও আছেন, কেউ কোথাও যাননি। শুনামাত্রই ফৌজদার সাহেব আতংকিত হয়ে উঠলেন। কদর খানের হাতে তাদের পরিণাম যে কি হবে, তা তিনি চিন্তা করতে পারলেন না। কেন তারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করে ভুলুয়াতেই রয়ে গেল, নাকি আসলেই তারা পালানোর মওকা পেলো না, এসব ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। তার সর্বাধিক চিন্তা হলো কনকলতাকে নিয়ে। না জানি কি লানতই নেমে আসে তার উপর।

মেঘনার পাড়ে আসার পর শরীফ রেজাও একদম হাত গুটিয়ে ছিলেন না, বা হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন না। ছদ্মবেশে ও আড়াল পথে হরহামেশাই তিনি নানা উদ্দেশ্যে নানা স্থানে ছুটোছুটি করছিলেন। ফৌজদার সাহেবের মকান নিয়ে শরীফ রেজারও কম ভাবনা ছিল না। কনকলতা যত দুর্ব্যবহারই করে থাকুন তাঁর সাথে, কনকলতার নিরাপত্তা নিয়েই তিনি কম উদ্বিগ্ন ছিলেন না। অন্যান্যদের নিরাপত্তার প্রশ্নও তাকে কম ভাবিয়ে তুলেনি বা ইনসান আলীকে নিয়েও তার ভাবনাচিন্তা কম ছিল না। কাজেই, কদরখানের বাহিনীর তৎপরতা খানিকটা স্তিমিত হয়ে এলেই শরীফ রেজা মেঘনা পেরিয়ে এপাড়ে চলে এলেন এবং সর্বপ্রথম ভুলুয়ার খবরে ছুটলেন।

কয়েকদিন পর ভুলুয়া থেকে মেঘনার পাড়ে ফিরে এসে শরীফ রেজা যে বার্তা পেশ করলেন, তা যেমনই বিস্ময়কর তেমনই তৃপ্তিদায়ক। ভুলুয়াটা গোটাই এখন ইনসান আলীর দখলে এবং ফৌজদার সাহেবের মকানসহ সেখানের সকলেই এখন ইনসান আলীর হেফাজতে।

সোনার গাঁ দখল করার পর পরই কদর খানের নজর গেল ভুলুয়ায়। তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন —— লুট করো ভুলুয়া। ফখরউদ্দীনের লোক জন যে যেখানে আছে বেঁধে আনো সবাইকে। ফৌজদার সোলায়মান খানের মকান সহ তার বিষয়-বিত্ত তামামই বাজেয়াপ্ত করো!

ইনসান আলীর এ সন্দেহ আগে থেকেই ছিল। সুতরাং কদর খানের এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে তিনি কদর খানকে জানালেন, ভুলুয়ার প্রশাসক এখন ফখরউদ্দীন সাহেব নন, প্রশাসক এখন তিনি। অতএব ভুলুয়ার প্রতি হুজুরের নির্দেশ অর্থহীন ও আত্মঘাতী নির্দেশ। কারণ, বরাবরই তিনি সোনার গাঁ প্রশাসনের অনুগত ছিলেন, এখনও তাই আছেন। আজাদীর ব্যাপারটা সবটুকুই শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আজাদীর কোন ঢেউ বা ফখরউদ্দীন সাহেবের কোন আত্মীয়—স্বজনও এই ভুলুয়াতে নেই। এমতাবস্থায় ভুলুয়া লুট করা মানেই নিজের ঘর নিজে লুট করা।

কদর খান ইতিমধ্যেই তাঁর ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে অনেকখানি জড়িয়ে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে নজর দেয়ার ফুরসুত্ বেশী ছিল না। কাজেই, ইনসান আলীর বক্তব্যকেই যুক্তিযুক্ত মনে করে তিনি এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে গেলেন না। ইনসান আলীকেই ভুলুয়ার প্রশাসক নিযুক্ত করে তাঁর প্রতি নির্দেশ দিলেন—ফৌজদার সোলায়মান খানের বিষয়—বিত্ত বাজেয়াপ্ত করো।

সেই থেকেই বাজেয়াপ্ত করার নামে পাইক পেয়াদা নিয়োগ করে ইনসান আলী সাহেব ফৌজদার সাহেবের তামাম কিছু অধিকতর হেফাজত করে রেখেছেন এবং তাঁর লোক জনের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করেছেন। ইনসান আলী সাহেব এখন তদারক করার নামে মাঝে মধ্যেই ফৌজদার সাহেবের মকানে গিয়ে হাজির হন এবং দবির খাঁ ও মুইজুদ্দীনদের উৎসাহ দেয়ার জন্যে ওখানে তিনি মাঝে মাঝে অবস্থানও করেন। ফৌজদার সাহেব না থাকায় কনকলতা ফৌজদার সাহেবের মকানে আর না এলেও ইনসান আলীর আথিথেয়তার বিঘ্ন কিছু ঘটে না। চাকর নফর নিয়ে পদ্মরাণীই তাঁর মেহমানদারী করেন।

ভুলুয়ায় গিয়ে শরীফ রেজা এ তথ্য সংগ্রহ করে এনেছেন। শরীফ রেজা ইনসান আলীকে প্রশ্ন করলে ইনসান আলী বলেছেন—এ ছাড়া উপায় কিছু ছিল না উস্তাদ! সাময়িকভাবে কিছুদিন কদর খানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করলে,

কোন দিকেই তাল সামলানো যেতো না। বিশেষ করে শাহ সাহেবের তো ব্যক্তিগত কোন কিছুই এই ভুলুয়ায় আর নেই, আপনাদের ওদিকটা অর্থাৎ জনাব খান সাহেবের তামাম কিছুই মিস্‌মার হয়ে যেতো। এভাবে চলে বর্তমানের ধক্কলটা সামলিয়ে নেয়া যাক, পরবর্তী চিন্তা-ভাবনা পরেই করা যাবে।

শরীফ রেজার রসিকতার জবাব দিতে ইনসান আলী ফের বলেছেন, না উস্তাদ, মিথ্যা তো কিছু বলিনি। সত্যিই তো আমি সোনার গাঁয়ের প্রশাসনের অনুগত লোক। আমি তো একথা বলিনি যে, দিল্লীর অধীন সোনার গাঁয়ের অনুগত লোক আমি, সুলতানের অধীন সোনার গাঁয়ের অনুগত লোক নই ? আমি বলেছি, আমি সোনার গাঁয়ের প্রশাসনের অনুগত লোক। ওদিকে আবার, আসলেই তো আমি দিল্লীর সুলতানের কর্মচারী। বাঙ্গালার সুলতানের কর্মচারী দু'দিন পরে হতে দোষ কি ? বাঙ্গালা মুলুককে আজাদ শুধু বাইরে থেকেই করবেন ? লাড্ডু মিয়াদের মতো ভেতরে থেকে করবেন না ?

শরীফ রেজা তারিফ করে বলেছেন — শাব্বাশ্!

ভুলুয়া থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করে এনে শরীফ রেজা খান সাহেবকে শোনালেন। শুনে ফৌজদার সোলায়মান খান লম্বা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস টানলেন।

এদিকে সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের রণপ্রস্তুতি যতই জোরদার হতে লাগলো, ওদিকে সোনার গাঁয়ে কদর খানের ঘরোয়া জটিলতা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সোনার গাঁ দখল করার পরই সোনার গাঁয়ের কোষাগারে সঞ্চিত প্রভূত ধনরত্ন সহকারে সোনার গাঁয়ের তামাম সম্পদ কদর খানের হস্তগত হলো। এ ছাড়াও, বাহরাম খান ও সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ পরিত্যক্ত প্রভূত সম্পদ এবং অসংখ্য হাতী—ঘোড়ারও মালিক হলেন তিনি। কয়দিন ধরে গুছিয়ে তামাম ধন-সম্পদ কদর খান নিজ ভাণ্ডারে তুললেন এবং হাতী-ঘোড়া সমস্তই নিজের দখলে নিয়ে নিলেন। সরকারী বা অন্যকারো মালিকানা এ সবের উপর রাখলেন না। নিজেই মালীক হলেন।

কয়েকটা দিন কেটে গেল। এর পরেই শুরু হলো গুঞ্জরণ। কদর খানের সেনা সৈন্য ও সঙ্গীদের ধারণা ছিল যে, তাঁরা সবাই মিলে যে গনীমত অর্থাৎ বিজয় লব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহ করলেন কয়দিন ধরে, তুল্যাংশে এর হিস্যা সবাই তাঁরা পাবেন। কিন্তু যখন তারা দেখলেন, কদর খান একাই সমস্ত ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে ফেলেছেন, কাউকেই তার জাররা মাত্র ভাগ অংশ দিচ্ছেন না, তখন সবার মধ্যেই গুঞ্জরণ শুরু হলো। প্রথম দিকে অনেকেরই আবার এ

ধারণাও হয়েছিল যে, হয়তো কদর খান তামাম সম্পদ দিল্লীতে সম্রাটের কাছে পাঠানোর জন্যেই একত্র করছেন নিয়ে গিয়ে। কিন্তু আসলেই যখন কোন প্রকার হিসেব—নিকেশ না রেখেই সম্পূর্ণ সম্পদ সকলের নজর থেকে সরিয়ে নিলেন কদর খান এবং আত্মসাৎ করে ফেললেন, হাতী-ঘোড়া তামামই তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ বলে দাবী করতে লাগলেন, তখনই পরিস্থিতিটা জটিল হয়ে উঠলো। প্রথমে গুঞ্জরণ এবং পরে গুঞ্জরণ থেকে এ নিয়ে চরম অসন্তোষ আর বিপুল হৈ চৈ শুরু হলো।

তবুও কদর খানের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া শুরু হলো না বা তাঁর টনক আদৌ নড়লো না। এই অঢেল অর্থাদি আর ধন-সম্পদ দেখে তিনি একদম আওয়ারা হয়ে গেলেন এবং এর কনামাত্রও অন্য কাউকে না দিয়ে নিজেই সব গ্রাস করার অন্ধ নেশায় মরিয়া হয়ে উঠলেন।

পরিস্থিতি যখন অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করলো তখন হিসেব—রক্ষক হুসামউদ্দীন আবু রেজা সেনা সৈন্যদের চাপে পড়ে কদর খানের কাছে এসে বললেন — আমি গনীমতের কথা বলছি জনাব। মানে ঐ বিজয়লব্ধ ধন-সম্পদের মোটামুটি একটা হিসেব থাকার দরকার। অন্ততঃ হিসেব একটা সবার সামনে তুলে ধরতে পারলেও তাদের তুষ্ট রাখা যেতো।

শুনেই কদর খান হুংকার দিয়ে উঠলেন—তুষ্ট! সোনার গাঁয়ের শাসনকর্তা কে ? কে ঐ লাখ্‌নৌতির শাসনকর্তা ?

হুসামউদ্দীন বললেন — কেন হুজুর আপনি!

ঃ তাহলে কোন্ সাহসে আপনি সবাইকে তুষ্ট রাখার পরামর্শ দিতে এসেছেন আমাকে ?

ঃ জনাব।

ঃ সবাইকে তুষ্ট রাখবো আমি, না ঐ সব গোলামের বাচ্চা গোলামেরাই তুষ্ট রাখবে আমাকে ? আমার জান আর নকরীটা তাদের হাতে, না তাদের জান আর নকরীটাই আমার হাতে ?

ঃ কিন্তু —

ঃ চাবুক লাগান। হৈ চৈ যে করবে, তার পিঠে শক্ত করে চাবুক লাগান। সব আপ্‌ছে আপ্ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!

তবু হুসামউদ্দীন সবিনয়ে বললেন — না জনাব, এতটা জিদ ধরা ঠিক নয়। ঠিক হবে না এটা। গনীমতের উপর সকলেরই হক আছে। এর হিস্যা সকলেরই প্রাপ্য। আর না হোক, ঐ বিপুল সম্পদের কিছু অংশ সবার মধ্যে বিলি বন্টন করে দিন. ফ্যাসাদটা চুকে যাক। আর যদি তা না করেন, তাহলে ঐ

ধন-সম্পদ সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিন। এত সম্পদ কাছে রাখা ঠিক নয়। এত সম্পদ নিজের দখলে রাখলে তার পরিণাম বড় খারাপ হবে জনাব!

কদর খানের দুই চোখ দপ করে জ্বলে উঠলো। তিনি কুপিত কণ্ঠে বললেন — পরিণাম খারাপ হবে! কি বলতে চান আপনি?

হুসামউদ্দীন ভয়ে ভয়ে বললেন — সেপাইরা বিদ্রোহ করতে পারে হুজুর।

পুনরায় গর্জে উঠলেন কদর খান — খামুশ্‌!

ঃ জনাব!

ঃ বিদ্রোহ? এখনও বিদ্রোহ করার খোয়াব দেখে ব্যাটারা? গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর, ফখরউদ্দীন মুবারক, এদের হালত দেখেও এলেম হয়নি বেয়াকুফদের?

ঃ না, মানে—

ঃ কত বাঘ সিংহ পড়ে মরলো, আর এসব নেড়ি কুকুরের —

ঃ হুজুর —

ঃ কুকুর মাফিক কোৎকা হাঁকান, বিদ্রোহের খোয়াব তাদের দরওয়াজা ভেঙ্গে পালিয়ে যাবে।

ঃ কিন্তু —

ঃ বটে! আপনার নসিহত তো চাইনি আমি? আপনি কেন এভাবে বিরক্ত করছেন আমাকে? যান, বেরিয়ে যান —

ঃ তবু হুজুর —

ঃ আহ্‌! নিকালো — আভ্‌ভি নিকালো —

যারপরনেই অপমান করে হুসামউদ্দীন আবু রেজাকে তাড়িয়ে দিলেন কদর খান। হুসামউদ্দীনের ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার সাথে সাথেই সোনার গাঁয়ের পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। নিজেদের সংযত রাখতে না পেরে কয়েকজন সেপাই ক্রোধ ভরে সেনাবাহিনীর ছাউনি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলো এবং কদর খানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অসন্তোষ ছড়াতে লাগলো।

কদর খানও তৈরি ছিলেন এর জন্যে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এদের কোতল করার হুকুম দিলেন। কদর খানের মনোরঞ্জনে কিছু সুবিধেবাদী ও স্বার্থপর সেপাই সেনা তৎক্ষণাৎ সে হুকুম কার্যকর করলো। ফলে, বদনসীব কয়েকজন সেপাইয়ের খণ্ডিত লাশ প্রকাশ্য রাজপথে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।

এ দৃশ্য দেখা মাত্রই সেপাই ছাউনির অধিকাংশ সেপাইদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তারা বিদ্রোহ করার উদ্দেশ্যে হাতিয়ার হাতে তৈয়ার হয়ে গেল এবং ছুটোছুটি করে সবাইকে একত্র করতে লাগলো।

কিন্তু কদর খানের কথাই ঠিক। তাদের এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়ার লোক কাউকেই পাওয়া গেল না। দীলে যার যত জ্বালাই থাক, কোন সালার, সহকারী সালার বা এমন কি একজন ফৌজদারও এই উৎক্ষিপ্ত সেপাইদের নেতৃত্ব দিতে এলেন না। তাঁরা ভেবে দেখলেন, উত্তেজনার বশে এ হঠকারিতায় যাওয়ার অর্থই মউতকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসা। কদর খান যদি স্রেফ কদর খান হতেন, তাহলে এ নিয়ে কারো দ্বিধাদ্বন্দ্বই ছিল না। কিন্তু কদর খান স্রেফ কদর খান নন। তাঁর পেছনে গোটা বাঙ্গালার শক্তি আছে, সর্বোপরি, দিল্লীর ফৌজ ও দিল্লীর সুলতান আছেন। সবাই তাঁরা বিদ্রোহ দমনে ছুটে আসবেন। কাজেই সাময়িকভাবে সাফল্য কিছু এলেও শেষ রক্ষে হবে না। শেষ পর্যন্ত তামাম বাঙ্গালা মুলুক ও দিল্লী মুলুকের কোথাও আত্মগোপনের স্থানটুকুও কারো তাদের থাকবে না।

সমস্ত দিক বিশদভাবে চিন্তা করে দেখে ঐ সেপাইদের নেতৃত্বদানে কেউ রাজী হলেন না। ফলে, নিদারুণ মর্মদাহ দীলে চেপে নিয়ে ঐ তৈরি হওয়া সেপাইরা ফের নিষ্ক্রীয় হয়ে গেল। নেতৃত্বহীন বিদ্রোহ অর্থহীন বোধে হাতিয়ার নামিয়ে রেখে নিজেদের বাহু তারা নিজেরাই কামড়িয়ে বিক্ষত করতে লাগলো।

কিন্তু এ দুনিয়ায় কিছুই যায় না ফেলা। সেপাইদের ঐ মর্মপীড়া একেবারেই নিরর্থক হয়ে গেল না। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলেন সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের লোকেরা। সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের যে সমস্ত শুভাকাঙ্খীরা এই সময় এই সোনার গাঁয়ে ছিলেন তাঁরা এবং সুলতানের গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা এই বিক্ষুব্ধ সেপাইদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন এবং তাদের হাত করতে লাগলেন। সুলতানের পক্ষে যোগ দিলে শুধু নেতৃত্ব লাভে প্রতিশোধ নেয়াই নয়, সুলতান ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ তাদের প্রত্যেককেই যথাযোগ্য পদে নিয়োগদান করবেন ও যথাসম্ভব অর্থনৈতিক সুবিধে দানে তাদের পুনর্বাসন করবেন জেনে, অল্প কথায় কদর খানের বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সেপাই সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের পক্ষে যোগ দিতে রাজী হয়ে গেল এবং সুলতানকে অতি সত্বর সোনার গাঁ আক্রমণ-করার আহবান জানাতে লাগলো।

ওদিকে আবার সেপাই সেনা ছাড়াও কদর খানের দুর্ব্যবহারে বেসামরিক কর্মকর্তাদেরও অনেকেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন এবং সোনার গাঁয়ের অধিবাসীদের মধ্যেও চরম অসন্তোষ বিরাজ করতে লাগলো। এই দুঃশাসনের নিরসন মানসে সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন। সুলতানের গোয়েন্দারা সোনার গাঁয়ের এই সার্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সুলতানকে হরওয়াক্ত অবহিত রাখতে রাখলেন।

সময় প্রায় পোক্ত হয়ে এলো। ইতিমধ্যেই চলে এলো বর্ষাকাল। হু হু করে ছুটে এলো পানি। সুলতান মুবারক শাহর নসীবগুণে সেবারের বন্যাটাও ছিল ভয়ংকর এক বন্যা। সোনার গাঁয়ের শহরটুকু বাদে চারপাশে তামাম এলাকা প্লাবিত হয়ে গেল। চারদিকে কেবলই পানি আর পানি। ভয়ানক খাদ্যাভাবে ও অধিক বন্যার কারণে বিমার আক্রান্ত হয়ে কদর খানের অসংখ্য ঐ হাতী ঘোড়া অচল ও অথর্ব হয়ে গেল এবং দলে দলে মৃত্যু বরণ করতে লাগলো।

এই সুযোগে ছুটে এলেন ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ সঙ্গে তাঁর সেনা-সৈন্য ও বিরাট এক নৌবহর। সসৈন্যে এসে তিনি বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সোনার গাঁয়ের উপর। সুলতান এসে আক্রমণ করার সাথে সাথেই মুষ্টি মেয় কিছু সেপাই সেনা বাদে কদর খানের ফৌজের সিংহভাগই সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করলো। পরিস্থিতি বিলকুলই সুলতানের পক্ষে এবং কদর খানের বিপক্ষে চলে গেল। এতে করে লড়াই আদৌও দীর্ঘস্থায়ী হলো না। লড়াইটা শুরু হওয়ার পরপরই কদর খানের সেপাইরাই কদর খানকে ঘিরে ধরে ঐ ময়দানেই তাকে হত্যা করলো। কদর খানকে নিহত হতে দেখেই কদর খানের পক্ষ অবলম্বনকারী ঐ মুষ্টিমেয় লোক-লস্করের অধিকাংশই তৎক্ষণাৎ পালিয়ে লাখ্‌নৌতির দিকে ছুটলো আর বাদ বাঁকীটাকে বিশেষ করে ঐ সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর ঘাতক সেপাই সেনাদের কদর খানের সেপাইরাই খুঁজে খুঁজে হত্যা করলো। সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ এবার অত্যন্ত সহজেই ও অল্পক্ষণেই নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হলেন।

পুনরায় সুলতান গিয়ে সোনার গাঁয়ের মসনদে উঠে বসলেন। সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের এই দুস্‌রাবারের মসনদ দখল কায়েমী দখল হলো। সাতগাঁয়ের শাসনকর্তা ঈজউদ্দীন ইয়াহিয়া আগেই নিহত হয়েছিলেন। লাখ্‌নৌতির শাসনকর্তা কদর খানও নিহত হলেন এবার। সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহকে বাধা দেয়ার মতো আর কোন শক্তিই আপাতত এই বাঙ্গালা মুলুকে রইলো না। ওদিকে আবার দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলকও আভ্যন্তরীণ নানাবিধ সমস্যা ও তাঁর অন্যান্য নানা প্রদেশের বিদ্রোহ-বিপ্লব নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, শুধু এই মুহূর্তেই নয়, তিনি আর তাঁর জিন্দেগীতেও বাঙ্গালা মুলুকের দিকে নজর দিতে পারলেন না। ফলে, ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের সোনার গাঁয়ের সোল্‌তানত্‌ কায়েমী হয়ে গেল।

মসনদ দখল করার পরই সুলতান মুবারক শাহ তার ওয়াদা রক্ষা করলেন। তার পক্ষে যোগদানকারী কদর খানের লোক লস্করদের উপযুক্ত পদ ও অর্থনৈতিক সুবিধা দানে পুনর্বাসন করে তিনি তাঁদের সকলেরই শ্রদ্ধা ভাজন হলেন। অতপর সুলতান সোনার গাঁয়ের অধীনস্ত সমগ্র এলাকার উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সোনার গাঁয়ের প্রশাসনকে মজবুত করার কাজে মনোনিবেশ করলেন।

এই ফাঁকে ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব একবার শরীফ রেজা সহকারে মকানের দিকে ছুটলেন। ফৌজদার সাহেব সরাসরি নিজ মকানে চলে গেলেন। কিন্তু শরীফ রেজা তা না গিয়ে মাঝ পথে রাস্তা বদল করলেন এবং ইনসান আলীর সাথে কিছু প্রয়োজনের অজুহাতে ভুলুয়ার সদরে এসে ইনসান আলীর মেহমান হয়ে রইলেন। বস্তুতঃ কনকলতা সৃষ্ট ঐ দুর্বিসহ পরিবেশে শরীফ রেজার যাওয়ার আগ্রহ হলো না।

বান্দা মুখলিস নিহত। কিছুদিন সকলের নিরিবিলি আর নিশ্চিন্তে কাটার পরই এলো এই দুঃসংবাদ। বান্দা মুখলিসের মৃত্যু সংবাদ বায়ুর বেগে ছুটে এলো সোনার গাঁয়ে এবং সেখান থেকে সে সংবাদ ভুলুয়ায় এসে পৌঁছলো।

বান্দা মুখলিসের মৃত্যুর মূল কারণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা। উপলক্ষ্য অতি উৎসাহ। এই অতি উৎসাহ খানিকটা বান্দা মুখলিসের নিজের খানিকটা সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ্‌র। সোনার গাঁয়ের ঐ দুস্‌রাবারের সহজলভ্য বিজয়ই এই অতি উৎসাহের উৎস। বাঙ্গালামুলুকে কোথাও আর উল্লেখযোগ্য কোন শক্তিই নেই দেখে অতি সত্বর গোটা বাঙ্গালা মুলুক দখল করার অদম্য এক আগ্রহ জাগে সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ্‌র দীলে। এই আগ্রহের বশবর্তী হয়ে শরীফ রেজা ও ফৌজদার সাহেব সোনার গাঁয়ে ফিরে না আসতেই তিনি জাফর আলীকে চাটিগাঁয়ে পাঠিয়ে দিলেন আউলিয়া কদল খান গাজী ও বদর আলমের সাথে সোনার গাঁয়ের পূর্বাঞ্চল ও চাটিগাঁয়ে অভিযান চালানোর ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপন করতে। জাফর আলীকে পাঠিয়ে দিয়েই তিনি বান্দা মুখলিসের সাথে সাতগাঁ ও লাখ্‌নৌতির প্রশ্ন নিয়ে বসলেন। তাঁরা আলোচনা করে দেখলেন, ঈজউদ্দীন ইয়াহিয়া ও কদর খানের মৃত্যুর পর সাতগাঁ ও লাখ্‌নৌতি এখন একদম এতিম। মসনদগুলো শূন্য। এই মুহূর্তে যে কেউ গিয়ে হুংকার দিয়ে পড়লেই এই দুই প্রদেশ তার অধীনে চলে আসবে। বিশেষ করে কদর খানের মৃত্যুটা অতি হাল আমলে ঘটায়, লাখ্‌নৌতির অবস্থাই এখন এই দুইয়ের মধ্যে অধিক নাজুক। লাখ্‌নৌতি বা গৌড়ের মতো একটা শক্ত প্রদেশ জয় করতে হলে, এই ওয়াক্তই আসল এবং একমাত্র ওয়াক্ত।

এই ধারণার বশবর্তী হয়েই উঠে দাঁড়ালেন বান্দা মুখলিস। তিনি সুলতানের আদেশ চাইলেন লাখ্‌নৌতিতে ফৌজ চালনা করার জন্যে। সুলতান অবশ্য এই মুহূর্তে ইতস্ততঃ করলেন খানিক। তিনি চাইলেন, ফৌজদার সাহেব ও শরীফ রেজা উভয়কেই বা নিদেন পক্ষে শরীফ রেজাকে সংবাদ দিয়ে আনা হোক এবং তাঁকে নিয়ে বান্দা মুখলিস লাখনৌতি জয়ে যাত্রা করুক।

কিন্তু বান্দা মুখলিস তর সইতে পারলেন না। তিনি বললেন — লাখ্‌নৌতির ব্যাপারে একাই তিনি যথেষ্ট। এর জন্যে শরীফ রেজাদের ডেকে আনা নিষ্প্রয়োজন। যখন কোন ব্যাপক লড়াইয়ে যাত্রা করবেন তাঁরা, পূব অঞ্চল বা চাটিগাঁ যখন জয় করতে বেরুবেন, তখন তাঁদের অবশ্যই সঙ্গে নিতে হবে। এখন এই ডাকাডাকি নিয়ে অহেতুক সময় নষ্ট না করে জল্‌দি জল্‌দি বেরিয়ে পড়া বেহতর। এমনইতে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে, আরো বিলম্ব হলে, ওদিকে সবাই সামাল হয়ে যাবে। চাই কি, দিল্লী থেকে ইতিমধ্যেই কোন নয়া শাসক এসে চেপে বসবে লাখ্‌নৌতির আসনে।

বান্দা মুখলিসের এই যুক্তি ও আগ্রহের মুখে সুলতান আর প্রশ্ন তুলতে গেলেন না। বরং খানিক বাহবা দিয়েই বান্দা মুখলিসকে তাঁর ফৌজসহ লাখ্‌নৌতি জয়ে পাঠালেন।

বান্দা মুখলিসের এই যুক্তি আর আগ্রহের পেছনে তাঁর যে মতলবটা ছিল তাহলো — লাখ্‌নৌতির ময়দান এখন ফাঁকা ময়দান। এই ফাঁকা ময়দানে ফৌজ চালিয়ে লাখ্‌নৌতি জয়ের কৃতিত্বটা একাই তিনি নেবেন, এ গৌরবের হিস্যাটা আর অন্য কাউকেই দেবেন না। সেই কারণেই, স্থানীয় আরো কিছু সেপাই সালার সঙ্গে নেয়ার ব্যাপারে সুলতানের শেষ নসিহতটাও মানলেন না। নিজের ফৌজ নিয়ে তিনি একাই বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু বদ নসীব! লাখ্‌নৌতির যে তথ্য তাদের কাছে ছিল, সময়ের ব্যবধানে সে তথ্য পালটে যাওয়ায় এবং যোগাযোগের বিভ্রাটে নয়া তথ্য না পাওয়ায়, বান্দা মুখলিসের হিসেবটা বিলকুলই গড়বড় হয়ে গেল। কদর খানের মৃত্যুর পর লাখ্‌নৌতির মসনদ ফাঁকা হয় ঠিকই, ফাঁকাও থাকে কয়েকদিন, কিন্তু দীর্ঘদিন তা থাকে না। সম্রাট কর্তৃক নিয়োজিত কোন শাসনকর্তাই দিল্লী থেকে আসেননি বা দিল্লীর সুলতান বাঙ্গালা মুলুকের কাউকেও শাসক পদে নিয়োগ দান করেননি, এ তথ্যও ঠিক। তবু লাখ্‌নৌতির মসনদ প্রথম দিকের কয়েকটা দিন ছাড়া মোটেই ফাঁকা থাকেনি।

লাখ্‌নৌতিতে অবস্থিত কদর খানের সেনাপতি আলী মুবারক স্বীয় প্রভুর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই তৎপর হয়ে উঠেন। ফাঁকা তখ্‌তে কে বসবে, না নিজেই উঠে বসবেন তিনি, এমন একটু চিন্তা-ভাবনা করেই আলী মুবারক আনুগত্যের ভনিতাচ্ছলে দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের কাছে দ্রুতগতিতে কদর খানের মৃত্যু সংবাদ সহ লাখ্‌নৌতির জন্যে নয়া শাসক নিযুক্তির প্রার্থনা পত্র পাঠান। পত্র পেয়ে মালিক ইউসুফ নামের এক ব্যক্তিকে দিল্লীর সুলতান নিয়োগ দানও করেন। কিন্তু বাঙ্গালা মুলুকে রওনা হওয়ার পথেই মালিক ইউসুফ ইন্তেকাল করেন। অতপর আর কোন শাসককেই দিল্লী থেকে না আসতে দেখে

এবং দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলককে নানা সমস্যায় জর্জরিত দেখে, কাল বিলম্ব না করে আলী মুবারক নিজেই লাখ্‌নৌতির তখ্‌তে উঠে বসেন। তখ্‌তে উঠে বসেই তিনি শাহ ফখরউদ্দীন এর অনুকরণে নিজেকে লাখ্‌নৌতির স্বাধীন সুলতান রূপে ঘোষণা দান করে সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ নাম ধারণ করেন।

এইভাবে একই সময়ে এক মুলুকে দুইরাজের উৎপত্তি ও দুই সুলতানের আবির্ভাব ঘটে। সোনার গাঁয়ে সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ, লাখ্‌নৌতি বা গৌড়ে সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ। বাঙ্গালা মুলুকের দুই জায়গায় দুই পতাকা উড়তে থাকে। মসনদ দখল করেই ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ নজর দেন রাজ্য বিস্তারের দিকে, আলী মুবারক ওরফে আলাউদ্দীন আলী শাহ নজর দেন রাজ্য রক্ষার দিকে। আলাউদ্দীন আলী শাহর দীলে এই শংকাই বিদ্যমান ছিল যে, সোনার গাঁয়ের ব্যাপার নিয়ে দিল্লীর সুলতান তেমন কোন সাড়াশব্দ না করলেও, লাখ্‌নৌতির ব্যাপারে তিনি আদৌ নীরব থাকবেন না। লাখ্‌নৌতি বা গৌড়ই বাঙ্গালা মুলুকের আদিপীঠ ও প্রাণ কেন্দ্র। দিল্লীর অধিকার থেকে সেই লাখ্‌নৌতির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানেই বাঙ্গালা মুলুকই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। অতএব যত বিপত্তিই থাক তাঁর, লাখ্‌নৌতি পুনরুদ্ধারে দিল্লীর সুলতান আসবেনই মহাক্রোশে। তাই মসনদ দখল করার পরই আলাউদ্দীন আলী শাহ প্রথমেই তাঁর সেনাবহিনীর সংস্কার সাধন করেন এবং সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে নিয়ে বহিরাক্রমণ প্রতিহত করার সুদৃঢ় মানসিকতার অপেক্ষা করতে থাকেন। সেই সাথে বহিঃ শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই অবহিত হওয়ার মানসে একটা সুদক্ষ গোয়েন্দাদল লাখ্‌নৌতির চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে রাখেন। এবম্প্রকার ব্যবস্থাদি তিনি এত ক্ষিপ্র গতিতে সুসম্পন্ন করেন যে, অনেকেই এত কম সময়ে এত বেশী অগ্রগতি কল্পনা করতেও পারেন না।

চারদিকেই গুপ্তচর নিয়োগ করা থাকলেও, দিল্লীর দিকেই আলী শাহর নজর ছিল তীক্ষ্ণ। যে কোন সময় দিল্লী থেকেই হামলা এসে পড়বে, এই ছিল আলী শাহর ধারণা। কিন্তু দিল্লী থেকে কোন হামলাই এলো না। হামলা এলো সোনার গাঁ থেকে। লাখ্‌নৌতির পূব সীমান্তে নিয়োজিত তাঁর কয়েকজন গুপ্তচর পড়িমরি ছুটে এসে খবর দিল — হামলা আসছে। তবে দিল্লী থেকে নয়, হামলা আসছে সোনার গাঁয়ের সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহর তরফ থেকে। বান্দা মুখলিস্ নামে সোনার গাঁয়ের জনৈক সেনাপতি সসৈন্যে লাখ্‌নৌতির সীমান্তের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে।

হামলাকারী সেনা সৈন্যের সংখ্যা, আগমনের পথ, সীমান্ত থেকে দূরত্ব হাতীঘোড়ার পরিমাণ — ইত্যাদি বিষয় গুপ্তচরদের নিকট থেকে সবিস্তারে জেনে নিলেন আলী শাহ। অতপর সসৈন্যে প্রস্তুত হয়ে এসে লাখ্‌নৌতির পূর্ব সীমান্তে এক কায়দামতো জায়গায় তিনি ওঁৎ পেতে রইলেন।

অতি উৎসাহী বান্দা মুখলিস কোনই খবর না রেখে এবং ফাঁকা ময়দানে বীরত্ব জাহিরের পুলকে নৃত্যের তালে এসে এই ফাঁদের মধ্যে ঢুকলেন। ব্যস্‌, সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যয়। ছাগের উপর বাঘ লাফিয়ে পড়ার মতো বান্দা মুখলিসের ফৌজের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো আলী শাহর সেপাই সেনা। আকস্মিক এই হামলায় বান্দা মুখলিস দিশেহারা হয়ে গেলেন। অপ্রস্তুত সেপাই সৈন্য নিয়ে বেসামাল অবস্থায় ঐ তৈরি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে অল্পক্ষণেই নিহত হলেন বান্দা মুখলিস। বান্দা মুখলিস নিহত হওয়ার সাথে সাথেই বান্দা মুখলিসের সেপাইরা রণভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে এলো সোনার গাঁয়ে।

সোনার গাঁ থেকে এই খবর এলো ভুলুয়ায়। অথচ এরমাত্র প্রহর খানেক আগেই কেবল শরীফ রেজা জানতে পেরেছেন — লাখ্‌নৌতিও এখন আর এক স্বাধীন মুলুক। দিল্লীর গোলামী ছেড়ে দিয়ে কদরখানের সেনাপতি ও হাজী ইলিয়াসের দুধভাই আলী মুবারক আলাউদ্দীন আলী শাহ নাম ধারণ করে লাখ্‌নৌতির ফাঁকা তখতে বসেছেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে লাখ্‌নৌতির আসমানে স্বাধীন নিশান তুলেছেন। অন্য কথায়, সাধক মখদুম জালালউদ্দীন তাব্রিজি খোয়াবে যে তাঁকে একটা রাজ্যের অধিপতি হওয়ার জন্যে বাঙ্গালা মুলুকে আসতে বলেছিলেন, আলী মুবারক সেই খোয়াবটাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন।

অবশ্য লাখ্‌নৌতির এই স্বাধীনতার খবরটা শরীফ রেজার কাছে অনেক দেরীতে এসে পৌঁছেছে। লাখ্‌নৌতির নূর হোসেন ও বরকতুল্লাহ সাহেবেরা শরীফ রেজাকে দেয়ার জন্যে এ খবর সাতগাঁয়ে পাঠান। সাতগাঁয়ের শায়খ হুজুর ফের এ খবরটা পাঠিয়ে দিয়েছেন ফৌজদার সাহেবের মকানে। ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব আবার শরীফ রেজার তালাশে এই প্রহর খানেক আগে ভুলুয়ার সদরে এসে পৌঁছেছেন।

লাখ্‌নৌতির এই স্বাধীনতার খবর নিয়েই শরীফ রেজা এতক্ষণ ফৌজদার সাহেব ও ইনসান আলীর সাথে আলাপরত ছিলেন। লাখ্‌নৌতির এই স্বাধীনতা ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে তাঁদের। বাঙ্গালা মুলুকে একজন স্বাধীন সুলতানের আবির্ভাব ঘটুক—এই ছিল তাদের সকলের দীর্ঘদিনের আকিঞ্চন। কিন্তু একাধিক স্বাধীন সুলতানের এক সাথে আবির্ভাব তাঁদের কল্পনাতেও আসেনি।

এখন বাস্তবে তা আসায় তাঁরা ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন, এখন তাদের কর্তব্য কি ? একজন স্বাধীন সুলতান প্রয়োজন তাদের — তা ফখরউদ্দীন মুবারক শাহই হোন, আর আলাউদ্দীন আলী শাহই হোন। একজন স্বাধীন সুলতানের মাধ্যমে এ মুলুকে দ্বীন ইসলামকে আর মুসলমান জাতিকে হেফাজত করাই লক্ষ্য তাদের, কোন নির্দিষ্ট লোককে সুলতান করা নয়। তাঁরা ভেবে দেখলেন, এই দুই সুলতানের একজনকে সরে যেতে হবেই, বা সরিয়ে দিতে হবেই। নইলে, খণ্ডশক্তি হয়ে একদিকে যেমন এঁরা কেউই দিল্লীর হামলা রোধ করতে পারবেন না, অন্যদিকে তেমনই পরস্পর অহরহঃ আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত হয়ে এঁরা স্বজাতির শক্তিকেই শুধু ধ্বংস করবেন আর ভিনজাতির পথ দেবেন বেঁধে।

এখন এই সরে যাওয়া বা সরিয়ে দেয়ার প্রশ্নে আলী শাহই একমাত্র ব্যক্তি যার কথা একান্ত সঙ্গত ও নিরঙ্কুশভাবে আসে, ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের কথা কস্মিনকালেও আসেন না। সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ দ্বীন ও কওমের খেদমতে নিবেদিত ব্যক্তি এবং তাঁদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফসল। আলী শাহই এখানে একমাত্র আগাছা। মওকা পেয়ে গজিয়ে উঠেছে অলক্ষ্যে। দ্বীন-কওমের খেদমতের বিন্দুমাত্র প্রতিজ্ঞা বা দরদ নিয়ে তিনি আসেননি। অতএব, সরে যেতে হবে তাঁকেই এবং তাঁকে সরিয়েই দিতে হবে। আপোষে তিনি যাবেন না। আর কেউ না জানলেও অন্ততঃ শরীফ রেজা বিশেষভাবেই জানেন, মন-মানসিকতায় আলী শাহ একজন নিম্নস্তরের ব্যক্তি।

এই ধরনের আলোচনার মধ্যে শরীফ রেজারা সবাই যখন মগ্ন, ঠিক সেই সময়ই সোনার গাঁয়ের এক বার্তাবাহক এসে তাদের ব্যস্ত কণ্ঠে জানালো, বান্দা মুখলিস নিহত এবং সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ তাঁদের এন্তেজারে মজবুর হয়ে আছেন।

অন্যথায় প্রশ্নই কিছু ছিল না। আলোচনা ক্ষান্ত করে তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়ালেন তাঁরা। সাব্যস্ত হলো, ইনসান আলী সাহেব ঐ আগের মতোই ভুলুয়ার সদর মফস্বল আগলে নিয়ে থাকবেন। ফৌজদার সাহেব এখান থেকে ফিরে যাবেন মকানে এবং সেখান থেকেই রওনা হবেন সোনার গাঁয়ে। শরীফ রেজা রওনা হবেন এখান থেকে এবং এখনই।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক শরীফ রেজা ও ফৌজদার সাহেব উভয়েই বেরিয়ে পড়লেন উভয় দিকে।

শরীফ রেজা একদিন আগে সোনার গাঁয়ে পৌঁছলেন। ফৌজদার সাহেব পৌঁছলেন তার পরের দিন। উভয়ে এসে হাজির হলে সুলতান ফখরউদ্দীন

মুবারক শাহ তাঁদের নিয়ে তখনই এক বৈঠকে মিলিত হলেন। সেখানে হাজির রইলেন সালার জাফর আলী খান সহকারে অন্যান্য আরো কয়জন সামরিক কর্মকর্তা। বান্দা মুখলিসের মৃত্যুতে সুলতান বড়ই পেরেশান ছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ করলেন। বান্দা মুখলিসের এই অকাল মৃত্যুর জন্যে তিনি নিজেও খানিকটা দায়ী এবং ঝোঁকের মাথায় বান্দা মুখলিসকে একা পাঠানো ঠিক হয়নি তাঁর — এই মর্মে সুলতান অকপটে ত্রুটি স্বীকার করলেন। এরপর পরবর্তী কার্যক্রমের কথা উঠতেই শরীফ রেজা উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমে বললেন — আমরা এর বদলা নিতে চাই জনাব! বান্দা মুখলিসের রক্তের বদলা নিতে চাই। এটাকে অমনি অমনি যেতে দেয়া চলে না।

চিন্তান্বিত কণ্ঠে সুলতান মুবারক শাহ বললেন — এ্যাঁ! বদলা ? শরীফ রেজা আরো অধিক জোর দিয়ে বললেন — শুধু বদলাই নয় জনাব, তার মতো একটা আপদের আশু ফয়সালা করতে চাই। আলী শাহকে আর বরদাস্ত করা যায় না।

ঃ অর্থাৎ ?

কথা ধরলেন ফৌজদার সোলায়মান সাহেব। বললেন— ঐ আলী শাহ মানে আলী মুবারকের এই হঠকারিতা মেনে নেয়ার মতো নয় জনাব। বাঙ্গালা মুলুকে একজন অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে একটা স্বাধীন সোলতানত কায়েম করার প্রয়াস পাচ্ছেন দেখেও তাঁকে সাহায্য করার বদলে বা তাঁর সাথে সামিল হওয়ার কোশেশ না করে নিজে আর একটা স্বাধীন সোলতানত ফেঁদে বসার অর্থই হলো, বাঙ্গালা মুলুকের স্বাধীনতটা বানচাল করা এবং স্বাধীনতার সাথে বেঈমানী করা। এ অপরাধ অমার্জনীয়। এটা শুধু জনাবের সাথেই দুশমনী করা নয়, এ মুলুকে দ্বীন ও কওমের নিরাপত্তার সাথে দুশমনী করা।

এর জবাবে সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ ধীর কণ্ঠে বললেন— কথা আপনার কায়েমী। জোরদার যুক্তি আছে পেছনে। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় বা উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে এখন আর আমি কিছুই করতে চাইনে।

থমকে গেলেন ফৌজদার সাহেব। বললেন — জনাব!

ধীর অথচ শক্ত কণ্ঠে সুলতান মুবারক শাহ বললেন — করা যখন যেটা খুবই যুক্তিযুক্ত আর যখন করার যেটা সময়, আমি তখনই সেটা করতে চাই, আগে নয়।

শরীফ রেজা ফের বিনয়ের সাথে বললেন — সাতগাঁও দখল করে আলী শাহর এই ঔদ্ধত্যের জবাব দেয়াটাকি তাহলে জনাব যুক্তিযুক্ত মনে করছেন না ?

সুলতান বললেন করছি। তবে সে সময় এখনও আসেনি।

ঃ সময় এখনও আসেনি ?

ঃ না। সে জন্যে সময়টা এখনও পরিপক্ক হয়নি। যে কাজের জন্যে সময় এখন অত্যন্ত অনুকূলে আর যে জন্যে তোমাদের আমি ডেকেছি, সেইটেই বলছি শোনো —

ঃ জনাব।

ঃ অচিরেই আমি এই সোনার গাঁয়ের পূব অঞ্চলে আর চাটিগাঁয়ে অভিযান চালাতে চাই।

ঃ চাটিগাঁয়ে ?

ঃ হ্যাঁ, চাটিগাঁয়ে। এই যে জাফর আলী উপস্থিত। সে কয়দিন আগে চাটিগাঁ থেকে ফিরে এসেছে। সেখানে আউলিয়া কদল খান গাজী সাহেব জঙ্গী সুফী সাধকদের একত্র করে নিয়ে আমার অভিযানের পথ চেয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

ঃ তাই না কি ?

ঃ চাটিগাঁ-ই বাঙ্গালা মুলুকে ইসলাম অনুপ্রবেশের আদি ও প্রধান দরওয়াজা। স্মরণাতীত কাল থেকে ঐ চাটিগাঁয়ে এসে ইসলামের অসংখ্য খাদেম ও সুফী সাধকবৃন্দ এ মুলুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় প্রাণ পাত করে আসছেন। বিধর্মীদের অত্যাচারে সেই আমল থেকেই অসংখ্য ওলী-আউলিয়া জর্জরিত হয়েছেন এবং আজও হচ্ছেন। দ্বীন ইসলামের খাদেমদের এতবড় একটা ঘাঁটি আজও বিধর্মীদের দখলে আর সেজন্যে আজও সেখানে ইসলামের আসন মজবুত করা সম্ভবপর হয়নি। সুফী সাধক আউলিয়াদের জানমালের নিরাপত্তা আজও সুনিশ্চিত করা যায়নি। এতদিন তাঁরা এককভাবে লড়েছেন। আজ তাঁরা আমার পতাকাতলে এসে আমার সাহায্য নিয়ে লড়তে চান — অন্য কথায়, চাটিগাঁকে মুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে তাঁরাই আমাকে সাহায্য করতে চান। তাঁরা সবাই তৈয়ার। এই মুহূর্তে এই তৈরি ময়দান ফেলে অন্যদিকে নজর দেয়ার ফুরসুত আমার নেই।

এরপর জাফর আলী খান চাটিগাঁ অর্থাৎ চট্টগ্রামের সার্বিক অবস্থা বর্ণনা করার পর শরীফ রেজাকে বললেন — আপনিই যে পয়গামটা পৌছে দিয়েছেন সেখানে, যে আশ্বাস নিয়ে এসেছেন তাদের পক্ষ থেকে, এখন তাঁরা তাদের সেই মদদ দিতে একান্ত আগ্রহী। সেটা এখন উপেক্ষা করবেন কি করে ? এ ছাড়াও সামগ্রিকভাবে যে হাওয়া এখন বইছে ওদিকে, তাতে চাটিগাঁ সহ এই সোনার গাঁয়ের গোটা পূব অঞ্চল জয়করাটা এই মুহূর্তে খুবই সহজ সাধ্য ব্যাপার। এই সুযোগ আর সময়টা আমরা অবহেলা করতে পারি ?

জাফর আলীর সুরের সাথে সুর মিলিয়ে সুলতান মুবারক শাহ হাসি মুখে বললেন — বলো, পারি আমরা ?

জবাবে শরীফ রেজাও স্মিতহাস্যে বললেন — আমি তৈয়ার।

খুশী হয়ে সুলতান বললেন — শাব্বাশ্!

অতপর ফৌজদার সাহেবকে লক্ষ্য করে সুলতান মুবারক শাহ ফের বললেন — এই বৃদ্ধ বয়সে মুরুব্বী আমাদের যে বাহাদুরী দেখিয়েছেন তা অন্য কেউ না বুঝলেও কারা প্রদেশের শাসক ফিরুজ খান হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছেন। এবার আমি মুরুব্বীকে এতটা তকলিফ দিতে চাইনে। তাঁর এজাজতটা খুবই আমাদের কাম্য।

এর জবাবে ফৌজদার সাহেবও সহাস্য বদনে বললেন—আল্লাহ তায়ালা আমাদের কামিয়াব করুন!

বৈঠক সমাপ্ত হলে শরীফ রেজা জাফর আলীকে ফাঁকে ডেকে বললেন, ভাই সাহেব এই যে এক ধারছে ময়দান থেকে আর এক ময়দানে ছুটছেন, আমার বহিনটার কথা ভুলেই গেলেন বিলকুল ?

জাফর আলী ঈষৎ হেসে বললেন, কেন-কেন, ভুলে যাবো কেন ?

ঃ নইলে যে শাদিটা তখনই হওয়ার কথা, সেই শাদিটা এই এতদিনও ঝুলে রইলো, এখন আবার আর এক বাজনা শুরু করলেন! শাদির বাজনা বাজবে কবে ?

রসিকতাচ্ছলে জাফর আলী চটপট জবাব দিলেন — ফুল ফোটেনি — ফুল ফোটেনি!

ঃ ফুল ফোটেনি! কিসের ফুল ?

ঃ আমার শাদির ফুল। শাদির কুসুমটা আমার বার বারই ফুটবো ফুটবো করে উঠে তখনই ফের মুঝে যাচ্ছে। পুরোপুরি একবারও ফুটছে না।

ঃ মানে ?

ঃ মানে ঐ সময়। ঐ যে শুনলেন না, করার যখন যেটা সময় তখনই সেটা করতে হয় ? তার আগে পরে নয় ? দেখতেই তো পাচ্ছেন, একটার পর একটা অন্য কাজের সময়গুলো কেমন তাগ্ড়া হয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে ? এদের ভিড় ঠেলে ঐ ব্যাটা শাদির সময় সামনে এগুতেই পারছে না।

ঃ অমনি অমনি না পারে, একটা ধাক্কা দিলেই তো পারে। আর তাতে করে এক ফাঁকে ঝুটমুট সেরে ফেলা যায় কাজটা!

ঃ না ভাই সাহেব, তা করা ঠিক হবে না।

ঃ কি রকম ?

ঃ শাদির অনুষ্ঠান শেষ করেই যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হওয়ার ঝুঁকিটা আমি নিতে পারিনে।

ঃ তাই ? তাহলে শাদির ব্যাপারটা নিয়ে এখন ভাই সাহেব কি ভাবছেন ?

জবাব দিতে জাফর আলী হাসিমুখে বললেন — ইন্নাল্লাহা মা-আস্-সোয়াবেরীন!

সবুর করা নিঃসন্দেহে মহৎকাজ। এতে আল্লাহ তায়ালা পক্ষে থাকেন। কিন্তু এই মহৎকাজটিই জাফর আলীকে করতে হলো লম্বা সময় ধরে। অনেক পরামর্শ আর চিন্তা-ভাবনা করে সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ যে অভিযানে বেরুলেন, তা অল্পতে শেষ হলো না। সময় নিলো অনেক দিন।

অভিযানটিও ফালতু অভিযান ছিল না। এর লক্ষ্য ছিল সুদূর প্রসারী। প্রস্তুতিও শক্ত প্রস্তুতি ছিল। বান্দা মুখলিসের ঐ দৃষ্টান্তের পর আর কমজোর কোন বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ যাত্রার সখ সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহর ছিল না। তিনি বেরুলেন শক্ত হয়ে। শক্ত শক্ত সেনাপতি আর দবেজ দবেজ সৈন্য বাহিনী সঙ্গে নিয়ে।

সাজ সাজ রবে কয়েকদিন যাবত রাজধানী সোনার গাঁ মুখরিত রাখার পর হাতী ঘোড়া লোক লস্করে সুসজ্জিত হয়ে সুলতান মুবারক শাহ রাজ্য জয়ে বেরুলেন। নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে শরীফ রেজা ও জাফর আলী আগে আগে রওনা হলেন। ফৌজদার সোলায়মান খান সহ হাতীর পিঠে রওনা হলেন সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ। পেছনে রইলো অন্যান্য সেনাপতিদের বাহিনী সবার পেছনে আনুসঙ্গিক লোক লস্কর ও পাইক পেয়াদা। দুরন্ত উদ্যমে নিয়ে সসৈন্যে এগিয়ে চললেন সুলতান। কিয়দ্দূর এগুতেই জঙ্গী আউলিয়া কদল খান গাজীর নেতৃত্বে সুফীদরবেশ ও মর্দে মু'মিনের বিরাট এক জঙ্গী দল এসে সুলতানের বাহিনীর সাথে সামিল হলো। এর ফলে, সুলতানের পেছনে যে শক্তি পয়দা হলো তা এক কথায় দুর্জেয়।

শুরু হলো বিজয়। সোনার গাঁয়ের পূবে, পূব-উত্তর ও পূব—দক্ষিণে বাঙ্গালা মুলুকের বিস্তৃত ঐ তামাম এলাকাটি তখনও মুসলিম রাজ্যের বহির্ভূত ছিল। ভিন্নধর্মী ছোট বড় অনেকগুলো সামন্ত ও স্বাধীন রাজারা রাজত্ব করতেন এখানে। বিশেষ করে, কামরূপ ও অহোমরাজাদের মদদপুষ্ট সামন্ত বা ক্ষুদ্র রাজারা দোর্দণ্ডপ্রতাপে শাসন করতেন এসব অঞ্চল। সুফী দরবেশদের তৎপরতায় হেথা হোথা ছিটে ফোঁটা দ্বীনের আলো পড়লেও, সার্বিকভাবে দ্বীনের আলো এ অঞ্চলে তখনও প্রবেশ করতে পারেনি। সুলতান ফখরউদ্দীন মুহবারক শাহ তাঁর ঐ দুর্জেয় বাহিনী নিয়ে এ দিকেই প্রথমে নজর দিলেন। তিনি একটার পর একটা রাজ্য জয় করতে লাগলেন এবং বিজিত অঞ্চলে বিজয় নিশান সহকারে দ্বীনের নিশান উড়িয়ে দিয়ে চললেন। এভাবে দীর্ঘদিনের বিরামহীন লড়াইয়ের মাধ্যমে ঐ বিশাল এলাকার প্রায় তামামটাই তিনি মুসলিম রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং অতপর এসে হানা দিলেন চাটিগাঁয়ে। পূর্ববর্তী অনেক স্থানে অনেক শক্ত লড়াই সংঘটিত হলেও, আসল লড়াই শুরু হলো এই চাটিগাঁয়ে এসে। মুসলীম বিজয় রোধ করার আখেরী প্রয়াস হিসাবে চাটিগাঁ ও তার পার্শ্ববর্তী তামাম এলাকার অমুসলমান শক্তি একত্রিত হয়ে রুখে দাঁড়ালো মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে। শুরু হলো প্রচণ্ড ও দীর্ঘ স্থায়ী লড়াই। সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহর পক্ষে এ লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিলেন জঙ্গী সাধক কদল খান গাজী। সুলতান মুবারক শাহর সেনাপতি হিসাবে সাধক কদল খান গাজী এ লড়াইয়ে যে বীরত্ব প্রদর্শন করলেন, তা অতুলনীয়। যদিও শরীফ রেজা, জাফর আলী বা আর অন্যান্য সকলেরই বীরত্ব ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য. তবু আউলিয়া কদল খান গাজী তাঁর জঙ্গীদল নিয়ে গাজী বা শহিদ হওয়ার দুরন্ত নেশায় এ লড়াইয়ে যেভাবে সবাই উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন তার নজীর অতি দুর্লভ।

ফলাফল সুষমাময়। সকলের সমবেত বীরত্বের মুখে চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়লো প্রতিপক্ষের ব্যূহ। ধূলীর সাথে মিশে গেল প্রতি পক্ষের অস্তিত্ব। এর ফলে, চাটিগাঁ তামামটাই মুসলমানদের অধিকারে চলে এলো এবং সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের রাজ্যভুক্ত হলো। জয়লাভের সাথে সাথেই চাটিগাঁয়ের মাটিতে দ্বীন ইসলামের পতাকা সহ বিজয় পতাকা উড়িয়ে বিজয়ীরা বিপুল উল্লাসে আওয়াজ দিলো আল্লাহু আকবর!

শেষ হলো যুদ্ধ। চাটিগাঁ জয় করে সোনার গাঁয়ে সগৌরবে ফিরে এলেন সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ। দীর্ঘ বিরতির পর আবার তিনি রাজধানীতে ফিরে এসে শাসনকার্যে মন দিলেন। বিজিত এই বিশাল ভূখণ্ডে আধিপত্য ও শাসন ব্যবস্থা মজবুত করার লক্ষ্যে রণের আনযাম তামামই গুটিয়ে নিলেন মুবারক শাহ। ফৌজদার সাহেব ও শরীফ রেজার ইচ্ছে তাকিদ সত্ত্বেও লাখনৌতি ও সাতগাঁয়ের ব্যাপারে এ মুহূর্তে তিনি আদৌ কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না বা ভবিষ্যতের কোন ইরাদা–ইচ্ছার ইংগিত আভাসও দিলেন না। ফলে, কিছুটা ক্ষুণ্নদীলেই ফৌজদার সাহেব তাঁর মকানে ফিরে গেলেন। সুলতানের সবিশেষ অনুরোধে সামরিক কিছু বিধি ব্যবস্থার কাজে শরীফ রেজা আটকে গেলেন কয়েকদিনের জন্যে।

সবুর করার ফল এবার সত্যি সত্যিই ফললো। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার অল্পকাল পরেই সুলতান মুবারক শাহ যুদ্ধের বাজনার পরিবর্তে শাদির বাজনা শুরু করলেন। এ বাজনা বাজানোর ইচ্ছে অনেক আগেই তাঁর ছিলো। প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে সে ইচ্ছে তিনি বাতিল করতে বাধ্য হোন। অনেক বয়স

হয়েছে ফরিদা বানুর। বয়স হয়েছে জাফর আলীরও। আর অপেক্ষা করা আদৌ সমীচিন নয়বোধে তিনি জাফর আলীর ও ফরিদা বানুর শাদির আনযাম শুরু করলেন। এখন তাঁর অনেকটা অবসর। এখন তিনি নিরাপদ ও চিন্তামুক্ত। তাই বেশ ধুমধাম ও আমোদ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই শাদির আয়োজন করলেন তিনি। দাওয়াত করলেন নিকটবর্তী সবাইকে। দাওয়াত পাঠালেন দূরবর্তী আত্মীয়–স্বজন ও শুভাকাঙ্খীদের কাছে।

হাতের কাজ শেষ করে শরীফ রেজাও ভুলুয়ায় ওয়াপস্ যাবেন, এমন কথাই ছিল। কিন্তু আবার তিনি আটকে গেলেন। আটকিয়ে দিলেন সুলতান এবং তাঁর চেয়েও শতগুনে শক্ত করে আটকিয়ে দিলেন দুলাহ্ দুলহীন উভয়েই। দাবী ও আব্দারের প্রাকার দিয়ে ঘিরে সলজ্জ হাসি মুখে উভয়েই ফরমানজারি করলেন তাদের বিয়েতে তিনি থাকবেন না, তা কি কখনও হয়?

কিন্তু যা হয় না, তাই হলো। বিয়ের দিন নিকটে আসতেই শরীফ রেজাকে সোনার গাঁ ত্যাগ করতে হলো। সাতগাঁয়ের দরবেশ শায়খ শাহ শফীহুজুর অসুস্থ। জরুরী বার্তা নিয়ে সাতগাঁ থেকে শায়খ হুজুরের এক মুরিদ হন্তদন্তভাবে সোনার গাঁ এসে হাজির হলেন। এসেই তিনি শরীফ রেজাকে জানালেন, শায়খ হুজুর ভয়ানক অসুস্থ এবং অবস্থা তাঁর খুবই সংকটাপন্ন। অসুস্থ শায়খ হুজুর একান্ত আগ্রহভরে শরীফ রেজার এন্তেজারে আছেন। যথাসত্বর সম্ভব শরীফ রেজা ছুটে আসুক সাতগাঁয়ে এই তাঁর আন্তরিক ও অন্তিম ইচ্ছা।

খোদ শায়খ হুজুর গুরুতর অসুস্থ এবং তিনি শরীফ রেজার এন্তাজারে আছেন। শরীফ রেজার কাছে এর চেয়ে বড় কথা এ দুনিয়ায় কিছুই আর ছিল না। খবর শুনেই শরীফ রেজা অস্থির হয়ে উঠলেন। না জানি তাঁর কি অবস্থা এখন! নিজেই যখন ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁকে, তখন নিশ্চয়ই অবস্থা তাঁর কল্পনাতীতভাবে জটিল! শিউরে উঠলেন শরীফ রেজা! হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ তাঁর হয়ই কিনা শেষ পর্যন্ত — এই ভেবে শরীফ রেজা দিউয়ানা হয়ে গেলেন। সুলতান ও দুলাহ্–দুলহীনের কাছে খবরটা পাঠিয়ে দিয়েই সাতগাঁয়ে রওনা হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যস্ত সমস্তভাবে তৈয়ার হতে লাগলেন।

খবর পেয়েই ছুটে এলেন সুলতান। শাদির দিনতক্ শরীফ রেজাকে আটকিয়ে রাখার ইরাদা নিয়ে এসেও পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করে তিনি খামুশ্ হয়ে ফিরে গেলেন। শায়খ হুজুরের ইচ্ছার উপর নিজের ইচ্ছে চাপিয়ে দেয়ার কোশেশ করে গুনাহ্গার হতে গেলেন না।

আফসোসের তুফান তুলে পরক্ষণেই ছুটে এলেন দুলাহ্–দুলহীন। কান্নার বেগ চাপতে চাপতে ফরিদা বানু বললেন সে কি কথা ভাইজান! আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন?

রুদ্ধকণ্ঠে জাফর আলী সাহেব বললেন — শেষ পর্যন্ত শাদিটা আমার এইভাবে নিরানন্দ করে দেবেন ভাই সাহেব ?

যত সহজে সুলতান এই পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করলেন, এঁরা দুইজন তত সহজে করলেন না। এঁদের শান্ত করতে পর্যুদস্ত দীল নিয়ে শরীফ রেজাকে অনেকখানি তকলিফ পেতে হলো। শায়খ হুজুরের আহ্বান, তাতে আবার শায়খ হুজুর ভয়ানক অসুস্থ — অনেক টানাটানি করলেও এর গুরুত্ব শেষ পর্যন্ত এঁরা দুইজনও বুঝলেন। তাই, চোখের পানি মুছে ফরিদা বানু বললেন— যেতে আপনাকে হবেই তা বুঝতে পারছি ভাইজান! কিন্তু একটা আফসোস, নিরানন্দময় হলেও আমাদের যা হোক গতি একটা হয়েই যাচ্ছে আল্লাহর রহমে। কিন্তু আপনি যে অসহায় সেই অসহায়ই রয়ে গেলেন। এ নিয়ে আপনার সাথে বসার আর কোন ফুরসুতই পেলাম না সেই থেকে!

জাফর আলীও খেই ধরে বললেন — ঠিক ঠিক! আপনার ব্যাপারে আর আমাদের বসাই হলো না তারপর! কনকলতাই তো এ দুনিয়ার একমাত্র আউরাত নন, খোঁজ করলে তেমন আউরাত আরো অনেক পাওয়া যাবে। এদিকে আজাদী হাসিলের ব্যাপার নিয়ে যে বাধাটা ছিল আপনার সামনে, নিশ্চয়ই এখন সেটা অনেকখানি শিথিল হয়ে এসেছে। অতএব —

শরীফ রেজা সবিশেষ আপত্তি তুলে বললেন—থাক ভাই সাহেব, ওসব কথা থাক।

ফরিদা বানু ব্যথিত কণ্ঠে বললেন — দুঃখ আমার এইখানেই ভাইজান! কনকলতাকে আপনি যে গভীরভাবে ভালবাসেন, সেটা আর গোপন কোন কথা নয়। আর তাই আমার ভয়, কনকলতা বহিনের ঐ আঘাতটা বড় শক্ত হয়ে লেগে থাকবে বুকে আপনার। তাঁর স্মৃতির কারণেই আপনি আর অন্য কাউকে আপন করে সংসারী হতে পারবেন না। জিন্দেগীটা বরবাদ করেই ফেলবেন!

শরীফ রেজা অধৈর্য কণ্ঠে বললেন — আমার বড় বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে বহিন। ওসব কথা এখন থাক। আল্লাহ তায়ালা যদি কখনও সুযোগ আবার দেন আমাকে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করার, তখন আমি এ নিয়ে আপনাদের সাথে বসবো। জিন্দেগীতে আমার আরো কিছু কথা আছে ঐ কনকলতা ছাড়াও। আমি এখন আসি বহিন; আপনিও আমাকে খুশী মনে এজাজত দিন ভাই সাহেব; আমি জলদি জলদি রওনা হই—

অগত্যা জাফর আলী ও ফরিদা বানু ক্ষীণকণ্ঠে বললেন — আল্লাহ হাফেজ!

সোনার গাঁ থেকে বেরিয়ে শরীফ রেজা আগে সোজা ভুলুয়ায় চলে এলেন। খবরটা তিনি ইনসান আলীকে দেবেন এবং ইনসান আলীর মারফতই খবরটা ফৌজদার সাহেবকে পাঠাবেন, এই ছিল তাঁর ইরাদা। ভুলুয়ার সদরে এসেই

ঘটনাচক্রে শরীফ রেজা ফৌজদার সাহেবের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলেন। কিন্তু ফৌজদার সাহেবের চেহারা দেখে ঐ অবস্থার মধ্যেই শরীফ রেজা চমকে গেলেন। ইতিমধ্যেই অনেকখানি ভেঙ্গে গেছে শরীর তাঁর। চোখ মুখের চেহারা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু এ নিয়ে অধিক চিন্তার অবকাশ তাঁর ছিল না। ফৌজদার সাহেবকে দেখেই তিনি শায়খ হুজুরের অবস্থার কথা তাঁর কাছে শশব্যস্তে বর্ণনা করে গেলেন। তামাম বিবরণ দিয়ে তিনি ধরা গলায় বললেন — গিয়ে যে কি দেখবো, তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

খবর শুনে ফৌজদার সাহেবও 'থ' মেরে গেলেন। খানিক পরে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে তিনি ভারী কণ্ঠে বললেন—আমিও হঠাৎ করেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছি। জরুরী এক কাজে অত্যন্ত তকলিফ করে কোন মতে এই সদর পর্যন্ত পৌঁছেছি। দূরের পাল্লা ধরার মতো আপততঃ কোন তাকত আমার নেই। নইলে আমিও তোমার সাথেই ঐ সাতগাঁয়ে ছুটতাম।

একটু থেমে পুনরায় তিনি আফসোস করে বললেন — কে জানে, হুজুরের সাথে শেষ সাক্ষাতের কিসমত আমার এই সাথেই শেষ হয়ে গেল কিনা!

শরীফ রেজা চমকে উঠে বললেন— জনাব!

ঃ তুমি সেখানে পৌঁছেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবস্থার সঠিক খবর মকানে আমার পাঠিয়ে দেবে। আমি কিন্তু অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে থাকবো।

ঃ জি জনাব! আমি অবশ্যই তা পাঠাবো।

ঃ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার কিসমত যদি থাকে আমার, পরে আমি চেষ্টা করবো সাক্ষাৎ করার। আর যদি এই সাথেই —

ফৌজদার সাহেবের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। তিনি আর বলতে পারলেন না। তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে একেবারেই ভেঙ্গে পড়লেন শরীফ রেজা। সঙ্গে সঙ্গে শরীফ রেজা আকুলকণ্ঠে বললেন—আমি এতিম হয়ে যাবো জনাব! আব্বা-আম্মা নেই, হুজুরেরও যদি কোন কিছু ঘটে যায় হঠাৎ করে, আমি একদম এতিম হয়ে যাবো। কাছে গিয়ে দাঁড়াবার মতো এ দুনিয়ায় আর কেউ আমার থাকবে না।

— বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদেই ফেললেন শরীফ রেজা। ফৌজদার সাহেব এ অবস্থায় বিহ্বল হয়ে গেলেন। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে শরীফ রেজার কাঁধের উপর আস্তে করে হাত রাখলেন। এরপর কম্পিত অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন — না-উম্মিদ হতে নেই বাপজান! একদিন কেউই আমরা এ দুনিয়ায় থাকবো না। আল্লাহ না করুন, শায়খ হুজুরের যদি মন্দই কিছু ঘটে যায়, তুমি আমার মকানে চলে আসবে। কে বললে এ দুনিয়ায় কেউ নেই তোমার ? সেখানে আমি থাকবো, কনকলতা থাকবে, আমার মকানের সবাই সেকানে থাকবে। আমরা তোমার কেউ পর নই!

শরীফ রেজা আপ্লুত কণ্ঠে বললেন জনাব!

ঃ আমার কোন সন্তান-আদি নেই। তুমিইতো আমার সন্তান বাপ! আমার বিষয় সম্পত্তির মালিক তো স্রেফ তুমি আর কনকলতা। তোমাদেরকেই তো তামাম কিছু দিয়ে যাবো আমি বাপজান। আমি অভাবে আমার মকানে তুমি আর কনকলতাই তো থাকবে!

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শরীফ রেজা বলে উঠলেন বাপজান!

অতঃপর ফৌজদার সাহেবের বুকের মধ্যে মুখ লুকালেন শরীফ রেজা। তাঁকে ধীরে ধীরে শান্ত করে ফৌজদার সাহেব বললেন — সময় এখন অত্যন্ত মূল্যবান বাপজান। আর দেরী করা ঠিক হবে না। যেখানে যেতে বেরিয়েছো, জলদি জলদি বেরিয়ে পড়ো সেদিকে।

ইনসান আলী সাহেবের কাছে আগেই বিদায় নিয়েছিলেন। এবার ফৌজদার সাহেবের দোআ নিয়ে শরীফ রেজা অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন। ছলছল নেত্রে শরীফ রেজার গতিপথে এক নজরে চেয়ে রইলেন অবসর প্রাপ্ত ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব।

১৩

মকানে ফেরার পরের দিনই ফৌজদার সাহেব একপত্র পেলেন। পত্র লিখেছেন শায়খ শাহ্ শফীউদ্দীন হুজুর। পত্র এনেছেন হুজুরের মোকামের অন্য এক মুরিদ। পত্রের মূল অংশে শায়খ হুজুর লিখেছেন — অসুস্থ আমি ঠিকই এবং বেশ খানিকটা অসুস্থ। তবে শরীফ রেজার কাছে ইতিমধ্যেই যে খবর গেছে, বিমারটা আমার তত মারাত্মক নয়। একটা অসুবিধার জন্যে আমি এক স্বনির্বাচিত দাওয়াই খাই। লতাপাতার দাওয়াই। নিদ্রালু আবেশটাই এ দাওয়াই এর বড় দিক। তাই, পরিমাণটা বেশী হয়ে যাওয়ায় আমি সেদিনটা গোটাই প্রায় অচেতন হয়ে থাকি। আমার এই দাওয়াই খাওয়ার ব্যাপারটা অন্যেরা কেউ জানতো না। ফলে, তারা ভাবলে, এটা আমার বিমারেরই চরম পর্যায়। আমার শেষ সময় উপস্থিত। এর উপর আবার সেই দিনই সকালে শরীফ রেজাকে তাড়াতাড়ি আসার জন্যে তাদের আমি খবর পাঠাতে বলি। এতেও তারা বুঝলে আমার অন্তিম অবস্থা আঁচ করেই আমি শরীফ রেজাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছি। এতে করে সংবাদ নিয়ে এখান থেকে যে লোকটি আগে গেছে, সে গিয়ে আপনাদের মাঝে কি অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা আন্দাজ করতে পেরেই আমার এই পত্র লেখা। হায়াত মউতের মালীক আল্লাহ। মরতে আমি যে কোন সময় পারি। তবে এখনই আমার মউত ঘটবে — এমনটি ভাবার পেছনেও কোন যুক্তি নেই। শরীফ রেজাকে আমার অন্য কাজে প্রয়োজন। সে এখনও রওনা হয়ে না থাকলে, তাকে পাঠিয়ে দেবেন.......।

পত্র পাঠ অন্তে আরাম ও স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব। আরো কিছুটা অবনতি ছাড়া তাঁর শারীরিক অবস্থার কোন উন্নতিই এখনও ঘটেনি। সাতগাঁ থেকে এ সময় খারাপ কিছু খবর-বার্তা এলেও, ঘরে বসে আফসোস্ করা ছাড়া তিনি সাতগাঁ যেতে পারতেন না। বিরাট এই দুঃশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার আনন্দে ফৌজদার সাহেবের মনে হলো, অসুখটা তাঁর অর্ধেকটাই উপশম হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে খবরটা তিনি ইনসান আলীকে পাঠিয়ে দিলেন। ও বেচারার মনের অবস্থাও তখন থেকেই খারাপ।

একদিন পরেই হাজির হলেন ইনসান আলী সাহেব। এই খোশ—খবরের ধন্যবাদ জ্ঞাপনেই নয়, তিনি এলেন দাওয়াত পত্র হাতে নিয়ে। সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহর তনয়া ফরিদা বানু বেগমের শাদির দাওয়াত পত্র। ভুলুয়ার প্রশাসকের পদ ইনসান আলী সাহেবের জন্যে স্থায়ী হয়ে গেছে। সুলতান মুবারক শাহও তাঁকেই ভুলুয়ার প্রশাসক বানিয়ে দিয়েছেন এবং ভুলুয়ার দাওয়াতগুলো সম্পাদন করার দায়িত্ব তার উপরই দিয়েছেন।

বৈঠক খানার পাশের ঘরেই ফৌজদার সাহেব গা এলিয়েছিলেন। ইনসান আলী এসে দাওয়াত পত্র হাতে দিতেই আনন্দে নেচে উঠলেন ফৌজদার সাহেব। ধড়মড় করে উঠে বিছানার উপর বসেই তিনি বিপুল উল্লাসে বললেন — মা-শা-আল্লাহ! ফরিদা আম্মার শাদি! কি আনন্দ! কি আনন্দ!

এই সময় পদ্মরাণী কি এক কাজে ফৌজদার সাহেবের ঘরের পাশে এসেছিল। ইনসান আলীকে দেখেই এবং ফরিদা বানুর শাদির কথা কানে পড়তেই সে থমকে ওখানেই দাঁড়িয়ে গেল। ফৌজদার সাহেবের ঐ আনন্দের প্রেক্ষিতে ইনসান আলী সাহেব বললেন — জি, ঝুট ঝামেলার জন্যে অনেকদিন অপেক্ষার পর এতদিনে সে মওকাটা এসেছে। সুলতান খুব ধুমধাম করেই মেয়ের শাদিটা দিচ্ছেন।

ফৌজদার সাহেব বললেন — বেশ-বেশ। জাফর আলী খুব সুন্দর ছেলে। দু'টিতে মানাবে ভাল।

ঃ জি—হাঁ। স্রেফ মানাবেই না; সুখীও তাঁরা হবেন তাঁদের জিন্দেগীতে এই ধারণাই করা যায়। আসলে দুইজনেই তো দুই জনের জন্যে কম অপেক্ষা করেননি?

ঃ ঠিক ঠিক। এটাও একটা মস্তবড় দিক। তারা জিন্দেগীতে সুখী হোক — এই কমনাই করি।

ঃ শাদির পর সুলতান বাহাদুর নাকি জাফর আলীকে চাটিগাঁয়ের তামাম স্বত্ব ছেড়ে দেবেন। মানে গোটা চাটিগাঁটাই ইনাম দেবেন সালার জামাই জাফর আলী খান সাহেবকে।

ঃ ইনাম ?

ঃ জি, জামাইকে ইনাম।

ফৌজদার সাহেব উল্লাস ভরে বললেন মারহাবা! মারহাবা! আহা! বেচারা শরীফ রেজা এ আনন্দে শরিক হতে পারলো না।

শরীফ রেজার সাথে দুর্ব্যহার করার পর থেকেই কনকলতা উদাসিনী। আহারে-বিহারে-কাজে-কর্মে তিনি এখন উৎসাহ হীনা। মন চায়তো এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করেন কিছু, না চায় তো ঘরের মধ্যেই শুয়ে বসে কাটান। বাইরে বড় বেরোন না। ফৌজদার সাহেব মকানে থাকলে তাঁর খেদমতে এ মকানে এখনও তিনি আগের মতোই আসেন, কিন্তু আগের সেই প্রাণ—চাঞ্চল্য, সেই প্রাণ প্রাচুর্য্য নেই। ফৌজদার সাহেব তা বুঝতে পারেন, কিন্তু কারণটা বুঝতে পারেন না। শরীফ রেজার প্রতি কনকলতার আগের সেই উৎসাহটাও নেই দেখে ফৌজদার সাহেবও ভাবেন, কিন্তু কারণ খুঁজে পান না। ফলে, তিনি তাঁর ঐ এক ধারণাই নিয়ে আছেন যে, কনকলতার অতীতের ঐ অপ্রকাশ্য জিন্দেগীর কোন তার কোথাও ছিড়ে গেছে এবং যা সে প্রকাশ করতে নারাজ, তার এই উদাসিনতা সেই কারণেই।

কনকলতা এখন অনুতাপে পুড়ছেন। ফরিদা বানুর উপর শরীফ রেজার যত আকর্ষণই থাক, বা শাদিই তাঁকে করুন তিনি, শরীফ রেজা তাঁকেও এক দিন ভাল বেসেছেন ওমনিভাবেই। আজ তাঁকে ভুলে গেলেও তাঁর প্রতি শরীফ রেজার সে দিনের সেই মুহাব্বত কৃত্রিম আদৌ ছিল না। দীলে তাঁর কোন গলদই নজরে পড়েনি কনকলতার। অথচ সেই লোকটার উপর এতটা তিনি নির্মম হতে গেলেন কেন, এতটা আঘাত না করলেও তো পারতেন তিনি। পুরুষ মানুষের একাধিক স্ত্রীও থাকে, ভালও বাসেন সবাইকে, আবার কখনও কখনও উপেক্ষাও করেন কাউকে কাউকে। এটাতো শরীফ রেজার একার ব্যাপার নয় কিছু ? অনেক লোকেরই ব্যাপার! সুতরাং, এ জন্যে শরীফ রেজার প্রতি তাঁর ঐ ইতর সুলভ আচরণ শোভন হয়নি মোটেই!

মাঝে মাঝেই এসব কথা ভাবেন আর অনুতাপে দগ্ধ হন কনকলতা। ক্ষমা চাওয়ার কথাও ভাবতে তিনি পারেন না। যে তাঁকে ইনকার করে চলে গেছে, তার কাছে তিনিই আবার উপযাচক হয়ে ক্ষমা চাইতে যান কি করে ? এ ছাড়া শরীফ রেজারও আর এখন দেখা সাক্ষাৎ মেলে না। তিনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন ফৌজদার সাহেবের মকান। কাছে-কোলে পেলে হয়তো সময় সুযোগ মতো বলা যেতো কিছু। কিছু নরম কথা বলে ঐ কসুরটা খানিক হালকা করা যেতো!

আনমনে কনকলতা বারান্দার নীচে পায়চারী করছিলেন। পড়িমরি ছুটে এলো পদ্মরাণী। সে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো — দিদিমণি-দিদিমণি, জব্বোর খবর আছে !

উদাসীনভাবে কনকলতা প্রশ্ন করলেন — কি হলোরে পদ্ম ?

ঃ বিয়ে দিদিমণি, ফরিদা আপার বিয়ে।

ঃ কি বললি ?

ঃ ভুলুয়ার ঐ সাহেব বড় হুজুরকে দাওয়াত দিতে এসেছেন। সুলতান হুজুরের মেয়ে ঐ ফরিদা আপার বিয়ে।

ঘটনাটা খেয়াল করেই কনকলতার মেজাজ গেল বিগড়ে। তিনি তিক্ত কণ্ঠে বললেন—তো কি হয়েছে ? এত ঘটা করে সে কথাটা আমাকে না শুনালে চলতো না ?

ঃ এ্যা!

ঃ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে তোরও এত সখ ?

ঃ দিদিমণি!

ঃ বিয়ে যে একদিন হবেই, সে তো আমি জানি। তোর ঐ ছোট হুজুর— মানে শরীফ রেজা সাহেব যে ফরিদা বানুকেই বিয়ে করবেন শেষ পর্যন্ত, এটাতো কোন নূতন খবর নয়।

ঃ না— মানে —

ঃ তুই—ই কেবল বিশ্বাস করতে চাস্‌নি। একটু আগেও তোর ধারণা ছিল, তোর ঐ ছোট হুজুর আর যাই—ই করুন, আমাকে একদম ফেলে দিতে পারবেন না, এখন হলো তো সে কথা ?

কনকলতার চোখ মুখ আঁধার হয়ে এলো। মনের কোণে এখনও যে ক্ষীণ আশা ছিল একটা, তাঁর আঁধার ঘেরা আসমানে এখনও যে আশার একটা ক্ষুদ্র শিখা মিটমিট করে জ্বলছিলো, এ খবরে তামাম কিছু দপ করে নিভে গেল। তিনি টলতে টলতে গিয়ে বারান্দায় পাতা খাটিয়ার উপর থপ্‌ করে বসে পড়লেন।

পদ্মরাণীও ছুটে এলো পিছে পিছে। সে আসতে আসতে বললো — আহা দিদিমণি, আমার কথাটা তো ভাল করে শুনবেন আগে ?

একই রকম রুক্ষকণ্ঠে কনকলতা বললেন — কি শুনবো ? এর আর শুনার কি আছে ?

ঃ বিয়েটাতো ছোট হুজুরের সাথে নয় ?

ঃ মানে ?

ঃ ফরিদা আপার বিয়ে আমাদের ঐ ছোট হুজুরের সাথে নয়। ওঁদেরই ঐ সেনাপতি জাফর আলী সাহেবের সাথে হচ্ছে।

চমকে উঠলেন কনকলতা। প্রশ্ন করলেন — কি বললি ? জাফর আলী সাহেবের সাথে ?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ দিদিমণি!

ঃ তোর ছোট হুজুরের সাথে নয় ?

ঃ আজ্ঞে না।

ঃ সে কি!

কনকলতার চোখে মুখে পুনরায় রক্ত ফিরে এলো। তাঁর মনে হলো, এতক্ষণে যেন বদ্ধ এই পৃথিবীতে হাওয়া বইতে শুরু করেছে আর সে হাওয়ায় তাঁর শ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া সহজ হয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে উঠে বসে তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন — কেন, জাফর সাহেবের সাথে কেন ?

ঃ সে কথা তো আমি বলতে পারবো না দিদিমণি। শুধু শুনলাম, বিয়েটা ঐ জাফর আলী সাহেবের সাথেই হচ্ছে আর ইনাম স্বরূপ ঐ চাটিগাঁ মুলুকটা গোটাই সুলতান জাফর আলী সাহেবকে দিচ্ছেন।

ক্ষণিকের জন্যে নীরব হলেন কনকলতা। দীর্ঘ দিনের বিষণ্ণতার পর তৃপ্তির একটা হিল্লোল এসে তাঁর দীলটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগলো। তবু দীর্ঘ দিনের আক্রোশের জের টেনে কনকলতা বললেন—ঠিক হয়েছে। যেমন আক্কেল তেমনি এলেম পেয়েছে! সুলতানের জামাই হবার সখটা এবার মিটেছে তো!

পদ্মরাণী কনকলতার এ মন্তব্যে খুশী হতে পারলো না। তাই সে সায় না দিয়ে বললো—কিন্তু এটা কি করে হলো দিদিমণি ? এতটার পর ঐ ফরিদা আপাই বা জাফর আলী সাহেবকে শাদি করতে গেলেন কি করে ?

কনকলতা চিন্তিত হলেন। বললেন—তাই তো! এতটা ঢলাঢলির পর ফরিদা বানু বেগমের মতো মেয়ের এই পরিবর্তন! ব্যাপার কি ? অন্য কিছু তো ঘটে যায়নি এর মধ্যে ?

ঃ আমার কাছেও ব্যাপারটা কেমন লাগছে দিদিমণি! তাঁর মতো একজন সরল সহজ মানুষকে ঐ রকমভাবে কাছে টেনে নিয়ে এভাবে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়াটা —

ঝট্‌কা মেরে উঠে দাঁড়ালেন কনকলতা। উঠতে উঠতে শক্ত কণ্ঠে বললেন — অন্যায়-অন্যায়, মস্তবড় অন্যায়। চলতো দেখি, এত বড় একটা অঘটন কেমন করে ঘটলো ? বড়বাপের কাছে গিয়ে শুনে দেখিতো ব্যাপারটা?

কনকলতার দেহে যেন নয়া তাকতের সঞ্চার হলো। পদ্মরাণীকে সঙ্গে নিয়ে ঝড়ের বেগে এসে তিনি ফৌজদার সাহেবের দরজার উপর দাঁড়ালেন। ঘরের মধ্যে তখনও ইনসান আলী সাহেবের সাথে ফৌজদার সাহেব আলাপরত ছিলেন। কোনদিকেই নজর না দিয়ে কনকলতা সরাসরি ফৌজদার সাহেবকে প্রশ্ন করলেন — এটা কেমন কথা হলো বড় বাপ ?

আচানক এই প্রশ্নে ঘরের ভেতরের উভয়েই মুখ তুলে তাকালেন। ফৌজদার সাহেব সবিস্ময়ে বললেন কোন কথা আম্মি ?

ঃ ফরিদা বানু আপার নাকি শাদি আর সে শাদি ঐ সালার জাফর আলী সাহেবের সাথে হচ্ছে ?

ঃ হ্যাঁ, তাইতো হচ্ছে।

ঃ কিন্তু তা হবে কেন ? ফরিদা আপার শাদি ঐ জাফর আলী সাহেবের সাথে হবে কেন ?

ঃ সে কি! তার সাথে হবে না তো কার সাথে হবে ?

ঃ কেন, শরীফ রেজা সাহেবের সাথে।

ঃ মানে!

ঃ শরীফ রেজা সাহেবের সাথেই তো হওয়ার কথা এ শাদি! তার সাথেই তো মুহাব্বত ছিল ফরিদা আপার!

ফৌজদার সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি বিব্রত কণ্ঠে বললেন—তওবা-তওবা! ভাইয়ে বোনে বিয়ে ?

ঃ ভাইয়ে বোনে!

ঃ শরীফ রেজা ফরিদা আম্মাকে নিজের বোনের মতো স্নেহ করে, ছোট বোনের মতো। ফরিদাও শরীফ রেজাকে আপন ভাইয়ের মতো দেখে, গভীর-ভাবে শ্রদ্ধা করে। ফরিদার বিয়ে তার সাথে হবে কেন ?

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলেন কনকলতা। বললেন—এ্যাঁ! ভাইয়ের মতো ?

ঃ একদম নিজের বড় ভাইয়ের মতো। ফরিদা তাকে ভাই হিসাবে এত পেয়ার করে যে কিছু দিন তাকে না দেখলেই সে বিগ্‌ড়ে যায়। এ দিকে শরীফ রেজাও বড্ড স্নেহ করে মেয়েটাকে।

ঃ বড়বাপ!

ঃ এদের মধ্যে সম্প্রীতি বা ভালবাসা আছে ঠিকই, গভীর ভালবাসা। কিন্তু সে ভালবাসাটাতো ভাই বোনের ভালবাসা। ভাই বোনের স্নেহপ্রীতি। এর মধ্যে

তুমি অন্য ধরনের মুহাব্বতের গন্ধ হঠাৎ পেলে কোত্থেকে। মানে যুবক—যুবতীর প্রেম বলতে যা বুঝায়, সে প্রেম তুমি দেখলে কোথায় ?

ঃ কিন্তু —

ঃ বরং প্রেম বলো, মুহাব্বত বলো, এসব কিছুই ফরিদা বানুর এই জাফর আলীর সাথেই। জাফর আলীই তার পছন্দ করা পাত্র।

ঃ বড়বাপ।

ঃ জাফর আলীর সাথে ফরিদা বানুর মুহাব্বতও দীর্ঘদিনের মুহাব্বত অনেকটা ঐ ছোটকাল থেকেই। এদের বিয়ের কথাও মোটামুটি প্রায় ঠিক হয়ে আছে—মানে ফরিদার আব্বার ইরাদা প্রায় ঐ সময় থেকেই। এখানে তুমি গরমিলটা পেলে কি ?

কনকলতা হতভম্ভ হয়ে গেলেন। তাঁর হাতে পায়ে কাঁপন ধরে গেল। তিনি থতমত করে বললেন—কিন্তু আমরা যে, মানে আমি আর এই পদ্ম যে সেবার ঐ ভুলুয়ায় গিয়ে স্বচোক্ষে দেখলাম —

ঃ কি দেখলে ?

ঃ ফরিদা আপা নিজের হাতে শরীফ রেজা সাহেবকে মালা পরিয়ে দিচ্ছেন —!

এবার কথা ধরলেন ইনসান আলী সাহেব। তিনি বললেন — দাঁড়ান-দাঁড়ান। আমাকে এখানে কথা একটু না বললেই চলছে না।

বিব্রত ফৌজদার সাহেব সাগ্রহে বললেন— বলো-বলো। দেখতো কি যেন একটা জট পাকিয়ে তুলছে ঐ পাগলী মেয়েটা।

ইনসান আলী কনকলতাকে বললেন—আপনি দেখলেন, ফরিদা বানু শরীফ রেজা সাহেবকে নিজে হাতে মালা পরিয়ে দিয়ে তাঁকে কদম বুঁচি করছেন।

শশব্যস্তে কনকলতা বললেন হ্যাঁ-হ্যাঁ তাইতো দেখলাম।

ঃ তাই দেখেই মন আপনার বিগ্‌ড়ে গেল।

ঃ এ্যাঁ! মানে—

ঃ আপনি বুঝলেন, এরা দুইজন গোপনে প্রেম করছেন বা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন ?

ঃ হ্যাঁ, মানে, তাইতো বুঝলাম।

ইনসান আলী সাহেব এবার সখেদে বললেন —আহারে আপনার বুঝ! এই বুঝে নিজেও আপনি পুড়ছেন আর শরীফ রেজা সাহেবকেও পোড়াচ্ছেন!

ঃ কি রকম ? আপনি কি বলতে চান ?

ঃ আপনি নাখোশ হবেন না। আমি আপনাদের অনেক কথাই জানি। শরীফ রেজা সাহেব এই যে সেবার আমার মকানে থাকার কালে সব কথাই আমাকে বলেছেন।

কনকলতার হাত পায়ের কাঁপন তখন ক্রমেই সারাদেহে সঞ্চারিত হচ্ছে। তিনি জড়িত কণ্ঠে বললেন — কি বলেছেন উনি ?

ইনসান আলী সাহেব এবার ফৌজদার সাহেবকে বললেন জনাব, আপনি এজাযত দিলে আমি আরো একটু খোলাখুলিভাবে কথা বলতে চাই এই বহিনের সাথে। সামান্য একটা বিভ্রান্তির বশে এরা মস্তবড় এক গোলমাল ফেঁদে বসে আছেন।

একই রকম ব্যগ্র কণ্ঠে ফৌজদার সাহেব বললেন — বলো-বলো।

ইনসান আলী সাহেব কনকলতাকে বললেন — আপনি শরীফ রেজা সাহেবকে ভালবাসতেন। কিন্তু ঐ দৃশ্য দেখার পরই আপনি তাঁর প্রতি নির্মম হয়ে গেলেন!

ঃ কে বললে সে কথা আপনাকে ?

ঃ ঐ শরীফ রেজা সাহেবই বলেছেন। তবে বলেছেন, এটা তাঁর অনুমান। আপনি তাঁর উপর ভয়ানক রুষ্ট হয়ে আছেন। কেন আপনি তাঁর উপর হঠাৎ এতটা রুষ্ট হলেন, এর কারণ খুঁজতে গিয়েই তাঁর এই ধারণা হয়েছে। অবশ্য প্রথম দিকে তাঁর এ ধারণা হয়নি। অন্য কোন কারণই আর তালাশ করে না পেয়ে এই শেষের দিকে তাঁর খেয়াল হয়েছে — ঐ ঘটনা দেখার পরই বোধ হয় আপনি তাকে ভুল বুঝেছেন।

ঃ ভুল বুঝেছি ?

ঃ ঘটনা যদি তাই-ই হয়, তাহলে বলবো, নিছক ভুল বুঝেছেন।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ আপনি যদি সত্যি সত্যিই ঐ ঘটনার পরই তাকে ভুল বুঝে থাকেন, মানে তার উপর রুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে বলি, তাঁকে ঐ মালা দিয়ে তার দোআ পাওয়ার আরজ বা আকাঙ্খা ঐ জাফর আলী সাহেবেরই। তাঁদের দাম্পত্য জীবন যাতে করে সুখের হয়, এই লক্ষ্যে বড় ভাই বা গুরুজনের দোআ চেয়ে নেয়া। ফরিদা বানু জাফর আলীর ইচ্ছেটাকেই বাস্তবায়ণ করেছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো শ্রদ্ধা করেন যাকে, তাকে নিয়ে বিয়ে বিয়ে খেলতে যাননি।

কনকলতা আর্তনাদ করে উঠলেন — সে কি!

ইনসান আলী সাহেব আরো জোর দিয়ে বললেন যদি বিশ্বাস না হয়, ঐ জাফর আলী সাহেবকেই আপনি কোন একদিন জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, কথাটা সত্যি কিনা!

অত্যন্ত কম্পন হেতু দেহের ভার ধরে রাখতে না পেরে কনকলতা পদ্মরাণীকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুটকণ্ঠে বললেন — পদ্মরে —

পদ্মরানীও এর জবাবে অস্ফুট কণ্ঠে বললো — আমি তো বরাবরই আপনাকে বলছি. ছোট হুজুর এমন লোক নন! একটা গোলমাল আছে কোথাও।

এতক্ষণে ফৌজদার সাহেব কনকলতাকে লক্ষ্য করে অভিযোগের সুরে বললেন — ও, আসল ঘটনা এই তাহলে ? এই জন্যেই তুমি এত মনমরা হয়ে আছো, আর শরীফ রেজাও এ দিকে আর আসছে না ? কি যে সব কাণ্ড তোমাদের!

ইনসান আলী সাহেব বললেন—না এতে করে একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। শরীফ রেজা সাহেব তাঁর সঠিক করণীয়টা স্থির করতে পেরেছেন।

ফৌজদার সাহেব প্রশ্ন করলেন কি রকম ?

ইনসান আলী সাহেব একটু ইতস্ততঃ করলেন। পরে সহজ কণ্ঠেই বললেন — বলেই যখন ফেললাম সব, তখন এটুকুও বলে ফেলাই ভাল, যাতে করে ভবিষ্যতে আর কোথাও কারো কোন বিভ্রান্তির কিছু না থাকে।

ঃ কোন্ কথা ?

ঃ আমি সবকিছু জানিনে। তবে সামান্য যা কিছু শরীফ রেজা সাহেব আমাকে বলেছেন, তাতে তিনি একজন বিবাহিত ব্যক্তি। তাঁর কৈশোরকালেই বিয়ে হয়। তবে কি এক দুর্ঘটনায় সমঝোতা না হওয়ায় কনে পক্ষ কনেকে সরিয়ে নিয়ে যায়, বর পক্ষও নিয়ে আর হৈ চৈ কিছু না করে নীরব হয়ে যায়। ফলে বিয়ের দিনেই ভেঙ্গে যায় তাদের বিয়ে। বর কনে কেউ কাউকে চেনেও না পর্যন্ত।

বিপুল বিস্ময়ে ফৌজদার সাহেব বললেন— সেকি! শরীফ রেজাতো একথা কোন দিন আমাকে বলেনি! তারপর ?

ঃ এটা কোন বলার মতো কথাও নয়, ঘটনাও নয় জনাব। হঠাৎ করে এ বিয়েটা হয়ে যায় আর ভেঙ্গে যায়। সে যা হোক, শরীফ রেজা সাহেব নাকি ইদানিং কিছু সন্ধান পেয়েছেন তাঁদের, — মানে তাঁদের হাল-অবস্থার। শরীফ রেজা সাহেব এবার কিছু তৎপর হলেই হয়তো বা ঐ ছেঁড়া সূতা পুনরায় জোড়া লাগতেও পারে।

ঃ আচ্ছা!

ঃ শরা শরিয়ত মতেই বিয়েটা তাদের হয়েছিল। এ দুনিয়াতে তো শরীফ রেজা সাহেবের আপন বলতে কেউ নেই! তাই তাঁর ইদানিং ইচ্ছে হয়েছে, খোঁজ খবর করে ঐ বিয়েটাই পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করবেন তিনি এবং তার মাধ্যমে জিন্দেগীর একটা অবলম্বন তৈয়ার করার কোশেশ করবেন।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ হ্যাঁ। আর আমার মতে তাই করাই তাঁর ভাল। খামাখা এদিক ওদিক ছুটে ধাক্কা খাওয়ার চেয়ে যেখানে তাঁর দাবী আছে সেখানে যাওয়াই ভাল।

কনকলতাকে কটাক্ষ করেই ইনসান আলী সাহেব এই শেষের কথাটা বললেন। কিন্তু কনকলতার অবস্থা তখন করুনভাবে অবর্ণনীয়। এইমাত্রই গোটা বিশ্বের মালিকানাটাই যেন তাঁর হাতের মধ্যে এসেছিল. আবার এখনই তা পুরোপুরি না হলেও চৌদ্দ আনাই হাতের বাইরে চলে গেল। তাঁর এখন প্রায় মূর্চ্ছা যাওয়ার অবস্থা!

পদ্মরাণী তার হাতের মধ্যে ধরে রাখা কনকলতার অবস্থাটা আঁচ করেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। একটা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পদ্মরাণী বুদ্ধিকরে বললো—চলুন দিদিমণি, শুনলেন তো সব! আপনার শরীর ভাল নেই। চলুন এবার বাড়ী ফিরে যাই আমরা —

— বলেই কোন উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে কনকলতাকে এক রকম টেনে নিয়েই হাঁটা দিলো পদ্মরাণী। কনকলতাও যন্ত্র চালিতের মতো পদ্মরাণীকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন। অবাক বিস্ময়ে ফৌজদার সাহেব ও ইনসান আলী সাহেব ওদের দিকে চেয়ে রইলেন।

ঘরে ফিরে স্বাধীনভাবে কেঁদে উঠলেন কনকলতা। বললেন — পদ্মরে। না বুঝে শুধু শুধুই একি আচরণ করেছি আমি তাঁর সাথে!

এর জবাবে পদ্মরাণী বললো যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর আফসোস্ করে লাভ নেই দিদিমণি! তাছাড়াও, যে লোক অন্য আর একজনকে আগে থেকেই গেঁথে রেখেছেন জীবনের সাথে এবং এখনও তারই খোয়াব দেখেন, তাঁকে নিয়ে এত উতলা হওয়ার কারণও কিছু নেই।

পদ্মরাণীর কথাতে গুরুত্ব না দিয়ে কনকলতা বললেন—তা হোক, তবু বিনা কারণে একজনকে এতটা অপমান করা ছিঃ ছিঃ! এ আমি কি করেছি!

ঃ দিদিমণি!

ঃ আর আমি ভাবতে পারছিনে। এর জন্যে মাফ নিতে না পারলে, এ গ্লানী আমাকে পীড়া দেবে সর্বক্ষণ!

খানিক পরেই ইনসান আলীকে বিদেয় করে ফৌজদার সাহেব চলে এলেন কনকলতার মকানে। কনকলতাকে পেরেশান দেখেই ফৌজদার সাহেব বললেন — এমন ধারণা আমারও কিছু হয়েছিল। কিন্তু এদিকে তোমরা যে এতবড় একটা গোলমাল বাধিয়ে নিয়ে বসে আছো, তাতো বুঝতে পারিনি!

কনকলতা উদাসকণ্ঠে বললেন — বড়বাপ!

ফৌজদার সাহেব বললেন — তা এ নিয়েই বা এতটা পেরেশান হওয়ার কি আছে ? শরীফ রেজা এখন সাতগাঁয়ে। সে ফিরে আসুক তোমার যদি

ধর্মান্তরে আপত্তি কিছু না থাকে, সব আমিই ঠিকঠাক করে দেবো। কবেকার কোন মুর্দা সম্পর্ক মাটি খুঁড়ে তুলতে চাইলেই তুলতে আমি দিলাম ? এ দিকের এই তাজা জিন্দেগী কবর দিয়ে কবরের ঐ হাড়হাড্ডি সে টানতে যাবে কোন যুক্তিতে ? আমাদের কোন দাবীই নেই তার উপর ?

নিরাসক্ত কণ্ঠে কনকলতা বললেন — থাক বড়বাপ! ওসব কোন চিন্তা-ভাবনাই মাথায় আমার নেই এখন।

ঃ মানে ?

ঃ আমাকে নিয়ে আমিই এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি, আপনারা নেবেন কি ?

ফৌজদার সাহেব লা–জবাব হয়ে গেলেন। এই রহস্যময়ী মেয়েটার দীলের খবর আজ পর্যন্ত তিনি উদ্ধার করতে পারলেন না। এ নিয়ে আর পীড়াপীড়ি না করে "আচ্ছা যা ভাল বোঝো — " বলে তিনি ধীরে ধীরে নিজ মকানে ওয়াপস্ চলে গেলেন।

ভুলুয়া থেকে একটানা ছুটে অত্যন্ত শংকিত চিত্তে শরীফ রেজা তাঁর হুজুরের মোকামে এসে হাজির হলেন। সাতগাঁয়ে ঢুকেই তিনি খবর নেয়া শুরু করেন এবং মোকামের কাছে এসেও তিনি শেষবার খবর নিয়ে জানলেন, না, উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই, হুজুরের অবস্থা তেমন শংকাজনক নয়।

আশ্বস্ত হয়ে অশ্ব থেকে নেমে শরীফ রেজা শায়খ হুজুরের আস্তানায় প্রবেশ করলেন। এরপর তিনি শায়খ হুজুরের চত্বরের দিকে এগুলেন। হুজুরের চত্বরে এসে দেখলেন — কাজ কর্মরত কিছু লোক ছাড়া, অন্য লোকের মোটেই কোন ভিড় সেখানে নেই। এমন কি শায়খ হুজুরও নেই। খবর নিয়ে জানলেন — অসুস্থ দরবেশ বেশ কিছু দিন পর মোকামের বাইরে একটু খোলা বাতাসে গেছেন এবং মোকামের মোটামুটি লোকজন তাঁর সাথেই আছেন। দীর্ঘ সফরের পর শরীফ রেজা তখনই আবার বাইরের দিকে ছুটলেন না, হুজুরের এন্তেজারে হুজুরের বারান্দার দিকে এগুলেন।

সেখানে এসে শরীফ রেজা দেখলেন, বারান্দায় পাতা খাটিয়ার উপর সৌম্য মূর্তির বলিষ্ঠ এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক চুপ চাপ বসে আছেন। তাঁর চেহারায় সৎ বংশের ছাপ আর চোখে মুখে জ্ঞানবুদ্ধির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। সালাম দিয়ে শরীফ রেজা বারান্দার দিকে এগুতেই ভদ্রলোকটি সালাম নিয়ে বললেন আপনি কি শায়খ হুজুরের সাক্ষাৎ চান ?

শরীফ রেজা স্মিতহাস্যে বললেন — জি।

ঃ তাহলে হয় আপনাকে আমারই মতো এন্তেজার করতে হবে, নয় ঐ সামনেই নদীর ধারে যেতে হবে। হুজুর ওখানেই গেছেন।

শরীফ রেজা ইতস্ততঃ করে বললেন — আপনি, মানে জনাবের পরিচয়টা ?

উৎফুল্ল হয়ে ভদ্রলোকটি বললেন — আমি এই হুজুরেরই একজন নগণ্য খাদেম।

শরীফ রেজা সবিস্ময়ে বললেন — হুজুরের খাদেম! তা জনাবকে তো আগে কখনও —

ঃ জিনা। আমি এই অল্প কিছুদিন আগে এসে হুজুরের খেদমতে নিয়োগ লাভ করেছি। মানে হুজুরের নেক নজর লাভ করেছি। আপনি ? আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

ঃ বহুৎ দূর থেকে ঐ সোনার গাঁ থেকে আসছি।

ঃ হুজুরের সাথে পরিচয় আছে আপনার ?

পুনরায় ঈষৎ হেসে শরীফ রেজা বললেন — জি আছে। আমিও আপনারই মতো এই হুজুরের এক নগণ্য খাদেম।

ভদ্রলোকটি সোচ্চার হয়ে উঠলেন। উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন — মা'-শা-আল্লাহ! আরে আসুন–আসুন —

— বলতে বলতে উঠে এসে তিনি শরীফ রেজার সাথে মোসাফেহা করলেন এবং শরীফ রেজাকে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজের পাশে বসালেন। শরীফ রেজা বললেন—আমি অবশ্য পুরানো খাদেম হুজুরের। প্রায় বাল্যকাল থেকেই হুজুরের নেক নজর লাভের কিস্‌মত আমার ঘটেছে। তা জনাবের নামটা ? মানে ঠাঁই ঠিকানা ?

ভদ্রলোক এবার ধীর কণ্ঠে বললেন — আমার কোন ঠাঁই-ঠিকানা নেই এখন। হুজুরের এই মকানই এখন আমার ঠাঁই–ঠিকানা বলতে পারেন। বহুদূর থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আল্লাহ তায়ালা এতদিনে আমাকে একটা সঠিক ঠিকানায় এনে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে।

ঃ জনাবের নামটা ?

ঃ শাহ ইলিয়াস।

শরীফ রেজা চমকে উঠলেন। বললেন জি ? আপনার নাম —

ঃ চেনা জানা সবাই আমাকে হাজী ইলিয়াস বলেন। কিন্তু আসল নাম আমার শাহ ইলিয়াস মানে ইলিয়াস শাহ।

ধড়মড় করে তাঁর দিকে ঘুরে বসলেন শরীফ রেজা। অত্যন্ত আগ্রহভরে প্রশ্ন করলেন — হাজী ইলিয়াস মানে ? আপনি কি দিল্লী থেকে এসেছেন ?

ঃ জি। তবে সরাসরি নয়। দিল্লী থেকে বেরিয়ে অনেক ঘুরেফিরে এই বাঙ্গালা মুলুকে এসেছি।

ঃ আপনি কি লাখ্‌নৌতির সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ মানে আলী মুবারকের দুধ ভাই ?

ঃ হ্যাঁ। সেই বদনসীব বা খোশনসীব আমারই।

হাজী ইলিয়াসের কণ্ঠস্বর ভারী হলো। পরক্ষণেই তিনি আবার কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন এনে প্রশ্ন করলেন — কিন্তু আপনি তা — মানে আপনি কি করে জানলেন ?

শরীফ রেজার তখন আর কোন খেয়াল ছিল না। তিনি একইভাবে প্রশ্ন করলেন—বরকতুল্লাহ নামের কাউকে চেনেন ? ঐ লাখ্‌নৌতির ফৌজেরই এক সেপাই এখন ?

ঃ জি, চিনি। ওখানে জনাব শরীফ রেজা নামের এক বাহাদুরের মকানে যে বরকতুল্লাহ সাহেব আছেন, তাঁর কথা বলছেন তো ?

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ। সেই বরকতুল্লাহ সাহেব।

ঃ জি, চিনি–চিনি। উনাকে চিনবো না মানে ? নসীবের মার খেয়ে বরকতুল্লাহ সাহেব আজ একটা সেপাই। কিন্তু সেদিনের সেই সহকারী সালার বরকতুল্লাহ সাহেবের সার্বিক প্রশংসায় দিল্লীর সামরিক ঘাঁটি মুখর থাকতো সকাল সন্ধ্যা।

অত্যন্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠে শরীফ রেজা বললেন— কি আশ্চর্য। কি আশ্চর্য! আপনিই সেই বিখ্যাত ব্যক্তি— সেই মশহুর যোদ্ধা আর নেকমান্দ ইনসান হাজী ইলিয়াস সাহেব ?

তদ্রূপই আশ্চর্যান্বিত হয়ে হাজী ইলিয়াসও বললেন—তাজ্জব! আপনি কে ? আপনি আমার এত কথা কি করে জানলেন ?

ইতিমধ্যেই সদল বলে সুফী শাহ শফীউদ্দীন সাহেব এসে হাজির হলেন এবং শরীফ রেজাকে দেখেই প্রফুল্লকণ্ঠে বললেন — আরে! এই যে শরীফ রেজা! কখন এলে ? কতক্ষণ হলো ?

চোখমুখ প্রস্ফুটিত করে হাজী ইলিয়াস বললেন — সোবহান আল্লাহ! ইনিই কি তাহলে সেই শরীফ রেজা সাহেব ?

দরবেশ শাহ শফিউদ্দীন হাসিমুখে বললেন — জি হাজী সাহেব, এই সে শরীফ রেজা যার তালাশে আপনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

এরপর শরীফ রেজাকে লক্ষ্য করে শায়খ হুজুর বললেন — আলাপ হয়েছে তোমাদের মধ্যে ?

শরীফ রেজা বললেন — জি, অল্প একটু হয়েছে। তবে — শায়খ হুজুর বললেন — ইনিও আমার এক প্রিয় ব্যক্তি। অল্পদিনের হলেও আমার একজন প্রিয় সাগ্‌রিদ। খুব দানাদার আদমী। তোমার সাথে মিলবে ভাল।

শরীফ রেজা বললেন—আমি তো হুজুর সেবার লাখনৌতি থেকে ফিরে এসে ইনার কথাই বললাম। ইনাকে আমার খুবই প্রয়োজন ছিল তখন।

ঃ এখনও আছে।

ঃ হুজুর!

ঃ মানুষের প্রয়োজন কি ফুরায় কখনও ? কিভাবে কাকে কখন যে প্রয়োজন তা ঐ একজন ছাড়া কে বলতে পারে ?

সুফী সাহেবের মুখে সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তা লক্ষ্য করে শরীফ রেজা সচকিত হয়ে উঠলেন। এ হাসির অর্থ শরীফ রেজা বোঝেন। কি বলতে চান হুজুর তাহলে ? তিনি সবিস্ময়ে শায়খ হুজুরের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তা লক্ষ্য করে শায়খ হুজুর ফের বললেন — বুঝলে না ? ইনাকেই আসলে আমাদের প্রয়োজন। নিজেদের ইরাদা পূরণ নিজেদের লোক ছাড়া অন্যকে দিয়ে হয় না।

ঃ হুজুর!

ঃ সে প্রতিজ্ঞা অন্যদের থাকে না। মসনদের মায়ায় তারা তালকানা হয়ে যায়। কোন ঝুঁকির দিকে সহজে আর এগোয় না। তৈরি রাস্তা পেলে তারা হাঁটে, না পেলে আর হাঁটে না। আমার আকাঙ্খা আমার কোন মুরিদ যদি হাসিল করার ওয়াদা নিয়ে মসনদে গিয়ে বসে, তাকেই কেবল মসনদ বিভ্রান্ত করতে পারবে না। মসনদ থাকুক আর চলে যাক, সে গন্তব্যতক এগুবেই।

ঃ হুজুর!

ঃ যেমন এই তোমরা। ইরাদা হাসিলের লক্ষ্যে তোমার বা সোলায়মান-খান সাহেবের যদি আগে থেকেই মসনদে উঠার নিয়াত থাকতো, মসনদ তোমাদের বিভ্রান্ত করতে পারতো না। তোমরা শেষতক্ এগুতেই।

ঃ তা মানে —

ঃ সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহকে নিয়ে কিছুটা ভরসা করার ছিল। কিন্তু আর তা নেই। আলী শাহর তো প্রশ্নই কিছু উঠে না।

ঃ হুজুর!

ঃ এখন গোণ্ডা গোণ্ডা মসনদ গজিয়ে উঠবে। পতাকাও উড়তে থাকবে একাধিক। কিন্তু কাজ হবে না কাউকে দিয়েই। দু'দিনের বাদশা হওয়াই জিন্দেগীর চরম পাওনা তাদের। কোন সুদূর প্রসারী নিয়াতের সাথে তাদের বাদশা হওয়া তেমন একটা নয়। তা থাক সে কথা। এ নিয়ে পরে বসবো। এখন শুধু পরিচয়ের খাতিরে বলি, এই হাজী সাহেবই আমাদের আসলী লোক।

হাজী ইলিয়াস বিনয়ের সাথে বললেন হুজুর আমাকে শরমিন্দা করছেন।

দরবেশ সাহেব নির্বিকার কণ্ঠে বললেন অনর্থক আমি বলিনে!

ঃ হুজুর —

ঃ আপনারা এখন আলাপ করুন। এইটুকু হেঁটে খুব কাহিল হয়ে পড়েছি। একটু জিরিয়ে নেয়ার দরকার —

কক্ষের মধ্যে ঢুকে গেলেন দরবেশ শাহ শফীউদ্দীন। শরীফ রেজা হাজী সাহেবকে বললেন — তা জনাব, আপনি এখানে মানে কিভাবে আপনি এখানে এসে হাজির হলেন ?

অত্যন্ত উল্লাসের সাথে হাজী ইলিয়াস বললেন — আপনার তালাশে আপনার তালাশে।

শরীফ রেজা বললেন আমার তালাশে ?

ঃ জি–জি। আপনার ঐ লাখ্‌নৌতির সংগঠনের সাথে আমিও তো পুরোপুরি সামিল হয়ে গেছি।

ঃ কি রকম ?

ঃ এ মুলুকের আজাদী হাসিলে আগ্রহী একটা দল আপনার লাখ্‌নৌতিতে আছে না ? গোপন জংগী দল ? আমিও সেই দলের একজন সদস্য।

ঃ আপনি ?

ঃ জি জনাব। আমি এসেই আপনার ঐ জঙ্গী দলে যোগদান করেছি। বরকতুল্লাহ সাহেবই আমাকে ঐ দলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আর দলের সাথে এক করে নিয়েছেন।

ঃ সোবহান আল্লাহ!

ঃ যদিও বরকতুল্লাহ সাহেবই সব দেখা শুনা করেন, তবু আমাকেই এখন আপনার ঐ সংগঠনের মোটামুটি নেতৃত্ব দিতে হচ্ছে। আপনার অনুপস্থিতিতে সবাই মিলে আমাকেই এই দায়িত্বে ফেলেছেন।

ঃ মারহাবা! মারহাবা!

ঃ দল এখন সন্তোষজনকভাবে মজবুত জনাব। কার্যক্রমে হাত দেয়ার উপযোগী। কিন্তু আপনার অনুমতি না পাওয়ায় আমরা কোন পদক্ষেপ নিতে পারছিনে।

ঃ কোন পদক্ষেপ নেয়ার মতো এতটা শক্তি কি সত্যি সত্যিই দলের এখন হয়েছে ?

ঃ জি। বললামই তো, আমরা তৈয়ার। আপনাকে হাতের কাছে পেলে কাজ আমরা এতদিন শুরু করে দিতাম।

ঃ কাজ ? কি ধরনের কাজ শুরু করতে চান আপনারা ?

ঃ লাখ্‌নৌতির প্রশাসন থেকে সকলকে বের করে এনে স্বাধীন জমিনে স্বাধীনভাবে আমরা আত্মপ্রকাশ করতে চাই। এর পরের পদক্ষেপ লাখ্‌নৌতি দখল করা। এখানে এসে হুজুরের অনুমতি সাপেক্ষে পরিকল্পনা একটা আমরা ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছি।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ যদি সোনার গাঁয়ের সুলতান আমাদের মদদ নেন, ভাল। আমরা তাঁর হয়েই লড়বো। অন্যথায়, আমরা নিজেরাই লাখ্‌নৌতি দখল করতে এগুবো। আমাদের লক্ষ্য হবে — এই সাতগাঁ, লাখ্‌নৌতি, সোনার গাঁ — অর্থাৎ গোটা বাঙ্গালা মুলুককে একটা স্বাধীন সোলতানতে পরিণত করা, যাতে করে দিল্লীর বাহিনীকে কুকুর তাড়ানো তাড়িয়ে দেয়ার তাকত আমাদের পয়দা হয়। দিল্লীর কোন নাম–গন্ধ এই বাঙ্গালা মুলুকের জমিনে কোথাও লেগে থাকুক, এটা আমরা চাইনে।

ঃ বহুত আচ্ছা! বহুত আচ্ছা!

ঃ একটা শক্তিশালী স্বাধীন মুলুক ছাড়া পরের গোলাম হয়ে ইজ্জতের সাথে বাস করাও যায় না, সুষ্ঠভাবে দ্বীন ও কওমের খেদমত করাও যায় না।

ঃ জনাব!

ঃ এই বাঙ্গালার মতো একটা গুমরাহী ঘেরা মুলুকে তো সে প্রয়োজন আরো অনেক বেশী।

ঃ শাব্বাশ!

ঃ আমরা এখন তৈয়ার। জনাবের এজাযতটুকুর অপেক্ষায় শুধু আছি।

ঃ হাজী সাহেব!

ঃ আপনাকে করতে কিছু বলবো না। যা করার আমরাই সব করবো। কিন্তু যেহেতু এ দলের মূল ব্যক্তি আপনি, মানে আপনিই এর মালিক, সেইহেতু এই দলটাকে কাজে লাগানোর আগে অনুমতি তো জরুর চাই আপনার। এমন অনেকেই আছেন, আপনার অনুমতি ব্যতিরেকে একটা কদমও তুলবে না।

অত্যন্ত আগ্রহভরে শরীফ রেজা বললেন, অনুমতির ব্যাপারটা কোন ব্যাপারই নয় জনাব। ওটা আপনাদের ঢালাওভাবেই দেয়া রইলো। আপনাদের সবার যা সিদ্ধান্ত, আমার সিদ্ধান্তও তাই–ই। ইরাদা থেকে আমরা কেউ বিচ্যুত হচ্ছি কিনা- এটুকুই শুধু লক্ষ্যণীয়।

ঃ ইরাদা আমাদের ঐ একটাই — গোটা মুলুকের আজাদী চাই আমরা। কয়দিনের সুলতানী করার আজাদী নয়, দিল্লীর হামলাকে কায়েমীভাবে ঠেকিয়ে রাখার আজাদী, এ মুলুকে দ্বীন ও কওমকে হেফাজত করার আজাদী।

ঃ আলহামদু লিল্লাহ! আপনি মুরুব্বী লোক, দানেশমান্দ আদমী। যথেষ্ট সুখ্যাতি আপনার শুনেছি। আপনার চিন্তাধারা আমাদের থেকে জুদা কিছু হবে না, এ বিশ্বাস আমার জোরদারভাবেই হয়েছে। এখন হুজুরের এজাযতটা পেলেই —

ঃ হুজুরের কোন আপত্তিই নেই জনাব। সে আলাপ আমাদের ইতিমধ্যেই হয়েছে। পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে হুজুরের বরং ইচ্ছেই রয়েছে জোরদার। নয়া উদ্যোগ ছাড়া ঐ সব খণ্ড সুলতানীর দ্বারা যে কাজ কিছু হবে না, হুজুর তো তাঁর কথার মধ্যেই সে দিকটা প্রকাশ করে গেলেন এখনই।

ঃ জি জি, আর কোন সমস্যাই নেই ওনিয়ে। হুজুরের ইচ্ছেই ইচ্ছে। এবার আমার কৌতুহলটা নিবৃত্ত করুন মেহেরবানী করে।

ঃ কৌতুহল!

ঃ জি—হাঁ। কিভাবে আপনি এ মুলুকে এলেন, বরকতুল্লাহ সাহেবের সাক্ষাৎ পেলেন কি করে—এসব। বরকতুল্লাহ সাহেব আপনার চিন্তায় জব্বোর পেরেশান ছিলেন তখন। আপনাকে পেয়ে নিশ্চয়ই যারপরনেই খুশী হয়েছেন তিনি ?

ঃ অবশ্যই—অবশ্যই। আমাকে পেয়ে হাতে উনার চাঁদ পাওয়ার অবস্থা। আসলে উনিতো আমাকে পেয়ার করেন জিয়াদা।

ঃ ঠিক—ঠিক! এবার বলুন, আপনার সব কথা মেহেরবানী করে বলুন এবার।

কিঞ্চিৎ নীরব থাকার পর হাজী ইলিয়াস যে বিবরণ দিলেন, তা হলো—শাহজাদা ফিরোজ—বিন—রজবের ঐ অন্যায় আক্রোশের শিকার হয়ে হাজী ইলিয়াস সপরিবারে দিল্লী থেকে বেরিয়ে আসেন এবং পথে পথে ঘুরতে থাকেন। দীর্ঘদিন নানা স্থানে ঘুরেও দিল্লীর শাসনভুক্ত কোন জায়গায় তিনি নিরাপত্তা খুঁজে পান না। একবার তিনি ধারণা করেন হিন্দুস্থানের বাইরে চলে যাবেন। কিন্তু পরে ভেবে দেখেন, ভাগ্যের অন্বেষণে সকলেই এই হিন্দুস্থানে আসছেন, তিনি এই হিন্দুস্থান ছেড়ে ফের যাবেন কোথায় ? কোন কিছু সাব্যস্ত করতে না পেরে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে ক্রমেই তিনি পূব দিকে এগুতে থাকেন। বিহারে এসে শুনেন, লাখ্‌নৌতি এখন একটা স্বাধীন মুলুক। দিল্লীর গোলামী ছেড়ে দিয়ে তার দুধভাই আলী মুবারক আজাদী ঘোষণা করে স্বাধীন সুলতান হয়েছে। এই প্রথম তিনি জানলেন, তাঁর দুধভাইও দিল্লী মুলুক ত্যাগ করে এই মুলুকে এসেছে এবং সে ইতিমধ্যেই এতখানি উন্নতি সাধন করেছে। এটা শুনে তিনি অতিশয় খুশী হন এবং মহানন্দে ছুটে লাখ্‌নৌতিতে চলে

আসেন। লাখ্‌নৌতিতে এসে হাজী ইলিয়াস আলী শাহ অর্থাৎ আলী মুবারকের সামনে সহাস্যবদনে দাঁড়াতেই তাঁকে তাজ্জব করে দিয়ে আলী মুবারক গর্জে উঠে বলেন—এই লম্পট আমাকে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভূগিয়েছে। কয়েদ করো বদমায়েশকে।

সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রীরা এসে কয়েদ করলো হাজী ইলিয়াসকে। কথা বলার কোন সুযোগই আলী মুবারক ওরফে সুলতান আলী শাহ তাঁকে দিলেন না বা তাঁর কোন মিনতিতেও কর্ণপাত করলেন না। বরং চরম বিদ্বেষভরে হুকুম দিলেন — আপাততঃ কয়েদখানায় ফিঁকে দাও, শিগ্‌গিরই এই নাদানকে কোতল করা হবে।

ইতিমধ্যেই খবর গেল বরকতুল্লাহর কাছে। বরকতুল্লাহ সাহেব সংগঠনের সবাইকে একত্র করে সুলতানের উপর চাপ সৃষ্টি করালেন। বরকতুল্লাহ সাহেবের মাধ্যমেই ইতিমধ্যে লাখ্‌নৌতির অনেকেই হাজী সাহেবের সচ্চরিত্র ও সদগুণের অনেক খ্যাতি—তারিফ শুনেছিলেন। লাখ্‌নৌতির অনেকের কাছেই এ ঘটনা অনেকটা জানা ঘটনা ছিল। কারণ, আলী মুবারকের বাঙ্গালা মুলুকে আগমনের প্রসঙ্গের সাথেই হাজী সাহেবের ব্যাপারটা সরাসরি জড়িত হওয়ায় এ নিয়ে অনেক কথাই লাখ্‌নৌতিতে হয়েছিল। আসল কাহিনী শুনে হাজী সাহেব যে নির্দোষ এবং তিনি একজন সৎব্যক্তি — এ ধারণা জনমনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। একমাত্র আলী মুবারকই বিষয়টি তলিয়ে দেখতে যান না। যা হোক, হাজী সাহেবকে কয়েদ করা নিয়ে এবং তাঁকে কোতল করার প্রশ্নে অচিরেই দরবারের ভিতরে ও বাইরে, বিশেষ করে সেপাইদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। পরিস্থিতির চাপে পড়ে মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করলেন আলী মুবারক, কিন্তু কারাগার থেকে মুক্তি তাঁকে দিলেন না।

হাজী সাহেবের আম্মা অর্থাৎ আলী মুবারকের দুধমাতা এসে অনুরোধ করা সত্ত্বেও প্রথম দিকে আলী মুবারক টললেন না। কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে আক্রোশ ও বিক্ষোভের মাত্রা যখন ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করলো এবং আলী মুবারকের দুধমাতাও যখন আরজে আকুতিতে সার্বিক পরিবেশ আচ্ছন্ন করে ফেললেন ও তা দেখে যখন সেপাইরা তলোয়ার খোলে খোলে অবস্থা, তখন সুলতান আলী শাহ মুক্তি দিলেন হাজী সাহেবকে। মুক্তি দেয়ার পরও যখন দেখলেন, বিক্ষোভের ঝড় তবু থামছে না, তখন আলী শাহ সেনাবাহিনীর মাঝে নিজের আস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে হাজী সাহেবকে সেনাবাহিনীর এক বড়পদে নিয়োগ দান করেন।

এরপর কিছুদিন কেটে গেল। হাজী সাহেবের নির্মল চরিত্রের গুণে এবং তাঁর হৃদয়ের স্পর্শে সেপাইরা অচিরেই মুগ্ধ ও হাজী সাহেবের অনুরক্ত হয়ে গেল। কিন্তু আলী শাহর এই নিয়োগদান কোন প্রীতির দান ছিল না।

সাময়িক-ভাবে সবাইকে শান্ত করার উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ নেন তিনি। তাই, সবাইকে শান্ত করার পর আলী শাহ আবার হাজী ইলিয়াসকে খতম করার কায়দা খুঁজতে লাগলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, যার সাথে একবার চরমদুর্ব্যহার করে ফেলেছেন তিনি, বিশেষ করে হাজী ইলিয়াসের মতো একজন দুধর্ষ যোদ্ধার সাথে, তাকে জিয়িয়ে রাখা বা তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হতে দেয়া মোটেই নিরাপদ নয় আলী শাহর জন্যে।

ফলে, মিথ্যা এক অজুহাতে আবার তিনি হাজী সাহেবকে পদচ্যুত করলেন। শুধু তাই-ই নয়, সর্ব সাধারণের কাছে তাঁকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্যে অবিরাম চেষ্টা চালাতে লাগলেন এবং তাঁর সাথে ইতর সুলভ আচরণ শুরু করলেন। অতপর আলী শাহর আচরণের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার চরম আভাস সুস্পষ্ট হয়ে উঠায় এবং গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হওয়ার আশংকা প্রবলতর হওয়ায় আবার তিনি লাখ্‌নৌতি থেকে সপরিবারে নিরুদ্দেশ হলেন এবং সাতগাঁয়ে শায়খ হুজুরের মোকামে চলে এলেন। কিন্তু নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে তাঁর অধীনে লাখ্‌নৌতির যে বাহিনী ছিল সেই বাহিনীর সাথে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন। হাজী সাহেবের প্রতি সুলতানের এই আচরণ যে অন্যায় ও জঘন্য এই অনুভূতি তামাম সেপাইদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। হাজী সাহেবের বাহিনী গোটাই হাজী সাহেবকে স্বতস্ফূর্তভাবে এর প্রতিশোধ গ্রহণের ওয়াদা দান করে এবং সেই মোতাবেক হাজী সাহেবকে প্রস্তুত হতে বলে।

এভাবে হাজী ইলিয়াসের গোটা বাহিনী সহ লাখ্‌নৌতির ফৌজের আরো অনেক সেপাই এখন বরকতুল্লাহ সাহেবের ঐ গোপন সংগঠনের সাথে একাত্ম ঘোষণা করেছে ও হাজী ইলিয়াস সাহেবের পদক্ষেপ গ্রহণের অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে। শুধু তাই নয়, হাজী সাহেবের ইংগিত পাওয়া মাত্রই লাখ্‌নৌতি থেকে বেরিয়ে এসে হাজী সাহেবের সাথে একত্র হওয়ার জন্যেও তারা এখন এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে।

তামাম কাহিনী শোনার পর শরীফ রেজা চরমভাবে তাজ্জব বনে গেলেন এবং হাজী সাহেবের এই সাফল্যের প্রশংসা তিনি কোন্ ভাষায় করবেন, তা তালাশ করে পেলেন না। অনেকক্ষণ যাবত হাজী ইলিয়াসের মুখের দিকে চেয়ে থাকার পর শরীফ রেজা বললেন — একেবারেই যে অসাধ্য সাধন করে ফেলেছেন জনাব! এখন যা পরিস্থিতি দেখছি, তাতে আপনার নির্দেশ — ইরাদার বাইরে আমার আর কিছুই করার নেই বা আমি পৃথকভাবে কোন কিছু করতে গেলেই বরং জটিলতার সৃষ্টি হবে। কাজ কিছু হবে না। এখন আপনি যেভাবে নির্দেশ দেবেন, হুজুরের এজাযত সাপেক্ষে আল্লাহর রহমে তাই এখন কায়েমী নির্দেশ। তার বিরুদ্ধে আর দুস্‌রা নির্দেশ নেই।

মৃদু আপত্তি তুলে হাজী ইলিয়াস বললেন — না-না, আমার ভুল ভ্রান্তিও তো হতে পারে ? আপনার উপদেশ নির্দেশ সবসময়ই আমার প্রয়োজন হবে। তবে এক্ষণে বড় প্রয়োজন, আমাদের কর্মকাণ্ড শুরু করার পক্ষে আপনার এজাযত।

ঃ এজাযত তো আগেই দিয়ে দিয়েছি আমি। আমরা যা পারছিনে বা পারিনি, তা যদি আপনার দ্বারা — আপনার অছিলায় সম্পন্ন হয়, আমাদের কাছে এর চেয়ে আর খোশ খবর কি আছে ?

ইতিমধ্যেই শায়খ শাহ্ শফীউদ্দীন সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হাজী সাহেবের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ-আদি সেরে হাজী সাহেবকে বিদায় করলেন দরবেশ সাহেব এবং শরীফ রেজাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পুনরায় ঘরে ঢুকলেন। অতপর শরীফ রেজাকে সামনে বসিয়ে দরবেশ হুজুর বললেন — তোমাকে আমি যে জন্যে ডেকেছি, সেই কথাই বলবো এখন। আমি জানি, তুমি একজন শক্ত দীলের বাহাদুর। আকস্মিক কোন ধাক্কা বা ভালমন্দ সব কিসিমের পরিস্থিতি সামাল দেয়ার তাকত্ তোমার আছে।

শরীফ রেজা শংকিত হয়ে উঠলেন। সেভাব গোপন করে বললেন — হুজুর!

ঃ আমার এ বিমার আপাতদৃষ্টিতে মারাত্মক কিছু না হলেও, আমি বুঝতে পারছি, এ বিমার আমার নিরাময় হবার নয়। এই সুস্থ এই অসুস্থ এভাবেই বাঁকীটা জীবন কেটে যাবে। অনেক বয়স হয়েছে আমার। বাঁকী জীবন বলতেও আবার দীর্ঘ কোন জিন্দেগী বা জীবনকালের আশাও আর আমি রাখিনে।

শায়খ হুজুরের মানসিকতার সাথে শরীফ রেজা সম্যকভাবে পরিচিত। নেহায়েতই আখেরী ওয়াক্ত ছাড়া নিজের এই দুর্বলতা এমনভাবে প্রকাশ করার লোক তিনি নন। এটা বুঝতে পেরেই শরীফ রেজা দিশেহারা হয়ে গেলেন। সংযত করার চরম চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর ঠোঁট দু'টি কেঁপে উঠলো। নিয়ন্ত্রণহীন কণ্ঠের আকুলতা চাপতে চাপতে শরীফ রেজা আওয়াজ দিলেন — হুজুর!

হাত তুলে বাধা দিলেন শায়খ হুজুর। বললেন — উঁহু-উঁহু! তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণাটা এভাবে মিথ্যে করে দিলে তো চলবে না! মানুষ কেউই অমর নয়। আর আমিও ঠিক এখনই ইন্তেকাল করছি — এমন কথাও তোমাকে আমি বলছিনে। আমি বলছি, সময়টা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে।

স্থির নয়নে শায়খ হুজুর শরীফ রেজার চোখের দিকে তাকালেন। চোখ দু'টি নামিয়ে নিয়ে শরীফ রেজা নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করলেন। এরপর সহজ কণ্ঠে বললেন — জি হুজুর, বলুন —

আবার একটু থেমে শায়খ হুজুর বললেন — আমি তাই স্থির করেছি, জিন্দেগীর বাঁকী কয়টা দিন আমি আমার হুজুর হজরত বু-আলী কলন্দর সাহেবের কবর শরীফে গিয়ে হুজুরের গোর জেয়ারতেই কাটাবো।

ঃ মানে ঐ পানিপথ কর্ণালে ?

ঃ হ্যাঁ, ঐ পানিপথ কর্ণালেই চলে যাবো আমি। আর শেষের কয়টা দিন আমি ওখানেই কাটাবো।

ঃ এ মোকাম ? আপনার এই সাতগাঁয়ের আস্তানা ?

ঃ এটা এখানেই থাকবে।

ঃ এটা তাহলে দেখবে কে হুজুর ?

ঃ তোমরা দেখবে। তোমার অনুপস্থিতিতে ঐ হাজী ইলিয়াস শাহ সাহেব দেখবেন। তারপর অন্য কেউ দেখবে বা ওটা নিয়ে যা করার তোমরা, বিশেষ করে ঐ হাজী সাহেবই করবেন। তাঁকে আমি তামাম কথা বলে দিয়েছি।

ঃ হুজুর!

ঃ আমার সাথে তোমাকে ঐ পানিপথ কর্ণালতক্ যেতে হবে। অবশ্য তোমার যদি তেমন কোন অসুবিধে না থাকে। আমাকে পৌছে দিয়ে ইচ্ছে করলে তখনই তুমি ওয়াপস্ চলে আসবে, আর মন চাইলে— কয়দিন ওখানে থেকে তারপর তুমি আসবে। এটা তামামই তোমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করবে, আমার কোন জরুরত এ নিয়ে থাকবে না।

ঃ হুজুর!

ঃ যেতে পারবে তুমি ?

শরীফ রেজা পরম আগ্রহে বললেন — জি হুজুর জি, জরুর পারবো। এখানে কোন প্রশ্নই নেই।

ঃ তকলিফ কিছু হবে নাতো ? কোন অসুবিধা ?

শরীফ রেজা ক্ষুণ্ণ হলেন। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললেন—হুজুর, আপনি সবিশেষ জানেন, পুত্রের কাছে পিতার সান্নিধ্যের মতো আপনার সান্নিধ্য আমার কত প্রিয়। যে কয়টা মুহূর্ত আপনার সঙ্গে থাকতে পারি, সেই কয়টা মুহূর্তই তো আমার পরম মুহূর্ত হুজুর! বরং আপনি আমাকে সঙ্গে নিতে না চাইলেই আমার তকলিফ হবে জিয়াদা।

দরবেশ সাহেবের চোখে মুখে আসমানী জ্যোতি ফুটে উঠলো। তিনি খোশদীলে বললেন — শাব্বাশ্ বেটা! পরম করুণাময়ের অফুরন্ত অনুগ্রহলাভের কিস্‌মত তোমার হোক, এই দোয়াই করি!

ঃ হুজুর মেহেরমান! তা কতদিনের মধ্যে তাহলে আমরা রওনা হচ্ছি হুজুর ?

ঃ খুব অল্পদিনের মধ্যেই। অধিক দিন আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না আমার।

ঃ তাহলে এ মুলুকের আজাদীর ব্যাপারে আর —

ঃ ও ব্যাপারে পারলে এই হাজী সাহেবই করতে কিছু পারবে বলে মনে করি। আর সে পরামর্শই আমি তাঁকে দিয়েছি।

ঃ কেন হুজুর ? সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ তো এ পথে এগিয়ে গেছেন অনেক খানি। তাঁকে একদম বাতিল করে —

হাত তুললেন শায়খ হুজুর। বললেন—তাঁর দৌড় শেষ।

ঃ হুজুর!

ঃ এগুনো তাঁর শেষ হয়েছে। তাঁর উপর যে ভরসা আমার ছিল, সে ভরসা আমার ফিঁকে হয়ে গেছে। শুরু তিনি করলেন ঠিকই, কিন্তু সারা আর তাঁর দ্বারা হলো না। এবার ভিন্ন উদ্যোগ চাই।

ঃ কেন জনাব ?

চকিতে শায়খ হুজুর তাঁর মাথাটা একটু উঁচু করলেন। শরীফ রেজার মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বললেন — প্রশ্নটা ঠিক তোমার মতো হলো না শরীফ!

ঃ হুজুর!

ঃ কেন, তা বোঝো না ? লাখ্‌নৌতিই দিল্লী হামলার দরওয়াজা। সেই দরওয়াজা খোলা রেখে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর ঐ পূব অঞ্চল জয় নিয়ে মেতে থাকা দেখেই আমি বুঝেছি, তাঁর উপর ভরসা করার আর কিছুই নেই। প্লাবণের উৎস মুখ খোলা রেখে উনি গিয়ে বাঁধ দিচ্ছেন মোহানায়। প্লাবণ উনি ঠেকাবেন কি ?

ঃ জনাব!

ঃ আলী শাহ একটা কুটো মাত্র। সুযোগ পেয়ে সুলতান হয়েছে। দিল্লীর এক ফুঁৎকারেই সে উড়ে যাবে। বাঙ্গালার তামাম শক্তি একত্র করে নিয়ে ঐ উৎস মুখে শক্ত হয়ে বসতে পারবে যে লোক, একমাত্র তার দ্বারাই স্বপ্ন আমাদের সফল হতে পারে। ফখরউদ্দীনের তেমন উদ্যোগ কোথায় ?

ঃ তা অবশ্য ঠিক হুজুর। তবে —

ঃ তবে ?

ঃ সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ অবশ্য দ্বীনের স্বার্থেই মানে দ্বীনের খেদমতেই ঐ পূব অঞ্চল আর চাটিগাঁ জয়ে গিয়েছিলেন।

ঃ কি রকম ?

ঃ ঐ এলাকার. বিশেষ করে চাটিগাঁয়ের সুফীসাধক আর আউলিয়ারা দীর্ঘকাল যাবত চরম মুসিবত আর মুস্কিলের মধ্যে ছিলেন। তাঁদের মুস্কিল আসানেই —

ঃ দীর্ঘকাল মুস্কিলে যারা ছিলেন, আর দু'টো দিনও থাকতে তাঁরা পারতেন। আর দু'টোদিন পরেও তাঁদের মুস্কিল আসানে যাওয়া যেতো। নিজের ঘরের খুঁটিটাই যার শক্ত করে পোঁতানেই, ঘর যার শূন্যের উপর ঝুলছে, ঝড় ঝঞ্ঝার সময়ে সে অন্যকে হেফাজত করবে কি ? আর অন্যের মুস্কিল আসান করে সে বেড়াতে পারবে কত দিন ?

শরীফ রেজার তবুও মনের ভ্রান্তি গেল না। তিনি ভয়ে ভয়ে বললেন — গোস্তাকী মাফ হয় হুজুর! খবর যা আছে তাতে, দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলক এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। বাঙ্গালা মুলুকে অভিযান চালানোর অবকাশ আর দিল্লীর সুলতানের নেই।

ঃ আবার সেই ছেলে মানুষের মতোই তুমি কথা বললে শরীফ!

ঃ হুজুর!

ঃ এখন নেই বলে পরেও আর থাকবে না, এটা ভাবছো কেন ? সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলক যদি না-ই পারেন, তাঁর পরের সুলতানও পারবেন না — এ নিশ্চয়তা পেলে কোথায় ? মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের পর ঐ শাহজাদা ফিরোজ-বিন-রজব যদি দিল্লীর সুলতান হন, তাহলে তিনিও যে এই বাঙ্গালা মুলুকে ব্যাপক হামলা চালাবেন না — এ ওয়াদা তোমাকে কে দিলে ? আর তা যদি তিনি চালান, তাহলে এসব ক্ষুদে সুলতানদের কোন তাকত্ থাকবে ঐ হামলা রোধ করার ?

শরীফ রেজা লজ্জা পেলেন। শরমে তাঁর মাথাটা অনেক খানি নীচে নেমে এলো। তাঁর হুজুর একজন দরবেশ। সেই দরবেশের এই গভীরতম রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দেখে তিনি তাজ্জব হয়ে গেলেন। লজ্জা জড়িত কণ্ঠে শরীফ রেজা বললেন—আমার বেয়াদপী মাফ করবেন হুজুর। কিছুটা বুঝলেও ব্যাপারটার এতটা গভীরে কখনও আমি যাইনি। আর এ জন্যেই এই প্রশ্নগুলো দীলে আমার ছিল। এবার তামাম কিছু আমার কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে জনাব। সত্যিই আবার নয়া উদ্যোগ দরকার।

ঃ বহুত খুব! বুঝতে একটু দেরী হলো, এই যা।

ঃ জনাব!

ঃ এক ধাক্কা খেয়েই সুলতান মুবারক শাহ পিছিয়ে গেছেন বুঝলে ? বান্দা মুখলিস মরলো, আর অমনি তিনি ঘাবড়ে গেলেন! মরণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে পাল্টা ধাক্কা দেয়ার জন্যে আর তিনি বেরুলেন না। শক্ত কাজ দেখেই তিনি আল্‌তু

ফাল্‌তু অজুহাতে অন্য দিকে নজর দিলেন। এরপর আলী শাহ যদি হামলা করতে আসেন, তিনিও ফের হামলা করতে বেরুবেন হয়তো ঠিকই, কিন্তু সে সবই আত্মরক্ষার হামলা, বৃহত্তর নিয়াত হাসিলের লড়াই সেগুলোকে বলা যাবে না সেক্ষেত্রে।

ঃ ঠিক জনাব, বিলকুল ঠিক!

ঃ সেই জন্যেই নয়া উদ্যোগ চাই আবার। আর সে উদ্যোগ এই হাজী ইলিয়াস শাহই নেবেন। আমি বিশ্বাস করি, তিনি কামিয়াবও হতে পারবেন। বর্তমানে ভবঘুরে হলেও তিক্ততার পাঠশালায় অনেক এলেম হাসিল করেছেন তিনি, সেই সাথে হাসিল করেছেন যথেষ্ট মনোবল আর নিষ্ঠা।

ঃ জি হুজুর জি। তাঁর কথাবার্তা শুনে এ উপলব্ধি আমারও হয়েছে।

ঃ তাই আমার নির্দেশ থাকবে, তুমিও আর অন্যদিকে সময় শক্তি ক্ষয় না করে এই হাজী সাহেবকেই মদদ দেবে সাধ্য মতো। আমার এই মোকামের লোক লস্কর অর্থাৎ আমাদের এই ক্ষুদে জঙ্গী বাহিনীটার মালিকানা তোমারই। তুমিই এদের অধিপতি। উপস্থিত থাকলে তোমার অধীনেই এ বাহিনী থাকবে। তোমার অনুপস্থিতিতে এ বাহিনী ঐ হাজী সাহেবই কাজে লাগাবেন, এই নির্দেশই তাঁকে আমি দিয়েছি।

ঃ জনাব!

ঃ নাখোশ হলে কিছু ?

ঃ জিনা হুজুর, জিনা। আপনার ইচ্ছেই যে আমার পরমার্থ হুজুর। আপনার ইচ্ছেকে বাস্তবায়ন করার মধ্যেই আমার তামাম আনন্দ, আমার তৃপ্তি। এভাবে বলে আমাকে গুনাহগার করবেন না।

ঃ পাগল বেটা! তা যা বলি, শোনো ঃ এ মুলুকে আমি এসেছিলাম দ্বীনের চেরাগ জ্বালাতে। যতটুকু তৌফিক আল্লাহ তায়ালা দিয়েছিলেন আমাকে, আমার সাধ্যমতো ততটুকু আমি করেছি। কিন্তু সেই চেরাগটাকে অর্থাৎ দ্বীন ইসলামকে এ মুলুকে হেফাজত করার পুরো কাজটা আমি দেখে যেতে পারলাম না। তুমিও এ ব্যাপারে যথাসাধ্য করেছো। তোমার উপর আর আমি জুলুম চালাতে চাইনে। তাই এ দায়িত্ব এবার এই হাজী ইলিয়াসকেই দিয়ে গেলাম আমি। তোমরা যে যেখানে আছো এবং যতটুকু পারো, তাঁকেই মদদ দান করবে।

ঃ আমার দ্বারা সে কাজে কসুর কিছুই হবে না জনাব।

ঃ বহুত আচ্ছা। তাহলে এবার মানসিকভাবে তৈয়ার হয়ে যাও। অল্প কয়দিনের মধ্যেই রওনা হবো আমরা।

ঃ আমি তৈয়ার। তবে —

ঃ তবে ?

ঃ আর সবাইকে খবরটা শিগ্‌গির — জানানো দরকার তাহলে ? এ মুলুকে আপনার শিষ্যমুরিদের সংখ্যা তো বড় কম নয়! তাঁরা তো —

কথার মাঝেই তাঁকে থামিয়ে দিলেন সুফী সাহেব। বললেন — খবরদার-খবরদার। ও কাজটি করতে যাবে না কখনও। আমি যেমন চুপ্‌টি করে এ মুলুকে এসেছিলাম, অমনি চুপ্‌টি করেই আমাকে আবার সরে পড়তে হবে। জানাতে গেলে তুমুল কাণ্ড ঘটে যাবে।

ঃ হুজুর —

ঃ এ মুলুক ছেড়ে একেবারেই চলে যাচ্ছি আমি. এ খবরটা প্রচার হয়ে গেলে কি কাণ্ড ঘটে যাবে তা অনুমান করতে পারছো না ? আফসোসে আর আহাজারীতে সবাই এসে এমন অবস্থার সৃষ্টি করবে যে. শেষ পর্যন্ত আমার নিয়াতটাই পণ্ড হওয়ার উপক্রম হবে।

ঃ জনাব।

ঃ এই জন্যেই কথাটা আমি ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবকেও বলিনি। তাঁকে আমি পত্র দিয়েছি কয়দিন আগে। তাতে আমার শারীরিক অবস্থা এমন কিছু খারাপ নয় একথাটা বলেছি আর তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দিতে বলেছি। আমার চলে যাওয়ার কিছু মাত্র আভাষ তাঁকেও আমি দেইনি। এবার বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা ?

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে শরীফ রেজা বললেন–জি হুজুর. পেরেছি।

ঃ আর কোন প্রশ্ন আছে ?

ঃ জিনা।

ঃ দীলটাকে শক্ত করো বেটা। একমাত্র যাকে বলে না গেলে আমার যাবার সাধ্য ছিল না, তাঁকে সঙ্গে নিয়েই তো যাচ্ছি। আর সে ব্যক্তি তুমি। অন্যদের দীলের সান্ত্বনা বিধানের জন্যে আমি পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার কাছে আরজ রেখে যাচ্ছি।

অতপর হাজী ইলিয়াস শাহকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়ে এবং তাঁর কামিয়াবীর জন্যে রহমানুর রহিমের দরবারে আরজ পেশ করে একদিন অতি প্রত্যূষে এ মুলুক থেকে দরবেশ ও সাধক শায়খ শাহ শফীউদ্দীন সাহেব অন্তর্হিত হলেন। একমাত্র তাঁর পথের সাথী ও পরম শিষ্য শরীফ রেজা ছাড়া বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে বা বিদায়কালে আর কেউ জানলো না— ইহজিন্দেগীর মতো বাঙ্গালা মুলুক ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন মশহুর দরবেশ ও দ্বীন ইসলামের জঙ্গী খাদেম হজরত শায়খ শাহ শফীউদ্দীন।

১৪

পানিপথ কর্ণালের উদ্দেশ্যে শায়খ শাহ শফীউদ্দীন সাহেব ও শরীফ রেজা অতি প্রত্যূষে যখন সাতগাঁয়ের ঐ আস্তানা থেকে বেরুলেন, তখন শায়খ সাহেবের মানসিক অবস্থা যে পর্যুদস্ত ছিল, এটা বলার কোন অপেক্ষাই রাখে না। শত স্মৃতি বিজড়িত দীর্ঘদিনের আবাস ছেড়ে চিরদিনের মতো বেরিয়ে আসা নিঃসন্দেহে শক্ত কাজ। কিন্তু অত্যন্ত শক্তদীলের মানুষ এই সাধক শাহ শফীউদ্দীন সাহেব। তাই তাঁর অন্তরের যাতনা উন্মুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো না।

কিন্তু কেঁদেই ফেললেন শরীফ রেজা। আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে পেছন ফিরে তাকাতেই শরীফ রেজার বুকের ভেতর হু হু করে উঠলো। শায়খ হুজুরকে লুকিয়ে তিনি পুনঃ পুনঃ চোখের পানি মুছতে লাগলেন।

শরীফ রেজা এই আস্তানা ছেড়ে জীবনের মতো যাচ্ছেন না। আবার তিনি ফিরে আসবেন এখানে। তাঁর এই কান্না তাই আস্তানার শোকে নয়। তাঁর ব্যথা অন্যরূপ। অনুভূতি তাঁর ভিন্নতর। এই যে তিনি হুজুরের সাথে বের হয়ে যাচ্ছেন আজ, কাল যখন ফিরবেন, তখন তাঁকে ফিরতে হবে একা। হুজুর সাথে থাকবেন না। কাল যখন এই আস্তানায় এসে ঢুকবেন আবার, তখন এ আস্তানা থাকবে শূন্য। ঘরে বাইরে কোথাও হুজুরকে খুঁজে পাবেন না। ওয়ারিশহীন সন্তানবৎ এতিম হয়ে পড়ে থাকবে এই আস্তানা। ঐ একটি মানুষ অভাবে এই আস্তানার অস্তিত্বটা অর্থহীন হয়ে যাবে। ঢনঢন করবে দশদিক। সাতগাঁয়ের এই আস্তানার আকর্ষণ শরীফ রেজার কাছে অতপর মিথ্যা হয়ে যাবে। যা কিছু থাকবে এখানে তার জন্যে, তামামই তা দায়িত্ব। কোন স্বস্তি-তৃপ্তি নয়। পাহারা দিয়ে রাখার কাজে শূন্যনীড়ে নিঃসঙ্গ বাস এক কথা, আর প্রিয়জনের পালকের নীচে নিশ্চিন্তবাস আর এক কথা। সুতরাং. এ আশ্রয়ের মোহও তাঁর ফুরলো।

মোহশূন্য হওয়ার ফলেই লাখনৌতির ঐ পিতৃগৃহের আকর্ষণ তাঁর অনেক আগেই ফুরিয়েছে। সে আশ্রয় তাঁর অনেক আগেই ভেঙ্গেছে। আশ্রয় বা আকর্ষণ তাঁর শেষ অবধি ভুলুয়ার ঐ খান সাহেবের মকানটাই হতে পারতো। কিন্তু কনকলতা সেটুকুও ছারখার করে দিয়েছেন। ভষ্মিভূত করেছেন লেলিহান অগ্নি শিখায়। ফৌজদার সাহেবের সেদিনের সেই আহবানটা যতই হৃদয়স্পর্শী হোক, ফৌজদার সাহেব জানেন না যে, শরীফ রেজার কাছে তাঁর মকান আর আকর্ষণ তো নয়ই কিছু, বরং একটা বদ্ধবায়ুর যন্ত্রণা। জানেন না যে, কনকলতার আগুনে তাঁর মকানের মোহটুকুই শরীফ রেজার পুড়েনি, সে আগুন শরীফ রেজার অন্তরেও এক দগদগে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে অনেকদিন আগে, কিন্তু সেই পোড়া ঘায়ের প্রদাহটা অদ্যাবধি কিছু মাত্র কমেনি।

শরীফ রেজার সামনে এখন অচেনা এক ভূমণ্ডল। পেছনে তাঁর চেনা মণ্ডলে তিনি একদম ছিন্নমূল। হেথা হোথা দু' একটা পান্থশালা থাকলেও পথ অন্তের গন্তব্য তাঁর নেই। ঝড়ের ধাক্কায় হেথা থেকে হোথা গিয়েই পড়ছেন শুধু, শিকড় তাঁর গভীরভাবে গজানো নেই কোথাও। জিন্দেগীর খরস্রোতে তিনি একটা কেবলই ভাসমান পানা। বাল্যকালেই তিনি ছিলেন এ বিশ্বে লা-ওয়ারিশ, আজ আবার তার মনে হলো, এ বিশ্বে ফের তিনি লা-ওয়ারিশই হয়ে গেলেন। অশ্রুসিক্ত চোখ মুছলেন শরীফ রেজা। অপসৃয়মান আস্তানার প্রতি শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি শায়খ হুজুরের পিছে পিছে পথ চলতে লাগলেন।

শায়খ হুজুরের কথাই ঠিক। এ অসুখ তাঁর নিরাময় হবার নয়। পানিপথ কর্ণালে পৌঁছার পর বেশ কিছু দিন কেটে গেল, অবনতি বই শায়খ হুজুরের তবিয়তের উন্নতি কিছু হলো না। এই সুস্থ এই অসুস্থ করে শেষে একটানা অসুস্থতাই আঁকড়ে ধরলো দরবেশ সাহেবকে, সুস্থতার আর লক্ষণ দেখা গেল না।

শরীফ রেজা গিয়ে তখনই ফিরে আসবেন না, কিছু দিন হুজুরের সাথে থেকে হুজুরের একটা সুব্যবস্থা করে দিয়ে তবেই তিনি ফিরে আসবেন—এই ছিল শরীফ রেজার চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু তাঁর চিন্তা-ভাবনা তামামটা টিকলো না। শেষেরটুকু বদলে গেল। অর্থাৎ তাঁর ফিরে আসা আর হলো না। এর পয়লা কারণ হুজুরের তবিয়তের ক্রমবর্ধমান অবনতি, দুস্‌রা কারণ হুজুরের তদবিরের নিদারুণ অব্যবস্থা। এর আগের বারও তিনি এসে দেখেছিলেন, ভাড়াটে কিছু খাদেম ছাড়া আন্তরিকভাবে খেদমত করার লোকের এখানে বড়ই অভাব। পেশাদার খাদেমেরা পয়সা নিয়ে খেদমত করে বেড়ায়। সম্পর্ক এদের পয়সার সাথে দীলের সাথে নয়। অনেক চেষ্টা করেও নির্ভরযোগ্য খাদেম খুঁজে না পাওয়ায়, আর শরীফ রেজার নিজেরও দেশে ফেরার গরজ তেমন না থাকায়, অসুস্থ শায়খ হুজুরের খেদমতেই তিনি রয়ে গেলেন, দেশে ফেরার আগ্রহ প্রকাশ করলেন না।

অনেকদিন হয়ে গেল। বহুত দিন। তা দেখে একদিন শায়খ সাহেবই তুলে বসলেন কথাটা। তাঁর প্রায় শেষ অবস্থা তখন। শরীফ রেজাকে শয্যার পাশে ডেকে তিনি বললেন—শরীফ, একান্ত নিরুপায় হয়েই এ যাবত আমি চুপচাপ ছিলাম। তুমিও কোন উৎসাহ প্রকাশ না করায় আমিও কথাটা তুলিনি। কিন্তু এখন ভেবে দেখছি, আমি স্রেফ গুনাহ্‌র বোঝাই বাড়াচ্ছি।

জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে শরীফ রেজা বললেন—কি কথা হুজুর ?

ঃ নিজের স্বার্থে তোমাকে এভাবে আটকিয়ে রাখা ঠিক হচ্ছে না আমার।

ঃ আটকিয়ে রাখলেন আপনি! কৈ, নাতো হুজুর ? আমি তো নিজের ইচ্ছেতেই রয়ে গেছি।

ঃ তা থাকাও ঠিক হয়নি তোমার।

ঃ হুজুর!

ঃ ওদিকে অনেক প্রয়োজন আছে তোমার। অনেকের অনেক প্রয়োজন। তুমি ওদিকে থাকলে অনেক কাজে লাগতে পারতে। আমাকে এভাবে আগলে নিয়ে থাকা আর উচিত হবে না তোমার। তোমার দেশে ফেরা উচিত।

ঃ আমাকে কি আজাদীর কাজে মেহনত দিতে বলছেন হুজুর ?

ঃ এ্যাঁ!

ঃ আপনি যদি হুকুম করেন, তাহলে আমাকে যেতেই হবে আলবত। নইলে আমি কিন্তু ভালই ছিলাম এখানে।

শায়খ সাহেব শশব্যস্তে বললেন — না-না, আজাদীর কাজের জন্যেই তোমাকে দেশে ফিরতে হবে, একথা আর আমি তোমাকে বলছিনে বা বলবো না। অনেক করেছো তুমি। এখন অন্যেরা কিছু করুক।

ঃ হুজুর!

ঃ বলছি, দেশে থাকলে মাঝে মধ্যে মদদ দিতে পারতে কিছুটা, এই কথা। নইলে আমি আর চাইনে, জিন্দেগী তোমার ঐ কাজেই খতম হয়ে যাক।

শরীফ রেজা ক্লিষ্ট হাসি হাসলেন। তারপর তিনি বললেন — দেশে থাকলে ঐ কাজ ছাড়া আমার আর কাজই বা কি আছে হুজুর যে, তাই নিয়ে থাকবো!

শায়খ সাহেবের পাণ্ডুর মুখে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি বললেন—কেন, ঘর সংসার নিয়ে থাকবে। দেশে ফিরে গিয়ে যদি জরুরত হয়, অর্থাৎ তোমার মদদ দেয়া একান্তই যদি প্রয়োজন হয় কখনও, জেহাদের কাজে অবশ্যই শরিক হবে। কিন্তু তারপর আর তোমাকে আমি ওভাবে দেখতে চাইবো না। ঘর সংসার নিয়ে সুখে শান্তিতে আছো তুমি, এইটেই আমার অধিক কাম্য এখন। সংসার জীবনে তুমি এখন প্রতিষ্ঠিত হলে, তোমার জিন্দেগী আমি বিরাণ করে দিয়েছি বলে পরকালে আর আমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

ঃ হুজুর —

ঃ আমার বরং এখন নির্দেশই রইলো তোমার উপর — তোমার এখন বড় কাজ হবে ঘর সংসার করা। লড়াই করাটা হবে স্রেফ প্রাসঙ্গিক ব্যাপার। নেহাতই জরুরত মনে করলে করবে, নইলে নয়। গুনাহ্ মুক্তির কথা যদি বাদও দেই, আমার মানসিক তৃপ্তির জন্যেও এটা আমি তোমার কাছে চাই।

আবার শরীফ রেজা ম্লান হাসি হাসলেন। এরপর নতমস্তকে বললেন — সংসার আমার কোথায় হুজুর যে, দেশে গিয়ে সংসারী হবো আমি ? সংসার তো আমার সংসার জীবনের সুবেহ্ সাদিকের ওয়াক্তেই চুরমার হয়ে গেছে!

ঃ শরীফ!

ঃ সংসারী হতে গিয়ে সেবার ভূদেব নৃপতির প্রাসাদে যে এলেম পেয়েছি আমি, তাতো হুজুরের অজানা নয়। এরপর আর—

তাঁকে বাধা দিয়ে শায়খ সাহেব বললেন—কিছু না, কিছু না। আমাদের এ জিন্দেগীতে কোন কিছুই নিরর্থক নয়। সবকিছুরই অর্থ আছে।

ঃ জনাব!

ঃ এ ঘটনা ঘটেছিল বলেই তো দ্বীন আর দেশের জন্যে এতটা করতে পেরেছো তুমি। অক্লান্ত শ্রম দিয়ে এত সওয়াব হাসিল করতে পেরেছো। ব্যস্! এবার নিশ্চিন্তে ঘর সংসার করে ঐ সওয়াবগুলো মজবুত করে নাও। নিতান্তই প্রয়োজনে ছাড়া, হেলায় যে এই দুর্লভ জনমটা মিথ্যা করে দেয়, তার কোন সওয়াবই কায়েমী হয় না শেষ পর্যন্ত।

ঃ কিন্তু হুজুর, নতুন করে সংসার পাতার—

ঃ নতুন করে পাতবে কেন ? ঐ বেটিকে নিয়েই তো সংসার করবে তুমি।

ঃ মানে ?

ঃ ঐ লতা, ঐ লতিফা বানুকেই তালাশ করে নেবে। মাননৃপতির ঐ বেটিই ঘর করবে তোমার।

শরীফ রেজা উদাস কণ্ঠে বললেন — এটা আবার কেমন কথা হুজুর ? তাকে আমি পাবো কোথায় যে, সে এসে ঘর করবে আমার ? তার কোন ঠাঁই ঠিকানাই পাওয়া যায়নি সেই থেকে —

ঃ পাবে-পাবে, শক্ত নিয়াতে তালাশ করলেই পাবে। বাঙ্গালা মুলুকে দেখেছে যখন লোকজন ওদের, তখন ও বেটি জরুর এই বাঙ্গালা মুলুকেই আছে। দেশে ফিরে গিয়ে তুমি অনুসন্ধান করো, আমি দোয়া করছি, আল্লাহ চাহে তো তাকে তুমি পাবেই।

ঃ জনাব!

ঃ বেটিটার এতদিনে ঢের আক্কেল হয়েছে। তোমাকে পেলে নিশ্চয়ই বেটি এবার বর্তে যাবে! তোমাকে নিয়ে ভাবতে গেলেই আমার যে কেবল মনে হয় ঐ বেটিকে নিয়ে তুমি সুখ শান্তিতে আছো।

ঃ হুজুর!

ঃ জিন্দেগী তোমার সুখ শান্তিতে ভরে উঠুক, আমি এই প্রার্থনাই তোমার জন্যে করছি।

ঃ সুখ শান্তি!

ঃ নামই যে তার রহমানুর রহিম। আমি তোমার জন্যে তাঁর দরবারে খাস দীলে আরজ পেশ করছি। তাঁর নামের অছিলায় নিশ্চয়ই তিনি আরজ আমার মঞ্জুর করবেন।

ঃ কিন্তু হুজুর —

ঃ আর কিন্তু নেই। হুকুম তোমায় করবো না। তবে এজাযত তোমায় দিয়ে রাখলাম, মন চাইলে যে কোন সময় তুমি স্বমুলুকে ওয়াপস্ চলে যাবে। কোন সংকোচবোধ করবে না।

ঃ জনাব!

ঃ ভাড়া করা লোকের উপর আর সবাই যদি নির্ভর করে থাকতে পারে, আমি কেন পারবো না? নিজের লোক কয়জনের সাথে আছে এখানে বলো ?

শরীফ রেজা করুণকণ্ঠে বললেন — আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন হুজুর ?

চমকে উঠলেন দরবেশ শাহ শফী সাহেব। তিনি ব্যতিব্যস্তভাবে বললেন — তওবা! তওবা! থাকো, তোমার যতদিন খুশী আমার পাশে থাকো। তোমার তকলিফ হচ্ছে বোধেই আমার বলা। আর আমি যেতে তোমাকে বলবো না।

ঃ হুজুর!

ঃ থাকো বেটা। তুমি আমার পাশে থাকলে তো আমার মনেই হয় না, আমি অসুস্থ বা আমার কোন তকলিফ আছে।

আসলেই শরীফ রেজার যাওয়ার আগ্রহ ছিল না। আগ্রহ নয়, বরং বলা যায়, যাবার সাহসই তার ছিল না। শায়খ সাহেবের এতটা প্রবোধ-উৎসাহের পরও, ঐ আকর্ষণহীন ভূমণ্ডলে ফিরে যাবার প্রসঙ্গটা মনে এলেই মনটা কেমন বিষণ্ন হয়ে উঠে। তিনি নেতিয়ে পড়েন হতাশায়। কনকলতার আশা-ভরসা নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার পর যে কয়দিন লড়াই নিয়ে কেটেছে সে কয়দিন তার ভাল গেছে। কিন্তু অবসর সময় এলেই তিনি কুঁকড়ে গেছেন আতংকে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে। কি করবেন তিনি এখন, কি নিয়ে কাটবে তাঁর সময়, এই চিন্তায় তিনি তখন আকুল হয়ে উঠেছেন। ওদিকে আবার বাঙ্গালা মুলুককে আজাদ করার লড়াইয়েও শরীফ রেজা এখন এক তালকানা আর দল ছুট এক সেপাই। মূল প্রবাহ থেকে তিনি ছিটকে পড়েছেন এক পাশে। আজাদীর প্রক্রিয়া এখন নিজ গতিতেই ছুটছে। এলোমেলো হলেও জোরদারভাবে ছুটছে। আজাদীর আর তাঁর কাছে প্রত্যাশা অধিক নেই। সে প্রক্রিয়া চালু করার এতিম ঐ ওয়াক্ত আর নেই। সে মুহূর্ত উৎরে গেছে। অতএব, শরীফ রেজার ছুটি।

এখানেই তিনি বেশ আছেন। যেকের আয্কারে মুখর এই পারত্রিক পরিবেশই তাঁকে বরং ভুলিয়ে রেখেছে অধিক। ফলে, শরীফ রেজা নড়লেন না। পেন্থনটাকে পেছনেই ফেলে রেখে তিনি তাঁর শায়খ হুজুরের সাথে এই ভিন্ মুলুকেই রয়ে গেলেন।

কিন্তু তাঁর শায়খ হুজুরও একদিন তাঁকে এই ভিন্ মুলুকে একা ফেলে ভিন্ জগতে চলে গেলেন। প্রাণপাত করেও শরীফ রেজা তাঁর প্রিয় হুজুরকে ধরে রাখতে পারলেন না। অক্লান্ত খেদমতসহ দাওয়াই-পথ্য-হেকিম এনে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু ফল কিছুই হলো না। ইহদুনিয়ার লেনা-দেনা চুকিয়ে দিয়ে দ্বীন-কওমের একনিষ্ঠ খাদেম, তৌহিদের অদম্য সৈনিক মহৎপ্রাণ দরবেশ শায়খ শাহ শফীউদ্দীন সাহেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ডুকরে উঠলেন শরীফ রেজা। কিয়ৎকাল তিনি অজ্ঞান হয়েই পড়ে রইলেন। অতপর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হুজুরের দাফন কাজ শেষ করলেন এবং দাফন অন্তে হুজুরের রূহের মাগ্‌ফেরাত কামনায় হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন। ক্ষুৎপিপাসা ভুলে ঐ ভাবেই কয়েকদিন কাটিয়ে দিলেন শরীফ রেজা।

এরপর আরো কিছুদিন তাঁর আহাজারী আর আফসোসের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। সবশেষে অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে শরীফ রেজা যখন নিজের কথা ভাবতে বসলেন, তখন দেখলেন, আর তিনি এতিম নন। এতিম হওয়ারও পর্যায় আছে একটা। এখন তিনি সে পর্যায়ও পেরিয়ে গেছেন। এখন তিনি স্বাধীন। দায়-দায়িত্বহীন একেবারেই স্বাধীন। যা ইচ্ছে করার, যেখানে ইচ্ছে থাকার পূর্ণ এক্তিয়ার এখন তাঁর নিজের মুঠোয়। উপদেশ কিছু নেবার, উপদেশ কিছু দেবার, মায় সামনে পেছনে ডাকার মতোও কেউ আর তাঁর ইহদুনিয়ায় নেই। ভেজ্ মওলা! এমন স্বাধীন জিন্দেগী লাখে একজন পায় না। তিনি স্থির করলেন, আর এক কদমও তুলবেন না, আর কোথাও যাবেন না। এখানেই তিনি পড়ে থেকে ইবাদত বন্দেগী করে জিন্দেগী তাঁর কাটিয়ে দেবেন। দরবেশের খাদেম দরবেশ হবেন, তাঁর আবার ঘর সংসার কি ? তিনি ভুলে গেলেন শায়খ হুজুরের উপদেশ। ঐ পানিপথ কর্ণালেই তিনি শায়খ হুজুরের ছাউনিটা মেরামত করে নিলেন। অতপর হুজুরের গোর জিয়ারত করে আর হাজেরান দরবেশদের মজলিসে হাজিরা দিয়ে দিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

এরপরও কেটে গেল অনেকদিন। শায়খ হুজুরের মৃত্যুর খবরও একদিন গিয়ে বাঙ্গালা মুলুকে পৌছলো। ভক্তেরা ও শিষ্যেরা এ নিয়ে অনেক শোখ দুঃখ করে তাঁরাও অবশেষে শান্ত হয়ে এলেন। হুজুরের মৃত্যুর পরও শরীফ রেজার নিরুদ্দেশ থাকার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন-তর্কের ঝড়ও একদিন শিথিল হয়ে এলো।

বাঙ্গালা মুলুকের স্মৃতি নিয়ে শরীফ রেজার অন্তরের ক্ষীণতর আকুতিটাও দিন দিন ক্ষীণতম হয়ে আসতে লাগলো। দিন কেটে চললো।

দিন হয়তো কেটেই যেতো এভাবে। শরীফ রেজা হয়তো ঐ দরবেশ জীবনই শেষ পর্যন্ত রপ্ত করে ফেলতেন। কিন্তু হঠাৎ এক ভিন্নতর ধাক্কা এসে লাগায় শরীফ রেজার মনের গতি ভিন্ন দিকে মোড় নিলো।

ধাক্কা দিলেন বাঙ্গালা মুলুকের ইনসান আলী সাহেব। বাঙ্গালা মুলুকের মুষ্টিমেয় যে কয়টি লোক শরীফ রেজার স্মৃতিটা কোন মতেই বিস্মৃত হতে পারেননি, আহারে-বিহারে-শয়নে-স্বপনে শরীফ রেজার স্মৃতিটা যাদের দীলে ঘা দিয়েছে বার বার, ইনসান আলী সাহেব তাঁদেরই একজন। পয়লা জন কনকলতা হলেও ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব আর ইনসান আলী কোন মতেই দ্বিতীয়জন ছিলেন না। কনকলতা আউরাত, ফৌজদার সাহেব রোগ শয্যায়। হদিস করার লোক বলতে একমাত্র ইনসান আলী যার জিন্দেগী গেল আনুগত্যের পালা বদল করতে করতে আর নিত্য নতুন মালিকের ধক্কল সামাল দিতে দিতে। শ্বাসরুদ্ধকর ব্যস্ততার বেড়াজালের মধ্যে ইনসান আলী সাহেব আটক আছেন এখনও। কিন্তু পরিস্থিতির আকস্মিকতায় এর মধ্যেই ইনসান আলীকে শরীফ রেজার হদিস করতে হলো। নিজে নড়তে না পেরে পানিপথ কর্ণালে লোক পাঠালেন তিনি। লোকের হাতে পত্রও দিলেন একখানা। যেখান থেকেই হোক আর যত দিনেই হোক, শুধু পত্র দিয়েই আসবে না, শরীফ রেজার তালাশ করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তবে বাঙ্গালা মুলুকে ফেরত আসবে প্রেরিত লোক, এই ওয়াদায় আবদ্ধ করে নিয়ে লোক পাঠালেন ইনসান আলী সাহেব।

পানিপথ কর্ণালে এসে প্রেরিত লোককে বেগ পেতে হলো না। সে অল্প তালাশেই সাক্ষাৎ পেলো শরীফ রেজার। শরীফ রেজাকে চমকিয়ে দিয়ে সাক্ষাৎ পেয়েই বার্তাবাহক ইনসান আলীর খতখানা শরীফ রেজার হাতে দিলো। খত নিয়েই শরীফ রেজা পড়তে লাগলেন ওখানেই। ইনসান আলী সাহেব লিখেছেন —

উস্তাদ,

বাদ তস্‌লীম জানাই, মানুষের নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা আছে। আপনি বোধ হয় সে সীমানাটাও পেরিয়ে গেছেন। তা না হলে আমাদের কথা কেমন করে আপনি এমন বেমালুম ভুলে গেলেন, তা চিন্তে করে পাচ্ছিনে। এ নির্মমতার নজীর নেই।

যাক সে কথা। যে জন্যে লোক পাঠালাম আপনার কাছে তাই আগে বলি। সে কথাটা আজ আপনার বুকে তেমন বাজবে কিনা জানিনে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন আপনি সে কথায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। আর সেই নিদারুণ কথাটা হলো—আমাদের একান্ত প্রিয়জন সেই সদাশয় ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব আর ইহজগতে নেই। তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিজের রোগ যাতনা ভুলে স্রেফ আপনার জন্যেই একটানা আহাজারী করে গেছেন এবং তাঁর বিষয় বিত্তের অর্ধেকটা আপনাকেই দিয়ে গেছেন। কয়টা দিন আগেও যদি আসতেন আপনি এখানে, তাহলে তিনি আপনাকে একনজর দেখে যেতে পারতেন!

আমি অন্য কিছু বলবো না। আপনার উচিত হবে অন্ততঃ একটাবার এসে তাঁর গোর জেয়ারত করে যাওয়া। আপনার হাতে এক মুঠা মাটি পাওয়ার তীব্র এক আকাঙ্খা তিনি প্রকাশ করে গেছেন।

আমার বিশ্বাস, আপনি আসবেন। আর আপনার এই আসার পথটা সুগম করার জন্যে এই দুঃখের মধ্যেই একথাটাও বলি যে, কনকলতা বহিন তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন। ফরিদা আপার শাদির খবর পেয়েই সে ভুলটা তাঁর ভেঙ্গেছে। আপনার ধারণাই ঠিক। আপনার গলায় ফরিদা আপার মালা পরিয়ে দেয়া দেখেই তাঁর ঐ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আপনার কৈশোরকালের শাদির কথাটা যদি গোপন করে যেতাম আমি, তাহলে বোধ হয় নিজেই তিনি এতদিন ঐ পানিপথ কর্ণালেই আপনার কাছে ছুটে যেতেন। কিন্তু আমি সে কথা বলে ফেলায় আবার তিনি একদম দমে গেছেন। তবু তিনি আপনার প্রতি আর নারাজ নন। বরং তাঁর বিগত আচরণের কারণে আপনার ক্ষমা পাওয়ার জন্যেই তিনি এখন মজবুর।

কাজেই আপনি আসুন। অন্ততঃ খান সাহেবের আকাঙ্খার মর্যাদা রক্ষার জন্যেই আপনি একবার আসুন। ইতি।

খাদেম,
ইনসান আলী।

শরীফ রেজার অবশ হাত থেকে পত্রখানা খসে পড়লো। প্রস্তর মূর্তির মতো তিনি ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল হয়ে। শুধু দুই নয়নের অবিরল ধারায় তাঁর বুকের বসন সিক্ত হতে লাগলো।

খান সাহেব আর নেই। শরীফ রেজার হাতের এক মুঠো মাটি পাওয়ার দুর্বার আকাঙ্খা ছিল নিঃসন্তান খান সাহেবের। কয়টা দিন আগে গেলেও দেখা

পেতেন তিনি তাঁর। স্বমুলুকে ফিরে যাওয়ার তাকিদও ছিল শায়খ হুজুরের। নির্দেশও তাঁর ছিল স্বমুলুকে ফিরে গিয়ে ঘর সংসার করার। ইচ্ছে করলে, আর না হোক একটা বার যেতেও তিনি পারতেন! অথচ —

শরীফ রেজার চোখের সামনে দুনিয়াটা তামামই বন বন করে ঘুরতে লাগলো। অন্তিমকালে কাছে না পেয়েও স্নেহের ঐশর্যেই যে হৃদয়বান নিজের বিষয় বিত্ত শরীফ রেজাকে দিয়ে যান, তাঁর কবর জেয়ারত করাটা যে শরীফ রেজার উচিত, অন্য একজন সে কথা আজ অনুরোধ করে শরীফ রেজাকে বোঝাচ্ছেন। পরিস্থিতি কি নির্মম রূপ নিয়েছে!

নিজের মাথার চুল নিজেই টেনে ছিঁড়তে গেলেন শরীফ রেজা। পত্রখানা কুড়িয়ে নিয়ে পত্রবাহক বললো — হুজুর —

অর্ধচৈতন্যে ফিরে এসে শরীফ রেজা বললেন — এঁ্যা!

পত্রবাহক বললো — আপনি যাবেন হুজুর ?

ঃ কোথায় ?

ঃ ভুলুয়ায়!

ঃ ভুলুয়ায় ?

ঃ জি হুজুর। ইনসান আলী হুজুর বিশেষভাবে বলেছেন।

ঃ ইনসান আলী বলেছেন ?

ঃ জি। আপনাকে না নিয়ে আমার ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। আপনি যাবেন তো হুজুর ?

শরীফ রেজার ঠোঁট দু'টি বিপুল বেগে কেঁপে উঠলো। তিনি অতি কষ্টে বললেন — যাবো, জরুর যাবো — এরপরও আর —

উদগত কান্নার বেগ রোধ করতে না পেরে শরীফ রেজা ছিট্‌কে এক পাশে সরে গেলেন এবং দুই হাতে মুখমণ্ডল চেপে ধরে সশব্দে ফুঁপিয়ে উঠলেন।

খানিক পরেই ছুটতে লাগলো অশ্ব। পাশা পাশি দুই অশ্ব। পানিপথ কর্ণাল থেকে বেরিয়ে শরীফ রেজা ও বার্তাবাহক — এই দুই জনের দুই অশ্ব বাঙ্গালা মুলুকের উদ্দেশ্যে দুরন্ত বেগে ছুটতে লাগলো। একটানা ছুটে এসে লাখ্‌নৌতিকে বাঁয়ে ফেলে দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেল অশ্ব দু'টি এবং সেখান থেকে ছুটে সরাসরি সাতগাঁয়ে চলে এলো।

দীর্ঘদিন অন্তর শায়খ হুজুরের সাতগাঁয়ের সেই আস্তানায় এসে শরীফ রেজা অশ্ব থেকে নামলেন। আস্তানার সেই চেহারা আর নেই। আস্তানার কোল ঘেঁষে ইতিমধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে সেনাবাহিনীর এক দুর্গ। আস্তানাটি তার পাশে পরিবর্তিত রূপ নিয়ে হতাশ দীলে ধুঁকছে। বিলকুল বদলে গেছে চেহারা তার। আধ্যাত্মিক আবহাওয়া ফিঁকে হয়ে গেছে। সামরিক তৎপরতার আধিক্যে পালটে গেছে পরিবেশ।

আস্তানারই নয় শুধু, এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে পাল্টে গেছে গোটা বাঙ্গালার পরিস্থিতি। শরীফ রেজার সুদীর্ঘ পরবাসের মধ্যে ব্যাপকভাবে বদলে গেছে গোটা দেশের দৃশ্যপট, উল্টে গেছে ইতিহাস। সাতগাঁ, সোনার গাঁ, লাখ্‌নৌতি, ভুলুয়া — সর্বত্রই আধিপত্যের, শাসনের ও সম্প্রীতির বিপুল এক পরিবর্তন এসেছে। হারিয়ে গেছে মানুষ, বদলে গেছে রাজা, বেড়ে গেছে রাজ্য, সরে গেছে রাজধানী। এক এক স্থানের একপ্রকার এক একটা কাহিনী।

সাতগাঁও এখন আর এক স্বাধীন মুলুক। আর একটা স্বাধীন রাজ্য। সোনার গাঁ ও লাখ্‌নৌতি রাজ্যের মতোই এখন সাতগাঁয়েও নয়া আর এক স্বাধীন পতাকা উড়ছে। উড়িয়েছেন সাতগাঁয়ের স্বাধীন সুলতান হাজী শাম্‌সুউদ্দীন ইলিয়াস শাহ।

দরবেশ শাহ শফীউদ্দীনের কাছেই হাজী ইলিয়াস দরবেশের এই আস্তানাকে তাঁর সামরিক তৎপরতার ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি লাভ করেন। আস্তানার লোক লস্কর সহকারে লাখ্‌নৌতির ঐ সংগঠনটাকে কাজে লাগানোর এজাযতও বিদায়ের আগে শরীফ রেজা সাগ্রহেই হাজী ইলিয়াসকে দিয়ে যান। ফলে, শায়খ হুজুর আর শরীফ রেজা সাতগাঁ থেকে বিদায় নেয়ার অল্পকাল পরেই তৎপরতা শুরু করেন হাজী ইলিয়াস। আস্তানার লোক লস্করদের একত্র করে নিয়ে হাজী ইলিয়াস সর্বপ্রথম এখানেই একটা স্বাধীন সৈন্যদলের নেতৃত্বে আসেন এবং নিরলস তালিম দিয়ে এই ছোট্ট বাহিনীটাকে সুশৃঙ্খল ও মজবুত করে তোলেন।

সাতগাঁয়ের মসনদটা অনেক আগে থেকেই ফাঁকা ছিল। শাহ ফখরউদ্দীনের সাথে সোনার গাঁয়ের লড়াইয়ে সাতগাঁয়ের শাসনকর্তা আজম মালিক ওরফে ঈজউদ্দীন ইয়াহিয়া নিহত হওয়ার পর থেকেই ফাঁকা ছিল সাতগাঁয়ের এই তখ্‌ত্‌। দিল্লীর সুলতান অতপর আর কাউকেই সাতগাঁয়ের শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ দান করেননি। অন্য কথায়, রাজধানীর সমস্যাদি সামাল দিতে ব্যস্ত থাকায়, দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ-বিন-তুঘলক লাখ্‌নৌতির মতোই সাতগাঁয়ের শাসনকর্তা হিসাবেও আর কাউকে নিয়োগ দানের ফুরসুত করতে পারেননি। স্থানীয় আমীর-উমরাহ আর সেপাই-সালার মিলে সাতগাঁয়ের শাসনকার্য সেই থেকে এ যাবততক কোন মতে নির্বাহ করে আসতে থাকেন। লাখ্‌নৌতির সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ এক সময় সাতগাঁ দখল করার ইরাদা গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তৎপূর্বেই সোনার গাঁয়ে অভিযান চালাতে গিয়ে তিনি সোনার গাঁয়ের সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহর সাথে পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং সাতগাঁ জয়ের চিন্তা ভাবনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

আলাউদ্দীন আলী শাহ আর ফখরউদ্দীন মুবারক শাহের ঐ পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন হাজী ইলিয়াস। সাতগাঁয়ের প্রশাসন একেবারেই শক্তিহীন বুঝে হাজী ইলিয়াস লাখ্‌নৌতিতে অবস্থিত বরকতুল্লাহ সাহেবদের তড়িৎবেগে এসে তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেন। নির্দেশ পেয়েই লাখ্‌নৌতির ঐ জঙ্গী সংগঠন সহকারে হাজী সাহেবের প্রতি অনুরক্ত লাখ্‌নৌতির ফৌজের বিপুল এক অংশ নিয়ে বরকতুল্লাহ সাহেবেরা লাখ্‌নৌতি ত্যাগ করে সাতগাঁয়ে চলে আসেন এবং শায়খ হুজুরের এই আস্তানায় এসে সমবেত হন। সকলেই এসে হাজির হলে হাজী ইলিয়াস এই আস্তানাকেই স্বাধীন এলাকা ঘোষণা দিয়ে ওখানেই তাঁরা সংগঠিত হন এবং নিরাপত্তা জোরদার করার নিমিত্তে আস্তানার পাশেই এই দুর্গটি নির্মাণ করতে থাকেন। সাতগাঁয়ের প্রশাসন এ সংবাদ পেয়ে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। প্রথমে উপেক্ষা করে এবং পরে হাজী ইলিয়াসের শক্তি দেখে ভয় পেয়ে সাতগাঁয়ের দুর্বল ঐ প্রশাসন হাজী ইলিয়াসের বিরুদ্ধে আদৌ কোন পদক্ষেপ নিতে আসে না।

হাজী ইলিয়াস শাহও তাঁর তৎপরতা কিছুদিন ঐ আস্তানার এলাকাতেই সীমাবদ্ধ রাখেন এবং সৈন্যদলকে শক্তিশালী করতে থাকেন। এরপর লাখ্‌নৌতি ও সোনার গাঁয়ের মধ্যে ঐ ঘন ঘন হামলা ও পাল্টা হামলা চলার সুযোগে হাজী ইলিয়াস সাতগাঁ আক্রমণ করেন এবং অনায়াসেই সাতগাঁয়ের প্রশাসনকে পরাভূত করেন। পরাজিত হওয়া মাত্রই নিরুপায় ঐ প্রশাসন হাজী ইলিয়াসের কাছে আত্মসমর্পণ করে ও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে। এভাবে সহজেই সাতগাঁ অধিকার করার পর হাজী ইলিয়াস শাম্‌স্‌ উদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম ধারণ করে সাতগাঁয়ের তখ্‌তে উঠে বসেন।

হাজী ইলিয়াস সেই থেকে সাতগাঁ নিয়েই আছেন। সঙ্গে সঙ্গে লাখ্‌নৌতি জয়ে বেরোননি। উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয়ের আগে লাখ্‌নৌতির মতো একটা বড় শক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হওয়া তিনি সমীচিন বোধ করেননি। তাই সাতগাঁয়ে বসে বসে তিনি এযাবত শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন। এক্ষণে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে হাজী ইলিয়াস যখন লাখ্‌নৌতি জয়ে অগ্রসর হতে যাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই সাতগাঁয়ে এসে হাজির হলেন শরীফ রেজা।

লাখ্‌নৌতিরও পরিবেশ পালটে গেছে ইতিমধ্যে। লাখ্‌নৌতি শহরটি নদীর তীরে অবস্থিত। সোনার গাঁয়ের সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ নৌযুদ্ধে শক্তিশালী হওয়ায় তিনি প্রতিবছর বর্ষাকালে নদীপথে এসে লাখ্‌নৌতিতে হামলা চালাতে থাকেন। এই কারণেই অধিকতর নিরাপত্তার খাতিরে সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ রাজধানীটাকে লাখ্‌নৌতি বা গৌড় থেকে সরিয়ে

খানিক দূরে ফিরুযাবাদ বা পাণ্ডুয়াতে নিয়ে গেছেন। পাণ্ডুয়া এখন লাখ্‌নৌতি রাজ্যের রাজধানী। এতে করে লাখ্‌নৌতি বা গৌড় শহর এখন বিরাণ হয়ে গেছে। শরীফ রেজার মকানটিও রাজধানী থেকে ফাঁকে পড়ে গেছে।

সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ এখন রণক্লান্ত। খরা মওসুমে সোনারগাঁয়ে হামলা চালিয়ে চালিয়ে এবং বর্ষা মওসুমে সোনার গাঁয়ের হামলা ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে আলী শাহ এখন পরিশ্রান্ত। কাউকেই কেউ কব্‌জা করতে না পেরে আলাউদ্দীন আলী শাহ এখন জেহাদ-জঙ্গ বাদ দিয়ে সাধক মখদুম জালালউদ্দীন তাব্রিজীর সেই দরগা নির্মাণে মনোনিবেশ করেছেন। সাধক মখদুম জালালউদ্দীন তাব্রিজী নাকি স্বপ্নযোগে আলী শাহকে সেই নির্দিষ্ট স্থানে দরগা নির্মাণের কথাটা ক্রুদ্ধ হয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাই এক্ষণে খবর, সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ এখন ঐ দরগা নির্মাণ সহ অন্যান্য নির্মাণ কাজে মনোনিবেশ করেছেন এবং রণের আনযাম আপাততঃ স্থগিত করে রেখেছেন।

সাতগাঁ ও লাখ্‌নৌতির কথা মামুলী। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে সোনার গাঁয়ে। সোনার গাঁয়ের ইতিহাসটা পুরোপুরিই পাল্টে গেছে। এক্ষণে সোনার গাঁয়ের সুলতান ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ নামক এক ব্যক্তি। ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ নন। ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ ইন্তেকাল করেছেন। তারও আগে নিহত হয় তাঁর একমাত্র পুত্র। সুলতানের বিশ্বাস অর্জন করে শয়দা নামের এক দুর্বৃত্ত কিছু কর্তৃত্ব হাতে পায়। সেই কর্তৃত্বের বলে সুলতানের অনুপস্থিতিতে সে মসনদ দখলের খাহেশে রাজধানী আক্রমণ করে ও শাহ জাদাকে হত্যা করে। শাহজাদাকে বাঁচাতে এসে একই সাথে নিহত হলেন পরিবারের অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি ও শাহ ফখরউদ্দীন সাহেবের একান্ত শুভাকাঙ্খী আদিল খাঁ আফগান। সংবাদ পেয়ে উন্মাদের মতো ছুটে এলেন সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ। কিন্তু তার আগেই বিক্ষুব্ধ জনতা শয়দাকে ঘেরাও করে হত্যা করে।

এরপর পুত্রহীন সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ পালকপুত্র গ্রহণ করেন। ফখরউদ্দীনের মুনিব তাতার খান ওরফে বাহরাম খান দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের পালকপুত্র ছিলেন। এই দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে পুত্রহীন সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী নামক এক ব্যক্তিকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং চাটিগাঁ অঞ্চল জামাই ও সোনার গাঁ অঞ্চল ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহর মধ্যে ভাগ করে দেন। এ ছাড়াও তাঁর মৃত্যুর পর ঐ গাজী শাহকেই সোনার গাঁয়ের মসনদের উত্তরাধিকার নির্ণয় করে যান। এতে জামাতা জাফর আলী খান নাখোশ হন এবং সুলতানের ইন্তেকালের পর পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভাসদদের সমর্থনে গাজী শাহ মসনদে উঠে বসলে, জাফর

আলী খান গোস্বা হয়ে চাটিগাঁয়ে চলে যান। চাটিগাঁয়ের ও চাটিগাঁয়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের স্বাধীন শাসক হিসাবে জাফর আলী খান এখন ঐ চাটিগাঁয়েই আছেন। সুলতান কন্যা ফরিদা বানুও পিতার এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে স্বামীর সাথে ঐ চাটিগাঁয়েই রয়েছেন, পিতার প্রাসাদের সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখেননি।

ফাঁপড়ে পড়ে গেছে লাল মোহাম্মদ লাড্ডু মিয়া। যাঁদের প্রেমে পড়ে জানের ঝুঁকি নিয়ে সে এযাবত গোয়েন্দার কাজ করেছে, আজ তাঁরা কেউ নেই। বাঙ্গালা মুলুকের আজাদী হাসিলের সেই দুর্বার নেশাও আজ ফিকে হয়ে গেছে। আজাদী হাসিলের সেই একক লক্ষ্য আর পরিকল্পনা আজ শতধা বিভক্ত। পেটের দায়ে ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহর নকরী করার গরজ এবং ইচ্ছে কোনটাই লাড্ডু মিয়ার নেই। ফলে, লাড্ডু মিয়া এখন নিজ মকানে ফিরে সংসারী হওয়ার কোশেশ করছে।

ফৌজদার সাহেবের মকানেও আরো ঘটনা ঘটেছে। সেখানে শুধু ফৌজদার সাহেবই ইন্তেকাল করেননি, পদ্মরাণীর পিতা হরিচরণ দেবও মৃত্যু বরণ করেছেন। পদ্মরাণীকে নিয়ে কনকলতা এখন অন্য রকম চিন্তা-ভাবনা করছেন। ফৌজদার সাহেবের গোটা মকানের খবরদারী আপাততঃ ইনসান আলী সাহেবের ঘাড়ে এসেই পড়েছে। মাঝে মাঝেই তাঁকে সেখানে গিয়ে জটিল জটিল সমস্যাদির সমাধান করে আসতে হচ্ছে। হরিচরণ দেবের মৃত্যু পর হারিস উদ্দীন ও নূরী ওরফে নূর বানু নামের এক তরুণ গ্রাম্য দম্পতিকে এনে ইনসান আলী সাহেব কনকলতার মকানে তুলে দিয়েছেন। এরাই এখন কনকলতাদের দেখাশুনা করে ও হুকুম আদেশ খাটে। এরা গ্রামের সেই দুই বালক বালিকা বরবধু যাদের বিয়ের গোলমালে ইনসান আলী হঠাৎ গিয়ে হাজির হন এবং তাদের বিয়ে পোক্ত করে দেন। আজ এরা তরুণ তরুণী। ইনসান আলীর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার সূত্র ধরেই তারা আজ ইনসান আলীর অশেষ প্রীতি অর্জন করেছে। এরা কনকলতা ও পদ্মরাণীকে জ্যেষ্ঠা ভগ্নিবৎ শ্রদ্ধা করে ও সানন্দে তাঁদের ফায়-ফরমায়েশ্ খাটে।

গোটা বাঙ্গালার এই কিসিমের পরিস্থিতি সামনে নিয়ে দীর্ঘদিন অন্তর সাতগাঁয়ে হাজির হলেন শরীফ রেজা। আস্তানায় এসে অশ্ব থেকে নামতেই পরিচিত লোকজনেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে এলো এবং হুজুরের শোকে তাঁকে ঘিরে আহাজারী করতে লাগলো। ইতিমধ্যেই খবর গেল হাজী ইলিয়াস শাহর কাছে। খবর পেয়েই হাজী ইলিয়াস ছুটে এলেন আস্তানায়। আঁসু ভেজা নয়নে উভয়েই উভয়ের সাথে কোলাকুলি ও মোসাফেহা করলেন। অতপর হাজী ইলিয়াস আফসোস্ করে বললেন — খবরটা এখানে এসে অনেক পরে

পৌঁছেছে। হুজুরের ইন্তেকালের অনেকদিন পরে। সঙ্গে সঙ্গে খবরটা যদি পেতাম, তাহলে হয়তো তাঁর জিয়ারতে গিয়ে হাজির হতে পারতাম। কিন্তু বদনসীব! সে কিস্‌মত কারো আমাদের হলো না। এখন অনেক ঝুটঝামেলা। তাই ভাবছি, পরে এক সময় গিয়ে হুজুরের গোর জেয়ারতটা করে আসবো!

আফসোসে হাজী সাহেব নীচের দিকে মুখ নামালেন। শরীফ রেজা ভারী গলায় বললেন—কি করবেন বলুন ? একেবারেই অচিন মুলুক। একমাত্র আমি ছাড়া বাঙ্গালা মুলুকে আমার মতো দুস্‌রা কোন আদমী ওখানে ছিল না। তাই সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানোর কোন উপায়ই ছিল না আমার।

ঃ কিন্তু জনাব, এরপর আপনিও যে ফের কোথায় উধাও হয়ে গেলেন, তাও তো কিছু জানলাম না ?

ঃ জি ?

ঃ আপনি! আপনি এতদিন বেখবর ? আপনি আবার কোথায় চলে গিয়েছিলেন ?

একটু থেমে শরীফ রেজা ধীর কণ্ঠে বললেন — যাইনি আমি কোথাও। ওখানেই ঐ পানিপথ কর্ণালেই আমি ছিলাম।

ঃ ওখানেই ?

ঃ জি-হা। ওখানেই থাকবো বলেছিলাম।

ঃ মানে ?

ঃ জিন্দেগীটা আমার কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে জনাব। না লাগলাম সাতে না লাগলাম পাঁচে। একেবারেই এলোমেলো জিন্দেগী। ঐ হুজুরই ছিলেন আমার এই ভাসমান জিন্দেগীর কাণ্ডারী। আমার প্রেরণার উৎস। সেই হুজুরই চলে যাওয়ায় বেঁচে থাকাটাই এখন আমার অহেতুক হয়ে গেছে। আর তাই —

ঃ তাই ?

ঃ এই বাতিল জিন্দেগী নিয়ে হৈ চৈ কিছু না করে, যে কয়দিন বাঁচি, ওখানেই কাটিয়ে দেয়ার ইরাদা ছিল আমার। চেয়েছিলাম, একেবারেই আত্মগোপন করে এ দুনিয়ার সুখ দুঃখের বাইরে গিয়ে হারিয়ে থাকবো আমি। কিন্তু —

ঃ তাজ্জব! বলেন কি জনাব ?

ঃ কিন্তু তা শেষ অবধি পারলাম না। একদিকে হুজুরের নির্দেশ, অন্যদিকে অতীত জিন্দেগীর দুর্নিবার টান — এই দু'য়ে মিলে আবার আমাকে টেনে আনলো ফেলে দেয়া জিন্দেগীর এই আবর্তে।

শায়খ শাহ্ শফীউদ্দীন সাহেব শরীফ রেজার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। পিতার অধিক প্রিয়। সেই প্রিয় হুজুরের মৃত্যুটা শরীফ রেজার দীলে যে কতটা বেজেছে — তা উপলব্ধি করে হাজী ইলিয়াস শাহ্ সাহেব অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে তাঁকে তিনি উৎসাহ দিয়ে বললেন — শাব্বাশ! তাইতো আপনি আসবেন। একেবারেই কাঁচা বয়স আপনার। এ বয়সে এ ধরনের অনুভূতি আপনার মতো লোকের কাছে আশা করিনে আমরা। ঐ কিসিমের জিন্দেগী আপনার জন্যে কোন ক্রমেই নয়।

ঃ জনাব!

ঃ হুজুরের নির্দেশটা কি ছিল তাই আগে বলুন তো ?

শরীফ রেজা উদাস কণ্ঠে বললেন — তাঁর নির্দেশ যেমনটি হওয়ার কথা তেমনটিই ছিল। পূর্ব জীবনে ফিরে আসা, ঘর সংসার করা, প্রয়োজনে জঙ্গ-জেহাদ করা, অর্থাৎ আমার কাছে এখন একেবারেই আকর্ষণহীন, সেই সব।

হাজী ইলিয়াস উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন — মারহাবা-মারহাবা! মহাজ্ঞানী হুজুর তো ঠিক নির্দেশই দিয়েছেন। আপনার জন্যে যা করণীয়, বলা যায় যা ফরজ, হুজুর তো তাই করতে বলেছেন। হুজুরের সেই নির্দেশ পালনে আগ্রহী হয়ে আপনিও এখন মস্তবড় সোওয়াবের কাজ করেছেন।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ আপনার উপর অনেক ভরসা আমাদের। আপনার মতো লোকের উপর দেশ-দশ অনেকের অনেক-অনেক হক আছে। সে হক থেকে আপনি সবাইকে বঞ্চিত করতে পারেন না ?

ঃ কিন্তু জনাব—

ঃ না-না, এর মধ্যে আর কিন্তুর অবকাশ কোথায় ? মূল ইরাদা আর নিয়াত থেকে আপনার মতো লোক এভাবে বিচ্যুত হয়ে গেলে দেশের, দ্বীনের ও কওমের ভরসা বলে আর থাকে কি ? আঘাতটা আপনার অত্যন্ত বড় আঘাত ঠিকই! আমাদের চেয়ে অনেক গুণে বড় আঘাত! কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, এই সব বড় আঘাত বড় ব্যথা জয় করার হিম্মত নিয়েই নখে গোনা কিছু লোক এই দুনিয়ায় আসেন। আপনি যে তাঁদেরই একজন।

ক্লীষ্ট হাসি হেসে শরীফ রেজা বললেন — আমাকে উৎসাহ দিচ্ছেন জনাব ?

ঃ হ্যাঁ, উৎসাহ বললে — উৎসাহ। গভীর শোকে আপনি আচ্ছন্ন হয়ে আছেন বলেই আপনি আপাততঃ ভুলে যাচ্ছেন কি আপনার করণীয় আর কোন মানুষ আপনি! বাঘ যদি নিজেকে মেষ বলে ভুল করে নিস্তেজ হয়ে পড়তে থাকে, তাহলে তো উৎসাহ দেয়ার প্রয়োজন সেখানে আছেই।

ইলিয়াস শাহর মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। এ প্রেক্ষিতে শরীফ রেজা স্বচ্ছ কণ্ঠে বললেন — এতটার আর প্রয়োজন নেই জনাব। এসে পড়েছি যখন, তখন কষ্টকর হলেও হুজুরের নির্দেশ আমি পুরোটাই পালন করার ইরাদা নিয়ে এসেছি। এখন কাজের কথা বলুন।

ঃ জি ?

ঃ জনাব তো দেখছি ইতিমধ্যেই অনেকটা কামিয়াবী হাসিল করে ফেলেছেন। এবার বলুন, আমাকে কি জনাবের আর বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে ? থাকলে তা কোন কাজে আর কখন ? সোচ্চার কণ্ঠে সাড়া দিলেন হাজী ইলিয়াস। শশব্যস্তে বললেন — আরে ব্যস্! প্রয়োজন আছে মানে ? যারপরনেই প্রয়োজন। এই ওয়াক্তে জনাবের উপস্থিতির খবরে আমার বুকের ছাতি দশগুণে ফুলে গেছে। একা একা আমি তো চুপসে ছিলাম এ যাবত।

ঃ কি রকম ?

ঃ আমি লাখ্‌নৌতি জয়ে বেরুচ্ছি। সব তৈয়ার এর উপর আল্লাহর রহমে আপনাকে আবার পেয়ে গেলাম! আমাকে আর রোখে কে ?

অতপর হাজী ইলিয়াস তাঁর প্রস্তুতি সহ এদিকের তামাম অবস্থা বর্ণনা করে শরীফ রেজাকে শোনালেন এবং সেই সাথে শরীফ রেজাকে তাঁর এই অভিযানে শরিক হওয়ার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ পেশ করলেন। শরীফ রেজাকে তিনি জোর দিয়ে বোঝালেন যে, ইতিমধ্যে নতুন কিছু সেপাই-সেনা বাহিনীভুক্ত করা হয়ে থাকলেও হাজী ইলিয়াসের এই ফৌজ মূলতঃ শরীফ রেজারই ফৌজ, তাঁরই আস্তানার আর লাখ্‌নৌতির সংগঠনের লোক। তিনি যদি তেমন কিছু নাও করতে পারেন, তাঁর উপস্থিতিটাই চরম কাজে আসবে। এতে হাজী সাহেবের ফৌজের মধ্যে আশাতীত উৎসাহ পয়দা হবে এবং শত্রু সেনার মধ্যেও এমন এক অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে যে, কামিয়াবী হাজী সাহেবের জন্যে অনেক খানি সহজ হয়ে আসবে।

এ প্রসঙ্গে শরীফ রেজার এক প্রশ্নের জবাবে তিনি ফের বললেন — জনাব, ঐ লাখ্‌নৌতির বাহিনীতে এখনও এমন অনেক সেপাই আছে, যারা আপনাকে ময়দানে দেখলে, আপনার পক্ষ অবলম্বন করতে আসুক আর না আসুক, আপনার বিরুদ্ধে হাতিয়ার তারা তুলবে না।

শরীফ রেজা এ কথায় হেসেই ফেললেন এবার। বললেন — অতিরিক্ত হয়ে গেল জনাব। আপনার উক্তির মধ্যে আতিশয্য রয়ে গেল চরম।

ঃ কেমন ?

ঃ এতটা তারা করবে, সেটা আপনি কি করে এমন নিশ্চিতভাবে জানলেন ?

ঃ জানলাম লাখ্‌নৌতির ঐ ফৌজে কাজ করতে গিয়ে। ঐ দীর্ঘদিন আগে লাখ্‌নৌতির ফৌজে থাকার কালে কি যাদুই যে আপনি করে এসেছেন তাদের, দেখলাম, আপনার গুণগানে অনেকেই তারা তাজ্জবভাবে মুখর।

ঃ মুখর যে তারা আপনার গুণগানেই কম কিছু, এটা ভাবছেন কেন ? আপনারটাতো অনুমান। কিন্তু আমি তো এখানে এসেই বাস্তবভাবে জানছি, আপনার যাদুতে মুগ্ধ হয়ে লাখ্‌নৌতি ফৌজের মস্ত একটা অংশই এসে আজ আপনার পেছনে দণ্ডায়মান ?

সাতগাঁয়ের সুলতান হাজী শাম্‌সুদ্দীন ইলিয়াস শাহও হেসে ফেললেন। বললেন — সবই ঐ একজনের রহম। আমার আপনার উপর পরম করুণাময়ের ঐ রহমটা আছে বলেই না আমাদের এই অভিযানে কামিয়াবীর ব্যাপারে আমি এতটা আশাবাদী।

এ নিয়ে আরো কিছু আলাপ হলো তাঁদের মধ্যে। সবশেষে হাজী ইলিয়াস শাহ চাইলেন, লাখ্‌নৌতি জয়ে এই দণ্ডেই অগ্রসর হবেন তাঁরা। কিন্তু শরীফ রেজা তাঁর অসুবিধাটা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললেন যে, মানসিকভাবে তিনি এখন অত্যন্ত অস্থির আছেন। ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের মৃত্যু সংবাদ পেয়েই তিনি পানিপথ কর্ণাল থেকে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে এই বাঙ্গালা মুলুকে এসেছেন। মরহুমের গোর জিয়ারত করাটাই এই মুহূর্তে মূল লক্ষ্য আর আদি নিয়াত শরীফ রেজার। মরহুম খান সাহেবের গোর জিয়ারত সমাপ্ত করার আগে দীলকে তিনি কিছুতেই শান্ত করতে পারবেন না। সুতরাং তিনি চাইলেন, অভিযানটি সামান্য কয়দিন স্থগিত রাখা হোক।

শরীফ রেজার ঐকান্তিক আগ্রহের কাছে হার মানলেন হাজী ইলিয়াস। অভিযান তিনি স্থগিত রাখতেই রাজী হলেন। শরীফ রেজাও খুশী হয়ে হাজী ইলিয়াসকে এই আশ্বাসই দিলেন যে, তিনি যাবেন আর আসবেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক লহমা সময়ও তিনি নেবেন না।

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে শরীফ রেজা ঐ দিনই ভুলুয়ার উদ্দেশ্যে ছুটলেন। শরীফ রেজার ওয়াপস্ আসার অপেক্ষায় সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে সাতগাঁয়ের সুলতান হাজী শাম্‌সুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বিপুল আগ্রহভরে পথ চেয়ে রইলেন।

ফৌজদার সাহেবের বাহির আঙ্গিনার উত্তর পাশেই তাঁর পারিবারিক গোরস্তান। সেই গোরস্তানে বাহির আঙ্গিনার একান্ত সংলগ্ন সামনের দিকে ফৌজদার সোলায়মান খানকে দাফন করা হয়েছে। শরীফ রেজা অশ্ব চালিয়ে সরাসরি ফৌজদার সহেবের বাহির আঙ্গিনায় চলে এলেন। আঙ্গিনা তখন

ফাঁকা। ফৌজদার সাহেবের অভাবে দহলীজে কেউ বসেও না, দহলীজের সামনে এই বাহির আঙ্গিনাতেও তাই আর আগের মতো ভিড় বা চাকর নফরদের ঘন ঘন আনাগোনা হয় না। আঙ্গিনার কিনার দিয়ে ঐ পাড়ারই কে একজন যাচ্ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে লোক শরীফ রেজাকে ফৌজদার সাহেবের কবরটা দেখিয়ে দিলো।

শরীফ রেজার অজু ছিলই। অশ্বটা নিকটেই একটা গাছের সাথে বেঁধে রেখে তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম বলে কবরের উপর এক মুঠো মাটি ছিটিয়ে দিলেন। এরপর শরীফ রেজা আগে একান্ত মনোনিবেশ সহকারে প্রয়োজনীয় ও আনুসঙ্গিক দোয়া দরুদ পড়লেন। তারপর তিনি মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনায় মনপ্রাণ ঢেলে মোনাজাতে মগ্ন হলেন এবং অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে মোনাজাতের মধ্যে বিভোর হয়ে রইলেন।

মোনাজাত শেষ করে শরীফ রেজা অল্প একটু সরে দাঁড়ালেন এবং একপাশে দাঁড়িয়ে এক ধেয়ানে ফৌজদার সাহেবের কবরের দিকে চেয়ে রইলেন। চেয়ে চেয়ে তিনি তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলেন—এখানেই শুয়ে আছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং শরীফ রেজার একান্ত প্রিয়জন অবসর প্রাপ্ত ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেব। যে সোলায়মান খান সাহেব শরীফ রেজার আগমনে পুলকিত হয়ে উঠতেন, যে সোলায়মান খান সাহেব শরীফ রেজার আহার-বিশ্রামের ব্যবস্থায় জান ছেড়ে দিতেন, যে সোলায়মান খান সাহেব পুত্রের অধিক স্নেহ করতেন শরীফ রেজাকে, সেই সোলায়মান খান সাহেব আজ এখানে — ঐ মাটির নীচে। তিনি আজ আর নেই। ইহদুনিয়ার সকল বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে তিনি পরলোকে চলে গেছেন। আজ এখানে শরীফ রেজা চীৎকার করে বুক ফাটিয়ে দিলেও, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে এই খোলা আঙ্গিনায় আহাজারী করলেও, বিমারে-ব্যাধিতে জরাজীর্ণ হয়ে এসে ঐ দহলীজে পড়ে ধুঁকে ধুঁকে মরলেও কোন সোলায়মান খান সাহেব ঐ মকান থেকে আর বেরিয়ে আসবেন না। কোন সোলায়মান খান সাহেব বেরিয়ে এসে ব্যস্তকণ্ঠে বলবেন না — 'হায়-হায়! একি বাপ ? তুমি এখানে এভাবে ?' কিংবা কখনও শরীফ রেজার অশ্ব এসে এই আঙ্গিনায় সশব্দে উঠলেও ব্যস্ত সমস্ত হয়ে আর কোন সোলায়মান খান সাহেব দহলীজ থেকে আঙ্গিনায় ছুটে আসবেন না, বা বলবেন না — আরে এই যে শরীফ রেজা ? এসো-এসো। কোথা থেকে ? কেমন আছো ?

এই মুহূর্তে শরীফ রেজার অকস্মাৎ যেন মনে হলো, ফৌজদার সাহেব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—না-উম্মিদ হতে নেই বাপজান একদিন কেউ

আমরা এ দুনিয়ায় থাকবো না। আল্লাহ না করুন, শায়খ হুজুরের যদি মন্দই কিছু ঘটে যায়, তুমি আমার মকানেই চলে আসবে। কে বললে তোমার কেউ নেই ? আমার কোন সন্তানাদি নেই, তুমি তো আমার সন্তান বাপ ! আমার বিষয়-বিত্তের মালিক স্রেফ তুমি আর কনকলতা। তোমাদেরকেই তো তামাম কিছু দিয়ে যাবো বাপজান ? আমার অভাবে এ মকানে তুমি আর কনকলতাই তো থাকবে!

নিজের অজ্ঞাতে সশব্দে কেঁদে ফেললেন শরীফ রেজা। নিজের কান্নার শব্দেই ধ্যান ভাঙ্গলো তাঁর। জ্ঞান ফিরতেই দেখলেন, তাঁর মুখ মণ্ডল, বক্ষস্থল এমন কি পরিধেয়ের অর্ধেকটা অজ্ঞাতেই চোখের পানিতে প্লাবিত হয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে তিনি চোখ মুখ মুছে ফেললেন। নিজেকে সংযত করে নিয়ে পেছন ফিরে কয়েক কদম আঙ্গিনার দিকে এগিয়ে আসতেই দেখলেন, তাঁর একদম সামনেই আঙ্গিনার এই প্রান্ত ঘেঁষে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কনকলতা। অশ্রুভারে দৃষ্টি তাঁর ঝাপ্‌সা।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন শরীফ রেজা। বাক হারিয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন ঐভাবে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বেদনা সিক্ত কণ্ঠে কনকলতা বললেন—আসুন—

গোরস্তান থেকে বেরিয়ে আঙ্গিনায় এসে শরীফ রেজা নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন— আপনি! আপনি এখানে কখন এলেন ?

কনকলতাও সংযত কণ্ঠে জবাব দিলেন—আপনি আসার পরে পরেই।

ঃ মানে ?

ঃ আপনি এসে বড় বাপের কবরের দিকে এগুলেন যখন, তখন।

ঃ সেই থেকেই আপনি দাঁড়িয়ে আছেন এখানে ?

ঃ হ্যাঁ।

শরীফ রেজা বিস্মিত হলেন। বললেন—সে কি! সে তো অনেক সময়!

ঃ জি ?

ঃ আমি এসেছি, একথা আপনাকে কে বললেন ?

ঃ কেউ বলেনি।

ঃ তাহলে ?

ঃ আমি আপনার ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছি, আপনি এলেন।

ঃ আমার ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনেই।

ঃ জি!

ঃ তাজ্জব! স্রেফ ঘোড়ার পায়ের শব্দেই ?

করুণভাবে চোখ তুলে কনকলতা শরীফ রেজার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর করুণ কণ্ঠে বললেন — অপরাধ আমার সীমাহীন, আর সে জন্যে আমার উপর আপনার নাখোশ হওয়ার চূড়ান্ত কারণ আছে বুঝি। কিন্তু এ বিষয়ে তাজ্জব হওয়ার কারণ কিছু বুঝলাম না।

ঃ কারণ ?

ঃ আপনার অশ্বের পায়ের শব্দ বিলকুল আমার চেনা। ও শব্দ শুনলেই যে আমি বুঝতে পারি আপনি এলেন, এটাতো নতুন কিছু নয় ? আপনার দ্বারা পালিত অশ্বের পা ফেলার তাল-মান-লয়, তামামই আমার মুখস্ত। এটাও আজ আপনি বুঝতে চাইছেন না কেন ?

কনকলতা চোখ দু'টি নামিয়ে নিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল বিষাদে ম্লান হয়ে গেল। তা লক্ষ্য করে শরীফ রেজা অভিভূত হয়ে গেলেন। লা-জবাব দাঁড়িয়ে থেকে তিনি আকুল হয়ে ভাবতে লাগলেন-কি তাজ্জব এই নারী! শরীফ রেজার নিজের পায়ের শব্দ নয়, তাঁর ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনেও এ নারী বুঝতে পারেন, তিনি এলেন। কি গভীর আত্মনিয়োগ! কি নিবিড় আত্মনিবেদন! এর জুটি নেই। এই নারী ছাড়া অন্য কোন নারীর প্রতি তিনি অনুরক্ত—এমন একটা ধারণা মনে এলেও এ নারী দিউয়ানা হয়ে যান, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন! অথচ আপন হয়ে তাঁর ঘর করতে এ নারী কোনদিনই আসবেন না। নিজেরও তাঁর এ নারীকে নিয়ে ঘর করার উপায় নেই। এই নারীও কোনদিন তাঁকে নিয়ে ঘর করতে চাইবেন না — তা মুহাব্বত তাঁর যত গভীরই হোক! শরীফ রেজার শায়খ হুজুরের নির্দেশ, ঐ মাননৃপতির কন্যাকে নিয়েই ঘর করতে হবে তাঁকে। হুজুরের এই অন্তিম আদেশ অমান্য করার ন্যূনতম অবকাশও শরীফ রেজার নেই। ওদিকে আবার, শরীফ রেজা যে বিবাহিত এ নারী তা জেনে গেছেন। সুতরাং স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্যের স্বামীর ঘর করতে আসার কোন আগ্রহই যে এ নারীর থাকবে না বা নেই, ইনসান আলী সাহেবের পত্রেই তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। হায়রে নসীব!

শরীফ রেজার অজ্ঞাতেই দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস শরীফ রেজার বুক ফেঁড়ে বেরিয়ে এলো। কনকলতার দৃষ্টি তা এড়ালো না। নিজেও একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস চেপে কনকলতা পূর্ববৎ কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন—আসুন, আর দেরী করা ঠিক হবে না।

সম্বিতে ফিরে এসে শরীফ রেজা বললেন — এ্যাঁ! কি হবে না ?

ঃ ঘামে আর চোখের পানিতে আপনার জামা কাপড় তামামই ভিজে গেছে। ওগুলো জলদি জলদি না বদলালে অসুখ বিসুখ হতে পারে। আসুন —

ঃ কোথায় ?

ঃ আপনার ঘরে।

ঃ আমার ঘর!

ঃ আপনারই তো। আপনি ছাড়া এ সবের মালিক আর কে আছে ? আসুন — কাপড় বদলানোর কথাতে শরীফ রেজার অশ্বের কথা মনে হলো। তিনি পাশ ফিরে চেয়েই চমকে উঠলেন। বললেন — আমার অশ্ব ?

ঈষৎ হেসে কনকলতা বললেন — ওটা আমি সহিসের হাওলায় দিয়েছি। সহিস ওটাকে দানা দিতে নিয়ে গেছে। আপনার কাপড় চোপড় আর সামনের থলে ঐযে ওখানে। ওটা আমি নিচ্ছি, আপনি আসুন জলদি।

শরীফ রেজা আর কথা বড়ালেন না। থলে নিয়ে কনকলতা আগে আগে হাঁটতে লাগলেন এবং শরীফ রেজা নীরবে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

নির্দিষ্ট সেই ঘরে এসে কনকলতা তালা খুলে থলেটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর শরীফ রেজাকে বললেন — যান, ঘরে গিয়ে গোছলের জন্যে তৈরি হন। গোসল করাই উত্তম হবে এখন। আমি গিয়ে বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাঁর সাথে গিয়ে আপনি গোসলটা সেরে আসুন, এর মধ্যে আমি খাবারের যোগাড় করে ফেলি।

কনকলতা দ্রুতপদে অন্দর মহলে চলে গেলেন। শরীফ রেজা ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখলেন, ঘরটি ঝকঝকে করে ধোয়া মোছা। আসবাবপত্রও চকচকে ঝকঝকে। পালংকের উপর বিছানাটাও সুন্দর করে পাতা। পরিষ্কার ও ধবধবে। বিছানা-মেঝে-আসবাবপত্রে একরত্তি ধূলো-বালীর চিহ্ন কোথাও নেই। দেখেই তিনি বুঝলেন, ঘরটি আর খালি নেই। নিশ্চয়ই কেউ বাস করছেন এখানে।

খানিক পরেই শরীফ রেজাকে গোসলে নেয়ার জন্যে দবির খাঁ এসে হাজির হলো। শরীফ রেজার আগমন বার্তা পেয়ে আর পাঁচজনের মতো দবির খাঁও অত্যন্ত খুশী হয়েছিল। এসেই সে সালাম দিয়ে পরম উল্লাসে বললো —আরে বাপ! কতদিন পর দেখা! তবিয়ত তো ঠিকঠাক আছে আপনার ?

সালামের জবাব দিয়ে শরীফ রেজা হাসিমুখে বললেন — জি চাচা, আমার তবিয়ত বিলকুল ঠিক আছে। তা আপনারা কেমন আছেন ?

দবির খাঁ এ প্রশ্নে দমে গেল। একটু থেমে সে ভারী গলায় বললো — তবিয়ত তো আচ্ছা আছে জরুর, লেকেন দীলটা বড় পেরেশান আছে বেটা।

ঃ চাচা!

ঃ পর পর দুই দুইটে মউত! হরিচরণ দাদার পরপরই হুজুরও চলে গেলেন। দীল আর আচ্ছা থাকে কি করে ?

শরীফ রেজা এসব খবর শুনেছেন। ইনসান আলী প্রেরিত বার্তাবাহকই এসব মউতের খবর বলেছে। তাই এ নিয়ে আর কথা বলে তিনি দবির খাঁর দীলের ব্যথা বৃদ্ধি করতে গেলেন না। ক্ষণিক নীরব থেকে অন্য প্রসঙ্গে গেলেন। দবির খাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বললেন — আচ্ছা চাচা, এ ঘরটায় এখন কে থাকেন ?

বুঝতে না পেরে দবির খাঁ পাল্টা প্রশ্ন করলো — এই ঘরে ?

ঃ হ্যাঁ, এই ঘরে ?

দবির খাঁ আসমান থেকে পড়লো। বললো — হায় আল্লাহ! এই ঘরে আবার কে থাকবে ? এই ঘরতো আপনার ঘর। এই বারান্দায় কারো পা দেয়ার জো আছে ?

ঃ বলেন কি! তাহলে এই যে বিছানাপত্র মানে তামাম কিছু এমন ঝাড়ামোছা আর সাফ ?

ঃ আম্মি করেছে, আম্মিজান।

ঃ কেন, আজকে হঠাৎ এ ঘরটা এত সাফা করতে গেলেন কেন ? আমি আজ আসবো, এ কথাতো কারো জানা নেই ?

ঃ হায় তাজ্জব! স্রেফ আজকে করবে কেন ? হররোজ তো এ ঘরটা পরিষ্কার করে আম্মিজান। দুই বেলা- দুই বেলা।

ঃ দুই বেলা ?

ঃ হুজুর ইন্তেকাল করলেন। আর তো তার কাজ নেই। এখনতো তার কাজই এই।

ঃ কেন কেন ? এই কাজই করেন কেন ?

ঃ আপনার ঘর যে এটা ? আপনি যে আসবেনই ?

ঃ আমি আসবোই ?

ঃ জরুর। আম্মিজান তো হামেশাই বলে, দেখে নিও, শরীফ রেজা সাহেব জরুর এসে পড়বেন যে কোনদিন। না এসে কি পারেন উনি ? আমার মুখের কথাই কি সব ?

ঃ মুখের কথা মানে ?

ঃ তাতো আমি জানিনে বাপজান। তবে আম্মিজান বলে, আমরা জব্বোর নাদান বেয়াদব হলে কি হবে ? উনি তো আর তা নন ? উনাকে আমি জানি। গোস্বা করে কক্খোনও উনি চিরদিন থাকতে পারবেন না। রাগটা পড়ে গেলেই আসবেনই উনি একদিন। শেষ পর্যন্ত কেউ তাঁকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না।

দবির খাঁ কিছু বুঝুক আর না বুঝুক, কনকলতার এসব কথার অর্থ শরীফ রেজা যথার্থই বুঝলেন। ক্ষণকাল নীরব থেকে ফের তিনি প্রশ্ন করলেন —কবে থেকে এই ঘরটা উনি সাফা করতে শুরু করেছেন চাচা ?

ঃ সে ঢের দিন হলো বাপজান। ঢেরদিন আগে থেকে। সেই যে আপনি হুজুরের সাথে সোনার গাঁয়ে লড়তে গেলেন, তার কিছুদিন পরে থেকেই।

শরীফ রেজা গুম হয়ে গেলেন। উদাস নেত্রে চেয়ে থেকে তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে — স্বগতোক্তি করলেন — হায়রে নারী!

দবির খাঁ আরো কিছু বলতে গেলো। কিন্তু শরীফ রেজার তরফ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে সে গোসলের জন্যে তাকিদ দিতে শুরু করলো। দবির খাঁর তাকিদে যন্ত্রচালিতের মতো তিনি গোসল করতে বেরুলেন।

আহার বিরাম অন্তে শরীফ রেজা অবসর হয়ে কুরসীতে এসে বসলে বরাবরের মতোই কনকলতা এসে ঘরের ভেতর ঢুকলেন এবং অন্য একটি কুরসী টেনে নিয়ে শরীফ রেজার মুখোমুখী বসলেন। এরপর মামুলী কিছু আলাপ সালাপ অন্তে ভাঁজকরা একখানা কাগজ মেলে ধরে কনকলতা বললেন — এই যে সেই কাগজ। এই কাগজেই বড় বাপ তাঁর বিষয় বিত্ত আপনাকে দিয়ে গেছেন।

শরীফ রেজা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন — এই কাগজে ?

কনকলতা বললেন — জি। নিন্ এটা।

ঃ এটা নেবো ? আমি ?

ঃ হ্যাঁ, নেবেন তো।

ঃ ওটাতে কি শুধু আমার কথাই আছে ?

ঃ মানে ?

ঃ আপনাকেও তো উনি শুনেছি দিয়ে গেছেন অনেকখানি।

চকিতে চোখ তুলে কনকলতা একবার শরীফ রেজার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন — জি-হ্যাঁ। চরম আপত্তি করা সত্ত্বেও বড়বাপ আমাকে দিয়ে গেছেন অর্ধেকটা।

ঃ কাগজ তো এই একটাই ? মানে এক কাগজেই দুইজনকে দিয়ে গেছেন ?

ঃ হ্যাঁ, এই এক কাগজেই।

শরীফ রেজা মৃদু হেসে বললেন — তাহলে ওটা আপনার কাছেই থাক।

ঃ কেন ?

ঃ দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমি একজন ছন্নছাড়া লোক। আমার নিজের বিষয় বিত্তেরই খোঁজ রাখিনে আমি। ওটাতে আপনার কথা না থাকলেও, ওটা আমি আপনার কাছেই রাখতে চাইতাম।

ঃ আমার কাছে ?

ঃ হ্যাঁ। ওটা আপনার কাছেই থাক। দরকার হলে আপনার কাছেই চেয়ে নেবো।

ঃ কিন্তু —

ঃ আমি কোথায় যাই, কোথায় থাকি — তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আমি তো বিলকুল হারিয়ে ফেলবো কাগজটা।

ঃ তবু —

ঃ অবুঝ হচ্ছেন কেন ? আমি তো আর অবিশ্বাস করছিনে আপনাকে।

কিঞ্চিৎ আঁড়চোখে চেয়ে কনকলতা বললেন — বিশ্বাস করতে পারছেন ?

ঃ এ্যাঁ!

ঃ বিশ্বাস করার সাহস হয় ?

শরীফ রেজা চোখ তুলে কনকলতার মুখের দিকে তাকালেন। এরপর নজর নামিয়ে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন — কেন পারবো না ? একবার যাকে বিশ্বাস করি, সন্দেহাতীত কারণ ছাড়া তাকে আমি চট্ করেই বিলকুল অবিশ্বাস করে বসিনে।

সুযোগ পেয়ে কনকলতা ফের বললেন — কিন্তু সে যদি আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করে বসে ? চরম দুর্ব্যবহার ? তবু তাকে অবিশ্বাস করেন না ?

একই কণ্ঠে শরীফ রেজা বললেন — দুর্ব্যবহারটা মানসিক অবস্থার ব্যাপার। যে কোন কারণেই মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। তার সাথে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই।

কনকলতার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তৃপ্ত নয়নে চেয়ে তিনি বললেন — সত্যিই আপনি অদ্বিতীয়। একথা আমাকে বার বার স্বীকার করতেই হবে।

ঃ জি ?

কনকলতা উচ্ছল কণ্ঠে বললেন — একটা মস্তবড় দুশ্চিন্তা আমার গেল। এবার আর একটা এজাযত পেলে আমি আরো খানিকটা আশ্বস্ত হতে পারি।

ঃ এজাযত!

ঃ হ্যাঁ, এজাযত। উদাসীন হয়ে দেশে বিদেশে পড়ে থাকবেন, এদিকের কথা ভাববেন না! এ দিকটা সামলায় কে ?

ঃ এদিক মানে ?

ঃ এদিক মানে, আপনার একটা অনুমতি অভাবে কেউ আমরা কিছুই করতে পারছিনে। বিশেষ করে ইনসান আলী সাহেবেরই সংকোচটা বেশী।

ঃ ব্যাপারটা কি বলুনতো ?

ঃ পদ্মরাণীকে ইনসান আলী সাহেব শাদি করতে আগ্রহী। দীর্ঘদিন যাবত তিনি বিপত্নীক অবস্থায় জীবন যাপন করছেন। এক্ষণে তিনি দারপরিগ্রহণে খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

শরীফ রেজা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন — সে কি! ইনসান আলী শাদি করতে আগ্রহী ? তাও আবার পদ্মরাণীকে ?

ঠোঁট টিপে হেসে কনকলতা বললেন — সবার মনই তো পাথর নয়। তাপ লাগলে অনেকের মনই গলে।

শরীফ রেজারও ঠোঁটের কোণে হাসির একটা ক্ষীণ রেখা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। তিনি পুলক-বিস্ময়ে বললেন — আচ্ছা! ব্যাপারটা তাহলে এই ?

ঃ জি, ব্যাপারটা এই।

ঃ পদ্মরাণী ? তারও তো একটা ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে ? জাত বামুনের মেয়ে!

ঃ ইচ্ছে-অনিচ্ছে মানে ? তাকেই তো আটকানো দায় হয়ে পড়েছে আমার ও বিলকুল মজে গেছে।

শরীফ রেজা কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন — তবু এটা কি ঠিক হবে ?

ঃ কেমন ?

ঃ আপনার, মানে আপনি কি এটা মনেপ্রাণে সমর্থন করতে পারছেন ?

কনকলতা প্রত্যয়ের সাথে বললেন—শুধু সমর্থন করাই নয়, আমি মনপ্রাণে এটা চাচ্ছি। ওর বাবার মৃত্যুর পর ওকে নিয়ে আমি চরম দুর্ভাবনায় পড়েছিলাম। মেয়েটার এরপর দাঁড়াবার ঠাঁই কোথায়—একমাত্র আমিই ব ওকে আগ্‌লে রাখবো কতদিন—এসব ভেবে পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম এরপর এঁদের এই আগ্রহের কথা জেনে আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। এতব সুন্দর একটা সদ্‌গতি যে ওর কিস্‌মতে হবে, আমি কল্পনা করতেও পারিনি।

ঃ কিন্তু আপনাদের সমাজ ?

ঃ আমাদের সমাজতো এখানে অন্ধ। ওকে ভাসিয়ে দেয়া ছাড়া, ও উপকারে আসার মতো, ওর সুখ দুঃখ দেখার মতো এতটুকু উদারতা সমাজের নেই।

ঃ বলেন কি ?

ঃ ওরা সুখী হবে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ওদের জীবন সুখে হবে।

আপনার এজাযতটা পেলেই এখন কাজ শুরু করতে পারি।

ঃ তা দেখবেন, গাছে তুলে দিয়ে আবার মই টান দেবেন না যেন ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ না, বলছি এমন ঘটনাও তো আপনাদের সমাজে ঘটে। বেচারা ইনসা আলী শেষে —

ঃ আরে না-না, আমাদের সমাজ নিয়ে আপনি এতো ভাববেন না। এর দায়িত্ব সব এখন আমার। আমি যা করবো তাই। আপনি এজাযত দিচ্ছেন কিনা তাই বলুন ? ইনসান আলী সাহেবের যত ভয়, তা আপনাকে নিয়ে। আপনার এজাযত ছাড়া —

ঃ আমার তো অমত কিছু নেই। আমি বরং খুশী হয়েই মত দিচ্ছি। কিন্তু —

ঃ আবার কিন্তু কি ?

ঃ এখানে যে আর একটা দিক ভেবে দেখার আছে।

ঃ আর একটা দিক!

ঃ হ্যাঁ। পদ্মরাণী চলে গেলে একা বাড়ীতে থাকবেন আপনি কি করে ?

কনকলতা সোচ্চার কণ্ঠে বললেন — আরে না-না, একা নইতো। পদ্মর বাবা মারা যাবার কয়দিন পরেই ইনসান আলী সাহেব সুন্দর একটা দম্পতিকে আমার বাড়ীতে রেখে গেছেন। ওরা এক ভিন্ন চত্বরে থাকলেও আমার খেদমতেই আছে।

ঃ বলেন কি!

ঃ হারিস্ আর নূরী ওদের নাম। বড় সুন্দর একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। খুবই কাঁচা বয়স। এই দুই বর-বধুই এখন আমাদের দেখাশুনা করে। বড় বোনের মতো ভক্তি করে আমাদের।

ঃ আচ্ছা!

ঃ যেমনই ওদের আদব কায়দা, তেমনই ওরা সহজ সরল। 'না' শব্দটি মুখে ওদের নেই। ওদের পেয়ে আমি বর্তে গেছি।

ঃ তাজ্জব। ইনসান আলী সাহেব এদের পেলেন কোথায় ?

ঃ কোন এক গাঁয়ের মানুষ ওরা। ইনসান আলী সাহেব নাকি ওদের বিয়ের আসরে হাজির হয়ে বিয়ে ওদের কায়েমী করে দিয়েছিলেন। সেই সুবাদে ইনসান আলী সাহেবকে ওরা জব্বোর ভক্তি করে।

শরীফ রেজা চকিতে একবার অতীতে ফিরে গেলেন। তার পর বললেন— বেশ বেশ। ইনসান আলী সাহেব খুব ভাল একটা কাজ করেছেন তাহলে।

ঃ আপনিই এখন বড় বাপের এই মকানের একমাত্র পুরুষ অভিভাবক। আপনার এজাযত ছাড়া তো কিছুই হতে পারে না।

শরীফ রেজা হেসে বললেন — এজাযত তো দিয়েই দিলাম। শুভ কাজটা এবার সেরে ফেলুন জলদি-জলদি।

ইতিমধ্যে এক নওকর এসে বললো—আম্মিজান, হুজুরের জন্যে এবেলা কি রান্না হবে, তা বাত্লে দেয়ার জন্যে সবাই আপনাকে অন্দর মহলে ডাকছে।

জবাবে কনকলতা বললেন — আচ্ছা যাও, আমি আসছি। নওকরটা চলে গেল। শরীফ রেজা এ প্রসঙ্গে কিছু বলার উদ্যোগ করতেই কনকলতা অনুনয় করে বললেন—এবার আছেন তো এখানে কিছুদিন ?

চম্কে উঠলেন শরীফ রেজা। বললেন — এ্যাঁ!

ঃ এতদিন পর এলেন। অন্ততঃ কিছুদিন না থাকলে —

ব্যাতিব্যস্ত কণ্ঠে শরীফ রেজা বললেন — ওরে বাপরে! না-না, এই রাতটুকু ছাড়া আর একদণ্ড এখানে আমার থাকার উপায় নেই শিগ্‌গিরই আমাকে লড়াইয়ে বেরুতে হবে।

ঃ লড়াই! আবার লড়াই ?

ঃ জি। অত্যন্ত জরুরী লড়াই।

ঃ তারমানে ?

শরীফ রেজা অনেকক্ষণ যাবত কনকলতাকে লাখ্‌নৌতি অভিযানের ব্যাপারটা — অর্থাৎ — এই অভিযানের বর্তমান অবস্থা ও গুরুত্ব বিশেষভাবে বোঝালেন। তাঁকে ছাড়া যে এ অভিযান আটকে থাকবে, তিনি যে এ ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ — এসব বিষয় কনকলতাকে বোঝাতে শরীফ রেজার অনেক মেহনত ও সময় লাগলো। এরপরও রান্নার ব্যাপারে দুস্‌রাবার তাকিদ আসায় কনকলতা যখন উঠে গেলেন, তখন তাঁকে প্রসন্ন মনে হলো না।

পরেরদিন প্রত্যুষেই শরীফ রেজা রওনা হওয়ার জন্যে তৈয়ার হয়ে গেলেন। কিন্তু যথেষ্ট তৎপরতা সত্ত্বেও তখনই তিনি বেরিয়ে যেতে পারলেন না। বেরুতে তাঁর আরো প্রহর খানেক সময় লাগলো শরীফ রেজাকে ভুলুয়ার এই মফস্বলে পাঠিয়ে দিয়েই ইনসান আলী সাহেবের সেই বার্তা বাহক সদরের দিকে ছুটেছিল। তার মারফত খবর পেয়েই ইনসান আলী সাহেব প্রত্যুষেই এসে দেখা করলেন শরীফ রেজার সাথে। উভয়ে মিলে অনেকক্ষণ তক সুখ দুঃখের আলাপ করে আহাজারী করলেন। এরপর দবির খাঁ, মুইজুদ্দীন মালিক ও এ মকানের অন্যান্য লোকজনও একে একে এসে শরীফ রেজার সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করে গেল। শেষে এলেন কনকলতা। এসেই তিনি বললেন —অন্যদের কথা নিয়েই এই সংকীর্ণ সময়টা আমাদের গেল। নিজেদের একটা কথাও শোনা বা বলা আমাদের হলো না।

শরীফ রেজা শংকিত চিত্তে বললেন — নিজেদের কথা ?

ঃ আর না হোক, আপনার জিন্দেগীর কোন কথাই তো শোনা হলো না আমার ?

ঃ আমার জিন্দেগীর কথা!

ঃ আপনার ঘর সংসারের কথা। বিয়েটা যখন করেই একবার ফেলেছিলেন, তখন তাঁকে ছেড়েই বা দিলেন কেন, মানে ছাড়াছাড়িটা হলোই বা কিভাবে, মিলনটাই বা কিভাবে আপনাদের হচ্ছে আবার — এসব ব্যাপারে একটা কথাও তো বললেন না ? আপনার কেউ নেই বলেই এসবের একটা কথা শোনারও কি হক আমার নেই ?

কনকলতার কণ্ঠস্বর ভারী হলো। শরীফ রেজা মহাসমস্যায় পড়লেন। এসবের বলবেন তিনি কি, আর কোন কথাই বা বলবেন ? ক্ষণিক নীরব থেকে শরীফ রেজা বললেন — দেখুন, ওসব কথার কোনটাই আমার আনন্দ কথা নয়। সবই আমার জিন্দেগীর চরম এক জিল্লতির কথা। সময় আজ সংকীর্ণ। সুযোগ যদি পাই কখনো, আমি কথা দিচ্ছি, অবশ্যই আমি আপনাকে তা শোনাবো। ও নিয়ে কোন দুঃখ আপনি করবেন না।

ঃ বড়বাপ আজ নেই। এ সংসারের আপনিই এখন একমাত্র অভিভাবক। আমি করবো কি, আমার কি করা উচিত, আমার প্রতি আপনার কি উপদেশ — এ ব্যাপারেও তো কিছু বলা আপনার উচিত ছিল ?

শরীফ রেজার সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠলো। তিনি অসহায় কণ্ঠে বললেন — এ্যাঁ! তা কথা হলো —

ঃ আপনারা সংসার জীবনে সুখী হোন, এ কামনা সর্বদাই আমি করবো। কিন্তু আমার ব্যাপারেও তো চিন্তা-ভাবনা করার একটা দায়িত্ব আপনার ছিল ? কোন পরামর্শ—কোন পথনির্দেশ ? যৌবনের দাবী তো আমার এরপর ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়বে। এভাবে আমি আর ভেসে বেড়াবো কতকাল ?

কনকলতার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে পানি নেমে এলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় শরীফ রেজা বললেন—ত-মানে-দেখুন—

ঃ আমারও তো নিজের কিছু কথা থাকতে পারে ? সেসব কথা শুনে সঠিক একটা পথও তো বাত্লিয়ে দিতে পারতেন আপনি ? ফয়সালা কিছু করতে পারতেন সমস্যার ?

শরীফ রেজা মরিয়া হয়ে বললেন— ঠিক আছে-ঠিক আছে অবসর মতো আবার আমি আসবো একদিন এখানে। নিরিবিলিতে বসে সেদিন আমরা তামাম কিছু আলাপ আলোচনা করবো। আজ আমার বড়ই অসময় হয়ে যাচ্ছে।

ঃ সেদিনটা কোন দিন ?

ঃ তা নির্দিষ্ট করে এই মুহূর্তে বলতে পারবো না। তবে আমি আসবো।

ঃ আসবেন তো ঠিক ?

ঃ আসবো-আসবো। আমি আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, ইতিমধ্যেই কোথাও মারা যদি না পড়ি, অন্ততঃ একবার আমি সময় করে আসবোই এখানে আবার!

ঢল নামলো কনকলতার দুই চোখে। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বললেন— ঠিকতো ?

ঃ জি-জি, ঠিক!

ঃ ইনসান আলী সাহেব এসে বারান্দার নীচে দাঁড়ালেন এবং ওখান থেকেই বললেন — এখনই যদি বেরোন উস্তাদ, তো চলুন, কিছুটা পথ অন্ততঃ একসাথেই যাই —

চোখ মুছে বেরিয়ে এলেন শরীফ রেজা।

১৫

ধূলী উঠছে বেশুমার। পুনঃ পুনঃ ধ্বনী উঠছে আল্লাহু আকবর! আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে দূরন্ত বেগে ছুটে চলেছে হাজী ইলিয়াস শাহের বাহিনী। সাতগাঁ থেকে বেরিয়ে নবদ্বীপের পাশ দিয়ে কর্ণসুবর্ণ ডাইনে রেখে একটানা উত্তর দিকে ছুটে যাচ্ছে সাতগাঁয়ের সুলতান হাজী শাম্‌সুউদ্দীন ইলিয়াস শাহর ফৌজ। লক্ষ্য তাদের আলাউদ্দীন আলী শাহর রাজধানী পাণ্ডুয়া। ধাবমান বাহিনীর এক অংশের নেতৃত্বে আছেন খোদ হাজী শাম্‌সউদ্দীন ইলিয়াস শাহ, অন্য অংশের সামনে আছেন দুর্ধর্ষ বীর শরীফ রেজা। সেপাইরাও প্রত্যেকেই নিয়াত আর প্রতিজ্ঞায় অচঞ্চল। গোটা বাঙ্গালা মুলুক দখল করার দূরন্ত এক নেশায় তারা উন্মত্ত।

খবর গেছে পাণ্ডুয়ার অধিপতি আলী শাহর কাছেও। আলী শাহর গোয়েন্দারাই খবর এনে দিয়েছে। কিন্তু ইলিয়াস শাহর ক্ষিপ্রতার সাথে গোয়েন্দাদের তৎপরতা তাল রাখতে পারেনি। বাঘের থাবা ঘাড়ের উপর পড়ো পড়ো হওয়ার আগে খোঁজ পায়নি তারা। ফলে, সসৈন্যে প্রস্তুত হয়ে আলাউদ্দীন আলী শাহ যখন বেরুলেন, তখন ইলিয়াস শাহর বাহিনী গৌড় পেরিয়ে এসেছে। আলী শাহও বিপুল বেগে ছুটলেন। তিনি গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মাঝামাঝি একস্থানে পৌঁছতেই ইলিয়াস শাহর বাহিনীর মুখোমুখী হয়ে গেলেন।

শুরু হলো লড়াই। আচমকা লড়াই। আলী শাহর তামাম নজর সোনার গাঁয়ের দিকে ছিল। এ লড়াইয়ের জন্যে তিনি আদৌ তৈয়ার ছিলেন না। ইলিয়াস শাহকে মোটেই তিনি গণ্যের মধ্যে আনেননি। ফলে, আচমকা এই

লড়াইয়ে পড়ে হকচকিয়ে গেলেন তিনি। ওদিকে আবার, হাজী ইলিয়াসের অনুমানটাই ফললো। লড়াই শুরু হওয়ার পরই আলী মুবারকের ফৌজের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। ইলিয়াস শাহ আর শরীফ রেজাকে দেখে আলী শাহর সেপাইরা মানসিকভাবে কমজোর হয়ে গেল। আলাউদ্দীন আলী শাহর ব্যবহারে তাঁর সেপাইরা অধিকাংশই তাঁর উপর নাখোশ ছিল। অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে ন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তারা — এমনই একটা অনুভূতি তাদের আচ্ছন্ন করে ফেললো। এতে করে কিছু সেপাই সরাসরি আলী মুবারক ওরফে আলী শাহর পক্ষ ত্যাগ করে হাজী ইলিয়াসের পক্ষে চলে এলো এবং কিছু সেপাই নিষ্ক্রীয় হয়ে গেল।

আলাউদ্দীন আলী শাহ তবু প্রাণপণেই লড়লেন কিন্তু ফল কিছু হলো না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি পরাজিত ও বন্দি হলেন। বন্দি অবস্থাও আলী শাহর অধিক স্থায়ী হলো না। ইলিয়াসের কাছে নেয়ার আগেই লাখ্‌নৌতি সংগঠনের কিছু বিক্ষুব্ধ সেপাই তাঁকে ঘিরে ধরে ওখানেই হত্যা করলো।

বিজয় নিশান উড়িয়ে দিলো ইলিয়াস শাহের সৈন্যরা। লাখ্‌নৌতি বা গৌড় রাজ্য অধিকৃত হলো। সাতগাঁয়ের সুলতান হাজী শাম্‌সউদ্দীন ইলিয়াস শাহ এবার বিপুল সমারোহে পাণ্ডুয়ার মসনদে উপবেসন করলেন। দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গালা গোটাই তাঁর অধীনস্ত হলো। স্বাধীন সুলতান পরিচিতি তাঁর কায়েমী হলো এতদিনে। পাণ্ডুয়াই হলো হাজী শাম্‌সউদ্দীন ইলিয়াস শাহর কায়েমী রাজধানী।

শরীফ রেজার প্রতি পাণ্ডুয়ার সুলতান শাম্‌সউদ্দীন ইলিয়াস শাহর ঋণ ও কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না। শরীফ রেজার লাখ্‌নৌতির ঐ সংগঠনই তাঁর আজকের এই অবস্থানের পয়লা সোপান। অতপর শরীফ রেজার সূত্র ধরেই শায়খ শাহ শফী হুজুরের মদদ লাভ। সবশেষে পাণ্ডুয়ার এই লড়াইয়েও শরীফ রেজার প্রত্যক্ষ এই অবদান। সবকিছু মিলে শরীফ রেজার কাছে তাঁর ঋণ পর্বত প্রমাণ ছিল। তাই, লড়াই ও ধুমধামের হৈ-হুল্লোর থেমে গেলে সুলতান শাম্‌সউদ্দীন ইলিয়াস শাহ একদিন শরীফ রেজাকে সঙ্গে নিয়ে নিরিবিলিতে বসলেন এবং অত্যন্ত সৌজন্যের সাথে বললেন—জনাব সরাসরি সুফী সাধক আর ওলি-আউলিয়া না হলেও, আপনি তাঁদেরই আশির্বাদ পুষ্ট ব্যক্তি। পরম শ্রদ্ধেয় দরবেশ শায়খ শাহ শফীউদ্দীন হুজুরের পুত্রতুল্য লোক। আপনার সাথে সামঞ্জস্যহীন কথা বলাটা বেয়াদবী। তবু যদি এজাযত আপনি দেন, তাহলে একটা কথা বলি —

শরীফ রেজাও সসম্ভ্রমে বললেন — জি বলুন।

সুলতান বললেন — কথাটা হলো, আমার-আপনাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার, অর্থাৎ গোটা বাঙ্গালা মুলুকে স্বাধীন সালতানাত কায়েম করার পথে আল্লাহ চাহেতো আর অধিক বাধা নেই। কিন্তু এর পরেই তো আপনি একদম অবসর হয়ে যাবেন। যদি পুরোপুরি দরবেশ জীবনে ফিরে যান তো আলাদা কথা। কিন্তু তা না গেলে, বেঁচে থাকার জন্যে একটা অবলম্বন প্রত্যেক লোকেরই দরকার। তাই অনেকটা সামঞ্জস্যহীন হলেও সেই অবলম্বনের ব্যাপারে আমি আগেই আপনার কাছে একটা অনুরোধ রাখতে চাই।

ঃ আচ্ছা বলুন-বলুন।

ঃ আপনি আমার সিপাহ-সালার পদে যোগদান করে আজীবন আমার পাশে থাকলে আমি বড়ই ধন্য হতাম।

ঃ জনাব না!

ঃ যদিও একমাত্র সুলতানের আসন ছাড়া তার নীচের আর কোন আসনই আপনার যোগ্য আসন নয়, তবু সুলতান হওয়ার নিয়াত আপনার ছিলও না কোনদিন, আর এক মসনদে দুইজন বসাও সম্ভবপর নয়। তাই আমার প্রস্তাবটা হলো — কাজ আপনাকে করতে হবে না কিছুই, স্রেফ সিপাহসালারের আসনটা অলংকৃত করে একটা অবলম্বন গ্রহণ করুন আপনি, আর আপনার জন্যে কিছু করার একটা মানসিক তৃপ্তি আমাকে ভোগ করতে দিন।

এ প্রস্তাবে শরীফ রেজা নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর তিনি অতিশয় তাজিমের সাথে বললেন — জনাব, আপনার এই আন্তরিকতার নিঃসন্দেহে তুলনা নেই। এ জন্যে নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আপনার এই অনুগ্রহের দান কবুল করার মওকা আমার নেই। তার প্রধান কারণ সবিশেষ আপনি জানেন। নকরী বা মসনদ—এর কোনটাই গ্রহণ করার জিন্দেগী আমার নয়। আমার মতো আমার হুজুরের আরো কিছু খাদেমেরও নয়। দ্বীনের স্বার্থেই আমাদের এই রাজনীতি বা লড়াই জঙ্গে আসা, নইলে এ কাজও আমাদের নয়। প্রত্যেকেই আমরা যে যার সাধ্যমতো দ্বীনের স্বার্থে কাজ করে যাবো — এই আমাদের সকলের স্বতস্ফূর্ত নিয়াত ও ওয়াদা। এই নিয়াত নিয়েই গড়ে উঠেছি আমরা আর এই নিয়াতের মধ্য দিয়ে জিন্দেগীটা পার করে দিতে পারলে তবেই আমরা নিয়াত আমাদের পূর্ণ করতে পারবো, পালন করতে পারবো আমাদের ওয়াদা।

অভিভূত সুলতান বললেন — আচ্ছা!

ঃ এক্ষণে আবার আমার শায়খ হুজুর আর এক দায়ে বেঁধে রেখে গেছেন আমাকে। কোন নকরী-পদে বাঁধা না পড়ে স্বাধীনভাবে ঘর সংসার পেতে সংসার ধর্মের মধ্যে দিয়ে দ্বীনের কাজ করে যেতে হবে আমাকে। সেই সাথে যেখানে

যখন দ্বীনের স্বার্থে জঙ্গ-জেহাদের প্রয়োজন দেখা দেবে, সেখানে গিয়ে শরিক হতে হবে আমাকে — যদিও তা আমার জন্যে আর বাধ্যতামূলক নয়। সুতরাং আপনার ও ব্যাপারে আমাকে অব্যাহতি দিতে হবে জনাব, আমি সবিনয় অনুরোধ পেশ করছি। তবে আপনাকে আমি এ ভরসা দিচ্ছি যে, আমাদের অভীষ্ঠ হাসিলের পথে আমার প্রয়োজনটা যে মুহূর্তে অনুভব করবেন আপনি, একটু ইঙ্গিত দেয়ামাত্রই খোলা তলোয়ার হাতে আমাকে আপনি পাশে পাবেন তখনই।

ঃ জনাব!

ঃ কাজেই, ও প্রসঙ্গ আর অধিক টেনে আমাকে শরমিন্দা করবেন না।

আর কথা চলে না। বাধ্য হয়েই এ প্রসঙ্গ পরিহার করলেন সুলতান। এর একটু পরেই তিনি অন্য প্রসঙ্গে এলেন। বললেন, এবার জনাব তাহলে একটা পরামর্শ দিন আমাকে। আপনি শুধু একজন সুদক্ষ যোদ্ধাই নন, সামরিক দূরদর্শিতাও আপনার চরম। আমি কি এই দণ্ডেই সোনার গাঁ দখল করতে বেরোবো, না আশে পাশের আর পাঁচটা মুলুকের দিকে নজর দেবো? এর কোন্‌টা আমার উচিত হবে?

কিয়ৎকাল চিন্তা করে শরীফ রেজা বললেন — দেখুন, সামরিক দূরদর্শিতা বলতে যা বুঝায়, তা খুব একটা নেই আমার। তবে আমার শ্রদ্ধেয় হুজুরের ধ্যান-ধারণা থেকে আপনাকে বলবো, সোনার গাঁ আমাদের আতংক নয়, আতংক দিল্লীর হামলা। এটাকে প্রতিরোধ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেই আমাদের সোনার গাঁ যাওয়া উচিত।

ঃ যথা?

ঃ সোনার গাঁয়ে আমরা পরে যেতেও পারবো। দু'দিন পরে গেলে দোষের কিছু হবে না। কিন্তু ঘরের দুয়ার সামাল না করে এগুলে, সে ত্রুটির তুলনা কিছু থাকবে না।

ঃ জনাব!

ঃ সোনার গাঁ বিজয় পাওয়ার মতো এত তড়িৎ বেগে নাও হতে পারে। সোনার গাঁ যে একটা মোটামুটি বড় শক্তি, সেটা বিগত সুলতান আলী শাহ বিশেষভাবেই বুঝে গেছেন। যথেষ্ট কোশেশ করেও উনি ওটা কব্জা করতে পারেননি। আমরা ওটাতে হাত দিয়ে যদি দীর্ঘ মেয়াদী লড়াইয়ের মধ্যে সোনার গাঁয়ে আটকে থাকি, আর ইতিমধ্যে যদি দিল্লীর বাহিনী বিনা বাধায় বাঙ্গালা মুলুকে ঢুকে পড়ে, তাহলে পরিস্থিতি নিতান্তই করুণ হয়ে পড়বে। এতদিন তারা আসেনি বলে যে, যেকোন মুহূর্তে আসবে না, এটা কোন যুক্তির কথা নয়।

সুলতান সঙ্গে সঙ্গে সরবে বললেন — ঠিক-ঠিক। খুবই ন্যায্য কথা।

ঃ তাই আগে উচিত হবে দিল্লীর ফৌজের সম্ভাব্য পথ বন্ধ করা। পথ বন্ধ থাকলে দিল্লীর ফৌজ একলাফে বাঙ্গালায় ঢুকতে পারবে না। ঢুকতে আদৌ পারলেও বেড়া বন্ধন ছিন্ন করে তবেই তাদের ঢুকতে হবে। আর এর মধ্যে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময় পাবো।

ঃ মারহাবা-মারহাবা! তাহলে কি করতে বলেন? এই পার্শ্ববর্তী এলাকার দিকেই —

ঃ হ্যাঁ। বিহার আমাদের অধীনস্ত। এটা বিশেষ একটা সুবিধে। কিন্তু বিহার ছাড়াও, সেই লক্ষ্যে আগে আপনার ত্রিহুত, নেপাল, গোরক্ষপুর এমন কি উৎকলতক্ এলাকাগুলো অধিকার করা উচিত। এগুলো শক্তি অধিকাংশই ক্ষুদ্রশক্তি। অথচ এরা এক ব্যাপক এলাকা দখল করে বসে আছে। এই ব্যাপক এলাকাটা নিজের অধীনে এনে দিল্লীর ফৌজের আগমন পথে একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার পরই সোনার গাঁয়ের দিকে হাত বাড়ানো উচিত বলে মনে করি আমি।

সুলতান ইলিয়াস শাহর মুখমণ্ডল রোশনাই হয়ে উঠলো। তাঁর নিজেরও ধ্যান ধারণা এই রকমই ছিল। উভয়ের চিন্তা এক হওয়ায় তিনি সোল্লাসে আওয়াজ দিলেন — শাববাশ্!

অতপর সুলতান শামসুউদ্দীন ইলিয়াস ঐ সমস্ত রাজ্যগুলি জয় করতে বেরুলেন। এসব অভিযান চরম কিছু শক্ত অভিযান না হওয়ায়, শরীফ রেজাকে তিনি আর এর মধ্যে টানলেন না। শরীফ রেজা গৌড়ে তার নিজ মকানে প্রত্যাবর্তন করলেন। সুলতান তাকে প্রাসাদোনুপম আবাসস্থল দান করতে চাইলেও, নিরিবিলির অজুহাতে তিনি সে আবাস প্রত্যাখ্যান করে নিজ মকানে ফিরে এলেন।

সুলতান ইলিয়াস শাহ রাজ্য জয়ে বেরুলেন। নিজ মকানে কয়েকদিন অবস্থানের পর শরীফ রেজা বেরুলেন লতা ওরফে লতিফা বানুর খোঁজে। তাঁর হুজুর তাঁকে বলেছেন, ঐ মাননৃপতির কন্যাকে নিয়েই ঘর করতে হবে তাঁকে। শক্ত নিয়াতে খুঁজলেই নাকি শরীফ রেজা খোঁজ পাবেন ঐ লতিফা বানুর। নতুন সংসার পাতার কথা একবিন্দুও সমর্থন তিনি করেননি। মাননৃপতির ঐ বেটিকে নিয়েই ঘর করতে হবে তাঁর। হুজুর তাঁকে পুনঃ পুনঃ এই নির্দেশই দিয়েছেন। অতএব, বিন্দুমাত্র অন্যথা নেই এখানে। যেখান থেকেই হোক আর যতদিনেই হোক, তার বিবাহিতা স্ত্রী ঐ লতিফাকে তার পেতেই হবে তালাশ করে।

শরীফ রেজা বেরুলেন। গৌড় থেকে বেরিয়ে উত্তর অঞ্চলের সম্ভাব্য সকল দিকে খোঁজ করতে করতে তিনি সাতগাঁয়ের ঐ আস্তানায় এসে হাজির হলেন। আস্তানার অস্তিত্বটা এখন পুরোপুরি মুছে যায়নি। তার প্রাণ প্রদীপ এখনও টিম টিম করে জ্বলছে। এই আস্তানাতেই আস্তানা গেড়ে তার চারদিকে শরীফ রেজা তালাশ করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি মাননৃপতির ভূখণ্ডে গিয়ে তালাশ করলেন। মাননৃপতিও নেই, তাঁর রাজ্য বা রাজত্বের আলাদা কোন অস্তিত্বও নেই। সাতগাঁয়ের মুসলিম রাজত্বের সাথে এক হয়ে গেছে। ঐ এতদিন আগের এক রাজকন্যার হদিস অর্থাৎ কোনদিকে গেছে বা কোথায় কে তাঁর আত্মীয়-স্বজন আছে — এসব খবর কেউ দিতে পারলো না। ভূদেব নৃপতির রাজ্যে গিয়ে খোঁজার পর তিনি গোটা রাঢ় অঞ্চল তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। ধলভূম, দণ্ডভুক্তি, ময়ূর ভঞ্জ, এমনকি সুলতান ইলিয়াস শাহর অভিযানে শরিক হয়ে উৎকলের অভ্যন্তরে অনেক দূরে গিয়ে তিনি খুঁজলেন, কিন্তু লতা বা লতিফা বানুর খোঁজ পাওয়া দূরের কথা, লতা বা তাঁর বংশের একটা লোকেরও নামটা কেউ শুনেছে—এমন লোক পেলেন না।

ফের তিনি ফিরে এলেন বাঙ্গালা মুলুকে। ফের তিনি বেরুলেন। মানভূম, ঝাড়খণ্ড, বিহার, পাটলীপুত্র — এই সমস্ত নানা স্থানে খোঁজ করে আত্মতৃপ্তির জন্যে তিনি অযোধ্যাতক গেলেন উলুগ জিয়া খানের আত্মীয় বা পরিচিতদের সন্ধানে। উদ্দেশ্য, তাঁরা যদি সেই লোকের হদিস্ দিতে পারে, যে লোক লতা আর তাঁর মাকে বাঙ্গালা মুলুকের পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল। হুজুর বলেছেন, খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। হুজুর তো মিথ্যা বলার লোক নন। তাঁকে হতোদ্যম হলে চলবে কেন ? কিন্তু অযোধ্যাতে এসেও ফল কিছু হলো না। এ ধরনের কোন কাউকেই পাওয়া গেলো না সেখানে। অতপর, একমাত্র অলৌকিক সূত্র ছাড়া তালাশ করে মাননৃপতির স্ত্রী-কন্যাকে বের করা যে আদৌ সম্ভব নয়, এ ব্যাপারে শরীফ রেজা নিঃসন্দেহ হয়ে গেলেন। এর চেয়ে তালাশ করার অধিক শক্ত নিয়ামতটা যে কি তার আকার-কিসিম কেমন — শরীফ রেজা তাও কিছু ঠাহর করতে পারলেন না। তবু, হুজুরের নির্দেশ, হতাশ হওয়ার অবকাশ তাঁর নেই। তাই, ঘরে ফিরে না গিয়ে শরীফ রেজা সাতগাঁয়েই পড়ে রইলেন এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় সন্ধান করতে লাগলেন।

অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহও একদিন উৎকল অভিযান সমাপ্ত করাসহ ত্রিহুত, নেপাল, চম্পা, গোরক্ষপুর — ইত্যাদি ছোটবড় কয়েকটা দেশ জয় করে পাণ্ডুয়ায় ফিরে এলেন। শরীফ রেজার অনুসন্ধান তখনও চলছেই। তিনি তখনও খুঁজেই ফিরছেন লতিফাকে কিন্তু সাতারের উপর পানি নেই। একদিন তিনি থেমে গেলেন। পথে পথে ঘুরে ঘুরে

বিধ্বস্ত সৈনিকের মতো অবশেষে হতাশ হয়েই তালাশ করা ছেড়ে দিলেন শরীফ রেজা। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে, উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় গৌড়ের সেই নিজ মকানে ফিরে এসে সটান হয়ে শুয়ে পড়লেন। দীলে তাঁর এক প্রশ্ন — এরপর কি করবেন তিনি ?

শয্যাশায়ী অবস্থায় শরীফ রেজা কয়েকদিন একটানা বিলাপ করে কাটালেন। একি কঠিন দায়ে হুজুর তাঁকে আবদ্ধ করে রেখে গেলেন। একি নির্মম খেলা খেললেন তিনি তাঁর সাথে! একি অব্যক্ত যন্ত্রণা। স্রেফ যদি সংসার করার কথা বলেই ক্ষান্ত হতেন হুজুর, লতিফা বানুর শর্ত জুড়ে না দিতেন, তাহলে আজ শরীফ রেজার সমস্যাই কিছু ছিল না। মাননৃপতির স্ত্রী-কন্যার হদিস করতে না পারলে, কনকলতাকে নিয়েই তিনি ঘর বাঁধতে পারতেন। কনকলতার দীলের যা বর্তমান অবস্থা, তাতে এ প্রস্তাব দিলে বা শরীফ রেজা এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলে কনকলতা যে বর্তে যাবে, শরীফ রেজার এতে আর লেশমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁর প্রতি কনকলতার আকর্ষণ শুধু দুর্বারই নয়, নজীরহীন। শয়নে-স্বপনে-নিদ্রায়-জাগরণে শরীফ রেজার আবর্তের বাইরে কনকলতার অস্তিত্ব যে কিছুই আর নেই, নিজেকে যে কনকলতা শরীফ রেজার অস্তিত্বের মধ্যে নিঃশেষে লীন করে দিয়েছেন, এবার গিয়ে শরীফ রেজা তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে এসেছেন। অথচ সে উপায়ও তাঁর নেই। একমাত্র ঐ মাননৃপতির মেয়ের সাথেই হুজুর তাঁর ইহজিন্দেগী পেরেক মেরে এঁটে দিয়ে গেছেন, বাইরে আসার ফাঁক কিছুই রাখেননি।

সেই সাথে শরীফ রেজা আরো ভেবে দেখলেন, ভুলুয়ার ঐ খান সাহেবের মকানে যাওয়ার উপায়ও আর তাঁর নেই। কনকলতা স্পষ্ট করে বলেছেন, তাঁর কিছু কথা আছে নিজের। সে কথাটা কি তাহলে ? যদি সে কথাটা এই কথাই হয় যে, সতীনের ঘরই করতে তিনি আগ্রহী ? আগের স্ত্রীর পাশাপাশি কনকলতাকেও শরীফ রেজার স্ত্রীর অধিকার দিতে হবে ? যদি সে কথাটা এই কথাই হয় যে, আগের স্ত্রীকে নিয়ে শরীফ রেজা যেখানে ইচ্ছে থাকুন, কনকলতা তাঁর স্ত্রীর পরিচয় চান শুধু ? ঐ পরিচয় নিয়ে তিনি তাঁর ঐ বর্তমান মকানেই কাল কাটাতে চান, আগের স্ত্রীকে নিয়ে শরীফ রেজার ঘর কন্যার মাঝে কনকলতা কোন রকম বিঘ্ন আনতে চান না ?

কথা যদি তাঁর এই-ই হয়, আর এই হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক, তাহলে ? তিনি 'না' করবেন কি করে ? স্বধর্ম ত্যাগ করে সতীনের ঘর করতে আগ্রহী হওয়ার পরও, শরীফ রেজার আর আপত্তি করার থাকবে কি ? তাঁর ঐ অতবড় ত্যাগের কথার পরও শরীফ রেজা কেমন করে মুখ ফিরিয়ে নেবেন ? আর তাই যদি তিনি নেন, তাহলে অবস্থাটা দাঁড়াবে কি ? কনকলতার প্রতি তাঁর এই

প্রাণের টান আর মুহাব্বত তামামই কি তার ছলনারূপে পরিগণিত হবে না ? কনকলতাকে আপন করে পাওয়ার জন্যে নয়, কনকলতার প্রতি তাঁর এই দরদ-মুহাব্বত-অনুভূতি সবকিছুই স্রেফ উপসত্ব ভোগ করার ছলনা — এইটেই কি প্রতিপন্ন হবে না ? এই কথাই কি উঠবে না যে, আর পাঁচজন লম্পট আর পাষণ্ডের মতোই শরীফ রেজাও একজন ভদ্রবেশী পাষণ্ড ? এমন অবস্থার পর আর শরীফ রেজার জিন্দা থাকার কি পথ থাকবে কিছু ? মওকা থাকবে মুখ দেখানোর ?

অতএব, তাঁর সামনে ভুলুয়ার পথও রুদ্ধ। ওখানেও আর যাওয়ার উপায় নেই তাঁর। তাহলে ? লতিফাকে পাওয়া গেলে তেমন ক্ষেত্রে দুই দিকই কোনমতে সামাল দিতে পারতেন তিনি পুরোটা না হলেও. হুজুরের নির্দেশও পালন করা হতো খানিক, কনকলতাকেও কিছুটা আশ্বস্ত করতে পারতেন। হুজুরের নির্দেশ তামামটাই উপেক্ষা করে কনকলতাকে নিয়ে তাঁর চিন্তা করারই মওকা নেই। আগে লতিফাকে চাই। কিন্তু সেই লতিফারই হদিস নেই। ফলে, আবার সেই প্রশ্ন—তাহলে ? তাহলে কি করবেন তিনি এখন ? সমাধান কি এই সমস্যার ? লতিফাকেও তালাশ করে পাবেন না, দুস্‌রা কাউকেও গ্রহণ করতেও পারবেন না, অথচ ঘর-সংসার করতে হবে— এ সমস্যার সমাধান কি ? দাওয়াই কি এই দুরপনেয় ব্যাধির ?

দাওয়াই শেষে পেলেন। চিন্তা করে দাওয়াই একটা বের করলেন শরীফ রেজা। সে দাওয়াই মউত। হুজুরের নির্দেশ খেলাপের দায় থেকে এবং কনকলতার কাছে প্রতারক হওয়ার প্রশ্ন থেকে তাঁর মুক্তি পাওয়ার কুল্লে দাওয়াই মউত। মউত ছাড়া আর দুস্‌রা দাওয়াই নেই। আত্মহত্যা মহাপাপ। এমন পাপে শরীফ রেজা লিপ্ত হতে পারেন না। তাঁর একমাত্র মুক্তি আসতে পারে যদি শহিদ হওয়ার কিস্‌মত তাঁর জোটে। শক্ত কোন লড়াইয়ে গিয়ে শহিদ হওয়ার কিস্‌মত!

এমনই যখন চিন্তাভাবনা শরীফ রেজার, তখনই তিনি দাওয়াত পেলেন লড়াইয়ের। দাওয়াত নিয়ে হাজির হলেন বরকতুল্লাহ সাহেব। তিনি এসে জানালেন. সুলতান শাম্‌স্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহ সোনার গাঁ দখল করার উদ্যোগ নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আনযাম প্রায় এগিয়ে গেছে অনেক খানি। শুধু শরীফ রেজার অপেক্ষাতেই আছেন এখন তিনি। শরীফ রেজা সমর্থন দিয়ে এ লড়াইয়ে শরিক হতে এগুলে আনযাম আরো জোরদার করবেন। অন্যথায় আবার তিনি তামাম আনযাম বাতিল করে দেবেন।

এই মুহূর্তে লড়াইয়ের দাওয়াত পাওয়ায় আচমকা এক শিহরণে শরীফ রেজার সর্বাঙ্গ আন্দোলিত হয়ে উঠলো। বিবরণ শুনে শরীফ রেজা প্রশ্ন করলেন—কেন ? আমি রাজী না থাকলেই আনযাম তিনি বাতিল করবেন কেন ?

জবাবে বরকতুল্লাহ সাহেব বললেন—সুলতান বাহাদুর খবর নিয়ে জেনেছেন. সোনার গাঁয়ের সুলতান ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ তাঁর সামরিক শক্তি ইতিমধ্যেই অত্যন্ত তাগ্‌ড়া করে তুলেছেন। ঐ পূব অঞ্চলে তিনি এখন এক অমিত পরাক্রম শক্তি। তাই আপনি রাজী না থাকলে এই মুহূর্তে ঐ শক্তির বিরুদ্ধে একা যাওয়া তিনি সমীচিন বোধ করবেন না। বিষয়টি তিনি পুনরায় ভেবে দেখবেন।

ঃ বটে!

ঃ আপনি পাশে থাকলে অবশ্য সুলতান বাহাদুরের মনোবলই আলাদা। সোনার গাঁয়ের ঐ শক্তি তখন কোন শক্তিই নয় তাঁর কাছে।

এই বুঝ এলো তাঁর সেই কিস্‌মত। শরীফ রেজা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বিপুল উৎসাহভরে তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন—রাজী। বরকতুল্লাহ সাহেব, জরুর আমি রাজী।

ঃ জনাব।

ঃ সুলতান বাহাদুরকে আমার সালাম দিয়ে জানান, এ লড়াইয়ে কামিয়াবীর সম্ভাবনা তাঁর চূড়ান্ত। আমার মৃত্যুর আগে তাঁর পরাজয়ের প্রশ্নই কিছু আসবে না।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা জনাবকে হায়াত দারাজ করুন। খোশদীলে বিদায় হলেন বরকতুল্লাহ সাহেব।

রওনা হওয়ার আগের দিন কনকলতার উদ্দেশ্যে পত্র পাঠালেন শরীফ রেজা। দায় মুক্তির পত্র। কনকলতার কাছে তিনি ওয়াদা করে এসেছেন, তাঁর বিয়ের ব্যাপারটা. বিশেষ করে ঐ ছাড়াছাড়ির ঘটনাটা, কনকলতাকে একদিন তিনি শোনাবেনই। যুদ্ধে যাবেন রাত পোহালেই। জীবনপণের লড়াই। যদি আর না ফেরেন ঐ লড়াই থেকে. তাহলে কনকলতার কাছে তিনি ওয়াদা খেলাপের দায়ে দায়ী হয়ে থাকবেন।

সশরীরে যাওয়ার ওয়াদাও আছে তাঁর। যাবেন তিনি বেঁচে থাকলে। মারা গেলে তাঁর লাশ যাবে ভুলুয়ায়। দাফন হবে মরহুম ফৌজদার সাহেবের গোরের পাশে। তাঁর দেয়া জমিনেই লাশ থাকবে শরীফ রেজার। এই ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছেন তিনি। তাঁর লোকজনেরা সে দায়িত্ব আগেই নিয়ে রেখেছে। পাণ্ডুয়ার সুলতান শাম্‌স্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহও জানেন তা। কিন্তু লাশতো তাঁর কোন কথাই কনকলতাকে বলবে না। তাই পত্রের মাধ্যমে কনকলতাকে তার বক্তব্যটুকু বলে পাঠিয়ে তিনি ওয়াদা পালন করলেন। তিনি লিখলেন —

ভদ্রে,

আপনি আমার বিয়ের কথা জানতে চান! জানতে চান, কি করে ফের বিচ্ছেদ ঘটলো আমাদের! আপনার সামনে বসেই এ কাহিনী বলার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু যুদ্ধে যাচ্ছি প্রত্যুষেই। কে জানে এই যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া হবে কিনা ? তাই পত্রের মারফত সে কথা আজ জানাতে চাই আপনাকে। আমার কপালের এই ছোট্ট কাটা দাগটা নিয়েও আপনার উৎসাহ ছিল প্রচুর। সবই ঐ একই সূত্রে গাঁথা। সবই বলছি, শুনুন—

আমি এক রাজকন্যার স্বামী। রাঢ় অঞ্চলের সামন্ত রাজা মাননৃপতির কন্যার। নাম তাঁর লতা। বিয়ের পর তাঁর নাম হয় লতিফা বানু বেগম। ভূদেব নৃপতির প্রাসাদে অকস্মাৎই বিয়েটা আমাদের সংঘটিত হলো। কিন্তু বিয়ের পরই বেঁকে বসলেন কনের মা। আমরা বর বধু কেউ কাউকে না দেখতেই বা আমাদের মধ্যে কোন রকম পয়পরিচয় না ঘটতেই, সে রাতেই কনেকে নিয়ে উধাও হলেন কনের মা। প্রাসাদ থেকে আরো কয়জন সঙ্গী সাথী নিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন অলক্ষ্যে। খবর পেয়েই স্ত্রীর খোঁজে ঐ রাতেই বেরিয়ে পড়লাম আমিও। আমার সঙ্গে রইলো ছোট্ট একটা সৈন্যদল। ধলভূমের কাছাকাছি আঁধার ঘেরা একস্থানে এসে সাক্ষাৎ পেলাম তাঁদের। তাঁরা এখন একদল দুর্বৃত্তের কবলে। দুর্বৃত্তেরা এসেছিল আমারই ঐ স্ত্রী মানে ঐ রাজকন্যাকে লুট করতে। তাঁদের আর্তনাদ কানে পড়তেই ছুটে এসে ঘিরে ধরলাম দুর্বৃত্তদের এবং তাদের সবাইকে হত্যা করে রক্ষা করলাম আমার স্ত্রী ও অন্যান্যদের। আঁধারের মধ্যে এঁদের এই রক্ষা করতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের আঘাতে কপালের এক অংশ কেটে গেল আমার। এই সেই কাটা দাগ।

ঘোর অন্ধকার তখন। কারো মুখমণ্ডল স্পষ্ট করে কেউ দেখতে পেলাম না। আমার শাশুড়ী নিজেই পরিচয় দিলেন তাঁদের। আমাকে তাঁরা চিনতেন না, চিনতেও তাঁরা চাইলেন না। বিপদমুক্তির কৃতজ্ঞতায় চোখমুখ নেড়ে পরম স্নেহে আমার শাশুড়ী আমাকে আশির্বাদ করতে লাগলেন। এই চোখ মুখ নাড়তে গিয়েই তাঁর হাত পড়ে আমার ক্ষতস্থানে। চমকে উঠে রক্তঝরা ক্ষতস্থানটা বেঁধে দেয়ার ইরাদায় আমার স্ত্রীর কাছে তিনি বস্ত্র চাইলেন একখণ্ড। আমার স্ত্রীর কাছে তখন কোন বস্ত্রখণ্ড না থাকায় মায়ের আদেশ পালনে তিনি তাঁর আঁচলেরই এক অংশ পড় পড় করে ছিড়ে দিলেন। আবেগ ভরে আমার স্ত্রীর আঁচল দিয়েই আমার কপালটা বেঁধে দিলেন আমার শাশুড়ী।

এর পরের কাহিনী করুণ! তাঁদের পালিয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমার শাশুড়ী আমাকে জানালেন, তাঁর এই মেয়েকে জোর করে মুসলমান করা হয়েছে এবং জোর করেই এক মুসলমানের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দেয়া

হয়েছে— যা তিনি কোনক্রমেই মেনে নিতে পারেন না। আর এই কারণেই মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তাঁকে নানাভাবে প্রশ্ন করা সত্ত্বেও তিনি পুনঃ পুনঃ জানালেন, প্রাণান্তেও মেয়েকে তিনি মুসলমান হতে দেবেন না এবং এ বিয়েও তিনি মানেন না।

তার চেয়েও আরো যা মর্মান্তিক তাহলো, আমার স্ত্রীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনিও নির্দ্বিধায় তাঁর মায়ের কথা সমর্থন করে বসলেন। অর্থাৎ মুসলমান হতে রাজী নন তিনিও এবং এ বিয়ে তিনিও মানেন না।

আমার স্ত্রীর ঐ অকম্পিত দ্ব্যর্থহীন সমর্থনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। লজ্জায় ঘৃণায় নিজের পরিচয় দেয়ার কোন রকম রুচি আর আমার রইলো না। পরিচয় দিলে আঁতকে উঠে তাঁরা যে ফের দৌড় দেবেন না তখনই, এইটাই বা নিশ্চিত করে বলবে কে ? তাই তাঁদের আকাঙ্ক্ষা মতো আমারই ফৌজের এক অংশ তাদের পলায়ন পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়োগ করে দিলাম।

কথাটা ঠিক বুঝলেন তো ? আমারই ভয়ে আমারই স্ত্রীর পলায়নের নিরাপত্তা আমরাই ফৌজ দ্বারা আমিই নিশ্চিত করে দিয়ে নিশ্চল হয়ে ঐ অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাকে ঐ অন্ধকারেই ফেলে রেখে আমার স্ত্রী নির্বিকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর আর তাঁদের কোন হদিসই আমি জানিনে। অদ্যাপিও নয়।

শরীফ রেজা।

আবার ছুটলো বাহিনী। পাণ্ডুয়ার সুলতান হাজী শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহর বাহিনী। এবার লক্ষ্য সোনার গাঁ। কতিপয় ক্ষুদ্র চেষ্টার পর লাখনৌতি বা গৌড় থেকে ফাঁকে এসে এই সোনার গাঁয়েই জন্ম নিয়েছে মুসলিম বাঙ্গালার আজাদী। এবার এই সোনার গাঁ জয় করেই গোটা বাঙ্গালার আজাদীকে পূর্ণরূপ দিতে যাচ্ছেন গৌড় রাজ্যের সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ। এ লড়াইয়ের সেনাপতি শরীফ রেজা। নিজেই তিনি চেয়ে নিয়েছেন লড়াই চালানোর এ দায়িত্ব। কথা হয়েছে—যতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, এ দায়িত্ব ততক্ষণ তিনিই পালন করবেন। পড়ে গেলে সুলতান আসবেন সৈনাপত্যে।

পড়ে গেলেন শরীফ রেজা। কিন্তু শহিদ হওয়ার কিস্‌মত তাঁর হলো না। ক্ষত-বিক্ষত দেহ থেকে অপরিমিত রক্ত ঝরে পড়ায়, জ্ঞান হারিয়ে অশ্ব থেকে পড়ে গেলেন তিনি।

শরীফ রেজা পড়ে যেতেই তাঁর কয়েকজন সেপাই তাঁকে তৎক্ষণাৎ তুলে নিয়ে ছাউনির দিকে ছুটলো এবং সুলতান শাম্‌সুউদ্দীন ইলিয়াস শাহ এসে সৈনাপত্যে দাঁড়ালেন। কিন্তু লড়াই প্রায় শেষ তখন। পূর্ণ বিজয় নিশ্চিত করে দিয়েই পড়ে গেলেন শরীফ রেজা।

এই লড়াই সকলের স্মরণীয় লড়াই। বিশেষ করে পাণ্ডুয়ার সুলতান ও সেপাই সেনার। দুরন্ত বেগে ছুটে এসে সোনার গাঁ আক্রমণ করলো পাণ্ডুয়ার সুলতান ইলিয়াস শাহর বাহিনী। আক্রমণ করেই পাণ্ডুয়ার ফৌজ বুঝলো, কাজটি বড় শক্ত কাজ। ইলিয়াস শাহর প্রাপ্ত খবর সর্বৈব সত্য। সোনার গাঁয়ের সুলতান ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহর ফৌজ বাস্তবিকই কল্পনাতীতভাবে এক দুর্জেয় ফৌজ ছিল। সুলতান শাম্‌সুউদ্দীন ইলিয়াস শাহর বাহিনী এসে সোনার গাঁয়ে হানা দিতেই এমন বিপুল বিক্রমে পাল্টা হামলা এলো, যা সামাল দেয়া পাণ্ডুয়ার বাহিনীর কাছে একেবারেই সাধ্যাতীত হয়ে গেল। সোনার গাঁয়ের সুলতান ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ তার সুশৃঙ্খল ও বিশাল বাহিনী নিয়ে বীর বিক্রমে রুখে দাঁড়ালেন আক্রমণকারী পাণ্ডুয়ার বাহিনীকে। শুধু রুখে দাঁড়ানোই নয়, এমন চাপ সৃষ্টি করলেন যে, লড়াইটা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সুলতান ইলিয়াস শাহর বাহিনী পিছু হটতে লাগলো। আরো যা মারাত্মক তাহলো— খোদ ইলিয়াস শাহ সহকারে পাণ্ডুয়ার অন্যান্য সেনাপতিরা নিজ নিজ অবস্থানে শত্রু বেষ্টিত হয়ে এমনভাবে আটকে গেলেন যে, শহিদ হওয়ার দুর্বার ঐ আকাঙ্খা নিয়ে শরীফ রেজা এ লড়াইয়ে শরিক হতে না এলে, পরাজয়ই নয় স্রেফ, পাণ্ডুয়ার সুলতান সহ তাঁর সেপাই সেনা তামামই সোনার গাঁয়ের ময়দানে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন।

শরীফ রেজা সেনাপতি। তিনি পুরোভাগেই ছিলেন। পরিস্থিতিটা অনুধাবন করেই মাথায় তাঁর খুন চেপে গেল। সেই সাথে তাঁর দীলের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে উঠলো শহিদ হওয়ার নিভৃত সেই আকাঙ্খা। আর তাঁকে পায়কে ? মরণকেই যে ধরতে চায়, মরণ আর তার কাছে আসে কোন সাহসে ? তাঁর সাথে অগ্রবর্তী বাহিনীটাকে অনুসরণ করার ইংগিত দিয়েই তিনি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রু সেনার উপর এবং দুরন্ত বজ্রের মতো শত্রুব্যূহ ভেদ করে গাজী শাহর সন্ধানে ঢুকে গেলেন মধ্যস্থলে। পিছে পিছে তাঁর সেপাইরা তাঁর তৈরি করা সংকীর্ণ পথ আরো অধিক প্রশস্ত করে ভেতরে ঢুকতে লাগলো। ভেতরে এসেই শরীফ রেজা সামনে পেলেন সোনার গাঁয়ের সুলতান ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহকে। সঙ্গে সঙ্গে শরীফ রেজা চড়াও হলেন তাঁর উপর।

একমাত্র মৃত্যুর জন্যে লালায়িত ব্যক্তি ছাড়া, এমনভাবে শত্রু-সেনার অভ্যন্তরে কেউ মেরে-ঠেলে ঢুকে না। সে কারণেই সুলতান গাজী শাহ এতটার

জন্যে আদৌ তৈয়ার ছিলেন না। আকস্মিক এই হামলায় তিনি দিশেহারা হয়ে গেলেন। প্রতিরোধ করার চেষ্টা তিনি সংগে সংগেই করলেন বটে, কিন্তু তাঁর সেপাই সেনারা ভেতরের খবর বুঝে উঠার আগেই শরীফ রেজার ফৌজের হাতে নিহত হলেন সোনার গাঁয়ের সুলতান ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ। গাজী শাহর নিকটবর্তী সেপাইরাও শরীফ রেজাদের ঘেরাও করে ফেললো ঠিকই, কিন্তু ইতিমধ্যেই গাজী শাহর মৃত্যু ঘটায় তারা চমকে উঠে পিছিয়ে গেল, আর এতে করেই ঘুরে গেল যুদ্ধের মোড়।

অস্ত্র চালনার পরিবর্তে আহাজারী আর আর্তনাদে মত্ত হলো সোনার গাঁয়ের সেপাইরা। সমগ্র বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে গেল দুঃসংবাদ। এতে করে সোনার গাঁয়ের তামাম সেপাই হতোদ্যম ও দিশেহারা হয়ে গেল। তা দেখে পশ্চাদ্‌গামী পাণ্ডুয়ার ফৌজ চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তাদের মনোবল ও সাহস-শক্তি শতগুণে বেড়ে গেল। ফের তারা গর্জে উঠে মহাবলে ঝাঁপিয়ে পড়লো হতোদ্যম প্রতি পক্ষের উপর। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুসেনার ব্যূহ-কাতার-আবেষ্টনী জীর্ণ করে ফেললো।

শরীফ রেজা তখনও উন্মত্তবৎ শত্রুসেনা নিধন করে যাচ্ছেন। শত্রুপক্ষের অসংখ্য আঘাতে দেহ তাঁর ক্ষত-বিক্ষত। রক্ত ঝরছে অবিরাম। কিন্তু তিনি তখন হুঁশ বুদ্ধির উর্ধে। অনুভূতি ও খেয়ালহীন। শত্রু সেনা নিধন করাই একমাত্র কাজ তাঁর। এই নেশায় আচ্ছন্ন।

পাণ্ডুয়ার বাহিনীর ঐ দুস্‌রা দফার উদ্যমে সোনার গাঁয়ের সুলতানহীন বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই বিপুল রক্তক্ষরণ হেতু অশ্ব থেকে অবশ হয়ে গড়িয়ে পড়লেন শরীফ রেজা। তাঁর সেপাইরা তাঁকে সরিয়ে নেয়ার সাথে সাথেই সুলতান এসে তাঁর জায়গায় সেনাপতি হয়ে দাঁড়ালেন এবং অল্পক্ষণের হালকা একটা লড়াইয়ের পর প্রায় সমাপ্ত বিজয়কে সুসমাপ্ত করে বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

ময়দানের লড়াই সমাপ্ত করেই সুলতান শাম্‌সুউদ্দীন ইলিয়াস শাহ সোনার গাঁয়ের সদর দপ্তরে প্রবেশ করলেন এবং সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ এই গোটা বাঙ্গালার স্বাধীন সোলতানত কায়েম করলেন। পূর্ণ করলেন মশহুর দরবেশ শায়খ শাহ শফীউদ্দীন, মরহুম ফৌজদার সোলায়মান খান ও শরীফ রেজাসহ দ্বীন ও কওমের অন্যান্য খাদেমদের দীর্ঘ দিনের উম্মিদ, দৃঢ় করলেন এ মুলুকের দ্বীন ও কওমের শংকিত ভিত্।

সদর দপ্তর দখল করেই সুলতান ইলিয়াস শাহ শরীফ রেজাকে সোনার গাঁয়ের প্রাসাদে তুলে আনলেন এবং সোনার গাঁয়ের নামজাদা হেকিম বৈদ্য এনে তাঁর চিকিৎসায় নিয়োগ করলেন। শুরু হলো মউতের সাথে লড়াই। হেকিমদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে কয়েকদিন পর আস্তে আস্তে চোখ মেললেন শরীফ রেজা।

অতপর সুলতানের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে একটানা আরো কয়েকদিন শরীফ রেজার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা পূর্ণোদ্যমে চললো। কিন্তু কিছু উন্নতি হলেও, চেষ্টানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। শরীফ রেজার রক্তহীন অবসন্ন দেহে এমন কোন শক্তি পয়দা হলো না যে, শক্ত হয়ে উঠে তিনি দাঁড়ান। তিনি শয্যাশায়ীই হয়ে রইলেন।

অবশেষে পাণ্ডুয়াতে প্রত্যাবর্তন জরুরী হয়ে পড়ায়। সুলতান শাম্‌সুদ্দীন ইলিয়াস শাহ হেকিমদের নিয়ে বসলেন। হেকিমগণ জানালেন, জটিল মুহূর্ত পার হয়ে গেলেও শরীফ রেজার অবস্থার এখনও এমন কিছু উন্নতি সাধন হয়নি, যাতে করে এত দীর্ঘ ধকল তিনি সামাল দিতে পারবেন। অবস্থা তাঁর এখনও খুব নাজুক। টানা হেঁচড়া অধিক হলে, ফলাফলটা যে কোন সময় মারাত্মক হয়ে পড়বে।

অবস্থা তাঁর নাজুক, একথা শরীফ রেজাও গভীরভাবে ভাবছেন। জ্ঞান ফেরার পর থেকেই তাঁর মনের মধ্যে একটা ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনি কেবলই ভাবছেন, সঙ্গে সঙ্গে শহিদ হওয়ার কিস্‌মত তাঁর না হলেও, আর তিনি বাঁচবেন না। এই শোয়াই তাঁর শেষ শোয়া। কয়েকদিনের বিরামহীন চিকিৎসার পরও উন্নতি যখন তেমন কিছুই হলো না, তখন তাঁর এই ধারণাই হলো যে, দিন তাঁর ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছে। ফলে, পাণ্ডুয়াতে ওয়াপস্ যাওয়ার কালে সুলতান শাম্‌সুদ্দীন ইলিয়াস শাহ এই সোনার গাঁয়েই শরীফ রেজার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে রেখে যাওয়ার বিশেষভাবে পক্ষপাতী হলেও, বেঁকে বসলেন শরীফ রেজা। তিনি জিদ্ ধরলেন, পাণ্ডুয়া খুব দূরে, কিন্তু ভুলুয়া অধিক দূরে নয়। যেভাবে হোক, ভুলুয়ায় ঐ মরহুম ফৌজদার সাহেবের মকানে তাঁকে প্রেরণ করা হোক। শেষ ক'টা দিন ওখানেই তিনি কাটাতে চান। হেকিম সাহেবেরাও অনেক তাঁকে বোঝালেন। তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণা ঠিক নয়, অবস্থা তাঁর আসলেই এতটা জটিল নয় — পুনঃ পুনঃ এ আশ্বাস তারা দিলেন। ভুলুয়ায় গেলে, সুস্থ হয়ে উঠেই তিনি সেখানে যেতে পারবেন — এমনটিও বললেন তাঁরা। কিন্তু শরীফ রেজা জিদ্ থেকে নড়লেন না।

অগত্যা বাধ্য হয়েই যথাসম্ভব নিরাপদ ব্যবস্থাদির মাধ্যমে শরীফ রেজাকে ভুলুয়ায় পাঠিয়ে দিয়ে সুলতান হাজী শাম্‌সুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সসৈন্যে পাণ্ডুয়ার পথ ধরলেন।

মরহুম ফৌজদার সোলায়মান খান সাহেবের মকানে বসে পদ্মরাণীর কাছে কনকলতা হারিসউদ্দীন ও নূরীর বিয়ের গল্প শুনছেন। কেমন করে ছেলে বয়সেই বিয়ে হলো তাদের, নূরীর মায়ের জিদে কেমন করে সে বিয়ে তাদের সেই মুহূর্তেই ভেঙ্গে যেতে বসেছিল, ইনসান আলী সাহেব গিয়ে কেমন করে সে বিয়ে তাদের কায়েম করে দিলেন আবার—সেসব কথা পদ্মরাণী বয়ান করে শুনাচ্ছে আর মোহাবিষ্টের মতো তা শ্রবণ করছেন কনকলতা।

এমন সময় দবির খাঁ এসে অপরাধীর মতো নতমস্তকে দাঁড়ালো। তার উপস্থিতি কনকলতা লক্ষ্য করলেন না দেখে, দবির খাঁ ইতস্ততঃ করে বললো — আম্মিজান —

স্বপ্নোত্থিতের মতো কনকলতা বললেন—এ্যা! কিছু বলছো বাবা ?

ঃ জি আম্মিজান।

ঃ বলো—

দবির খাঁ মাথা চুলকিয়ে বললো— জব্বোর গল্‌তি হয়ে গেছে।

ঃ গল্‌তি!

ঃ জি আম্মিজান। আমি জব্বোর গলতি করে ফেলেছি।

ঃ কি রকম ?

জেব থেকে একখানা পত্র টেনে বের করে দবির খাঁ বললো — এই খতখানা জিয়াদা দিন আগে গৌড় থেকে এসেছে। এক লোক মারফত। তুমি তখন মকানে হাজির না থাকায় এটা আমিই নিয়ে বাকসের মধ্যে রেখে দিই। লেকেন —

কনকলতা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে বললেন—লেকেন ?

ঃ আমার গল্‌তি হয়ে গেছে আম্মিজান। এটা তোমাকে দিতে আমি বিলকুল ভুলে গেছি।

ঃ কোথা থেকে এসেছে বললে ? গৌড় থেকে ?

ঃ জি-জি।

ঃ সে কি! এতবড় ভুল তোমার ? দাও-দাও, শিগ্‌গির দাও —

পত্রখানা কনকলতার হাতে দিয়ে ভয়ে ভয়ে সরে পড়লো দবির খাঁ। ত্রস্ত-হস্তে কনকলতা পত্রখানা খুললেন। পত্রের শেষ অংশে শরীফ রেজার নাম

দেখে তিনি অত্যন্ত আগ্রহভরে পড়তে শুরু করলেন। কয়েক ছত্র পড়ার পরই কনকলতার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো। এক নিঃশ্বাসে পত্রখানা পাঠ করেই বিপুল বেগে ফুঁপিয়ে উঠলেন কনকলতা। সশব্দে কাঁদতে কাঁদতে বললেন — পদ্মরে —

চমকে উঠলো পদ্মরাণী। সে সবিস্ময়ে বললো — কি হলো দিদিমণি ? কি আছে ঐ পত্রে ?

কথা বলার সাধ্যটুকুও কনকলতার আর ছিল না। তিনি মুখে কিছু না বলে পত্রখানাই পদ্মরাণীর হাতে দিলেন এবং একটানা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

পদ্মরাণী পত্রখানা আদ্য-অন্ত পাঠ করে সবিস্ময়ে বললো — তো কি হয়েছে দিদিমণি ? এতে আপনার এত আফসোস্ করার কি আছে ?

পুনরায় সশব্দে কেঁদে উঠলেন কনকলতা। কাঁদতে কাঁদতে বললেন ওরে পদ্ম ? আমিই সেই মাননৃপতির কন্যা, আমিই সেই লতা!

চমকে উঠে পদ্মরাণী বললো — এ্যাঁ — সে কি!

বিপুল বিস্ময়ে আচ্ছন্ন পদ্মরাণীর মুখে অতপর আর কোন কথাই ফুটলো না। ক্ষণিকের জন্যে সেও বোবা হয়ে গেল।

ঠিক এই মুহূর্তে ছুটে এলো হারিসউদ্দীন। এসেই সে চীৎকার করে বলতে লাগলো — আপামণি, আপামণি, শিগ্‌গির আসুন — শিগ্‌গির! খান সাহেব, মানে আপনার বাবা, এক বিমারীকে আপনার ঐ ঘরে তুলে দিয়েছে, আপনার ঐ তালা দেয়া ঘরে।

বাকশক্তি রহিত কনকলতা আর পদ্মরাণীর তরফ থেকে কোন জবাব না আসায় হারিসউদ্দীন আরো মরিয়া হয়ে উঠলো এবং আরো অধিক চীৎকার করে বলতে লাগলো—আপামণি আরো অনেক লোক ঢুকেছে আপনার ঐ ঘরে। দেখেই আমি বাড়ীতে গিয়ে তালাশ করলাম আপনার। মুইজুদ্দীন চাচার বাড়ীতেও আপনাকে না পেয়ে এই এখানে ছুটে এলাম। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। জলদি আসুন — জলদি আসুন, পাগল ঐ খাঁ সাহেবের পাগলামীতে ঘরটা আপনার কেমন তছনছ হয়ে গেল, দেখবেন আসুন —

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! হতবুদ্ধি কনকলতা অসহায়ভাবে পদ্মরাণীর মুখের দিকে তাকালেন। কনকলতার চোখের ভাষা বুঝতে পেরেই পদ্মরাণী তৎক্ষণাৎ বাইরের দিকে ছুটলো। হারিসউদ্দিনও পদ্মরাণীর পিছে পিছে দৌড় দিলো।

একটু পরেই বাইরে থেকে চীৎকার এলো পদ্মরাণীর — দিমিমণি, ছোট হুজুর —

'ছোট হুজুর' শব্দটা কানে যেতেই ভীষণভাবে চমকে উঠলেন কনকলতা। তিনিও তৎক্ষণাৎ উন্মাদিনীর মতো সেই দিকে ছুটলেন।

দবির খাঁ যখন শরীফ রেজার পত্রখানা কনকলতার হাতে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো, ঠিক সেই সময়ের ঘটনা। ঠিক সেই সময় সোনার গাঁ থেকে অসুস্থ শরীফ রেজার কাফেলা ভুলুয়ায় এই খান সাহেবের মকানে এসে শরীফ রেজার ঘরের সামনে দাঁড়ালো। দুর্বল শরীফ রেজাকে ধরাধরি করে নিয়ে তাঁর লোকজনেরা তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট সেই তালাবদ্ধ ঘরের বারান্দায় উঠতেই, দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে ছুটে এলো দবির খাঁ। শরীফ রেজাকে বিমারী অবস্থায় দেখেই "কেয়া গজব–কেয়া গজব" করতে করতে সে ত্রস্তহস্তে ঘরের তালা খুলে দিলো এবং সবার সাথে সেও শরীফ রেজাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পানি-পাখা, এটা-সেটা যোগান দেয়ার কাজে ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। হারিসউদ্দীন দূর থেকে এ দৃশ্য দেখেই কনকলতাকে খবর দেয়ার জন্যে কনকলতার বাড়ীর দিকে দৌড় দিলো।

শরীফ রেজার কাফেলার সাথে ছিল কিছু সৈনিক, কিছু খাদেম, কয়েকজন পাল্কী বাহক ও সোনার গাঁয়ের একজন প্রখ্যাত হেকিম। শরীফ রেজাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে একজন মাত্র সৈনিককে বাতাস করার কাজে রেখে হেকিম সাহেব আর সবাইকে ঘর থেকে বাইরে সরিয়ে নিলেন এবং হৈ চৈ করতে নিষেধ করলেন। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসার পেরেশানীতে শরীফ রেজা অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। আরাম করে শুইতে পেয়ে এবং পাখার বাতাসে তিনি অল্পক্ষণেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। তা দেখে হেকিম সাহেব নিজে এসে দুয়ার আগ্‌লে দাঁড়ালেন এবং বারান্দার উপর থেকেও লোকজনদের নামিয়ে দিলেন।

হারিসউদ্দীনের খবরে পদ্মরাণী ছুটে এসে শরীফ রেজার বারান্দার উপর উঠলো এবং খোলা দরজা দিয়ে বিছানায় শায়িত সজ্ঞাহীন শরীফ রেজাকে দেখেই সে চীৎকার দিতে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন হেকিম সাহেব। সন্ত্রস্ত ও কঠিনভাবে ইশারা করে তিনি পদ্মরাণীকে আওয়াজ দিতে নিষেধ করলেন এবং তাকে বারান্দা থেকে নেমে যাওয়ার ইংগিত দিলেন। দিশেহারা পদ্মরাণী তখনই ফের বারান্দা থেকে নেমে ফৌজদার সাহেবের অন্দরের দিকে ছুটলো এবং রাস্তা থেকেই আওয়াজ দিলো — দিদিমনি, ছোট হুজুর —

পদ্মরাণীর আওয়াজে উদ্ভ্রান্ত কনকলতাও উন্মাদিনীর মতো দৌড়ের উপর এসে সেই বারান্দার উপর উঠলেন। হেকিম সাহেব সামনেই ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি দুই হাত জোড় করে চাপা অথচ ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—দোহাই আপনাদের, বিমারীটাকে মেরে ফেলবেন না আপনারা! তাকে একটু বিরাম নিতে দিন।

এতক্ষণে কনকলতা কিছুটা হুঁশে এলেন। একথায় তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং জবান ফিরে পেতেই বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন — মেরে ফেলবো মানে! কে ? বিমারীটা কে ?

হেকিম সাহেব ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — একটু এদিকে আসুন, এদিকে আসুন —

বলতে বলতে হেকিম সাহেব বারান্দার এক প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। যন্ত্র চালিতের মতো কনকলতা তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতেই হেকিম সাহেব বললেন — বিমারীর নাম শরীফ রেজা। উনি এই বাড়ীরই লোক।

থর থর করে কেঁপে উঠলেন কনকলতা। আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কি হয়েছে তাঁর ? কি হয়েছে ?

ঃ সে অনেক কথা। দীর্ঘপথের ক্লান্তির পর এখন একটু চোখ মুজেছেন উনি। এমনিতেই উনি আগে থেকেই খুব দুর্বল। তার উপর সোনার গাঁ থেকে আসতে এই দীর্ঘপথের পেরেশানীতে উনার হৃদপিণ্ড কমজোর হয়ে এসেছে। বিশ্রাম তাঁর একান্ত প্রয়োজন। এই মুহূর্তে বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটলে, অবস্থা তাঁর মারাত্মক মোড় নিতে পারে। কিছুক্ষণের জন্যে এই মেহেরবানীটুকু করুন আপনারা।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করে কনকলতা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যেই চারপাশে আরো অনেক লোকের ভিড় জমতে লাগলো। তা দেখেই হেকিম সাহেব বারান্দা থেকে নেমে এলেন এবং আর কেউ যেন বারান্দায় এখন না আসে বা হৈ-হল্লোর না করে, এই মর্মে সোনার গাঁ থেকে আগত সেপাইদের তিনি হুঁশিয়ার করে দিলেন।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুহূর্ত খানেক দাঁড়িয়ে থাকার পর কনকলতা ফের বারান্দার নীচে হেকিমের কাছে ছুটে এলেন এবং কম্পিত কণ্ঠে বললেন — আপনি, আপনি কে ?

ঃ আমি তাঁর হেকিম।

ঃ হেকিম ? দোহাই আপনার! তাহলে বলুন, সত্যি করে বলুন, বাঁচার আশা আছে তো তাঁর ?

কনকলতার আকুতি দেখে হেকিম সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন — আরে না-না! আল্লাহর রহমে সে রকম কোন ভয় আর নেই! কিন্তু এখন উনি খুবই ক্লান্ত। একটু ঘুমানোর দরকার। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারলেই পথের এই ধকলটা উনি সামলে নিতে পারবেন। খুবই দুর্বল তো!

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে কনকলতা ফের প্রশ্ন করলেন — কেন, কি হয়েছিল তাঁর ? দুর্বল হলেন কেন ?

ঃ বলবো-বলবো। কিন্তু আপনি ?

দবির খাঁ, মুইজুদ্দীন মালিক ও অন্যান্য আরো অনেকে হেকিম সাহেবকে ঘিরে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পদ্মরাণীও ফিরে এসে কনকলতার পাশে পাশে ফিরছিলো। হেকিম সাহেবের প্রশ্নের জবাবে দবির খাঁ বললো — মালেকা-মালেকা, হেকিম সাহেব, এই আম্মিই এই মকানের খোদ মালেকা।

হেকিম সাহেব অপ্রতিভ হয়ে লজ্জিত কণ্ঠে বললেন — সেকি! আপনিই সেই ভদ্র মহিলা ? কি তাজ্জব! কি তাজ্জব! মনে মনে আমরা এতক্ষণ আপনারই খোঁজ করছি।

এলোপাথাড়ি ধাক্কায় বিহবল কনকলতা আস্তে আস্তে সামলে নিলেন নিজেকে। রুঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি এবার সংযত কণ্ঠে বললেন — হ্যাঁ, আপনারা আমারই মেহমান। কিন্তু দয়া করে আগে বলুন, কি হয়েছিল তাঁর ?

একটু থেমে হেকিম সাহেব বললেন — ঘটনাটা করুণ। বাঙ্গালার বর্তমান সুলতান আলহাজ ইলিয়াস শাহের পক্ষ নিয়ে সোনার গাঁয়ে লড়তে এসে উনি ক্ষত-বিক্ষত হন। আঘাত কোনটাই মারাত্মক না হলেও ক্ষতের সংখ্যা অনেক। এই অসংখ্য ক্ষত বেয়ে বিপুল পরিমাণ রক্তক্ষরণের ফলে উনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। এরপর সঙ্গে সঙ্গেই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া হলে রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হয় এবং উনি ক্রমে ক্রমে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেন।

কিন্তু —

হেকিম সাহেব থামলেন। কনকলতা পুনরায় বিচলিত হয়ে উঠে বললেন — কিন্তু ? কিন্তু কি ?

ঃ ক্ষতস্থান তামামই তাঁর শুকিয়েই প্রায় এসেছে। এতদিনে উনি প্রায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতেন। কিন্তু উনার নিজের দোষেই দেহে এখনও শক্তি সঞ্চার হচ্ছে না।

ঃ নিজের দোষে!

ঃ জি। জিন্দেগীর উপর কেন যেন তাঁর চরম অনিহা। সুস্থ হয়ে উঠতে নিজেই তিনি নারাজ। আর এতে করেই আহার-পথ্য-দাওয়াই—কোন কিছুই সঠিকভাবে গ্রহণ উনি করছেন না।

ঃ সেকি!

ঃ জিন্দেগীর প্রতি কিছুটা আগ্রহী হয়ে উঠলেই কিন্তু আর কোন দুর্বলতা তাঁর থাকে না। তিনি তর তর করে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আমরা তাকে অনেকভাবে বুঝিয়েছি। কিন্তু ফল হয়নি। এবার আপনারা সবাই চেষ্টা করে দেখুন, তাঁর মন মতলব ফিরিয়ে আনতে পারেন কিনা। দাওয়াই-এর আর অধিক প্রয়োজন নেই। এখন প্রয়োজন সেবাযত্ন আর তাঁর মানসিক প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনা।

ঃ তা মানে —

ঃ দরদ, বুঝলেন, দরদ। খুব দরদ দিয়ে সেবাযত্ন করতে পারে এমন লোককেই তাঁর সেবায় এখন নিয়োগ করতে হবে। সুলতানের নির্দেশে আমরা এসেছি, আমরা আবার ফিরে যাবো। তাঁর সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব এখন আপনাদেরই নিতে হবে।

এক লহমা নীরব থেকে কনকলতা বললেন — তাঁর কাছে এখন কে আছে?

হেকিম সাহেব বললেন — আমাদেরই এক সেপাই। সে পাশে বসে বাতাস করছে।

ঃ সেপাই!

ঃ জি। কিন্তু ঐ যে বললাম, সেপাই-নওকরের সেবায় ফল বিশেষ হবে না। তাঁর যদি একান্তই আপনজন কেউ থাকে এখানে, তাকেই গিয়ে তাঁর সেবায় বসতে হবে এবং সেবার মাধ্যমে তার মনের গতি ফিরিয়ে আনতে হবে।

কনকলতা এবার অবিচল কণ্ঠে বললেন — আপনাদের ঐ সেপাইকে বেরিয়ে আসতে বলুন। আমিই গিয়ে তাঁর কাছে বসবো।

হেকিম সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—আপনি?

ঃ তাঁর শুশ্রূষার দায়িত্ব এখন আমার। ও নিয়ে আপনাদের আর কিছুই ভাবতে হবে না।

হেকিম সাহেব আমতা আমতা করতে লাগলেন। তা দেখে কনকলতা প্রত্যয়ের সুরে বললেন — ভয় নেই। তার ঘুম আমি ভাঙ্গাবো না।

কনকলতা এগুলেন। হেকিম সাহেব তবুও সংশয়ের সাথে বললেন — কিন্তু আপনি—

কথা বললো পদ্মরাণী। সে হেকিম সাহেবের সামনে এসে বললো — উনিই তাঁর একান্ত আপনজন।

ঃ আপনজন!

ঃ উনার চেয়ে ঐ হুজুরের আর বড় আপনজন এ দুনিয়ায় কেউ নেই। উনাকে যেতে দিন।

ঃ তাই নাকি?

ঃ জি। ঐ হুজুরের প্রতি উনার চেয়ে অধিক দরদও আর কারো নেই। আপনি খামাখা ইতস্ততঃ করবেন না। উনাকে যেতে দিন।

হেকিম সাহেব এবার উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন — অবশ্যই-অবশ্যই। তাহলে তো আর কথাই নেই।

বলতে বলতে তিনি গিয়ে ব্যজনরত সেপাইটিকে পাখা রেখে বেরিয়ে আসতে ইংগিত দিলেন। সেপাইটি বেরিয়ে এলে কনকলতা নিঃশব্দে গিয়ে শরীফ রেজার মাথার কাছে পাখা হাতে বসলেন।

ঘরে ঢুকেই শরীফ রেজার শরীরের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন কনকলতা। সর্বাঙ্গে তাঁর অসংখ্য শুকনো ও আধা শুকনো ক্ষতচিহ্ন দেখে কনকলতার অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠলো। দাঁত দিয়ে সবলে ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্নার বেগ রোধ করলেন তিনি। অতপর চোখ মুছে নিঃশব্দে গিয়ে পাখা হাতে বসলেন এবং নিষ্ঠার সাথে শরীফ রেজাকে বাতাস করতে লাগলেন।

শরীফ রেজা অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। কনকলতা বসার পর অনেক সময় কেটে গেল। মেহমানদের নিয়ে মুইজুদ্দীন মালিকেরা মেহমানদারী করার জন্যে দহলীজে রওনা হলো। সমবেত লোকজনও একে একে বিদেয় হলো। বারান্দার নীচে পাহারারত দবির খাঁর পায়চারীও শ্লথ হয়ে এলো। পদ্মরাণী একবার অন্দর একবার বাহির করতে করতে এক সময় সেও বারান্দার নীচে এক পাশে বসে পড়লো। শরীফ রেজার ঘুম তখনও ভাঙ্গলো না।

ঘুম ভাঙ্গলো একদম শেষ বিকেলে। পূর্বাহ্ন থেকে অপরাহ্নতক্ একটানা ঘুমিয়ে শরীফ রেজা হাই তুলে চোখ মেলে তাকালেন এবং পাশে কনকলতাকে দেখেই — আরে! এই যে আপনি এসেছেন —

বলতে বলতে তিনি ধড়মড় করে উঠতে গেলেন। শরীফ রেজাকে সবলে শুইয়ে দিতে দিতে কনকলতা ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন — দোহাই-দোহাই! উঠবেন না। আপনি উঠবেন না। আপনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন!

অগত্যা পুনরায় বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে শরীফ রেজা সহাস্যে বললেন — আরে না-না, এতটা অসুস্থ আর নেই আমি। এখন অনেকটা জোর পাই গায়ে।

ঃ পান, বেশ ভাল কথা। তবু আপনি নড়ানড়ি করবেন না। পথে অনেক ক্লান্তি গেছে।

ঃ জি, তা গেছে। কিন্তু এই ঘুমটা হওয়ায় বেশ এখন আরাম বোধ করছি।

কনকলতা ধরা গলায় বললেন—তা করলেই ভাল। কিন্তু এই সর্বনাশটা করলেন আপনি কেন ? এমন লড়াই না লড়লেই কি চলতো না ?

শরীফ রেজা এ প্রশ্নের কোনই জবাব দিলেন না। চোখ মুজে গা এলিয়ে পড়ে রইলেন। কনকলতার ঠোঁট দু'টি ঈষৎ কেঁপে উঠলো। ফের তিনি বললেন — কৈ, কিছুই বলছেন না যে ?

শরীফ রেজা ম্লান কণ্ঠে বললেন — কি বলবো, বলুন ?

ঃ কি বলবেন মানে ? নিজের জান দিয়ে সুলতানকে জেতাতে হবে, এত গরজই ছিল আপনার ? সুলতানের নিজের বা তাঁর আর কোন সালারের এমন গরজ ছিল না ?

শরীফ রেজা নীরব হলেন। কনকলতা ফের বললেন — আপনার কি জবাব দিতে কষ্ট হচ্ছে ?

ম্লান হেসে শরীফ রেজা বললেন — না-না, তা হবে কেন ?

ঃ তাহলে বলুন, সুলতানকে জেতানোর জন্যে আপনি এভাবে জান দিতে গেলেন কেন ?

শরীফ রেজার মুখ মণ্ডলে বিষাদের ছায়া পড়লো । আরো একটু নীরব থেকে এর জবাবে তিনি ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন — আমি জানি, শত হেকিম আমার জন্য প্রাণপাত করলেও তারা আমাকে সারিয়ে তুলতে পারবেন না । সেরে উঠার জন্যে যে মানসিক শক্তি লাগে সে শক্তির বিন্দুমাত্র অস্তিত্বও আমার মধ্যে নেই। আর তাই খান সাহেবের কবরের পাশে থাকার জন্যেই এখানে আমি এসেছি । সুতরাং আজ আর কিছুই আপনার কাছে গোপন আমি করবো না। আমার এই অবস্থা শুধু সুলতানকে জেতানোর জন্যেই নয়, আসলে আমি তো আমার জানটাই দেয়ার জন্যে ঐ লড়াইয়ে নেমেছিলাম। কিন্তু বদনসীব। কষ্টই পেলাম জানটা তখনই গেল না।

কনকলতার ঠোঁটের কাপন দ্রুত হলো। তিনি বললেন — সেকি! কেন, আপনি জান দিতে গেলেন কেন ?

ঐভাবেই চোখ মুজে পড়ে থেকে শরীফ রেজা বললেন — কি হবে আর এই অবলম্বনহীন জিন্দেগীটা বয়ে বেরিয়ে বলুন ? এই হালহীন-গন্তব্যহীন কিস্তিটা ভাসলেই কি, ডুবলেই কি ? বেঁচে থাকার অবলম্বনতো কিছুই আমার নেই!

ঃ নেই ?

ঃ কিছুমাত্র নেই। আমার পত্রতো আপনি পেয়েছেন ?

পুনরায় ঠোঁট কামড়ে উদগত কান্নার বেগ রোধ করতে করতে কনকলতা বললেন — জি, পেয়েছি।

ঃ আমার হুজুরের শেষ নির্দেশ ঐ মাননৃপতির কন্যা লতাকে নিয়েই ঘর বাঁধতে হবে আমাকে। এর অন্যথা করা চলবে না। কিন্তু প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। এদিকে আবার যাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারলে জীবন আমার ধন্য হতো, আমি অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চাইতাম, আমার হুজুর আমাকে এমন বাঁধনে বেঁধে রেখে গেছেন যে, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধারও উপায় আমার নেই।

ঃ কেন নেই ?

ঃ তা আমি পারিনে। হুজুরের অন্তিম আদেশ অমান্য করে জিন্দেগীর তামাম সঞ্চয় আমি বরবাদ করতে পারিনে।

শরীফ রেজার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বিপুল আবেগ ভরে কনকলতা প্রশ্ন করলেন — তাহলে কে তিনি ? যাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারলে অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চাইতেন আপনি, সে মানুষটি কে ?

একটু চোখ খুলেই পুনরায় চোখ মুজলেন শরীফ রেজা। এরপর বললেন — আমি আগেই বলেছি, আজ আর আমি কিছুই গোপন করবো না। আমার সেই চির বাঞ্ছিত মানুষটি ছিলেন আপনিই।

কনকলতার ঠোঁট দু'টি বরাবরই অবাধ্য ছিল। কাঁপন কখনও থামেনি। এবার তারা ঝড়ের মুখে পাতার মতো থর থর করে কেঁপে উঠলো। কান্না আর কিছুতেই তিনি ধরে রাখতে পারলেন না। বিপুল বেগে ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর দুই চোখের বাঁধভাঙ্গা অশ্রু ধারার কিয়দংশ ঝড় ঝড় করে শরীফ রেজার গালে মুখে ঝরে পড়লো।

চমকে গিয়ে চোখ মেললেন শরীফ রেজা। অশ্রু বিহবল কনকলতাকে দেখে তিনি বড় কষ্ট পেলেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আফসোস্ করে বললেন — আমি জানি, একথায় আপনি বড় দুঃখ পাবেন। কিন্তু আমি নিরুপায় —

কনকলতা বাধা দিয়ে আকুলকণ্ঠে বললেন — না-না, দুঃখ নয়। আপনি বিশ্বাস করুন, আমার এই চোখের পানি দুঃখের পানি নয়। এ পানি আমার পরম আনন্দের পরম তৃপ্তির!

ঃ তৃপ্তির!

ঃ আমিই যে সেই মাননৃপতির কন্যা, আমিই সেই লতা, আমিই আপনার সেই লতিফা বানু বেগম!

সীমাহীন বিস্ময়ে দুই চোখ ফুটিয়ে তুলে শরীফ রেজা বললেন তার মানে!

ঃ আমার যে অতীত, আমার যে পরিচয় এযাবত আমি প্রাণপণে গোপন করে রেখেছি, এই আমার সেই অতীত, এই আমার সেই লুকিয়ে রাখা পরিচয়।

ঃ সেকি!

ঃ আমি কি জানি, যার ভয়ে অবিরাম আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, তিনিই আমার এই সবচেয়ে প্রিয়জন ? আবার একান্ত কাংখিত ও একান্ত কাম্যজন ?

খপ্ করে কনকলতার এক হাত দুই হাতের মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে বিহ্বল শরীফ রেজা উচ্ছ্বাস ভরে আওয়াজ দিলেন — কনকলতা!

ঃ একটু যদি জানতাম আগে সেটা! একটু সেটা কোনভাবে প্রকাশ পেতো যদি! এক সাথে রইলাম অথচ —

শরীফ রেজার শরীরে দ্বিগুণ শক্তি ফিরে এলো। খুশীতে ও আবেগে তিনি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠতে গেলেন। কনকলতা পুনরায় তাকে পূর্ববৎ শুইয়ে দিতে দিতে মিনতি করে বললেন সর্বনাস! করেন কি — করেন কি! আপনার পায়ে পড়ি! দোহাই! আমার কূলে ভিড়া ভরাতরী আর ডুবিয়ে আপনি দেবেন না। পুনরায় শুয়ে পড়ে শরীফ রেজা বিহ্বলকণ্ঠে বললেন — তাই তো আমার হুজুর আমাকে ঐ বাঁধনে বেঁধে রেখে গিয়েছেন! আমি নাদান, তাই কিছুই বুঝতে পারিনি। কি তাজ্জব! আপনিই, মানে তুমিই আমার সেই —

ঃ জি, আমিই তোমার সেই ঘরভাঙ্গা বউ। পালিয়ে যাওয়া পত্নী।

ঃ লতা —

ঃ জানের কাঁটাও বলতে পারো —

অশ্রুভেজা নয়নে কনকলতা মুখ টিপে হাসতে লাগলেন। শরীফ রেজার দুই চোখে আনন্দের ধারা ছুটলো। কনকলতা তা আঁচল দিয়ে সযতনে মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

—— সমাপ্ত ——